KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication ৯ মধুসূদন ঘোষ লেন, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher রঘুনাথ শীল
Title প্রকৃতি	Size 5.5" x 8" 13.97 x 20.32 c.m.
Vol. & Number : ৭/১–৮	Year of Publication : ১৩৩৩ Condition : Brittle ✓ Good
Editor : সত্যচরণ লাহা	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

চিত্রসূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা
১। ফনোফিল্ম বা সবাক চলচ্চিত্র—			
চিত্র ১—	...	...	৬
চিত্র ২—	...	...	৮
চিত্র ৩—	...	...	৯
চিত্র ৪—	...	...	১০
চিত্র ৫—	...	...	১২
চিত্র ৭ (ক)—	...	...	১৪
চিত্র ৭ (খ)—	...	...	১৪
চিত্র ৮—	...	...	১৫

শ্রীসরদারমল ছগমল।

১২২ নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা। এই দোকানে সকল প্রকার নূতন নূতন কাপড় ধোয়া ও কোরা দেশী ও বিলাতী ধুতি, সাটী, উড়ানি এবং পাটনাই ও দেশী খেড়ুয়া, ছিট, টিকিন মান্দ্রাজী ও বাণ্ডেজ ক্লথ, দেশী ও বিলাতী সকল রকম মশারির থান ও আসল বোম্বাই ও পার্শী সাটী ও স্বদেশী মিলের সকল রকম কাপড় বিশেষ সুবিধা দরে অতি অল্প লাভে পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে।

মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারিবেন।

লোকসানি কাপড় জোড়া না কাটিলে বা কাপড় পছন্দ না হইলে, তিন দিনের মধ্যে বদ্‌লাইয়া দেওয়া যায়।

নগদ মূল্য, একদর, ঠিক জিনিষ।

Health is Wealth—

—Happiness is Life !

Then why do you neglect your health and overlook your life ?

HEALTH & HAPPINESS

Will bestow upon you a superb virility of manhood and put you on the royal road to an unbroken happiness.

It meets every question that troubles your mind regarding health and sex always gives you the correct information.

It acts as priest to unite Doctor and Householder into an eternal bond of amiable understanding.

IT IS MAGAZINE WITH A PURPOSE.

Write for Sample Copy today lest you forget tomorrow

To The Manager—"Health & Happiness"

45, Amherst Street, Calcutta.

Read and be convinced.

Annual Subscription Rs. 2/- (*including postage*).

শীতলা বস্ত্রালয়

প্রসিদ্ধ পোষাক ও বস্ত্র বিক্রেতা

২০৮।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফ্যাক্টরীর দরে—শাল, আলোয়ান, বেনারসী প্রভৃতি

টাকায় /০ আনা লাভে যাবতীয় আরঙ্গের তাঁতের কাপড়

ব্যাজ লাভে

যাবতীয় মিলের কাপড়।

প্রোপ্রাইটার

৺সাধুচরণ রায় ও শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

হোলসেল ও রীটেল, লাইম এণ্ড স্যাণ্ড মার্চ্চেণ্টস্

হেড অফিস—১০ নং সাউথ শিয়ালদহ রোড, বেলিয়াঘাটা চুনাপটি।

ফোন নং ৪০৩৫ কলিকাতা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

৯ম বর্ষ | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ | ১ম সংখ্যা

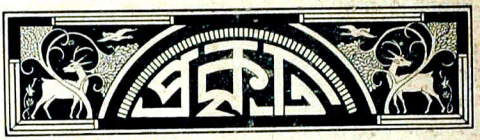

ফনোফিল্ম বা সবাক চলচ্চিত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ঠিক জীবন্ত প্রাণীর মত ছবির অঙ্গসঞ্চালন দেখিতে পাওয়া যাইবে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে ইহা যখন মানুষের নিছক কল্পনার বিষয় ছিল, সেই সময়ে ইংলণ্ডে রোজেট নামে (Peter Mark Roget) এক ভদ্রলোক ১৮২৪ খৃঃ অব্দে রয়েল সোসাইটীতে "চোখের পর্দ্দার উপর গতিশীল বস্তুর ছাপের স্থিতিকাল" (The persistence of vision with regard to moving objects) বিষয়ক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই প্রবন্ধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া হার্সেল (Sir John Herschel), ফারাডে (Michael Faraday), এণ্টোইন প্লেটো (Joseph Antoine Plateau) এবং ভিয়েনানগরীর Dr. Simon Ritter von Stampfer প্রমুখ পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে অগ্রসর হন। ইহার কিছুদিন পর—ঠিক ১৮৩১ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে মিঃ হরনার (W. G. Horner) Zeotrope বা "জীবনচক্র" নামক এক প্রকার যন্ত্র সাহায্যে গতিশীল ছবি দেখাইয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করেন। যন্ত্রটীর কার্য্য ও নির্ম্মাণকৌশল অতি সাধারণ; চলিবার ভঙ্গীতে একটি ঘোড়ার বিভিন্ন অবস্থার ছবি একটা মোটা 'সিলিণ্ডার' বা 'রোলারে'র গায়ে আঁটা থাকিত, এবং দর্শকদের সম্মুখ দিক হইতে একখানি বড় ধাতু বা কাষ্ঠফলক দ্বারা রোলারটীকে আড়াল করিয়া রাখা হইত। ঐ কাষ্ঠফলকের মধ্যস্থলে দেখিবার

মত একটী ছোট ছিদ্র থাকিত। ছিদ্রপথে চাহিয়া সিলিণ্ডারটী ঘুরাইলেই মনে হইত ছবির ঘোড়া, ঠিক জীবন্ত ঘোড়ার মত তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই ঘটনার পর হইতে অনেকে চলচ্চিত্রপ্রদর্শনের প্রকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। অনেকে অনেক রকম যন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন, কিন্তু কোনটাই তেমন কার্য্যকরী হইল না। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রেলিয়ার গোলন্দাজ সৈন্যদলের একজন অফিসার ব্যারণ ফ্রাঞ্জ (Baron Franz von Uchatius) "ম্যাজিক লণ্ঠনের" সাহায্যে ছবিকে পর্দ্দার উপর ফেলিয়া বড় করিয়া দেখাইবার উপায় উদ্ভাবন করেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক এডিসন আসরে অবতীর্ণ হন এবং "কিনেটোস্কোপ" নামক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া চলচ্চিত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার যন্ত্রটীতে দোষত্রুটী অনেক রহিয়া গেল। তিনি কিন্তু ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। উন্নতির চেষ্টা চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে Freize-Green লণ্ডন হইতে কতকটা সিনেমা-যন্ত্রের অনুরূপ এক যন্ত্র তৈয়ারী করেন। উন্নতির কার্য্য এইরূপে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে মায়ব্রিজ (E. Muybridge) অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের এক সিনেমা-যন্ত্র বাহির করেন। প্রকৃত উন্নতি তখনও তেমন কিছু হয় নাই। অনেক প্রকার কৌশল ও কায়দা করিয়া তখন মাত্র অল্প সময়ের জন্য ছবিকে সচল দেখানো সম্ভবপর হইত।

১৮৮১ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত 'কোডাক' ক্যামেরার আবিষ্কারক ইষ্টম্যান (যিনি সেদিন মাত্র আত্মহত্যা করিয়াছেন) ছায়াচিত্র তুলিবার 'ফিল্ম' আবিষ্কার করেন। ইহার অল্প কয়েক বৎসর পরেই, ১৮৯০ খৃঃ অব্দে সেলুলয়েড (celluloid) নির্ম্মিত 'রোল-ফিল্ম' আবিষ্কার চলচ্চিত্রের উন্নতির অন্যতম প্রধান ঘটনা। এই রোল-ফিল্ম আবিষ্কারের পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে চলচ্চিত্রের উন্নতি সুরু হয়। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে মিঃ মারে (E. J. Murey) রোল-ফিল্মের উপর ছবি তুলিয়া দীর্ঘ সময়ের জন্য অতি সুন্দর চলচ্চিত্র দেখাইয়া লোকের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে ফরাসী দেশের লুই ও লুমিয়ার (Louis and Auguste Lumiere) পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কার-সমূহ অবলম্বনে Cinematographe নামক চলচ্চিত্রপ্রদর্শনের এক সন্তোষজনক যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।* ঐ সময়েই ওয়াশিংটন হইতে আর্ম্মাট নামক (Thomas Armat) এক ভদ্রলোক বর্ত্তমান চলচ্চিত্রপ্রক্ষেপক যন্ত্রের (Cinema-Projector) মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তদবলম্বনে 'ভিটাস্কোপ' যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পর বৎসর—১৮৯৬ খৃঃ অব্দে—লণ্ডন নগরের রবার্ট পল 'থিয়েট্রোগ্রাফ' নামক আরও উন্নত এক যন্ত্র তৈয়ারী করেন।

---

* লুমিয়ার ও এডিসন প্রবর্ত্তিত যন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে, এডিসন সেকেণ্ডে সর্ব্বোপরি ৪৮ খানা ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু লুমিয়ার 'এক্সপোজারের' সংখ্যা অনেক কমাইয়া সন্তোষজনক ফললাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮১০ খৃঃ অব্দে সিবেক (J. T. Seebeck) রঙ্গীন আলোকচিত্র তুলিবার জন্য সচেষ্ট হন, তিনি কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে জেঙ্কার (W. Zenker), ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে লর্ড র‍্যালে (Lord Rayleigh) এবং ১৮৯০ খৃঃ অব্দে উইনার (O. Wiener) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে ১৮৯১ খৃঃ অব্দে প্যারী নগরীর লিপ্‌ম্যান (G. Lippmann) রঙ্গীন আলোকচিত্র তুলিবার প্রকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন।

১৯০৬ খৃঃ অব্দে মিঃ স্মিথ ও চার্লস আরবান (G. A. Smith and Charles Urban) "কিনেমাকালার" নামক যন্ত্র সহযোগে রঙ্গীন ছবি দেখাইয়া চলচ্চিত্রকে আরও সজীব ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলেন। এইরূপে ক্রমশঃ চলচ্চিত্রের দোষত্রুটী বহুলাংশে বিদূরিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে Sterioscopic ছবি অর্থাৎ সামনে-পিছনে উচুনীচু হুবহু জীবন্ত প্রতিকৃতি দেখাইবার ব্যবস্থাও উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

মানুষ কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় প্রতিকৃতির নিখুঁত গতিশীলতা দেখিয়া মানুষের মাথায় আর এক খেয়াল চাপিল;—ছবিকে যদি জীবন্ত প্রাণীর মত গতিশীল দেখানো সম্ভবপর হইল, তবে নির্ব্বাক ছবিকে সবাক করিয়া দেখানো সম্ভবপর হইবে না কেন? প্রশ্ন উঠিতেই সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা সুরু হইল। এডিসনই সর্ব্বপ্রথম 'কিনেমা' এবং তদীয় 'ফনোগ্রাফ' সহযোগে "কিনেটোফোন" যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া সবাক চিত্র প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন। এই যন্ত্রে চলন্ত ছবির অঙ্গ বা মুখভঙ্গীর সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া কুকুরের ডাক, বিড়ালের ডাক, মানুষের হাসিকান্না ইত্যাদি শোনানো যাইত। সেই যন্ত্র কিন্তু বেশীদিন আসর জমাইতে পারিল না; কারণ ফনোগ্রাফের শব্দের সঙ্গে অনেক সময় ছবির অঙ্গভঙ্গীর বৈসাদৃশ্য ঘটায় দর্শকের হাস্যরসের উদ্রেক করিত। কাজেই এই ব্যবস্থা ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইল।

সেলিনিয়াম সেলের (selenium cell) উপর আলোকরশ্মি ফেলিলে তড়িৎপ্রবাহের প্রতিবন্ধকতার পরিবর্ত্তন ঘটে, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে এই অদ্ভুত আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক জগতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ধাতুবিশেষের উপর আলোকপাত করিলে দেখা যায় যে, তাহার তড়িৎপরিচালন শক্তি বাড়িয়া যায়। 'সেলিনিয়াম' এই জাতীয় পদার্থ। কিন্তু ইহার একটা প্রধান অসুবিধা এই যে, আলোকপাতের ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ইহা কার্য্যকরী হয় না, অপেক্ষাকৃত কম দ্রুততার সহিত সাড়া দেয়। চূড়ান্ত শক্তি (maximum value) অর্জ্জন করিতে ইহার কম পক্ষে কয়েক সেকেণ্ড সময় অতিবাহিত হয়। আবার আলোকপাত বন্ধ করিলেও তড়িৎপ্রবাহের শক্তিহ্রাস ঘটিতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগিয়া থাকে। তথাপি আলোকপাতের তারতম্যানুযায়ী বৈদ্যুতিক প্রবাহের তারতম্য বা পরিবর্ত্তন ঘটাইবার এই সরল পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ায় বৈজ্ঞানিকদের অনেক জটিল সমস্যাসমাধান সহজসাধ্য হইয়া উঠে।

এডিসন-উদ্ভাবিত "কিনেটোফোন" সন্তোষজনকভাবে কার্য্যকরী না হওয়ায় বৈজ্ঞানিকেরা এই সেলিনিয়াম সেলের সাহায্যে সবাক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবার উপায় নির্দ্ধারণে মনোনিবেশ করেন।

১৯১৯ খৃঃ অব্দে র‍্যাঙ্কিন (A. O. Rankine) আলোকরশ্মির সাহায্যে শব্দতরঙ্গকে দূরে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে "ফটোফোন" নামক একপ্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।* এই যন্ত্রের নির্ম্মাণপ্রণালী সংক্ষেপতঃ এইরূপ :—

আলোকাধার হইতে আলোকরশ্মি 'লেন্সের' (lens) ভিতর দিয়া একখানি নিম্নপৃষ্ঠ দর্পণের (concave mirror) উপর প্রতিফলিত হয়। গ্রামোফোনের 'সাউণ্ড বক্সে'র মধ্যে যেরূপ পর্দ্দা থাকে, এই দর্পণখানি সেইরূপ একটী সাউণ্ড-বক্সের পর্দ্দার (diaphragm) সঙ্গে সংযুক্ত। আলো, এই দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় আর একখানি 'লেন্সে'র ভিতর দিয়া দূরে পতিত হয়। একই রকমের দুইখানা 'গ্রীড' (grid) বা ছাঁকুনি পূর্ব্বোক্ত লেন্স দুখানার প্রথমটির সম্মুখে ও দ্বিতীয়টির পশ্চাতে বসানো থাকে। যখন নিস্তব্ধতা বিরাজ করে, তখন প্রথম গ্রীডের ছায়া দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া দ্বিতীয় গ্রীড-খানার উপর সমানভাবে পতিত হয়। পর্দ্দার সামনে কথা বলিলে, পর্দ্দা কাঁপে এবং তৎসংলগ্ন নিম্নপৃষ্ঠ দর্পণও কাঁপিতে থাকে এবং তাহার উপর প্রতিফলিত গ্রীডের কালো ছায়াগুলি দ্বিতীয় গ্রীডের ফাঁকের মধ্যে নড়াচড়া করে অর্থাৎ আলোকরশ্মি শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হইতে থাকে এবং আলোর তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। এই আলোক-কম্পন একখানি সংগ্রাহক লেন্স (collecting lens) দ্বারা কেন্দ্রীভূত হইয়া তড়িৎকোষ (Battery) ও টেলিফোনসংযুক্ত সেলিনিয়াম সেলের উপর পড়িয়া ঠিক পূর্ব্বেকার শব্দ উৎপাদন করে। যদি "ফটোফোন-প্রেরকযন্ত্র" (Photophone transmitter) হইতে কেন্দ্রীভূত আলোকরশ্মি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে 'সিনেমা-ফিল্মের' উপর পতিত হয়, তবে শব্দানুযায়ী কম্পনের দরুণ আলোকের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ফিল্মের গায়ে অঙ্কিত হইয়া যাইবে এবং ফিল্ম 'ডেভেলপ' করিলে বিভিন্নগভীরতাবিশিষ্ট কালো রেখা ফুটিয়া উঠিবে।

আলোকাধার হইতে আলোকরশ্মি লেন্সের ভিতর দিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়া ফিল্মের গায়ের উক্ত বিভিন্নগভীরতাবিশিষ্ট কালো রেখার ভিতর দিয়া 'সেলিনিয়াম সেলের' উপর পতিত হইলে, আলোকের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্যানুসারে, তড়িৎপ্রবাহেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে এবং তৎসঙ্গে টেলিফোন বা 'লাউড-স্পীকার' যোগ করিয়া দিলে পূর্ব্বের শব্দ আবার শুনিতে পাওয়া যাইবে। যে পর্দ্দার উপর ছবি পড়ে, লম্বা লাইন জুড়িয়া টেলিফোন বা লাউড

* Phys. Soc. Proc., Aug. 15, 1919, xxxi (V) 242-264 and Feb. 15, 1920, xxxii (ii) 78-82.

স্পীকার তাহার পিছনে স্থাপন করা হয়। খুব স্পষ্ট শব্দ বাহির করিবার জন্য অন্যান্য অনেক খুঁটীনাটী কৌশল অবলম্বন করা হয়, বাহুল্য বোধে তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

কিন্তু সেলিনিয়াম-সেলের পূর্ব্ববর্ণিত অসুবিধার জন্য ফটোফোন সহযোগে সবাক চলচ্চিত্রও সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নাই।*

বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সেলিনিয়াম সেল অপেক্ষা আরও উন্নত ধরণের কয়েক প্রকার কৌশল উদ্ভাবিত হয়। সেলিনিয়ামের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; অন্য দুই প্রকার প্রক্রিয়ার কথা নিম্নে সংক্ষেপে বলিতেছি :—

কোন কোন পদার্থের উপর আলোকপাত করিলে, তাহার উত্তেজনা-প্রবণতার বিশেষত্বের দরুণ বৈদ্যুতিক চাপের (voltage) উন্মেষ ঘটে। "কপার-অক্সাইড" এই জাতীয় পদার্থ, উহার উপর আলোক পড়িলে রীতিমত বৈদ্যুতিক চাপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহারও খানিকটা জড়তা (time lag) আছে; তজ্জন্য সবাক চিত্রে তেমন কার্য্যকরী হয় না; কারণ দ্রুতপরিবর্ত্তনশীল আলোকরশ্মির সহিত সমতালে বৈদ্যুতিক চাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না।

কিন্তু ১৮৯০ খৃঃ অব্দে এলষ্টার এবং গিটেল উদ্ভাবিত 'ফটো-ইলেকট্রিক সেলে'র উপর আলোকসম্পাতে তাহার অদ্ভুত কার্য্যকরী শক্তি বর্ত্তমান সবাক চিত্রকে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যোপযোগী করিতে সমর্থ হইয়াছে। আলোকপাতে ইহা হইতে 'বিদ্যুতিন' (electorn) বিকীর্ণ হয় বলিয়া ইংরাজীতে ইহাকে Photo Emissive Light Sensitive Device বলা হয়।

বায়ুশূন্য কাচগোলকে (vacuum tube) ধাতুবিশেষের নিষ্ক্রিয় "এনোড" (inactive element) এবং সক্রিয় "ক্যাথোড" (active element) প্রান্তদুটী পরস্পর হইতে নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে স্থাপন করিয়া উহাতে ব্যাটারী হইতে নির্দ্দিষ্ট চাপের তাড়িত শক্তি প্রয়োগ করিলে ক্যাথোড্ প্রান্তের উপর আলোকরশ্মিপাতের অনুযায়ী তড়িতাণু বা বিদ্যুতিনের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। এই প্রক্রিয়ার সুবিধা এই যে, আলোকপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা এত দ্রুত সাড়া দেয় যে, আলোকপাত ও তৎপরক্ষণেই তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তির মধ্যে কতটুকু সময় ব্যয় হয়, এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই।

লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, সিজিয়াম প্রভৃতি ক্ষারধর্ম্মী ধাতু (alkali metals) হইতে এই জাতীয় "ফটো-টিউবের" সক্রিয় প্রান্ত বা ক্যাথোড্ নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী ফটো-টিউবের ক্যাথোড্-প্রান্তে সিজিয়মের খুব সূক্ষ্ম একটী আস্তরণ দেওয়া হয়।

* ইহার পর ১৯২৬ খৃঃ অব্দে "ভিটাফোন" নামে এক প্রকার সবাক চলচ্চিত্রের উদ্ভাবন হয়। ইহা কতকটা kinetophone-এর অনুরূপ; তবে রেকর্ড তুলিবার সময় শব্দতরঙ্গকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া এম্‌প্লিফায়ার সহযোগে বর্দ্ধিত করিয়া তদ্দ্বারা সিসকে কাঁপাইয়া রেকর্ড অঙ্কিত করা হইত।

এই জাতীয় ফটো-টিউবে আলোকপাতে বিকীর্ণ বিদ্যুতিনসমূহ যে পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহন করিয়া আনে, তাহা "থার্মো-আওনিক ভালভের" মধ্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহের তুলনায় অনেক কম। একটা সাধারণ ফটো-টিউবের ৩ সে. মি. ব্যাসবিশিষ্ট আলোকপথে

ফটো-ইলেক্ট্রীক-সেল।

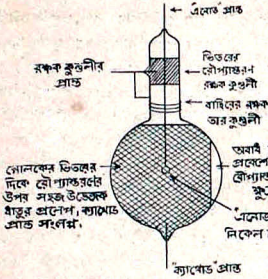

চিত্র—১

(window) ২০ সে. মি. দূর হইতে ১০০ ওয়াট বাতির আলোক ফেলিলে প্রায় এক "মাইক্রো-এম্পিয়ার" তড়িৎশক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু দুই উপায়ে এই শক্তিকে আরও বাড়াইয়া লওয়া যায়। এক উপায়ে টিউবের বাহিরে আলাদা লাইন (circuit) সংযোগ এবং অন্য উপায়ে টিউবের ভিতরেই তড়িৎশক্তি বৰ্দ্ধিত করা। এস্থলে জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, টিউব অথবা ভালভ্ দুই প্রকারের হইতে পারে; যথা:—শক্ত ভালভ্ এবং নরম ভালভ্। কাচগোলক বায়ুশূন্য করিয়া যদি শূন্যস্থান অন্য কোন গ্যাস দ্বারা পরিপূর্ণ না করা হয়, তবে তাহাকে শক্ত টিউব বা ভালভ্ (hard valve) বলে। আর যদি উক্ত বায়ুনিষ্কাশিত গোলক হিলিয়াম, নিওন, আরগণ, ক্রিপ্‌টন বা জিনন প্রভৃতির যে কোন একটী নিষ্ক্রিয় গ্যাস দ্বারা আংশিকভাবে পূর্ণ থাকে, তবে তাহাকে নরম টিউব বা ভালভ্ (soft valve) বলে। এই নরম টিউবের মধ্যেই উক্ত বিদ্যুৎপ্রবাহকে বৰ্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

আলোকরশ্মিপাতে টিউবের ক্যাথোড-প্রান্ত হইতে যখন বিদ্যুতিনগুলি বিপুল বেগে গ্যাসের মধ্য দিয়া ছুটিয়া বাহির হয়, তখন গ্যাসের অণুপরমাণুগুলির সঙ্গে তাঁহাদের ভীষণ সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায় এবং ধাক্কা লাগিয়া গ্যাসের অণুপরমাণু হইতে বিদ্যুতিন বিশ্লিষ্ট হইয়া

পড়ে। ঐ বিশ্লিষ্ট বিদ্যুতাণুগুলি বিকীর্ণ বিদ্যুতিনের সঙ্গে মিলিত হইয়া বৰ্দ্ধিত সংখ্যায় একসঙ্গে ছুটিতে থাকে। এই ব্যাপারটাকেই "সংঘর্ষণে আয়নোৎপত্তি" (Ionization by collision) বলে। ফটো-ইলেট্রিক-সেলের এনোড ও ক্যাথোডের মধ্যবর্ত্তী এবং আশেপাশের শূন্যস্থানগুলি গ্যাসপূর্ণ থাকায় এবং তাহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাশালী ব্যাটারীসংযোগজনিত আলোকপাতে ক্যাথোড হইতে নির্গত বিদ্যুতিনের পরিমাণ বৰ্দ্ধিত হইয়া এনোডে গিয়া পৌছায়। গ্যাসশূন্য 'সেলে' এইজন্যই বিদ্যুৎস্রোতের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে না।

কিন্তু এই উপায়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ যতটা বৰ্দ্ধিত হয়, তাহাতে বহুলোকের শ্রুতিগোচর হইতে পারে এরূপ বিরাট লাউড্-স্পীকার কার্য্যকরী হয় না। কাজেই এই বিদ্যুৎপ্রবাহকে আরও বাড়ানো দরকার। 'থার্ম্মআওনিক এম্‌প্লিফায়ার' বা তড়িৎস্রোত-পরিবর্দ্ধকযন্ত্র সাহায্যে এই প্রবাহকে বাড়াইয়া কার্য্যের উপযুক্ত করা হয়। নিম্নে এই 'থার্ম্মআওনিক ভালভ' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইল:—

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে বৈজ্ঞানিক এডিসন কার্ব্বণ বাতির (carbon filament lamp) অভ্যন্তরে নেগেটিভ্ ও পজিটিভ্ বাহুদুটীর মধ্যস্থলে একখানা ধাতুপাত্র বসাইয়া তার সংযোগে উহার অপর প্রান্ত তড়িৎমান বা "গ্যালভেনোমিটারের" মধ্য দিয়া বাতির বাহিরে তাহার পজিটিভ প্রান্তের সহিত যোগ করিয়া দেখিতে পান যে, গ্যালভেনোমিটারের মধ্য দিয়া তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই ব্যাপারটীকে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদিতে "এডিসন-এফেক্ট" বলা হয়। তখন যদিও তিনি ইহার কোন সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারেন নাই, তথাপি এই আবিষ্কারের সূত্র ধরিয়াই বর্ত্তমান থার্ম্মআওনিক ভালভের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছিল। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯০৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ বিষয়ের আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। অবশেষে ফ্লেমিং থার্ম্মআওনিক ভালভের মূলসূত্র ও "ট্রায়েড ভালভ" আবিষ্কার করিয়া জগৎবাসীর অশেষ ধন্যবাদভাজন হন। ১৯০৭ খৃঃ অব্দে ডি ফরেষ্ট (De Forest) অধিকতর কার্য্য-শক্তিসম্পন্ন ট্রায়োড এম্‌প্লিফায়ার আবিষ্কার করেন। এই থার্ম্মআওনিক ভালভ্ উদ্ভাবন ফলেই রেডিওফোন সহযোগে হাজার হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে মনুষ্যকণ্ঠস্বর মুহূর্ত্তমধ্যে সুস্পষ্টরূপে শ্রুতিগোচর হইতেছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একই ভালভ্ অবিরাম বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদন, অদৃশ্য তরঙ্গের অস্তিত্ব জ্ঞাপন এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ-পরিবর্দ্ধন—এই তিন প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

থার্ম্মআওনিক এম্‌প্লিফায়ারের মোটামুটী রহস্য এই যে, যখন বায়ুশূন্য কাচগোলকের অভ্যন্তরস্থ 'কার্ব্বণ ফিলামেণ্টের' মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহের দরুণ উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইতে থাকে, তখন ঐ প্রজ্বলিত ফিলামেণ্ট হইতে ঋণাত্মক তড়িৎশক্তি-বহনকারী অসংখ্য কণিকা (ions) একমুখীভাবে (unilateral direction) প্রবাহিত হইতে থাকে। যদি

এই কণিকাগুলিকে ধরিয়া আলাদা বৈদ্যুতিক পথে পরিচালিত করা যায়, তবে বৈদ্যুতিক বাতির বাহিরে ভিন্ন রকমের একটা তড়িৎস্রোত পাওয়া যাইবে। এডিসন এই প্রবাহই দেখিতে পাইয়াছিলেন। ফিলামেণ্টের যে অংশ তড়িৎপ্রবাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেই অংশটির চারিদিকে—ফিলামেণ্টের গায়ে কোন- রকমে না ঠেকাইয়া—যদি ভিন্ন আর একটা তড়িৎপ্রান্তের (electrode) সঙ্গে একখানি প্ল্যাটিনামের (Platinum) পর্দা চোঙ্গের

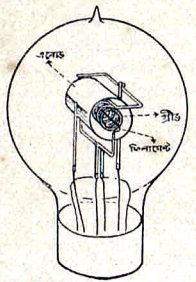

চিত্র—২

মত করিয়া আঁটিয়া দেওয়া যায়, তবে 'ফিলামেণ্ট' হইতে ছুটিয়া আসিয়া 'আয়ন'-গুলি প্ল্যাটিনাম-চোঙ্গের গায়ে পড়িবে এবং প্ল্যাটিনাম-প্লেটের অপর প্রান্ত বাতির পজিটিভ প্রান্তের সহিত অথবা অন্য কোন নিরপেক্ষ প্রান্তের সহিত যোগ করিয়া দিলেই সম্পূর্ণ আলাদা একটী প্রবাহ পাওয়া যাইবে (২নং চিত্র)।

একখানা অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট ছাঁকুনির উপর আর একখানা অনুরূপ ছাঁকুনি সমানভাবে রাখিলে ছিদ্রগুলি সমানই থাকিবে; কিন্তু একখানাকে স্থির রাখিয়া অপরখানাকে একটু এদিক ওদিক নাড়াইলে ছিদ্র ছোট বড়, বা- বন্ধ হইয়া যাইবে। সেইরূপ ফিলামেণ্ট ও প্লেটের মধ্যে যদি অন্ত আর একটী প্রান্ত (electrode) হইতে তড়িৎশক্তিসংবাহক তার সমান্তরালে —কাহারও গায়ে না ঠেকাইয়া—ফিলামেণ্টের চারিদিকে জড়ানো থাকে এবং এই তার-কুণ্ডলী (এক ফেরতাভাবে পর পর জড়ানো এই তারকুণ্ডলীকেই গ্রীড বলা হয়) যদি তড়িৎ-তরঙ্গের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তাহা হইলে ফিলামেণ্ট হইতে 'প্লেট' বা এনোড পর্য্যন্ত প্রবাহিত একমুখী ঋণাত্মক তড়িৎস্রোতের পক্ষে ঠিক পূর্ব্বোক্ত ছাঁকুনির মত কাজ করিবে, অর্থাৎ 'ফটো-ইলেক্‌ট্রিক সেলের' উপর আলোকপাতের তারতম্যানুযায়ী কম বেশী তড়িৎ-

প্রবাহ তরঙ্গের* আকারে উক্ত তারকুণ্ডলী বা গ্রীডে (grid) গিয়া পৌঁছিবে এবং এই তরঙ্গের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া উক্ত ঋণাত্মক তড়িৎবাহী আয়নসমূহ বেশী বা কম পরিমাণে 'প্লেটে' গিয়া পড়িবে। কাজেই প্রথমে কথা কহিবার বা গান গাহিবার সময় যেরূপ শব্দকম্পন উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই কম্পনই তাড়িত তরঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রীডে আসে; ইহাতে শব্দের বিভিন্ন সুর বা ভঙ্গী একই থাকে, কিন্তু পরিবর্দ্ধক যন্ত্র হইতে (Amplifier) অতিরিক্ত বিদ্যুৎস্রোত উহার সঙ্গে মিলিত হইয়া ঐ শব্দ বহুলাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ প্রথম এম্‌প্লিফায়ারের প্লেট হইতে বর্দ্ধিত তড়িৎতরঙ্গ দ্বিতীয় এম্‌প্লিফায়ারের গ্রীডে যায়, সেখানে আবার পূর্ব্বের তরঙ্গের তাল বজায় রাখিয়া আরও বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে ৪।৬টী এম্‌প্লিফায়ার ব্যবহার করিলে এই তড়িৎতরঙ্গ এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, বিরাট রঙ্গমঞ্চের পরিবর্দ্ধক-যন্ত্রের পর্দ্দা কাঁপাইয়া খুব জোরে শব্দ বাহির করিতে পারে।

৩নং চিত্রে আলোকরশ্মি ফিল্মের পার্শ্বে অঙ্কিত শব্দতরঙ্গের আলোকচিত্রের ভিতর দিয়া 'ফটো-টিউবের' উত্তেজক পর্দ্দায় পড়িলেই 'বি' ব্যাটারী হইতে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। এই প্রবাহ যে তারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহারই একাংশ 'ক' একটী

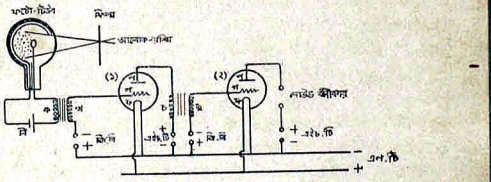

চিত্র—৩

লৌহদণ্ডের উপর একফেরতা করিয়া জড়ানো থাকে। অন্য একটী পাশাপাশি লাইন 'খ' উক্ত প্রথম কুণ্ডলীর উপরে ঠিক একফেরতা করিয়া জড়াইয়া তাহার অপর প্রান্তকে (১) এম্‌প্লিফায়ারের গ্রীডে লইয়া যাওয়া হয়। ব্যাটারীর তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা ১, ২ টিউবের 'ফ' 'ফ' ফিলামেণ্ট অনবরত প্রজ্বলিত অবস্থায় থাকে এবং উহা হইতে আয়নসমূহ 'প' 'প' প্লেট বা এনোডে গিয়া পড়ে। ফিলামেণ্ট ও প্লেটের মধ্যে 'গ' 'গ'

* এইস্থলে তড়িৎ-তরঙ্গ কথাটি প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সমভাবে চলিলে তাহাকে প্রবাহ বা স্রোত বলিলাম; কিন্তু অসমানভাবে অর্থাৎ প্রবাহ একটানা না চলিয়া কমবেশী ভাবে চলিলে কতকটা তরঙ্গ প্রকৃতির অনুরূপ হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

গ্রাউণ্ড অবস্থিত। ব্যাটারী হইতে তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হইলেই inductance-এর দরুণ 'ধ' কুণ্ডলীতে অনুরূপ প্রবাহের সৃষ্টি হইবে ও তাহা গ্রাউণ্ডে গিয়া পৌছিবে, এবং গ্রাউণ্ডের তড়িৎতরঙ্গের ন্যায় আবর্তসমূহও কম বেশী ভাবে (১) 'ন' প্লেটে গিয়া পৌছিবে; সেখান হইতে 'চ' কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া চলিবার সময় 'ছ' কুণ্ডলীতেও একই রকম প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া (২) গ্রাউণ্ডে পৌছিবে। এইরূপে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে স্বরবর্দ্ধক যন্ত্র বা লাউড-স্পীকারে গিয়া উপস্থিত হইবে।

এই 'এম্‌প্লিফায়ার' ও 'ফটো টিউব'ই সবাক চিত্রের সর্ব্বপ্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। সবাক চিত্র কি উপায়ে তোলা ও পুনঃপ্রদর্শিত হয়, এখন সে সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করিতেছি:—

সবাক চিত্রে কথার ছবি তুলিয়া লইতে হয়। ৪ নং চিত্রে দেখা যাইতেছে একজন বেহালাবাদকের সঙ্গে গায়িকা গান গাহিতেছেন (১), তাহাদের সম্মুখে চলচ্চিত্র তুলিবার

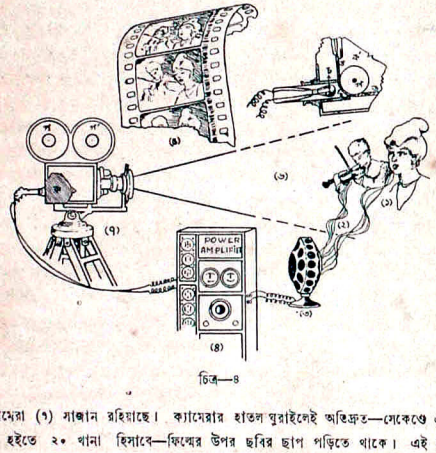

চিত্র—৪

ক্যামেরা (৭) সাজান রহিয়াছে। ক্যামেরার হাতল ঘুরাইলেই অতিদ্রুত—সেকেণ্ডে প্রায় ১৬ হইতে ২০ খানা হিসাবে—ফিল্মের উপর ছবির ছাপ পড়িতে থাকে। এই ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ফটো তুলিবার জন্যও ক্যামেরার মধ্যে অদ্ভুত কৌশলপূর্ণ একটী আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা আছে। আমরা যে সমস্ত জিনিষ চোখে দেখিতে পাই, ফটোগ্রাফে তাহাদেরই মাত্র ছবি তোলা যাইতে পারে এই আমরা জানি। কিন্তু শব্দ তো বাতাসের কম্পন মাত্র,

বাতাসকে তো আর চোখে দেখা যায় না, তবে সেই অদৃশ্য শব্দের ফটোগ্রাফ তোলা কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে। বিশেষ কৌশল করিয়া শব্দেরও ফটোগ্রাফ তোলা হইয়া থাকে। শব্দের ফটোগ্রাফ তোলার উপায় আবিষ্কৃত না হইলে সবাক চলচ্চিত্র এরূপ নিখুঁতভাবে প্রদর্শন করা সম্ভব হইত না। কি উপায়ে ইহা করা যায়, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি:—

গান গাহিলে বা কথা বলিলে, বায়ুর কম্পন গ্রামোফোনের পর্দ্দার (diaphragm) উপর পড়িয়া তাহাকে শব্দানুযায়ী কাঁপাইয়া তৎসংলগ্ন পিনের সাহায্যে দক্ষিণে বামে ঢেউখেলানো অথবা গভীর ও অগভীর দাগকাটা রেকর্ড নির্ম্মিত হয়; এক্ষেত্রে কিন্তু সেরূপ কিছুই হয় না। এস্থলে গানের বা কথার শব্দকে প্রথমে তড়িৎশক্তিতে পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত করা হয়। তৎপর সেই তড়িৎশক্তিকে আবার আলোতে রূপান্তরিত করিয়া বিভিন্ন গভীরতাবিশিষ্ট সাদা-কালো রেখায় ফটোগ্রাফ তোলা হইয়া থাকে।

শব্দের ফটোগ্রাফ দুই উপায়ে তোলা যাইতে পারে। এক প্রকারে, বিভিন্ন গভীরতার কালো রেখা অঙ্কিত হয়, ইহাকে ইংরেজীতে variable density records বলে। আর এক প্রকারে, চিরুণীর দাঁতের মত পাশের দিকে উঁচুনীচু ঢেউ-এর অনুরূপ বিভিন্ন কালো রেখা অঙ্কিত করা হয়; ইংরেজীতে ইহাকে variable width or area records বলে। এই প্রক্রিয়ায় আলোকরশ্মি ডাইনে-বায়ে কাঁপিতে পারে এরূপ দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া সূক্ষ্ম ফাঁকের (slit) উপর পতিত হয় এবং মাইক্রোফোন হইতে আগত স্বরতরঙ্গ বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত এবং এম্‌প্লিফায়ারের দ্বারা বিবর্দ্ধিত হইয়া ঐ দর্পণকে কাঁপাইয়া ঢেউ-এর মত কালো দাগ অঙ্কিত করে। বর্ত্তমানে বিভিন্ন ফিল্ম-কোম্পানী তাহাদের সুবিধানুযায়ী এই দুই প্রথার যে কোন একটী অবলম্বন করিয়া ফিল্ম তোলেন।

৪ নং চিত্রের গানের ঢেউ (২) আসিয়া মাইক্রোফোনে (৩) পড়িতেছে। সাধারণ টেলিফোনের কথাবলার যন্ত্রের মত শব্দকম্পনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বরবর্দ্ধক যন্ত্র বা মাইক্রোফোনের অভ্যন্তরস্থ লৌহপর্দ্দা সমান তালে কাঁপিতে থাকে। পর্দ্দার কম্পনে মাইক্রোফোনের তারকুণ্ডলীতে শব্দানুযায়ী তড়িৎশক্তির উদ্ভব ঘটে। ঐ তড়িৎপ্রবাহ তারের মধ্য দিয়া এম্‌প্লিফায়ারে (৪) পৌছিয়া প্রায় ১০০,০০০ গুণ বর্দ্ধিত হয়। এই বর্দ্ধিত তড়িৎশক্তি ক্যামেরার (৭) 'ক' চিহ্নিত স্থানে 'এয়ো-লাইট' (Aeo-light) নামক বিশেষভাবে নির্ম্মিত এক প্রকার বাতির 'চ' মধ্য দিয়া পরিচালিত হইবার সময় তাহার (বাতির) ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায়। 'ক' চিহ্নিত স্থানকে 'ক'' চিহ্নিত স্থানে বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে। 'গ' রীল হইতে 'ঙ' 'ঙ' ফিল্ম 'ন' রোলারের তলা দিয়া ঘুরিয়া আবার 'গ' রীলে গুটানো হইতেছে। 'ন' রোলারের গায়ের সঙ্গে খুব অল্প চাপে ঠেকানো একটী ছোট চোঙ্গ বা কুঠুরীর মধ্যে 'চ' এয়ো-লাইট স্থাপিত। 'ছ' একটী ক্ষুদ্র দ্বার বা পাশের দিকে লম্বা সূক্ষ্ম আলোক-পথ। ঐ পথ দিয়া এয়ো-লাইট হইতে আলো ফিল্মের গায়ে পড়িলেই আলোর ঔজ্জ্বল্যের

তারতম্যের দাগ অঙ্কিত হইয়া যায়। শব্দ জোরে হইলে আলোর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায় এবং শব্দ কম হইলে তড়িৎপ্রবাহের হ্রাস ঘটে এবং তাহাতে আলোর ঔজ্জ্বল্যও কমে। ফিল্ম

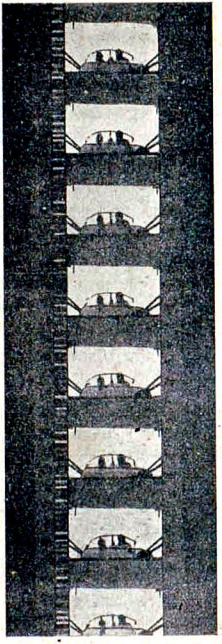

চিত্র—৫

ক্রমশঃ 'গ' রীলে গুটাইয়া যায় বলিয়াই ঐ দাগ পর পর অঙ্কিত হইতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে আবার বাদক ও গায়িকার বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবি পাশে পাশে পরের পর অঙ্কিত হইয়া যায়।

(৫) ফিল্ম তুলিয়া ডেভেলপ্ করিয়া দেখানো হইয়াছে। বামদিকে বাদক ও গায়িকার ছবি, ডানদিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কালো দাগ। উহাই গানবাজনার ফটোগ্রাফ। ৫ নং চিত্রে ফিল্মের এক অংশের ফটোগ্রাফ দেখানো হইল।

এস্থলে 'এয়ো-লাইট' সম্বন্ধে একটু বুঝাইয়া বলা দরকার। ইহা সাধারণ বিজলী বাতি হইতে ভিন্ন ধরণের। অনেক গবেষণা ও পরীক্ষার পর Case Research Laboratoryতে সবাক চিত্র তুলিবার উপযোগী এয়ো-লাইট তৈয়ারী হইয়াছে। বিভিন্ন শব্দের সূক্ষ্ম তারতম্য, প্রত্যেক খুটিনাটী, খুব ক্ষীণ শব্দ হইতে উচ্চ শব্দের বিভিন্নতার সঙ্গে —অন্য কোন জটিলতার সৃষ্টি না করিয়া—ফিল্মের উপর আলোর ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধির নিখুঁত ছাপ অঙ্কিত করা একটা গুরুতর সমস্যা ছিল। এয়ো-লাইটে তাহা দূরীভূত হইয়াছে। প্রায় ১½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট এবং ৬ ইঞ্চি লম্বা কাচ অথবা কোয়ার্টজ্ নির্ম্মিত গোলকের মধ্যে ½-ইঞ্চি চওড়া ও ½ ইঞ্চি লম্বা নিকেল পাতের (sheet nickel) 'এনোড' বসানো এবং বিপরীত দিকে U-আকৃতির ক্ষারধর্ম্মী মৃত্তিকার অক্সাইড-মিশ্রণ* দ্বারা আবৃত প্ল্যাটিনামের 'ক্যাথোড' স্থাপিত আছে। গোলকের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট চাপে হিলিয়ম গ্যাস ভর্ত্তি থাকে। সাড়ে তিন শত ভোল্ট, দশ মিলি-এম্পিয়ার তড়িৎস্রোত প্রবাহিত হইয়া 'ক্যাথোড' প্রান্ত নির্দ্দিষ্ট ঔজ্জ্বল্যের

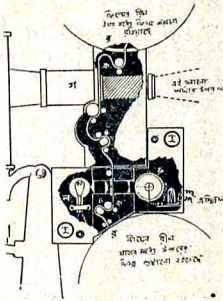

চিত্র—৬

কেন্দ্রীভূত আলোক প্রদান করিতে থাকে। ইহার উপর 'মাইক্রোফোন' হইতে তড়িৎশক্তির হ্রাসবৃদ্ধিতে আলোকের তীব্রতার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে।

এই ফিল্ম হইতে পুনরায় কি উপায়ে চলন্ত ছবির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া (synchro-

* A mixture of alkaline earthoxides.

nization) গান বা কথা বাহির করা হয় ৬ নং চিত্রে তাহা সরলভাবে দেখানো হইয়াছে। 'গ' সিনেমা-যন্ত্রের মধ্য দিয়া তীব্র 'আর্ক লাইট' 'ক' 'ক' ফিল্মের ছবিকে বর্দ্ধিত আকারে পর্দ্দার উপর ফেলিতেছে। উপরের 'ঘ' রীলে ফিল্ম গুটানো আছে। ফিল্মের অপর প্রান্ত সিনেমা-যন্ত্রের আলোকপথের মধ্য দিয়া চিত্রানুযায়ী বিভিন্ন রোলারের উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নীচের 'ঙ' রীলে জড়ানো হইতেছে। নীচের 'ল' চিহ্নিত আলোটিকে কোন নির্দ্দিষ্ট ভোল্টের তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা অনবরত প্রজ্বলিত রাখা হয়। ঐ বাতির আলোকরশ্মিকে 'চ' লেন্স দু'খানার মধ্য দিয়া কেন্দ্রীভূত করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে 'ক' 'ক' ফিল্মের সাদাকালো সূক্ষ্ম রেখাঙ্কিত অংশের ভিতর দিয়া 'ফ' চিহ্নিত 'ফটো-ইলেক্‌ট্রিক সেলে'র

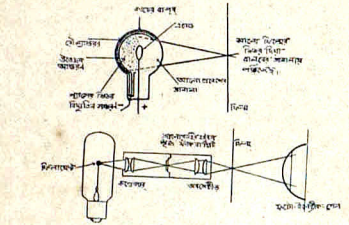

চিত্র—৭ (ক)

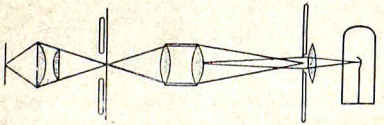

চিত্র—৭ (খ)

উপর ফেলা হয় (৭নং ক চিত্র)। ৭ নং খ চিত্রে নূতন আবিষ্কৃত উন্নত ধরণের আলোক-সম্পাত-প্রক্রিয়ার ছবি দেখানো হইয়াছে।

৬ নং চিত্রে পর্দ্দার উপর ছবি পড়িবার স্থান হইতে 'ন' চিহ্নিত আলো পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যবধান লক্ষিত হইতেছে। এই ব্যবধান দেখিয়া মনে হইতে পারে, ছবি অনেক আগে পর্দ্দার উপর পড়িতেছে এবং কথা অনেক পরে হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ঘটে না, কারণ প্রথম ছবি তুলিবার সময়ও চেহারার এবং কথার ফটোর মধ্যে ঠিক অতটাই ব্যবধান ছিল।

কাজেই এক সময়ে কথা ও চেহারা দুইই শোনা ও দেখা যাইবে। 'ন' চিহ্নিত বাতি হইতে ফিল্মের বিভিন্নগভীরতাবিশিষ্ট কালো শব্দরেখার ভিতর দিয়া আলোক চলিয়া যাইবার সময় তাহার তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে এবং তদনুসারে ফটো-টিউবের মধ্যে তড়িৎস্রোত উৎপন্ন হইবে। এই হ্রাসবৃদ্ধি অনুযায়ী তড়িৎতরঙ্গ পূর্ব্বোল্লিখিত এম্‌প্লিফায়ারের মধ্য দিয়া বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া পর্দ্দার পিছনে বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে স্থাপিত বিরাট লাউড্-স্পীকারের তারকুণ্ডলীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলেই শ্রোতের তারতম্যানুযায়ী কখনও জোরে, কখনও বা আস্তে কাঁপিয়া অভিনেতা-অভিনেত্রীর কণ্ঠস্বর অবিকল উৎপাদন করিবে।

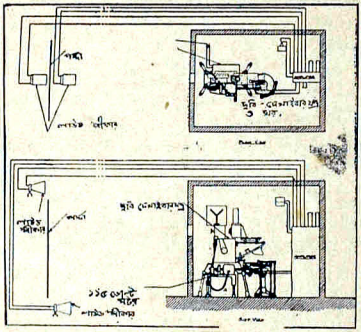

চিত্র—৮

৮ নং চিত্রে উপরে ও নীচে লাউড্-স্পীকার ও সিনেমা-প্রদর্শকযন্ত্র স্থাপন করিবার দুই বিভিন্ন প্রকার ছবি দেওয়া হইল।

গ্রহগণের জন্মকথা বা জড়ের জন্মমৃত্যু রহস্য

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

বেদে কথিত আছে, মহাপ্রলয়কালে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন। পরে অন্ধকার জন্মলাভ করিল। তৎপরে সৃষ্টি আরম্ভকালে জলপূর্ণ সমুদ্র উৎপন্ন হইল, সেই জল হইতে বিশ্বপ্রকটনকারী বিধাতা জন্মিলেন। তিনি দিবাপ্রকাশক রবি ও রাত্রিপ্রকাশক চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া বৎসর কল্পনা করেন। অর্থাৎ তদবধি দিনরাত্রি, ঋতু, অয়ন, বর্ষ প্রভৃতি হইতে লাগিল। অতঃপর ক্রমে ক্রমে স্বঃ (বুধ) ভুবঃ (শুক্র) ভূঃ (পৃথিবী) মহলোক (মঙ্গল) জনলোক (বৃহস্পতি) তপলোক (শনি) সত্যলোক (ইউরেনাস্) সৃষ্ট হইল। তার পর তিনি কল্পনা করিলেন যে, আমি বহু হইব; ফলে এক পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা বহু জীবাত্মারূপ ধারণ করিলেন। জীবের সৃষ্টি হইল, স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বিকশিত হইল।

সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থার নাম "অব্যক্ত"। ইহাই হইল মূলা প্রকৃতি। প্রকৃতির গুণ-বৈষম্যে 'মহান্' সৃষ্টি হইল। মহামন, বুদ্ধি ও চিত্ত 'মহান্' শব্দের অন্তর্গত। মহান্ হইতে 'অহঙ্কার' জন্মিল। মহান্ হইল মূল প্রকৃতির বিকৃতি, কিন্তু ইহা অহঙ্কারের প্রকৃতি। অহঙ্কারটি মহানের বিকৃতি, কিন্তু পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ ইহাদিগকে পঞ্চ তন্মাত্র বলে; অহঙ্কার হইতে ইহাদের জন্ম। সাংখ্যদর্শন সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়া অপর সাতটিকে অর্থাৎ মহান্, অহঙ্কার, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহাদিগকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলিয়াছেন। গীতা বলিতেছেন

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। ৭ অঃ, ৪ শ্লোক।

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটি ঈশ্বরের প্রকৃতি। মূল প্রকৃতি সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া তজ্জাত 'মহান্'ও ত্রিবিধ। মহান্ ত্রিবিধ বলিয়া তজ্জাত অহঙ্কারও ত্রিবিধ; যথা সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার ও তামসিক অহঙ্কার। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়, দেবতা ও মন জন্মিয়াছে। সূর্য্য, দিক্, বায়ু, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি—ইহাদিগকে ইন্দ্রিয় দেবতা বলে। রাজস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মলাভ করিয়াছে। তামস অহঙ্কার হইতে শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র জন্মিয়াছে। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূল ভূত জন্মিয়াছে; অর্থাৎ শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে আকাশের সহিত বায়ু, রূপ-তন্মাত্র হইতে আকাশ ও বায়ুর সহিত তেজ, রস-তন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু ও তেজের সহিত জল এবং গন্ধ-তন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলের সহিত ভূমির সৃষ্টি হইয়াছে।

আবার ভূতপঞ্চকের রজঃ অংশ হইতে পঞ্চপ্রাণ সৃষ্ট হইল; পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণে সমুদয় জড়দেহ এবং উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ এই চতুর্বিধ জীবের সৃষ্টি হইল। এইরূপে বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে।

বাইবেল বলে, ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাবলী তিনি সৃজন করিয়াছেন; জল-স্থল-অন্তরীক্ষ ও যাবতীয় সচেতন জীব তাঁহার সৃষ্টি। এই বিরাট সৃষ্টি-ব্যাপার মাত্র ৬ দিনে অবিরাম পরিশ্রম করিয়া তিনি শেষ করেন এবং বিপুল শ্রমের পর সপ্তম দিবসে বিশ্রাম উপভোগ করেন। এই সৃষ্টি ব্যাপারটা প্রায় ৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছে।

তার পর বিজ্ঞানের কথা। সৌরজগৎ-পরিব্যাপ্ত মহাকর্ষণের (Gravitation) ফলাফল গণিতশাস্ত্রযোগে অতি সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিবার জন্য মহামতি ল্যাপ্‌লাস্ (Laplace) সারাজীবন অতিবাহিত করেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি গ্রহগণের গতিবিধির মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। গ্রহগুলির কক্ষ প্রায় বৃত্তমত। এই বৃত্তগুলি আবার প্রায় একই তলে (in one and the same plane) অবস্থিত; এই তলটী রবির বিষুবরেখা হইতে খুব দূরবর্ত্তী নহে, অতি নিকটেই অবস্থিত। তিনি আরও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, সকল গ্রহই রবির চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং একই দিকে ঘুরিতেছে। গ্রহগুলি আবার নিজ নিজ নাভিরেখার (অক্ষরেখা বা axis) চারিদিকেও ঘুরিতেছে। রবির চারিদিকেই ঘুরুক বা নিজ নাভিরেখার চারিদিকেই ঘুরুক, গ্রহগণ ঠিক একই দিকে ঘুরিতেছে—ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি আরও বিস্মান্বিত হইয়াছিলেন। উপগ্রহগুলিও গ্রহগণের ন্যায় সেই একই দিকে ঘুরিতেছে; কেহ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, আবার কেহ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে যাইতেছে এরূপ নহে, সকলেই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে যাইতেছে। এই যে ঘোরার দিক্ সম্বন্ধে একটা মিল, একটা সামঞ্জস্য—ইহাও তাঁহাকে কম বিস্মিত করে নাই। তিনি ভাবিতেন, এই যে সামঞ্জস্য বা মিল, ইহা কি দৈবক্রমে ঘটিয়াছে, অথবা ইহা কোন আইনকানুন বিধিনিষেধের বশীভূত? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এ সম্বন্ধে একটা মতবাদ বা থিওরি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। উহা "নেবুলার থিওরি" (Nebular Theory) নামে জগতে পরিচিত।

সৌরজগতের সৃষ্টিতত্ত্ব অর্থাৎ সূর্য্যচন্দ্রাদি গ্রহ-উপগ্রহগণ কিরূপে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য পুরাকালের পণ্ডিতগণ নেবুলার থিওরির অবতারণা করিয়াছিলেন, এই থিওরি পর্য্যবেক্ষণ বা গণিতশাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর নহে; ইহা একটা অনুমান মাত্র। অনুমান হইলেও তখনকার দিনে লোকে ইহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাইত। এমন কি জ্যোতিষিগণ নতশিরে ইহাকে মানিয়া লইয়াছিলেন।

সৌরজগতে এমন অনেক ব্যাপার দেখা যায়, যাহাতে মনে হয়, ইহার অন্তর্গত সমুদয় গ্রহ-উপগ্রহগণ এক বস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; উহাদিগের আদি পুরুষ এক, সকলেই

এক গোত্র। ধূমকেতুর কথা আমরা বাদ দিয়া রাখিব। ধূমকেতুগুলি সৌরজগতের অঙ্গ, না, উহারা অনন্ত আকাশ হইতে আসিয়া সৌরজগতের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে—তাহা আমরা জানি না। যদি তাহারা সৌরজগতের অঙ্গই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা সূর্য্য হইতেই বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমান ভ্রমণপথ আলোচনা করিয়া শত শত যুগ পূর্ব্বে উহাদের কক্ষ কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। এই কারণেই ইহাদিগকে প্রথমে আমরা এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া নেবুলার থিওরি আলোচনা করিব।

ধূমকেতুগুলিকে বাদ দিলেও সৌরজগতের অঙ্গসংস্থান প্রায় দুই তিন শত বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রায় সকলেই নেবুলার থিওরির পরিপোষক এবং ইহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম ও গুণ পর্য্যালোচনা করিলে নেবুলার থিওরির সত্যতা উপলব্ধি হয়। প্রথম লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রবির চারিদিকে তাহারা সকলে একই দিকে (পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে) ঘুরিতেছে। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহগণ রবিকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণ করিয়া নিজ নিজ কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা যে কেবল বড় বড় গ্রহের বেলায় সত্য, তাহা নহে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় দুই শত "টুকরো" গ্রহও (asterides) এই নিয়মের অধীন। গ্রহগণের কক্ষ প্রায় বৃত্তের মত এবং সকল কক্ষ প্রায় একই তলে (plane) অবস্থিত। এগুলি পর্য্যবেক্ষণের ফল। এখন কথা এই যে, ইহারা দৈবক্রমে সকলে একই দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, না, কোন বিশেষ বিধির বশবর্ত্তী হইয়া সকলে এক দিকে ঘুরিতে বাধ্য হইয়াছে? দৈবক্রমে সকলে এক দিকে ঘুরিতেছে—এ কথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে না। দু-একটা গ্রহ হইলে দৈবের কথা আসিতে পারিত, কিন্তু প্রায় আড়াই শত গ্রহ একই দিকে ঘুরিতেছে—ইহা দৈবের আশ্রয় লইয়া বুঝিতে যাওয়া বাতুলতা। ইহার নিশ্চয়ই একটা গূঢ় কারণ আছে। শুধু যে গ্রহগণ একই দিকে ঘুরিতেছে, তা নয়; উপগ্রহগুলিও গ্রহগণ যে দিকে ঘুরিতেছে সেই দিকে ঘুরিতেছে। গ্রহগণ আবার স্ব স্ব অক্ষরেখার (নাভিরেখা বা axis) চারিদিকে সেই একই দিকে (পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে) ঘুরিতেছে। সুতরাং এতগুলি তথ্যব্যাখ্যার জন্য দৈবের কথা তোলা যাইতে পারে না।

গ্রহ-উপগ্রহগণের একই দিকে ঘোরার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধির জন্য নেবুলার থিওরির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অনেক নিভৃত চিন্তা ও গভীর গবেষণার পর ল্যাপলাস্ মানসচক্ষে দেখিলেন যে, বহু পুরাকালে—সেই আদি যুগে—রবি একটা আবছা ধোঁয়ার মত দিগন্তব্যাপী বিরাট আবরণে আবৃত ছিল। রবির এই বিরাট আবরণ, গ্রহগণ এখন যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিপুল ধূম্রবৎ আবরণের কেন্দ্রে রবি অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত পদার্থ। এই সুবিশাল ধূমমণ্ডল (nebulous atmosphere) নিজ অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরিতেছে। যত সময় যাইতেছে, ততই এই বিরাট ধূমমণ্ডল শীতল হইতেছে; যত শীতল হইবে, ততই কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্টিত

নেবুলার থিওরি

হইবে (চুপ্‌সাইয়া যাইবে) এবং যত আকৃষ্টিত হইবে, গতিবিজ্ঞানের বিধি অনুযায়ী ততই অধিক বেগে ঘুরিতে থাকিবে। কাজেই কেন্দ্রবিমুখ বল (centrifugal force) কেন্দ্রমুখী বল অপেক্ষা অধিক হইবে। ফলে, আবরণের বহির্দ্দেশের একটা স্তর আলাদা হইয়া যাইবে। ধূমমণ্ডলের অবশিষ্ট অংশ ক্রমে শীতল হইলে আবার আকৃষ্টিত হইবে এবং উহার বেগবৃদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় আবার একটা স্তর মুখ্য আবরণ হইতে স্খলিত হইয়া যাইবে; এইরূপে কালে ভিন্ন ভিন্ন স্তর মূল আবরণ হইতে পৃথক্ হইতে থাকিবে। ইহা হইতে বেশ অনুমান করিতে পারা যায় যে, ধূমমণ্ডল ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেন্দ্রীয় স্তরের সহিত একই দিকে ঘুরিতে থাকে। এখানে মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বিরাট ধূমমণ্ডলের সহিত রবি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক স্তর তাপবিকিরণের নিয়মানুযায়ী তাপ বিকিরণ করিতে করিতে শীতল হইতে থাকিবে; ক্রমে শীতলতা হেতু বায়বীয় আকার ত্যাগ করিয়া তরল আকার (liquid) ধারণ করিবে। যদি স্খলিত স্তরের গভীরতা সকল স্থানে সমান হয়, তাহা হইলে সেই স্তর শীতল হইবার কালে অসংখ্য গ্রহের সৃষ্টি করিবে। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষদ্বয়ের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ সমাবেশ এইরূপেই হইয়াছে।

কিন্তু সাধারণতঃ সম-গভীরতার স্তর মূল আবরণ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয় না। যে স্তর বিচ্ছিন্ন হয়, তাহার গভীরতা সকল স্থানে সমান নহে; কোন স্থানে বেশী, কোন স্থানে খুব কম। তাপবিকিরণের ফলে এরূপ স্তর যখন শীতল হয়, তখন যে অংশে গভীরতা বেশী, সেই অংশে যাইয়া পদার্থ (mass) জমিতে থাকে। ফলে যখন শীতল হইয়া কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়, তখন স্তরমধ্যস্থ প্রায় অধিকাংশ পদার্থই ঘনীভূত হইয়া গ্রহের সৃষ্টি করে এবং এই সকল গ্রহ পূর্ব্বের ন্যায় একই দিকে ঘুরিতে থাকে। স্তরের আকুঞ্চনকালে উপগ্রহের সৃষ্টি হয়। যে নিয়মের ফলে গ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে, সেই নিয়মের বলেই উপগ্রহের সৃষ্টি। আদিতে সমস্ত ধূমমণ্ডল উহার অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরিত; যখন উহা হইতে এক একটী স্তর পৃথক হইতে লাগিল, তখন উক্ত স্তরগুলি তাহাদের পূর্ব্বের গতিহারা হইল না। তাহারা ঘূর্ণায়মান ধূমমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইল বটে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে যে দিকে ঘুরিতেছিল, পরেও সেই দিকেই ঘুরিতে লাগিল; কঠিন গ্রহে বা উপগ্রহে পরিণত হইলেও এই ঘোরার পরিবর্ত্তন ঘটিল না। ইহাই হইল নেবুলার থিওরি।

আর একটা দিক আছে। সে দিক দিয়াও আমরা এই প্যাপারটি বিচার করিতে পারি। রবিকে বর্ত্তমানের অবস্থায় রাখিয়া সেই আদি যুগে উহার কি অবস্থা ছিল, বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। রবি হইতে বর্ত্তমানে দৈনিক যে বিপুল তাপ বিকীর্ণ হইতেছে, উহার আলোচনা করিলে নেবুলার থিওরি মানিতে বাধ্য হইতে হয়। প্রত্যহ রবি হইতে কতখানি তাপ বহির হয়, তাহা গণনা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে, এবং পৃথিবীতে দৈনিক কতখানি তাপ আসিয়া পড়ে, তাহাও নির্ণীত হইয়াছে। রবি হইতে যতখানি তাপ বিকিরণ হয়, তাহার

২২০০০০০০০০০ অংশ পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, রবিনিঃসৃত তাপপ্রবাহের অধিকাংশই বিরাট আকাশে (space) নষ্ট হইয়া যায়। এই তাপ আসে কোথা হইতে? যদি কেহ মনে করে যে, রবি নিজের দেহমধ্যে বিপুল পরিমাণে তাপ লইয়া বসিয়া আছে এবং সেই তাপ যুগযুগান্তর ধরিয়া বিকিরণ করিতেছে, তাহা হইলে সে অনুমান ভ্রান্ত হইবে। কেন না, যুগযুগান্তর ধরিয়া রবি যদি তাপবিকিরণ করিতে থাকে এবং অন্য কোন দিক হইতে তাপ আসিয়া উহাতে পৌঁছাইতে না পারে, তাহা হইলে উহার তাপ ক্রমেই কমিয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু রবি-তাপের কম হইবার কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পান নাই। দু-হাজার বৎসর পূর্ব্বে রবি হইতে যে পরিমাণ তাপ বিকীর্ণ হইত, এখনও সেই পরিমাণ তাপ বিকীর্ণ হইতেছে; ফলে রবির অনেক হাজার ডিগ্রি গরম (temperature) কমিয়া যাইবার কথা। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা উহার কোন প্রমাণ আজও পান নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, রবি নিজস্ব উত্তাপ ছাড়া উহা অন্য কোন উপায়েও তাপ পাইয়া থাকে। রবি যে পরিমাণে তাপ বিকিরণ করিতেছে, সেই পরিমাণে আর কোন উৎস হইতে সে তাপ সংগ্রহ করিতেছে। তাই উহার গরম যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সমভাবে আছে; বাড়েও না, কমেও না।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, দহন-ক্রিয়া (combustion) দ্বারা রবির মধ্যে তাপ উৎপন্ন হইতেছে। গণনা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, রবির এক বর্গফুট হইতে যে পরিমাণ তাপ বাহির হইয়া আসে, ২০ টন কয়লা পোড়াইলে সেই পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়। যদি রবি কয়লার মত উত্তম দাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে কয়েক হাজার বৎসর মধ্যেই সমস্ত পদার্থ পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত; এতদিনে রবির অস্তিত্বই থাকিত না। সুতরাং দহন-মতবাদের দ্বারা রবিতাপের সমতা ব্যাখ্যা করা যায় না।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রবির উপর অসংখ্য উল্কাপাতের ফলে তাপোৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন উল্কাপিণ্ড বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবার সময় একটা আলোক-রেখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং বায়ুমণ্ডলের সেই অংশ গরম হইয়া উঠে। এই সূত্র ধরিয়া কেহ কেহ রবিতাপের সমতা বুঝিবার জন্য উল্কাপাত থিওরির অবতারণা করেন। কিন্তু বিচারের কষ্টিপাথরে ইহাও টেঁকে না। কেনন', রবিতাপের সমতা রক্ষা করিতে হইলে প্রতি-বৎসরে উল্কাপিণ্ডের পরিমাণ চন্দ্রের ওজনের সহিত সমান ধরিতে হয়। এমন কোন উৎস দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখান হইতে এই বিশাল উল্কাপিণ্ড আসিয়া রবির উপর পড়িতে পারে। এই কারণে এই থিওরিও আমরা ত্যাগ করিতে বাধ্য।

রবি একটি উজ্জ্বল জলন্ত পিণ্ড, সর্ব্বদাই তাপ বিকিরণ করিতেছে। ইহার শীতল না হইবার দুই কারণ; যথা, (১) ইহার সুবিপুল পদার্থ (mass); এবং (২) তাপের সাধারণ নিয়ম। অবশ্য ইহার সঙ্গে আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যখন

প্রকৃত কারণ

কোন শক্তি (energy) এক আকারে লোপ পায়, তখন উহা অপর আকারে দেখা দিয়া থাকে।

রবি যখন তাপবিকিরণ করিতে থাকে, তখন ইহা আকুঞ্চিত হয়। ইহার এক এক জোড়া জড়কণা আকুঞ্চিত হইবার পূর্ব্বে যতদূরে ছিল, আকুঞ্চিত হইবার পরে আর ততদূরে থাকে না, পরস্পরের নিকটে সরিয়া আসে। কাজেই আকুঞ্চিত হইবার পর উহাদের শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। শক্তি কখনও অপচয় হয় না, যতটুকু শক্তি কমিয়া যায়, ততটুকু শক্তি তাপরূপে দেখা দেয়। রবি তাপবিকিরণের দ্বারা আকুঞ্চিত হইতেছে বটে, কিন্তু আকুঞ্চন হেতু তাপের সৃষ্টিও হইতেছে; এবং এই নবোদ্ভূত তাপ যতক্ষণ না বিকীর্ণ হইয়া যায়, ততক্ষণ রবি আর সঙ্কুচিত হয় না। এইরূপে রবি আকুঞ্চনে বাধা পায় ও তাপের সমতা রক্ষা করে।

বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, রবি আকুঞ্চিত হইতেছে। প্রতি শতাব্দীতে অর্থাৎ প্রতি এক শত বৎসরে রবির ব্যাস ৪ মাইল করিয়া কমিয়া যাইতেছে। রবির ব্যাস প্রায় দশ লক্ষ মাইল। এই বিশাল ব্যাসের তুলনায় ৪ মাইল দূরত্ব, বলিতে গেলে, কিছুই নয়। যতই কম হউক, রবি যে ক্রমশঃ আকুঞ্চিত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হাজার বৎসর পূর্ব্বে রবির ব্যাস ছিল এখনকার ব্যাস অপেক্ষা চারি লক্ষ মাইল বেশী। তাহা হইলে দেখা যায় যে, আমরা যত অতীতের দিকে পিছাইয়া যাইব, রবির ব্যাস তত বাড়িতে থাকিবে। রবির ব্যাস বাড়িয়া যাওয়া মানে রবির আয়তন বাড়িয়া যাওয়া। এইরূপে যদি আমরা পিছাইয়া সেই পুরাকালে গিয়া পৌঁছাই, তখন রবির আয়তন এত বাড়িয়া যাইবে যে, আমাদের পৃথিবী স্পর্শ করিবে; আরও পিছাইয়া গেলে রবির আয়তন আরও বাড়িয়া বৃহস্পতিকে স্পর্শ করিবে; তারপর আরও পিছাইয়া গেলে রবি নেপচুনকে স্পর্শ করিবে। রবির আয়তন এরূপে বাড়িতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে উহার পদার্থ (mass) বাড়ে না। কাজেই সেই আদি কালে যখন ইহার আয়তন নেপচুন প্রভৃতি গ্রহ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল, তখন ইহার অণুগুলি অতীব বিরল হইয়া পড়িয়াছিল অর্থাৎ তাহারা পরস্পর হইতে অতি দূরে দূরে অবস্থান করিত। ইহাকেই—এই অবস্থাকেই নেবুলার বা অস্পষ্ট বা আব্ছা অবস্থা বলে। নেবুলার অবস্থা হইতে পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে সৌর-জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাপ-গতিবিজ্ঞানের (Thermodynamics) অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হয়; ফলে উহা বিজ্ঞান জগতে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হেলমহোলৎজ (Helmholtz) বলেন যে, আকুঞ্চনমান নেবুলার মহাকর্ষণ-

চেম্বারলিন-মৌলটনের গ্রহজন্মবাদ

জনিত স্থিতিজ শক্তি দ্বারাই (potential energy) রবির তাপবিকিরণের হার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, এই থিওরি দ্বারা রবি যে এখনও প্রায় ২ কোটি বৎসর ধরিয়া বর্ত্তমান হারে তাপ বিকিরণ করিবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু ভূতত্ত্ববিৎ রবির কোষ্ঠী আলোচনা করিয়া উহার আয়ু আর এককোটি বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

থিওরি যত সরল হইবে, উহার প্রতি লোকের তত শ্রদ্ধা জন্মিবে। ল্যাপ্লাস-

হেল্‌মহোল্‌ৎজের নেবুলার থিওরির সরলতায় মুগ্ধ হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর সুধীবৃন্দ উক্ত থিওরির গোঁড়া ভক্ত হইয়াছিলেন। উহা দ্বারা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। উক্ত মতবাদ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকায় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কেল্‌ভিন (Lord Kelvin) সর্ব্বসাধারণের নিকট উহাকে অভ্রান্ত থিওরি বলিয়া জোর গলায় প্রচার করিয়াছিলেন।

কিন্তু নেবুলার থিওরি অনুযায়ী সৌরজগতের উৎপত্তি ও স্থিতির যে কাল নির্দ্দেশ করা হয়, উহা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মনঃপুত হয় নাই। কাজেই তাঁহাদিগের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল। এখন লর্ড কেলভিনের বক্তৃতার ফলে তাঁহারা আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

চেম্বারলেন (T. C. Chamberlain) চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিভাগের সার্ব্বভৌম কর্ত্তা ছিলেন। তিনি কেল্‌ভিনের মত সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৮৯৯ সালে নেবুলার থিওরি সম্বন্ধে কেল্‌ভিনের বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই চেম্বারলেন কেল্‌ভিনের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক ও অসত্য বলিয়া প্রচার করেন। তিনি বলেন যে, নেবুলার থিওরি ফগভঙ্গুর ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। চেম্বারলেন অকাট্য যুক্তিদ্বারা নেবুলার থিওরি ভূমিসাৎ করিলেন। সেই সময় হইতেই সৃষ্টিবিজ্ঞানের নবযুগ আরম্ভ।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের কর্ত্তা মৌল্‌টন্ (F. R. Moulton) গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সহযোগিতায় চেম্বারলেন যে কেবলমাত্র নেবুলার থিওরির গলদগুলি দেখাইলেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে একটা নূতন থিওরিও গড়িয়া তুলিলেন। তিনি ইহাকে গ্রহজন্মবাদ (Planetesimal theory) নামে অভিহিত করিলেন। পুরাতন সৃষ্টিবিজ্ঞানের মূল কথা—আবর্ত্তনহেতু অস্থিরতা;* নব্য সৃষ্টিবিজ্ঞানের মূল কথা হইল—দুইটি তারকা খুব কাছাকাছি আসিবে, কিন্তু পরস্পরে ধাক্কা লাগিবে না। উক্ত তারকাদ্বয়ের মধ্যে একটি রবি।†

চেম্বারলেনের গ্রহজন্মবাদমতে সেই আদি যুগে রবি একাকী অবস্থান করিতেছিল। তখন কোন গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয় নাই, ধূমকেতুর জন্ম গ্রহণ করে নাই। এমন সময় ঘটনাক্রমে অপর একটি সূর্য্য আমাদের সূর্য্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়; তাহারা খুব কাছাকাছি আসিলেও কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে নাই। আমাদের রবি ও আগন্তুক সূর্য্যের অবস্থা তখন নেবুলার থিওরির ধূমমণ্ডলের মত। উভয় সূর্য্যের

নব গ্রহজন্মবাদ

মুখোমুখী স্থানে উভয়ের সান্নিধ্যহেতু বিরাট জোয়ারের সৃষ্টি হয়। দুই বিরাট জড়পিণ্ড পরস্পরের নিকটে আসায় উভয়ের মধ্যে মহাকর্ষণজনিত টান অতি তীব্র হয়, ফলে খানিকটা জড়পিণ্ড আমাদের রবিদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

* Rotational instability i.e. rotational instability of gases in the Nebular Hypothesis of Laplace.

† Close approach but not collision of two stars, one of which was our own sun.

এই বিচ্ছিন্ন অংশ রবিদেহের সাত শত অংশের এক অংশ মাত্র। যদি অপর সূর্য্যের টান না থাকিত তবে বিচ্ছিন্ন জড়পিণ্ড রবিদেহ মধ্যে আবার ফিরিয়া যাইত। কিন্তু উভয়ের টান আছে বলিয়া বিচ্ছিন্ন জড়পিণ্ড বৃত্তাভাস পথে (elliptical path) ঘুরিতে থাকে। এই বিচ্ছিন্ন জড়পিণ্ডই কালে গ্রহরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে। ইহাই গ্রহাদি সৃষ্টির পূর্ব্ব ইতিহাস।

কল্পনারাজ্যে অনেক কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু এত দূর দেশের সংবাদ—সৌরজগতের বহির্দ্দেশের সংবাদ যে কল্পনা সাহায্যে সংগ্রহ করা সম্ভব, ইহা কখনও কেহ ভাবে নাই। এখন বিশ্বজগতের বাহিরের কথা আমাদের কল্পনা করিতে হইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত জগতের লোক জানিয়া আসিয়াছে যে, এক (রবি) হইতে গ্রহ-উপগ্রহ জন্মলাভ করিয়াছে, সৌরপরিবারের জন্মদাতা পিতা এক। কিন্তু এখন সে ধারণা আর রহিল না; এখন স্বীকার করিতে হইবে সৌরপরিবার গ্রহ-উপগ্রহ দুই জন হইতে জন্মলাভ করিয়াছে (bi-parental)।

নানা দিক দিয়া এই গ্রহজন্মবাদ পরীক্ষা করা হইয়াছে; গত ৩০ বৎসর যাবৎ বিচারের কষ্টিপাথরে ইহাকে কষিয়া দেখিয়া তবে ইহার সত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষ কোন গলদ আছে বলিয়া এখনও মনে হয় না। অনেক জটিল প্রশ্ন উঠিতে পারে; এবং প্রত্যেক প্রশ্ন সরলভাবে ইহা দ্বারা ব্যাখ্যা করাও সম্ভবপর নহে। প্রকৃতিদেবী বড়ই রহস্যময়ী, তিনি জটিল রহস্যময় দৃশ্য মানবচক্ষের সম্মুখে ধরিতে ভালবাসেন। সকল সময়ে সে রহস্য ভেদ করা মানবের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না।

একটা দেশ বা মহাদেশের মানচিত্র আঁকিতে হইলে প্রথমে চারিদিকে সীমাসূচক রেখা টানিতে হয়; পরে উহার মধ্যে হ্রদ, নদী, নগর, গ্রাম ইত্যাদি বসাইতে হয়। বড় বড় জ্যোতিষী ও ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে গ্রহজন্মবাদ পৃথিবী ও গ্রহ-উপগ্রহগণের আদি ইতিহাসের সীমাসূচক রেখা নির্দ্দেশ করিয়াছে, এইবার উহাদিগের খুঁটিনাটি ব্যাপারের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত হইবে।

আবহমান কাল হইতে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা হইয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য জগতে প্রায় এক শতাব্দী হইল ইহার আলোচনা হইতেছে। সৃষ্টিতত্ত্ব বলিতে আমরা এই বুঝি, যে সকল জ্যোতিষ্ক আমরা দেখিতে পাই, যে সকল গ্রহতারকা আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে, উহারা কেমন করিয়া বর্ত্তমান কলেবরে পরিণত হইয়াছে, উহাদের আদি কিরূপ ছিল এবং কিরূপে উহারা জন্মলাভ করিল? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টিতত্ত্ব অতীত কাল লইয়াই আলোচনা করিয়াছে। জড়তত্ত্ববিৎ (Physicist) ইহাতে সন্তুষ্ট নয়; সে আরও অগ্রসর হইতে চায়। সে চায় কোষ (cells), দানা (crystals), অণু (molecules), পরমাণু (atoms) ইলেক্‌ট্রন প্রভৃতির স্বরূপ বুঝিতে। গ্রহ-উপগ্রহগণের ন্যায় কোষ, দানা, অণু, পরমাণু,

ইলেক্‌ট্রন প্রভৃতিও সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তর্গত। ইহাদের সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে।

বিশ্বজগতের মধ্যে যাবতীয় জড়ঘটিত ব্যাপার এক সূত্রে গ্রথিত করিবার চেষ্টাও সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তর্গত। শক্তির রূপান্তর এবং নির্দ্দিষ্টকালের জন্য কোন স্থানে শক্তি আবদ্ধ থাকা সৃষ্টিবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। ইলেক্‌ট্রন, পরমাণু, দানা, তারকাদি আবদ্ধ শক্তিমাত্র; ইহারা শক্তির বিভিন্ন রূপ। এগুলিকে জড়ের এক একটি মাত্রা বলে (physical units)। শক্তি আবদ্ধ হইয়াই জড়রূপে (matter) দেখা দেয়। বন্ধনগত শক্তির নামই জড়। ইলেক্‌ট্রন-প্রোটন সম্বন্ধবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন জড়ের সৃষ্টি করিয়াছে, জড়তত্ত্ব আলোচনা করিয়া ইহাই আমরা শিখিয়াছি। জগতে শক্তি আছে; আর শক্তির রূপ সম্বন্ধবদ্ধভাবে অবস্থান করিতেছে—জড়বিজ্ঞান (Physics) ইহাই শিক্ষা দেয়।

বিমানবিহারী গ্রহগণের গতি উপলব্ধি করিবার জন্য নিউটন তিনটি গতি-বিধি (laws of motion) ও মহাকর্ষণ-বিধি (law of gravitation) নির্ণয় করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি গণিতবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন; ফলে Calculus-এর সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রহগণের গতিবিজ্ঞান যাঁহারাই আলোচনা করিয়াছেন, নিউটন হইতে পয়েনকেয়ার পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐ গতিবিজ্ঞান মানববুদ্ধির চরম উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিয়াছে। সৌরজগত ছাড়িয়া যখন আমরা একটু দূরে গিয়া তারকারাজ্যে উপস্থিত হই, তখন আমাদিগকে গতি-বিজ্ঞান ছাড়িতে হয়; কেননা তারকাপুঞ্জের গতি সম্বন্ধে আমরা এখনও বেশী কিছু বুঝিতে পারি নাই। কাজেই তখন আমাদের গতিবিজ্ঞান ছাড়িয়া স্থিতিবিজ্ঞানের (Statics) আশ্রয় লইতে হয়।

চার্লিয়ার ও ক্যাপটিন্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ তারকাবলির গতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তারকার দেহান্তর্গত পরিবর্ত্তন দু-এক শতাব্দীর মধ্যে বুঝিতে পারা যায় না, যুগযুগান্তর ধরিয়া লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়। এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে হইলে শতাব্দীকে সময়ের মাত্রা বা ইউনিট ধরিলে চলিবে না; $১০^{১৮}$ বৎসরকে মাত্রা ধরিতে হইবে। ইহাকে জ্যোতিষিগণ "ইয়োন" (eon) নামে অভিহিত করিয়াছেন।

নক্ষত্রজগতের একটা ব্যাপার উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাক। কত দিন অন্তর দুইটি তারকা পরস্পরের খুব নিকটস্থ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, ৪ 'ইয়োনে'র মধ্যে একবার দুটি নক্ষত্র পরস্পরের কাছাকাছি আসিতে পারে। কাছাকাছি মানে ২।১০ হাতের মধ্যে নয়। এখানে 'কাছাকাছি' মানে পৃথিবী রবির যত কাছে থাকিতে পারে, তত কাছে। ল্যাপলাস্-হেল্‌মহোল্‌ৎজের নেবুলার থিওরির মধ্যে ৪ ইয়োনের ($১০^{১৮} \times ৪$ বৎসর) স্থান নাই। নেবুলার থিওরি যাঁহারা মানেন, তাঁহারা ইয়োনকে সময়ের মাত্রা বা ইউনিট ধরিতে নারাজ।

বিজ্ঞান সৃষ্টি (creation) মানে না। কেননা, সৃষ্টিসম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার যন্ত্রপাতি

উহার নাই। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অসংখ্য তারকারাজি বিরাজ করিতেছে, এবং এত বড় বিরাট সময় ($১০^{১৮} \times ৪$ বৎসর) তাহাদের সঙ্গে চলিয়া যাইতেছে! সময়ের পরিমাণ দেখিয়া আমরা চমকিয়া উঠিতে পারি; কিন্তু সত্যকে তো উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আচ্ছা, আমরা কি বিশ্বাস করিতে পারি যে, শত কোটি বৎসর পূর্ব্বে সকল নক্ষত্রই আলোকবিহীন শীতল পদার্থ ছিল, তারপর হঠাৎ সকলে উজ্জ্বল পদার্থে পরিণত হইয়াছে? কয়েক শত কোটি বৎসর পরে আবার তাহারা উজ্জ্বলতা হারাইয়া আলোকহীন পদার্থে পরিণত হইবে, তাহাদের সমস্ত শক্তি লোপ পাইবে? তারকারাজি এখন যেমন উজ্জ্বল আছে, এইরূপ যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহারা কিরণ দিতে থাকিবে। যতকাল কিরণ দিবে, সেই কালের ইউনিট বা মাত্রা ইয়োন ($১০^{১৮}$ বৎসর), ইহাতে আমাদের কখন সন্দেহ হয় না।

বিজ্ঞান সৃষ্টি মানে না

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্ব্বিদ্যার বর্ত্তমান অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্‌মিলান্ (W. D. MacMillan)। তিনি উক্ত সমস্যা সম্বন্ধে (১৯২৫) অনেক চিন্তা করেন। তিনি ভাবিতেন, এই যে ছায়াপথগত অসংখ্য তারকা অক্লান্তভাবে অনবরত আলোকশক্তি বর্ষণ করিতেছে, এই বিরাট শক্তি যায় কোথায়?—আকাশ (space) তো একভাবে অন্ধকার রহিয়াছে? তিনি ভাবিয়া অবাক হইতেন, জড়তত্ত্ববিৎ যে পরমাণুমধ্যে বিরাট শক্তির সন্ধান পাইয়াছে, এ শক্তি উহাতে আসিল কোথা হইতে? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে হইল যে, আকাশই পরমাণুর জন্মস্থান; নক্ষত্ররাজিনিঃসৃত আলোকশক্তিই (light energy) পরমাণুর মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

শক্তির আবর্ত্তনচক্র

এই থিওরি মানিয়া লইলে নৈশ আকাশের অন্ধকারের রহস্য বেশ বুঝা যায়। অসংখ্য তারকারাজিনিঃসৃত আলোক নৈশ আকাশকে আলোকিত করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা করে না; নিশাকালে আকাশ থাকে অন্ধকারময়। এই বিরাট আলোকশক্তি আকাশে জড়পরমাণুর রূপ ধারণ করে ও জড়পরমাণুমধ্যে সঞ্চিত থাকে। আলোকশক্তি যখন আলোকের রূপ ত্যাগ করিল, তখন আর নৈশ আকাশ আলোকিত হইবে কিরূপে? এই যে অসংখ্য জড়পরমাণু আকাশে উৎপন্ন হইল, ইহাদের সমষ্টিকে নেবুলা (Nebula) বলে। ল্যাপ্‌লাস্ নেবুলার থিওরির প্রতিষ্ঠাতা বটে, কিন্তু নেবুলা কি করিয়া সৃষ্ট হইল, তাহা তিনি বলেন নাই। ম্যাক্‌মিলান সে কথা বলিলেন। তারকারাজি যে যুগযুগান্তর ধরিয়া আলোক-শক্তি বিকিরণ করিতেছে, অত শক্তি উহারা পায় কোথা হইতে? ম্যাক্‌মিলানের থিওরি হইতে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। আলোকশক্তি নূতন দলের মধ্যে আবদ্ধ হইল অর্থাৎ জড়পরমাণুর মধ্যে আটকাইয়া গেল। আকাশে (space) জড়পরমাণু পুর্ব্বে ছিল না; আলোকশক্তি বিকার প্রাপ্ত হইয়া জড়পরমাণুর রূপ ধরিল ও উহার মধ্যে খানিকটা আলোকশক্তি রূপান্তরিত হইয়া রহিয়া গেল (কেন না, পরমাণুর পদার্থ বা mass আছে

এবং ইহা মহাকর্ষণ-শক্তি বলে বলীয়ান)। নক্ষত্রের দেহমধ্যস্থ ভীষণ চাপের (stress) ফলে জড়পরমাণু ভাঙিয়া আবার সেই আলোকশক্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, আলোকশক্তি হইতে জড়পরমাণু উৎপন্ন হইতেছে, আবার জড়পরমাণু স্বয়ং বিশ্লিষ্ট হইয়া আলোকশক্তিতে পরিণত হইতেছে। শক্তির এই ভাঙাগড়া চক্রাকারে চলিয়াছে। এইরূপে তারকারাজি বিরাট আলোকশক্তি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিতেছে।

যদি একজন মনে করে যে, কোন নক্ষত্র স্বীয় আলোকশক্তি দ্বারা সেই পরিমাণ জড় নেবুলি সৃষ্টি করিতেছে, যে পরিমাণ জড় নেবুলি ভাঙিয়া উহা হইতে আলোক নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে নক্ষত্র অনন্তকাল ধরিয়া আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। নক্ষত্র যতখানি আলোক ও তাপশক্তি বিকিরণ করিতেছে, উহার মধ্যে পরমাণু ভাঙিয়া ততখানি আলোক ও তাপশক্তি যোগান দিতেছে।

ম্যাক্‌মিলানের এই প্রস্তাব ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়। পর বৎসর জড়তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার একটা খণ্ডন গঠন করিলেন। যদি একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক তড়িৎকণা (ইলেক্‌ট্রন) এমন করিয়া পরস্পরের সহিত মিশে যে, একের তড়িৎক্ষেত্র ঠিক অপরের তড়িৎক্ষেত্রের উপর পড়ে, তাহা হইলে তাহাদের তাড়িতস্থিতিজ শক্তি (electrostatic potential energy) আলোক ও তাপের আকার ধারণ করে। তখন উহাদের সম্মিলনে পদার্থের (mass) লেশমাত্র অস্তিত্ব থাকে না। কারণ, তড়িৎক্ষেত্রের উপর পদার্থ (mass) নির্ভর করে; তড়িৎক্ষেত্র এস্থলে লোপ পাইয়াছে; কাজেই, পদার্থও থাকিতে পারে না। যতদূর পর্যন্ত স্থিতিজ শক্তি (potential energy) তাপ বা আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, সেই দূরত্ব যদি ধনাত্মক তড়িৎকণার ব্যাসার্দ্ধের সমান হয়, তাহা হইলে বিকিরণ-শক্তির (radiant energy) পরিমাণ স্থির করিতে পারা যায়। এই শক্তির (তাপ ও আলোক) পরিমাণ রবির বেলায় এত বেশী হইবে যে, বর্ত্তমান হারে তাপ ও আলোক বিকিরণ করিয়াও রবি ১৫×১০^{১২} বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে। এতদিন যে রবি বাঁচিতে পারে, ইহা ভূতত্ত্ববিৎ ও জ্যোতিষিগণের কল্পনাতীত ছিল। এতদিনে জ্যোতিষিগণের (ভূতত্ত্ববিদ্‌গণেরও) ভাবনা দূর হইল। জড়তত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট এজন্য তাঁহারা ঋণী।

পূর্ব্বে যে বলা হইল, একটি ধনাত্মক তড়িৎকণা ও একটি ইলেক্‌ট্রন একত্রে এমন অবস্থায় মিশিতে পারে যে, তাহাদের পদার্থের লয় হয়—ইহা একেবারে নূতন কথা নয়। ১৯০৪ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক জীন্স (Jeans) স্বতঃকিরণবিসারী ধর্ম্মের (radio-active phenomena) ব্যাখ্যা করিবার সময় ঐ কথা বলিয়াছিলেন। সে সময়ে কথাটা সেখানে ঠিক খাপ্ খায় নাই বটে, কিন্তু সেই অবধি ঐ ভাবটা একেবারে লোপ পায় নাই।

১৯০৫ খৃঃ আইন্‌ষ্টাইন দেখাইলেন যে, এক গ্রাম জড় (matter) ৯×১০^{২০} আর্গ (erg) শক্তির সমান। তড়িতের অবস্থিতিপ্রসূত স্থিতিজ-শক্তি হইতে গণনা করিয়া এক গ্রাম জড়ের সমান যে শক্তির অঙ্ক পাওয়া যায়, উহা পূর্ব্বোক্ত সংখ্যা

(৯×১০^{২০}) হইতে শতকরা ২ ভাগ মাত্র তফাৎ। আইন্‌ষ্টাইন আরও বলেন যে, শক্তি-বিকিরণ হেতু রবির দেহ (mass) পূর্ব্বোক্ত হারে ক্ষয় পাইতেছে। তিনি রবিতাপের উৎস সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। প্রায় সাত বৎসর হইল পূর্ব্ববর্ণিত থিওরির অনুরূপ একটি থিওরি (সর্ব্বাংশে মিল না থাকিলেও অনেকাংশে মিল আছে) ইংলণ্ডে জীন্স ও স্যর অলিভার লজ্ এবং জার্ম্মাণিতে নার্ণষ্ট (Nernst) প্রচার করিয়াছেন।

সুদূর তারকাখচিত আকাশে বিকিরণ-শক্তি হইতে (radiant energy) জড়পরমাণু উৎপন্ন হইতেছে, আবার তারকাদেহমধ্যে জড়পরমাণু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বিকিরণ শক্তিরূপে দেখা দিতেছে—এই থিওরি দ্বারা মানবের সৃষ্টিসম্পর্কিত চিন্তাধারাগুলির ক্রমশঃ প্রসার ঘটিয়াছে। পরমাণু জন্মলাভ করিতেছে, আর তাহাদের বিরাট সংখ্যা জ্যোতি-বিজ্ঞানে আকাশের গভীরতা সূচনা করিতেছে। সম্প্রতি মিলিক্যান (Millikan) ভিত্তমান বিকিরণ সম্বন্ধে (penetrating radiation) গভীর গবেষণাপূর্ণ তথ্য নির্ণয় করিয়াছেন। উহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, জড়পরমাণুর কেন্দ্রস্থ প্রোটোনঘটিত কোন ব্যাপার তারকামণ্ডিত সুদূর আকাশেও ঘটিতেছে। মিলিক্যানের এই সিদ্ধান্ত তারকা-বিরাজিত আকাশে জড়পরমাণুর জন্মসূচক থিওরি সুপ্রমাণ করিতেছে। এত শীঘ্র যে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে, তাহা কেহ ভাবিতে পারে নাই।

চেম্বারলিন-মোল্টনের গ্রহজন্ম সম্বন্ধীয় থিওরি হইতে গ্রহগণের পরিণাম সম্বন্ধে অনেকটা অনুমান করিতে পারা যায়। দুটি তারকা (বা রবি) খুব কাছাকাছি হওয়ার দরুণ গ্রহগণ জন্মলাভ করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ ইয়োন ধরিয়া (১ ইয়োন = $১০^{১৮}$ বৎসর) ছায়াপথ গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ছায়াপথের মধ্যে আমাদের মত সৌরজগত বিস্তর আছে। উহারা সকলেই কিন্তু একই সময়ে উৎপন্ন হয় নাই; কেহ আগে, কেহ পশ্চাতে জন্মিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেকে আমাদের সৌরজগতের দাদা, অর্থাৎ আমাদের সৌরজগতের পূর্ব্বে জন্মিয়াছে।

গ্রহগণের উৎপত্তি বুঝা গেল; কিন্তু ইহাদের পরিণাম কি হইবে? পরিণত বয়সে ইহাদের কি অবস্থা ঘটবে? গ্রহগণ আকাশস্থ ধূম্রবৎ নেবুলি হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে; অবশ্য গড়িয়া উঠিতে বহুযুগ লাগিয়াছে। যেমন তাহারা গড়িয়া উঠিতে থাকে—তাহাদের

পৃথিবীর পরিণাম

দেহ যত পুষ্টিলাভ করিতে থাকে, তাহারা ততই পরস্পরের নিকটে আকৃষ্ট হয়; তাহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও আলোড়ন ততই বাড়িতে থাকে। আমাদের সৌরজগতের গ্রহগণের দশাও ঠিক ঐরূপ; পৃথিবী ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী গ্রহগণ (বুধ, শুক্র, মঙ্গল) ক্রমেই রবির দিকে অধিক আকৃষ্ট হওয়ার দরুণ উহার দিকে সরিয়া যাইতেছে। পরে একে একে প্রত্যেকে রবির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। খুব সম্ভব বহির্দেশস্থ গ্রহগণের দশাও (শনি, ইউরেনাস্, নেপ্‌চুন) পৃথিবীর মত হইবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিলে মনে হয়, কেবল বৃহস্পতি সূর্য্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে না, ইহা একটি তারকার অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে।

রবি ও বৃহস্পতি উভয়ে একটি দ্বি-তারকা (binary stars) রূপে অবস্থান করিবে। রবি হইতেই গ্রহগণের উৎপত্তি হইয়াছিল, আবার রবিতেই লয় পাইল। যেখান হইতে উৎপত্তি সেইখানেই নিবৃত্তি—ইহা প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

প্রবন্ধের সার কথা হইতেছে এই যে, আলোকশক্তি হইতেই জড়ের জন্ম, আবার জড়ের মৃত্যুতে আলোকের উৎপত্তি।

কেরোসিন তেল

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

সরিষা, তিসি, রেড়ী ও নারিকেল তেল এখন আর আমাদের ঘরের অন্ধকার দূর করে না। ধনী, নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলের গৃহেই এখন অল্পাধিক পরিমাণে কেরোসিন তেল ব্যবহৃত হইতেছে। রুষ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ও ব্রহ্মদেশ হইতে এই বস্তু এক্ষণে ভারতের দীনদরিদ্রের কুটীরেও আনীত হয়। এই তেল না হইলে শহরবাসিনী গৃহলক্ষ্মীগণ ঘুঁটে জ্বালিয়া পাথুরিয়া কয়লা ধরাইতে পারেন না। বিদেশী কেরোসিন লণ্ঠন তো যত্রতত্র বিরাজ করিতেছে, ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও পথ চলিতে লোকের আর বিশেষ অসুবিধা হয় না। সেকালের দেশীয় চৌকা হাত-লণ্ঠন তো "শ্রুতৌস্থিত" অর্থাৎ কানে শোনার বস্তু হইয়াছে, দেখিবার উপায় নাই। এই তেলের একজাতি মোটর বা হাওয়াগাড়ী চালাইতেছে। ভেসেলিনও ইহারই রূপান্তর বিশেষ। কত আর বলিব?

যে দ্রব্যের গুণে আমাদের এত সুবিধা হইয়াছে, উহা কোথায় এবং কাহার দ্বারা প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তাহা জানিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। এসিয়া মহাদেশের পশ্চিম সীমায় কাস্পিয়ান্ হ্রদ অবস্থিত। কেহ কেহ উহাকে কাঞ্চণ হ্রদও বলেন। এই হ্রদের পশ্চিম উপকূলে ইয়োরোপের মধ্যে য়্যাস্পারণ (Asperon) উপদ্বীপ, তথায় বাকু নামে প্রসিদ্ধ একটি নগর রহিয়াছে। উহা ঐ অঞ্চলের কেরোসিন-খনিসমূহের কেন্দ্রস্থলে বিদ্যমান। রেলযোগে ঐ শহর হইতে তেল বেটাম-এ নীত হয়। বেটাম কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত একটি বন্দর। ঐ বন্দর হইতে জাহাজযোগে কেরোসিন তেল আমাদের দেশে আনীত হইয়া থাকে।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বাকুর নিকটেই "আগামুখী" তীর্থ ছিল, তথায় ভূগর্ভের এক-স্থান হইতে নিয়ত-অগ্নিশিখা বহির্গত হইত। ভারতের অনেক স্থানে এরূপ অগ্নিস্রোত দেখা যায়, চট্টগ্রাম প্রদেশে চন্দ্রনাথপর্ব্বত ইহার একটি উদাহরণ। বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কোপোলো এবং তাঁহার বহুকাল পরে হ্যানওয়ে নামক জনৈক ইংরাজ (১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে) বাকুর দাহ বাষ্পের বিষয় বর্ণনা করেন।

রুষ-কেরোসিন

ঐ শহরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে নিয়মিতভাবে খনির কার্য্য আরম্ভ হয়। রুষ-গবর্ণমেণ্ট উহা একচেটিয়া করেন। পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নোবেল (Nobel) ভ্রাতাগণ সুবৃহৎ আকারে উহার কাজ আরম্ভ করিলে রুষ-তেল নানাদেশে রপ্তানি হইতে থাকে। এই কেরোসিন মার্কিণ-তেলের ঠিক অনুরূপ নহে। এখানকার কেরোসিন-কূপের (pools) উপরে গ্যাসের অত্যধিক চাপ থাকায় ড্রিল যন্ত্রের সাহায্যে ভূস্তর ছিদ্র করিলে ঐ ছিদ্র দিয়া ফোয়ারার মত প্রবল বেগে তেল উঠিতে থাকে। ক্রমশঃ কূপ হইতে ক্রমাগত চারি মাস ধরিয়া দিবারাত্র যে তৈলস্তম্ভ আকাশে প্রায় ৩০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চে উঠিয়া নষ্ট হয়, তাহাতে প্রায় ১০ কোটি গ্যালন বা প্রায় ১২ লক্ষ ১৫ হাজার ২৭৮ মণ তেল লোকসান ঘটে। মধ্যে মধ্যে এই সব খনিতে আগুন লাগে এবং কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া উহা জ্বলিয়া নিঃশেষ হয়। কূপ হইতে যে তেল উঠে, উহাকে নানা প্রক্রিয়া দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া না লইলে যে উহা ব্যবহারের যোগ্য হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। রুষ-কেরোসিন কে প্রথমে আবিষ্কার করেন, তাহা জানা যায় নাই।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ড্রেক পেনসিলভেনিয়া প্রদেশে কেরোসিন তেল আবিষ্কার করেন। এখন ওহিও, কলোরেডো, ক্যালিফর্ণিয়া, কানাডা এবং অন্যান্য অঞ্চলেও উহা পাওয়া যাইতেছে।

মার্কিণ তেল

খনির অপরিষ্কৃত তেলকে সুদীর্ঘ লৌহ-নলের সাহায্যে কখন কখন ৩০০ মাইল পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলে আনা হয়। প্রথমে ঐ অপরিষ্কৃত তেলকে সামান্যরূপ চুয়াইয়া পরে গন্ধক-স্রাবক এবং সোডার সাহায্যে যথোপযুক্ত রূপ উত্তপ্ত করিয়া ব্যবহারোপযোগী নানাবিধ পদার্থে রূপান্তরিত করা হয়। কানাডা ও ব্রহ্মদেশের কেরোসিন তেলও পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া থাকে।

কেরোসিন তেলের উৎপত্তিসম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়টি মনে উদিত হয়:—

(১) উহা কি একটি মৌলিক (original) পদার্থ; না, অন্য কোন পদার্থের রূপান্তর বিশেষ?

(২) যে সকল প্রস্তরস্তরে উহাকে সচরাচর দেখা যায়, উহা কি ঐ স্তর হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে? না হইলে উহার মূলাধার প্রস্তর (source rock) কোথায় অবস্থিত?

---

* "The crude oil is fractionally distilled in large iron stills and purified. It is divided into the following fractions, which are recognised in trade by various names :— 1. Cymogene, 2. Rhigolene, 3. Petroleum ether, 4. Petroleum naphtha or Ligroin, 5. Petroleum benzine or Benzoline, 6. Kerosine, Photogene or Burning oil, 7. Lubricating oil, 8. Vaseline."—*Theoretical Organic Chemistry* (1911), by J. B. Cohen, P. 53.

(৩) উহা যদি অন্য কোনও প্রস্তরস্তরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা বর্ত্তমান আধার বা আশ্রয়স্থানে আসিল কি উপায়ে ?

কেরোসিন তেলের উৎপত্তিসম্বন্ধে বহুকাল হইতে দুইটি মতবাদ বা theory চলিয়া আসিতেছে। এক মত অনুসারে উহা ইনর্‌গ্যানিক বা অজৈব পদার্থ। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ এই মতের পক্ষপাতী। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা মনে করেন, উহা জীব ও উদ্ভিদদেহের বিশেষরূপ বিকৃতির ফল মাত্র।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে বহুবিধ যৌগিক পদার্থ (compound) বিদ্যমান রহিয়াছে। ভূগর্ভস্থ জল ও বাষ্পের প্রভাবে ঐ সকল পদার্থ ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া কেরোসিন তৈলে পরিণত হয়। ইহাই অজৈব মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের মূল বক্তব্য।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রুষ রাসায়নিক মেণ্ডেলিয়েফ প্রচার করেন যে, ভূগর্ভে বিবিধ প্রকার যৌগিক পদার্থ—যেমন, লৌহ-কার্ব্বাইড (iron carbides)—বিদ্যমান রহিয়াছে। মৃত্তিকার উপর দিয়া নদীর জল যেরূপ হ্রদ বা সাগরাভিমুখে নিয়ত প্রবাহিত হয়, ভূপৃষ্ঠের নিম্নস্তর দিয়াও সেইরূপ জলস্রোত বহিয়া থাকে। কূপাদি খনন করিলে ঐ জল দৃষ্ট হয়। ভূগর্ভে জলীয় বাষ্পেরও অভাব নাই। পূর্ব্বোক্ত লৌহকার্ব্বাইড বাষ্প বা জলের সহিত মিশ্রিত হইলে হাইড্রোকার্ব্বন বা উদঙ্গার অর্থাৎ তেল সমুদ্ভূত হয়। পরীক্ষাগারে তিনি উহা প্রদর্শন করেন।

ভূত্বকে আমরা দ্বিবিধ শিলা (rock) দেখিতে পাই :—(১) অগ্নিজ শিলা (igneous বা fiery rock). (২) জলজ বা স্তরীভূত শিলা (watery or stratified rock).

অগ্নিজ শিলা

আদিতে পৃথিবী অত্যুষ্ণ গ্যাস-পিণ্ডরূপে বিদ্যমান ছিল। উহা তাপবিকিরণের ফলে ক্রমশঃ শীতল হইলেও ভূগর্ভের অভ্যন্তর প্রদেশে অদ্যাপি সেই আদিম তাপ অনেক পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। উহারই প্রভাবে এক সময় ভূত্বক গলিয়া অগ্নিজ শিলায় পরিণত হইয়াছিল। এই প্রকার শিলা স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে না, উহাকে ভাঙ্গিলে মিছরির দানার মত ছোট বড় অনেক দানা দেখা যায়। মার্ব্বেল প্রস্তর ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

জলজ শিলা

রৌদ্র, বৃষ্টি, তুষারপাত, ঝড় প্রভৃতির প্রভাবে অগ্নিজ শিলার বহিঃপৃষ্ঠ নিয়ত ক্ষয় পাইতেছে। বালুকাকণা, পলিমাটি ও মৃত্তিকাকণা ঐ অগ্নিজ শিলারই রূপান্তরিত অবস্থা মাত্র।

নদীর প্রবল স্রোত দ্বারা আনীত পলিমাটি, বালুকাকণা প্রভৃতি পদার্থ মোহানার নিকটে নিয়ত সঞ্চিত হইয়া থাকে। প্রতি বর্ষাকালে এই সঞ্চয়ের মাত্রা যে বাড়ে তাহা বলা বাহুল্য। সমুদ্রের গভীর জলের প্রবল চাপে ঐ সকল পলিমাটি ও বালুকাকণা জমাট বাঁধিয়া শিলার আকার প্রাপ্ত হয়। এক এক বর্ষায় এক এক স্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্তরে স্তরে সজ্জিত হয় বলিয়া ঐরূপ শিলাকে স্তরীভূত শিলাও বলে। উহাদের স্থানে স্থানে জলজ জীবের কঙ্কাল বিদ্যমান থাকে। ভূপৃষ্ঠের আকুঞ্চন বা ভূমিকম্পের

ফলে ঐ সকল জলজ শিলা সমুদ্রের তলদেশ হইতে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতের আকার ধারণ করে। এই শিলা অবশ্য অগ্নিজ শিলার উপরে সজ্জিত হইয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বত ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

আপাতদৃষ্টিতে মেণ্ডেলিয়েফের পূর্ব্বোক্ত মতবাদ বেশ সমীচীন বলিয়াই মনে হয় বটে, কিন্তু উহাতে অনেকগুলি দোষ দেখা যায় ; যথা—

(১) পৃথিবীর নানাস্থানে বহুযোজনব্যাপী অগ্নিজ শিলারাশি রহিয়াছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে তো কেরোসিন তেলের খনি দেখা যায় না। যে সকল স্থানে উহার খনি রহিয়াছে, তাহার অদূরেই স্তরীভূত শিলা দৃষ্ট হয়। ইহাতে স্বতঃই মনে হয় যে, কেরোসিন তেল স্তরীভূত শিলার মধ্যে উৎপন্ন হইয়া কোন কারণে অগ্নিজ শিলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিবে।

(২) তর্কের খাতিরে যদি বা স্বীকার করা যায় যে, কেরোসিন তেল অগ্নিজ শিলা হইতে উৎপন্ন হইয়া উপরিস্থিত স্তরীভূত শিলারাজির স্তরভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠে, তাহা হইলেও কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, জলচলাচলের উপযোগী সছিদ্র বালুকাস্তরের মধ্য দিয়া তেল উপরে উঠিলেও কর্দ্দমোৎপন্ন নিশ্ছিদ্র শেল বা শ্লেটস্তর ভেদ করিয়া উপরে উঠা তাহার পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে।

(৩) কেরোসিন তেলের মধ্যে হিলিয়ম (Helium) দৃষ্ট হয়। এইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, উহা ভূগর্ভের গভীরতম প্রদেশ হইতে অর্থাৎ অগ্নিজ শিলা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। কিন্তু হিলিয়ম যে ভূগর্ভের কোন্ স্তরে অবস্থিত, তাহা অদ্যাপি ঠিক নির্ণীত হয় নাই। সুতরাং উপরোক্ত কারণে কেরোসিন তেল যে অজৈব পদার্থ অর্থাৎ অগ্নিজ শিলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করা চলে না।

বিখ্যাত রাসায়নিক ডাঃ সি, পি, ম্যাবেরী মনে করেন যে, কেরোসিন তেল জীবদেহ হইতে উৎপন্ন ; কেন না অধিকাংশ কেরোসিন তেলের মধ্যে যে নাইট্রেট বা মরুতিম দেখা যায়, উহা অজৈব পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। কেবল মাত্র জীবদেহ হইতেই উক্ত মরুতিম সংগৃহীত হওয়া সম্ভব।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ জে, এস, নিউবেরী প্রচার করেন যে, কেরোসিন তেল উদ্ভিদ্‌জাত। ভূত্বকের আকুঞ্চন ও ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থান বসিয়া যায় এবং নিকটস্থ সমুদ্রের জল ঐ নিম্ন ভূভাগের উপরে আসিয়া পড়ে। ঐ সকল স্থানে গভীর অরণ্য থাকিলে উহারা নিমজ্জিত ও কালক্রমে নদীর পলি বা নিকটস্থ স্থলভাগ হইতে আনীত মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়। ঐ সকল উদ্ভিদ্ ভূগর্ভের তাপ এবং উপরিস্থিত মৃত্তিকাস্তর ও গভীর জলরাশির চাপ বশতঃ ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া পাথুরিয়া কয়লার আকার ধারণ করে। এই পাথুরিয়া কয়লা হইতে অর্থাৎ রূপান্তরিত উদ্ভিদ্দেহ হইতে কেরোসিন তেল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

অধিকাংশ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতই এই মতের পোষকতা করেন। আবার কেহ কেহ মনে

করেন, জীবদেহ হইতেও ঐ তেল প্রচুর পরিমাণে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ঐ তেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলজ স্তরীভূত শিলার মধ্যে দৃষ্ট হয়। ঐ সকল স্তরের অনেক স্থানে নানারূপ অবস্থায় পরিবর্ত্তিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন যে মৃত্তিকা-স্তরে প্রভূত পরিমাণে উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে, তাহাতে উত্তাপ প্রদান করিলে উদ্গার পাওয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, কেরোসিন তেল এবং উহার গ্যাসেও ঐ পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং উহা সাধারণ তাপে গলিয়া তেলের মত তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

মজার কথা এই যে পাথুরিয়া কয়লা তো উদ্ভিজ্জাত পদার্থ; কেরোসিন তেলও যদি উদ্ভিদেরই পরিণাম হয়, তাহা হইলে কোথাও বা উদ্ভিদ্ পাথুরিয়া কয়লার, আবার কোথাও বা কেরোসিন তেলের আকার ধারণ করিবে কেন?

এই প্রশ্নের সন্তোষজনক সম্যক উত্তর আজও পাওয়া যায় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, উদ্ভিদের উপাদান, জীবাণুর (Bacteria) আক্রমণ ও উদ্ভিদস্তরসংস্থানের উপর কেরোসিনের উৎপত্তি অনেকটা নির্ভর করে *।

সকল উদ্ভিদ্ অবশ্য সমান নহে। বেতের ছাতাও উদ্ভিদ্‌বিশেষ; কিন্তু উহা অশ্বত্থ বট হইতে কত পৃথক্। অনেক পাথুরিয়া কয়লা যে উচ্চতর উদ্ভিদের দেহাবশেষ তাহা নিশ্চয়; কিন্তু এমন কয়লারও অভাব নাই (যেমন boghoods এবং cannels), যাহাদিগের মধ্যে বড় উদ্ভিদের কোন চিহ্নই পরিদৃষ্ট হয় না, বরং যথেষ্ট পরিমাণে algae (বেতের ছাতা) জাতীয় উদ্ভিদের চিহ্ন দেখা যায়। উত্তাপ পাইলেই উহা হইতে তেল বাহির হয়। শ্লেটের মত অনেক কয়লাকেও (shales) উত্তপ্ত করিলে যে ঐরূপ তেল পাওয়া যায় না এমন নহে।

এই জন্য মনে হয়, নিম্নস্তরের কোন কোন উদ্ভিদ্‌দেহ বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে কেরোসিন উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন পচা সামুদ্রিক উদ্ভিদের গায়ে এক প্রকার তৈলাক্ত আবরণ থাকে। সামুদ্রিক অনেক কীটাণুর (diatoms) গায়েও তৈলবিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, এক সময় ঐ সকল কীটাণু সমুদ্রের নানাস্থানে ঝাঁকে ঝাঁকে অগণিত সংখ্যায় সন্তরণ করিয়া ফিরিত; উহাদের দেহাবশেষ হইতে তেল উৎপন্ন হইয়াছে একথা অবিশ্বাস্য নহে।

অনেকেই জানেন যে, জলের মধ্যে কোন উদ্ভিদ্‌দেহ যখন পচিতে থাকে, তখন উহা হইতে এক প্রকার গ্যাস ও কয়েক প্রকার তরল উদ্গার বাহির হয়। অবশিষ্ট অংশ কয়লার ন্যায় পদার্থবিশেষের আকারে (carbonaceous or coaly matter) পড়িয়া থাকে।

Algae জাতীয় অনেক জলজ উদ্ভিদ্ অবশ্য শাল সেগুনাদি উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের মত শক্ত নহে। নিম্নস্তরের ঐ সকল উদ্ভিদ্ যদি সমুদ্রের কোন এক স্থানে প্রভূত পরিমাণে জন্মে এবং কালে পচিয়া জলের চাপে জমাট বাঁধে, তাহা হইলে ঐ স্তরে হাইড্রোজেন বা উদ্‌যান যথেষ্ট

* Scientific American, January 1929, p. 57.

পরিমাণে সৃষ্টি হয়। এই স্তরকে পচা-স্তর (sapropel) বলে। অনেকে অনুমান করেন, এই পচা-স্তর হইতেই কেরোসিন জন্মিয়া থাকে।

ডাঃ ডেভিড হেয়ার বলেন, নিম্নশ্রেণীর যে সকল উদ্ভিদ্ হইতে মোমের মত, চর্ব্বির মত, জিলেটিনের মত, অথবা ধুনার মত পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং যাহাদের সহিত অন্যান্য জৈব পদার্থ অল্পাধিক পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, উহারাই কেরোসিন তেলের মূল উৎস।

সমুদ্রের লবণাক্ত ও হ্রদের সুস্বাদু জলে ঐ সকল পচা-স্তর উৎপন্ন হইয়া তলদেশে সঞ্চিত হইতে পারে। প্রথম প্রথম কিছুকাল হয় তো এমন জীবাণু উহাদের উপর কার্য্য করে, যাহাদের বাতাস না হইলে বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। এই সময় পচা-স্তর অবশ্য জলের উপরেই থাকে। পরে যখন তলাইয়া যায়, তখন যে সকল জীবাণুর পক্ষে অক্সিজেন বা অম্লজানের কোন প্রয়োজন নাই এবং যাহাদের পক্ষে অম্লজান মৃত্যুতুল্য, সেইরূপ জীবাণু ঐ পচা-স্তরের উপর দীর্ঘকাল ধরিয়া কার্য্য করে। ফলে উহা পচিয়া উঠে ও গ্যাস উৎপন্ন হয়; ঐ গ্যাসই কেরোসিন তেলের প্রধান উপাদান।

হ্রদ বা সমুদ্রের তলদেশে যে সময় পূর্ব্বোক্ত পচা-স্তর জমিতে থাকে, তখন প্রাথমিক পরিবর্ত্তন ঘটে। এই অবস্থার নাম জীবরাসায়নিক অবস্থা (bio-chemical stage)। পরে ঐ পচা স্তর যখন পরবর্ত্তী অন্য কোন কর্দ্দম বা বালুকাস্তরের নীচে চাপা পড়ে, তখনও এই পরিবর্ত্তন চলিতে থাকে। এই অবস্থাকে শক্তি-উৎপাদক রাসায়নিক (dynamo-chemical) অবস্থা বলে।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কেরোসিন তেল যখন জল অপেক্ষা হাল্‌কা ও এইজন্য জলের নীচে না থাকিয়া উপরে ভাসে, তখন ঐ তেল উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলের উপরে ভাসিয়া উঠে না কেন? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যায় যে, ঘোলা জলে তৈলবিন্দু না ভাসিয়া পলিমাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উহা জলের তলদেশেই থাকিতে বাধ্য হয়।

উদ্ভিদ্ হইতেই যদি কেরোসিন তেল ও গ্যাসের উৎপত্তি, তবে ঐ উদ্ভিদ্ কি সামুদ্রিক, না স্থলজাত? শেষোক্ত উদ্ভিদের সংখ্যা যখন অপেক্ষাকৃত অধিক, তখন উহারাই কেরোসিন তেলের উৎপত্তির কারণ হওয়া সম্ভব। এতদ্ভিন্ন যে মাতৃ-শিলা (mother-rock বা source bed) হইতে ঐ তেল ও গ্যাস জন্মে, সেই শিলা বিশুদ্ধ জল অথবা সমুদ্রের কিনারাস্থিত অগভীর প্রদেশেই দৃষ্ট হয়। ডাঃ হোয়াইট-এর মতে বিশুদ্ধ অথবা লবণাক্ত যে জলেই কেরোসিন তেল উৎপন্ন হউক না কেন, উহাদের পরিমাণের বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু অন্যান্য অনেক পণ্ডিত বলেন, বিশুদ্ধ জলে যে সকল শিলা বা স্তর উৎপন্ন হয়, তাহার তেল অধিকতর বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট এবং এইরূপ স্তরই অধিকতর বিস্তৃত। আবার কাহার কাহারও মতে ঐ তেলোৎপাদনের জন্য সামুদ্রিক লবণ একান্ত আবশ্যক।

এঙ্গলার, হফার ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ মৃত মৎস্য ও অন্যান্য জীবদেহ হইতে রাসায়নিক

প্রক্রিয়ার সাহায্যে উদগার অর্থাৎ তেল নিষ্কাশিত করিয়া দেখাইলেও মৎস্যাদি জলজ জীব হইতে কেরোসিন্ তেল উৎপন্ন হওয়ার কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন না; কেন না মৃত মৎস্যাদি প্রাণীর মাংস জলচর জন্তুরা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। ইহা ভিন্ন ঐ সকল প্রাণী যথেষ্ট পরিমাণে এক স্থানে প্রোথিত হইলেও উহাদের দেহ হইতে অপর্য্যাপ্ত কেরোসিন তেল উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। উহাদের দেহে—টিসুর মধ্যে—প্রচুর পরিমাণে ফস্‌ফেট অব্ লাইম থাকে; সুতরাং উহাদের দেহ হইতে উৎপন্ন হইলে কেরোসিন তেলেও কিছু না কিছু ফস্‌ফেট পাওয়া যাইত; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা পাওয়া যায় না।

কেরোসিন তেল জীবদেহজাত

অতএব মোটের উপর প্রাণী অপেক্ষা আমরা উদ্ভিদ্‌কেই কেরোসিন তেলের মূলাধার মনে করিতে পারি। আর তাহা হইলে জলজ স্তরীভূত শিলায় উহাকে পাইবারই কথা।

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। যে স্তরে কেরোসিন কূপ দেখা যায়, ঐ স্তরেই উহা প্রকৃতপক্ষে উৎপন্ন হয় না। অন্য স্তর হইতে ঐস্থানে আসিয়া সঞ্চিত হয় মাত্র। কোন কোন কূপে তরল কেরোসিন তেল পাওয়া যায়। আবার অন্য অনেকগুলাতে উহা মোমের মতন অর্দ্ধতরল অবস্থায় থাকে। পরে উপযুক্ত পরিমাণ তাপ প্রয়োগ দ্বারা উহাকে তরল করিয়া লইতে হয়। এই জন্য প্রশ্ন উঠে, মাতৃস্তরে থাকার সময় উহা তরল আকারে, কিম্বা অর্দ্ধতরল মোমের মত অবস্থায় থাকে?

কেরোসিনের মাতৃ-শিলা

৪৫০ ফা. তাপ ব্যতীত অর্দ্ধতরল কেরোসিন গলে না। ভূগর্ভের যতটা নিম্নে কেরোসিন তেল পাওয়া যায়,* তথায় অত অধিক তাপ থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং যে কূপে তরল তেল পাওয়া যায়, তথায় উহা সাধারণতঃ তরল আকারেই বিদ্যমান থাকে। উপরিস্থিত মৃত্তিকা বা শিলাস্তূপের প্রবল চাপেও উহা জমাট বাঁধে না বলিয়াই বিশ্বাস হয়।

কেরোসিনের বিভিন্ন অবস্থা

মেকয় বলেন, সমুদ্রের লবণাক্ত জলে তরল কেরোসিন তেল উৎপন্ন হইলেও উহা ঘন হইয়া মোমের মত হইয়া যায়। তবে উহা স্বস্থান ছাড়িয়া তরল আকারে অন্যত্র যে আশ্রয় লইতে না পারে এমনও নহে।

কি কারণে কেরোসিন তেল মাতৃশিলা পরিত্যাগ করতঃ অন্যত্র আশ্রয় অন্বেষণ করে? তাপ ইহার কারণ হইতে পারে না, কেন না যে স্তরে কেরোসিন তেল পাওয়া যায়, সে স্তরে তাপের মাত্রা সাধারণতঃ বড় বেশী নহে।

অন্যত্র আগমনের কারণ

চাপও ইহার একটা কারণ হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু অত্যধিক চাপের ফলে কর্দ্দম পাথরের মত শক্ত ও নিশ্ছিদ্র হইবার কথা। এতদ্ভিন্ন জলে কর্দ্দমের

* ১০০ হইতে ৬০০০ ফুট মৃত্তিকার নীচে কেরোসিন তেলের কূপ দেখা যায়।

ছিদ্রপথ পূর্ণ থাকিলে তেল চলিবারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না, পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহের সহিত কেরোসিন তেল মাতৃশিলা বা আদি স্থান হইতে স্থানান্তরে চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই মতবাদকে স্বীকার করিলে ইহাও জানিতে হয় যে, অধিকতর তাপযুক্ত ক্ষেত্র হইতে জলপ্রবাহ মাতৃশিলার ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়া তেলকে ভাণ্ডার-শিলায় (reservoir rock) লইয়া যায়। কিন্তু দেখা যায় উৎপত্তি-ক্ষেত্রসমূহ সাধারণতঃ নিশ্ছিদ্র ও সেই জন্য জল চলাচলের অনুপযোগী। এতদ্ভিন্ন নিকটস্থ স্তরসমূহে যে জল থাকে, উহাদের উপাদানও একরূপ দেখা যায় না।

মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে জল যে উৎপত্তি-শিলার মধ্য দিয়া চলিতে বাধ্য হয়, একথাও বিশ্বাস্য নহে। কেন না ঐরূপ শিলার ছিদ্র ·০১ মিলিমিটার বা ২৫০০ ইঞ্চিরও কম।

আর এক দল বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, কেরোসিনতেলসিক্ত স্তরের নাচে গ্যাস ও উপরে জল থাকিলে মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে ভারী জল সকলের নীচু স্তরে চলিয়া যাইবে, এবং গ্যাস তৈলস্তরকে ভেদ করিয়া উপরে উঠিবে।

অপর এক মতে, জলপ্রবাহ ভূত্বকের অভ্যন্তর দিয়া চলিবার সময় তৈলবিন্দুকে লইয়া চলে। শিলার মধ্যে গর্ত্ত থাকিলে ঐ গর্ত্তে তেল জমিয়া কেরোসিন-কূপ উৎপন্ন করে। এই মতবাদকে জলচাপ-প্রকল্প (hydraulic theory) বলা হয়। এই মতের দোষ এই যে, তৈলবাহী জলস্রোত কোথাও যাইয়া আশ্রয় লওয়া উচিত, নতুবা একই কূপে জলের উপরে তেল ভাসিত; কিন্তু এরূপ দেখা যায় না।

জলচাপ প্রকল্প

তেলের সঙ্গে গ্যাস মিশিয়া থাকে। এই মিলন অবশ্য রাসায়নিক সংমিশ্রণ নহে। সুতরাং গ্যাসের প্রবল চাপে কেরোসিন তেল উৎপত্তিশিলা হইতে স্থানান্তরে নীত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। সাধারণতঃ ভূস্তরের নানাস্থান যন্ত্র সাহায্যে ছিদ্র করিয়া দেখা হয় যে, ঐ সকল স্থানের নীচে তেল আছে কি না। অনেক স্থলে ঐ ছিদ্রপথ দিয়া কেরোসিন তেল ফোয়ারার মত বেগে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। দ্রুজ্ বা কূপ হইতে উৎক্ষিপ্ত তৈলস্তম্ভের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গ্যাসের চাপ যে এই উৎক্ষেপের কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গ্যাসচাপ প্রকল্প

সাধারণতঃ রাসায়নিক পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, ভূগর্ভস্থ জল ও বাষ্পের প্রভাবে বহুবিধ রাসায়নিক পদার্থ সংমিশ্রিত হইয়া কেরোসিন তেল উৎপন্ন হয়। ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন, উহা জলজ জীব ও উদ্ভিদদেহের বিশেষরূপ বিকৃতির ফল মাত্র।

সারার্থ

হ্রদাদির সুস্বাদু বা সমুদ্রের লবণাক্ত জলে যে সকল কীটাণু অতি প্রাচীন কালে বাস করিত, উহাদের দেহাবশেষ পলি মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়া কালক্রমে পচিয়া যায়। ঐ পচা কীটাণুদেহ হইতে কিছু তেল যে না জন্মিয়াছে এমন নহে, তবে উহার পরিমাণ বড়ই অল্প বলিয়া মনে হয়।

জলাভূমিতে গাছপালা পচিয়া পিট (peat) উৎপন্ন হয়। ঐ পিট হইতে পাথুরিয়া কয়লা জন্মে। ভূগর্ভের তাপ ও উপরিস্থ পলি-শিলার (sedimentary rock) অত্যধিক চাপের ফলে পূর্ব্বোক্ত পিট বিভিন্ন প্রকারের কয়লায় পরিণত হয়। প্রথম অবস্থার নাম উদ্ভিজ্জ-কয়লা (lignite), দ্বিতীয় অবস্থার নাম বিটুমেন-কয়লা এবং তৃতীয় অবস্থার নাম য়্যান্থ্রাসাইট। য়্যান্থ্রাসাইট কয়লার ধুম থাকে না।

পলি-শিলার মধ্যে অবস্থানের সময় কেরোসিন তেলেরও ঐরূপ নানাপ্রকার রূপপরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। নানা কারণে কেরোসিন তেল উৎপত্তি স্থান হইতে অন্য শিলার মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লয়। ভূস্তর সর্ব্বত্র সমোচ্চ নহে, পরন্তু খিলানের মত ঢেউখেলানো। উচ্চ স্তর গ্যাসের ও নিম্ন স্তর তেলের আশ্রয়স্থল।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, যেরূপ অবস্থায় অদেহজ পদার্থ হইতে কেরোসিন তেল উৎপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ অবস্থা পৃথিবীতে বহু বার ঘটিয়াছে। সেইজন্যই ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরে ঐ তেল পাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদের ত্রিধাতু

কবিরাজ শ্রীদীনেন্দ্রনাথ রায়

বিজ্ঞানশাস্ত্রমাত্রেই কতকগুলি বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। ত্রিদোষ-তত্ত্ব আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের মূলসূত্র। ত্রিদোষ সম্বন্ধে বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ত্রিদোষ যে শরীরান্তর্গত দ্রব্যবিশেষ আমরা তাহাই দেখাইব। তৎপূর্ব্বে শরীর কি উপাদানে গঠিত তাহা জানা আবশ্যক। শরীর পঞ্চভূতাত্মক, সুতরাং আমরা অগ্রে পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বের আলোচনা এবং সংক্ষেপে পদার্থতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিব। প্রাচীন ষড়দর্শনের মধ্যে ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্য-পাতঞ্জল পদার্থসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

ন্যায় দর্শন—বৈশেষিকে কণাদ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের দ্রব্যসমূহের গুণকর্ম্ম আলোচনা করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, জগৎ পরমাণু সমষ্টির দ্বারা গঠিত। কোনও দ্রব্যকে ভাগ করিতে করিতে শেষ যে সীমায় উপস্থিত হওয়া যায়, তাহাই পরমাণু। কণাদ বলেন যে, এই সমস্ত পরমাণু পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে নূতন গুণের উৎপত্তি হয়। তিনি বলেন মন ও শরীর উভয়েই পরমাণুসমষ্টি,—মন মন-পরমাণু এবং শরীর শরীর-পরমাণুর দ্বারা গঠিত। যখন এই দুই পরমাণুর সংযোগ হয় তখন তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। কণাদের মতে জগতের

মূল কারণ পরমাণু এবং উহা ব্যতীত অপর কিছু নহে। পরমাণু সূক্ষ্ম এবং নিত্য; পরমাণু-সমূহের সংযোগে জগতের বিভিন্ন দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। ইহাকে আরম্ভবাদ বলে।

সাংখ্য দর্শন—কণাদের এই পরমাণুবাদের সহিত ডাল্টনের পরমাণুবাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু প্রতীচ্যে এখন যেরূপ ডারউইনের পরিণামবাদ ড্যাল্টনের পরমাণু-বাদকে বিশ্বাস করিয়াছে, সেইরূপ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও কণাদের পরমাণুবাদের পরিবর্ত্তে কপিলের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকারগণ বিশেষভাবে সাংখ্যমতই গ্রহণ করিয়াছেন।

একটী পরমাণু অপর একটী পরমাণুর সহিত মিলিত হইতে গেলে যে পরিস্পন্দনের প্রয়োজন সেই ক্রিয়াশক্তি কোথা হইতে আসিয়া তাহা কণাদ বলিতে পারেন নাই। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রভৃতি জৈব পদার্থের সৃষ্টি কিরূপে হইল এবং অজৈব বস্তু হইতে জৈব বস্তুর সৃষ্টিই বা কিরূপে হইল তাহাও বলেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইন ইহার মীমাংসা করিয়াছেন, আর প্রাচ্যে কপিল তাহা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উভয়েরই মত এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে একটীমাত্র পদার্থ ছিল, সেই এক বস্তুর পরিণাম হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকরা বলিতেন যে, ৯০।৯২টী মূল দ্রব্য হইতে এই জগতের সৃষ্টি। এখন তাঁহারা বলেন, ঐ ৯০টী মূল দ্রব্যের একটী অপরটীতে পরিণত হইতে পারে। সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে একটা পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, পারদ-বাষ্পের ভিতর দিয়া অনবরত আট দিন ধরিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালাইলে উহা হইতে কয়েক কণা স্বর্ণ পাওয়া যায়। ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎকণাতত্ত্ব, আইনষ্টাইনের নূতন আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং কুরীদ্বয়ের রেডিয়ম পরীক্ষা হইতে স্থির হইয়াছে যে, একটী পরমাণু ঋণ-তাড়িত এবং ধন-তাড়িত কণার দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক পরমাণু যেন এক একটী সৌরজগৎ; একটী ধনতাড়িত কণার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি ঋণতাড়িত কণা অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে। কোনও উপায়ে যদি ঐ পরমাণুতে একটী তাড়িতকণা যোগ বা বিয়োগ করিতে পারা যায়, তবে উহা অপর এক ভিন্ন দ্রব্যের পরমাণুতে পরিণত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মূল দ্রব্যের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ডারউইনের নব্য মত এই যে, সৌরজগৎ একখণ্ড দীপ্ত বাষ্পরাশির পরিণাম মাত্র। এই তেজঃপদার্থ ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিলে তাহার উপরের অংশে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। পরে গুরুত্ব বশতঃ উহার বিভিন্ন অংশ মূল পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের সৃষ্টি করিল। ইহার একটী পৃথিবী। এই বিচ্ছিন্ন অংশ—পৃথিবী যখন আরও শীতল হইল, তখন প্রথমে বৃক্ষাদি, পরে প্রাণিসকল এবং সর্ব্বশেষে মানবের সৃষ্টি হইল।

সৎকার্য্যবাদ—সাংখ্যপ্রণেতা কপিল প্রথমেই বলেন যে, বিশ্বজগতে কিছুই নূতন সৃষ্টি হয় না। কারণ শূন্য অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহা হইতে শূন্য ছাড়া অপর কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকরাও এ বিষয়ে একমত। সুতরাং নূতন কোন

দ্রব্যে আমরা যে সকল গুণ দেখিতে পাই, সেইগুলি আরব্ধ দ্রব্যে নিশ্চয়ই—অন্ততঃ সূক্ষ্মরূপে—বর্ত্তমান ছিল। বৃহৎ বটবৃক্ষ ক্ষুদ্র এক বীজ হইতে উৎপন্ন। এই বীজ মৃত্তিকা, জল এবং বায়ু হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া বীজরূপ হইতে বৃক্ষরূপে পরিণত হইল; অর্থাৎ বৃক্ষের সমগ্র রূপ অতি সূক্ষ্মভাবে বীজে নিহিত ছিল, উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িয়া তাহা প্রকাশ পাইল। এইরূপ আবার কাষ্ঠ জ্বালাইলে উহা ভস্ম বা ধূমে পরিণত হয়। ইহাতে এই বুঝায় না যে, কাষ্ঠের উপাদান-দ্রব্যের ধ্বংস হইয়া নূতন দ্রব্য ধূম উৎপন্ন হইল। যদি এক বস্তুর ধ্বংস হইয়া অপর এক নূতন বস্তুর সৃষ্টি ঘটা সম্ভবপর হয়, তবে দুগ্ধ হইতেই ঘোল হয়, জল হইতে হয় না কেন? অথবা তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হয়, বালুকা হইতে তৈল পাওয়া যায় না কেন? সুতরাং দেখা যাইতেছে, এখন যাহা আছে পূর্ব্বে তাহা অব্যক্তরূপে বর্ত্তমান ছিল,—হইতে পারে যে, পূর্ব্বাবস্থায় উহা অতি সূক্ষ্মরূপে ছিল। ইহাকে সাংখ্যে সৎকার্য্যবাদ বলে। এই মত এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 'অবিনশ্বর শক্তিবাদ' একই। প্রভেদ এই যে, সৎকার্য্যবাদ কেবলমাত্র এক বস্তুর অপর বস্তুতে পরিবর্ত্তন ঘটিলে বর্ত্তায়, কিন্তু আধুনিক মতে জগতের সমস্ত দ্রব্য এবং শক্তিসমষ্টি নিত্য, তাহার ধ্বংস নাই।

প্রকৃতি—সৎকার্য্যবাদ যদি মানিতে হয় তবে ইহা স্বতঃই প্রতীয়মান হইবে যে, এই বিশ্বের সৃষ্টি শূন্য হইতে আরম্ভ হইতে পারে না। সাংখ্যমতে প্রকৃতি বা অব্যক্ত হইতেই এই জগতের সৃষ্টি; সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিতে অতি সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল। কপিলমতানুসন্ধী সুশ্রুত বলিতেছেন—"যিনি সর্ব্বভূতের কারণ অর্থাৎ যাঁহা হইতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল ভূত উৎপন্ন হয়, যিনি নিজে অকারণ অর্থাৎ যাঁহার উৎপত্তির কারণ নাই, যিনি সত্ত্বরজস্তমঃ স্বরূপ (ত্রিগুণাত্মক), যিনি অষ্টরূপ অর্থাৎ অব্যক্ত, মহান্, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টরূপবিশিষ্ট এবং যিনি নিখিল জগতের প্রকাশের কারণ তাঁহারই নাম অব্যক্ত অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি।" সু. শা. অ. ১

সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অপর প্রবন্ধ লিখিতে হয়। বাহুল্য ভয়ে উহা না করিয়া প্রকৃতিকে সৃষ্টির আদি ধরিয়া কিরূপে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে এখন তাহাই বলিব।

বুদ্ধি—সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, যখন কোনও ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হন, তখন প্রথমেই তাঁহার বুদ্ধির উদ্রেক হয়; অর্থাৎ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে উহাতে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতিও জগৎসৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন। এইজন্যই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। মানবদেহে আত্মা বর্ত্তমান, সেইজন্য মানুষ বুদ্ধির অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। প্রকৃতির সমস্ত গুণ আছে, কিন্তু আত্মা নাই। সুতরাং উহা বুদ্ধির অস্তিত্ব বুঝিতে পারে না। প্রকৃতি চেতনাহীন।

হ্যাকেল বলেন, "পরমাণুর আত্মা আছে ইহা যদি স্বীকার করা না যায়, তবে রসায়নের সাধারণ ঘটনারও ব্যাখ্যা করা হয় না। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, আকর্ষণ, প্রত্যাকর্ষণ এই সমস্ত গুণ পরমাণুসমষ্টিরূপ দ্রব্যের প্রত্যেক পরমাণুতে আছে। কারণ যৌগিক

দ্রব্যের উৎপত্তি এবং বিশ্লেষণ হইলে আরম্ভক পরমাণুসমূহের যে পরিস্পন্দনের প্রয়োজন তাহা কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না—যদি না পরমাণুর জ্ঞান এবং ইচ্ছার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়।" সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, নব্য বৈজ্ঞানিকও বলিতেছেন জগতের জড় পদার্থসমূহের এমন একটা গুণ আছে, যাহা মানুষের বুদ্ধির সমান। কিন্তু তাঁহারা এই গুণ অনুভব করিতে পারে না। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি কেন হইল, তাহা এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি। সুশ্রুতও বলিয়াছেন,—"সেই অব্যক্ত হইতে মহান্ অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়।" সু. শা. অ. ১

অহঙ্কার—দ্বিতীয় পরিণাম অহঙ্কার। প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হইবার পরও আমরা দেখিতেছি যে, প্রকৃতির তখনও একত্ব ভাব থাকে। জগতে কিন্তু বিভিন্ন বহু দ্রব্য দেখা যায়, যথা—মানুষ, জন্তু, প্রস্তর, মৃত্তিকা, ধাতু, বৃক্ষ প্রভৃতি। এই পৃথক্‌ত্ব আসিল কিরূপে? সেইজন্যই দ্বিতীয় পরিণাম অহঙ্কার। "আমি অপর বস্তু হইতে ভিন্ন" এই যে জ্ঞান তাহাই অহঙ্কার। জড়পদার্থসমূহ এই অহংজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারে না। মানব আত্মবান্, সেইজন্য তাহার আত্মজ্ঞান হয়। অন্ততঃ ইহা ঠিক যে, যদি এই অহঙ্কার স্বীকার করা না যায়, তবে জগতের বিচিত্র, নানাগুণসম্পন্ন দ্রব্যের অস্তিত্ব সমাকৃরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না।

অহঙ্কারের পর প্রকৃতি দুইভাগে বিভক্ত হইলেন, জৈব ও অজৈব। জৈব বা ইন্দ্রিয়যুক্ত পদার্থ ১১টী,—৫টী জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন। প্রকৃতির তমোগুণবাহুল্যে ৫টী তন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়াছে; এই ৫টী তন্মাত্র সমস্ত অজৈব দ্রব্যের মূল।

পঞ্চতন্মাত্র—এক্ষণে দেখা যাক যে, অজৈব দ্রব্যের মূল উপাদান পাঁচটী কেন হইল? নব্য বৈজ্ঞানিকেরা সমুদায় সৃষ্ট বস্তুকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—কঠিন, তরল এবং বায়বা। সাংখ্যে অন্য পদ্ধতিতে দ্রব্যের বিভাগ করা হইয়াছে। সাংখ্যকারেরা বলেন জগতের সমস্ত বস্তু আমরা পাঁচটী মাত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারি। এই ইন্দ্রিয় পাঁচটী এইরূপ যে, এক একটী ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র একটী গুণকেই বুঝিতে পারে। চক্ষুর দ্বারা গন্ধের উপলব্ধি হয় না, কিংবা শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা দেখা চলে না। কোনও দ্রব্য মধুর, কি কটু, কি তিক্ত তাহা ত্বগিন্দ্রিয় বুঝিতে পারিবে না; জিহ্বা শুনিতে পারিবে না; ঘ্রাণেন্দ্রিয় রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

এইরূপে যদি কেবলমাত্র পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ—এবং তাহাদের উপলব্ধ পাঁচটী বিষয়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যে পাঁচটী গুণ ঐ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় সেই পাঁচটী গুণ হইতেই জগতের সৃষ্টি হয়। কারণ আমরা অতিরিক্ত একটা ষষ্ঠগুণের কল্পনা করিতে পারিলেও ঐ গুণ উপলব্ধি করিবার কোনও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আমাদের নাই।

এই পঞ্চ গুণ আবার নানাবিধ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—যদিও শব্দ একটি গুণ, তথাপি এই শব্দ মধুর, কর্কশ, উচ্চ বা কোমল হইতে পারে। রস এক, কিন্তু ইহা মধুর,

অম্ল লবণ, কটু, তিক্ত, কষায় ভেদে ছয় প্রকার। রূপও হরিৎ, পীত, রক্ত প্রভৃতি ভেদে বহু। শুধু এই নহে; মধুর একটী বিশিষ্ট রস, কিন্তু এই মধুরতা আবার বহুবিধ যথা,—ইক্ষুর মধুরতা, দুগ্ধের মধুরতা, আম্রের মধুরতা ইত্যাদি। এইরূপে প্রত্যেক গুণেরই অসংখ্য ভেদ করা যায়। আবার বিভিন্ন গুণের তর-তম সংযোগে অসংখ্য দ্রব্যের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু যেরূপ ভাবেই সংযোগ হউক না কেন, আমরা পাঁচটীর অতিরিক্ত গুণ উপলব্ধি করিতে পারি না, কারণ পাঁচটী ইন্দ্রিয় ছাড়া অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আমাদের নাই।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, যদিও জগতে এমন কোনও বস্তু নাই যাহাতে কেবল একটী মাত্র গুণ পৃথক্‌ভাবে আছে, তথাপি কপিল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, প্রকৃতি হইতে পাঁচটী মাত্র মূল পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে; যথা,—শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, এবং গন্ধ তন্মাত্র। এই পঞ্চ তন্মাত্র সমস্ত সৃষ্টির কারণ, এবং ইহারা সূক্ষ্ম।

পঞ্চ মহাভূত—এই সূক্ষ্ম তন্মাত্র দ্রব্যের সংযোগ হইতে স্থূল পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি। নিম্নলিখিত ভাবে উহাদের সৃষ্টি হয়। আমরা জানি যে দ্রব্যকণাসমূহের স্পন্দন হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কণাগুলির পরস্পরের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান না থাকিলে স্পন্দন হইবে কিরূপে? সেইজন্যই একখণ্ড লৌহের অভ্যন্তরে শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে না। "শব্দ গুণমাকাশং" এই সূত্রের দ্বারা সাংখ্যকার উহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। সুতরাং জগতে শব্দের উৎপত্তি হইতে গেলে যে স্থূল মহাভূতের বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন তাহা আকাশ। এখানে আমরা দেখিতেছি যে, আকাশ মহাভূতে একমাত্র শব্দ গুণই আছে; অপর কোন গুণ নাই। আকাশ স্পর্শ করা যায় না, বা দেখা যায় না; রসনা বা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাও উহা গ্রাহ্য নহে। সেইজন্য ডল্লন সুশ্রুতের টীকায় বলিয়াছেন,—"শব্দতন্মাত্রাচ্ছব্দগুণং ব্যোমঃ।"

বাহ্য বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ বর্ত্তমান। বিশুষ্ক (অর্থাৎ যাহাতে অল্প কিছুও সংমিশ্রণ নাই এইরূপ) বায়ু স্পর্শের দ্বারা অনুভব করা যায় এবং শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহার রসও নাই, গন্ধও নাই। যে দ্রব্যে উক্ত শব্দ ও স্পর্শ দুইটী গুণ সমবেত থাকে তাহাই বায়বীয়। বাহ্য জগতে আমরা একমাত্র সাধারণ বায়ুতে ঐ দুই গুণ সমবেত দেখিতে পাই বলিয়াই দ্বিতীয় মহাভূতকে 'বায়ু' বলা হইয়াছে। তৃতীয় মহাভূত তেজঃ বা অগ্নি; ইহাতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিন গুণ বিদ্যমান। চতুর্থ অপ্, ইহাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী গুণ আছে। পঞ্চম মহাভূত পৃথিবীতে উহা ছাড়া অতিরিক্ত গন্ধ গুণ বর্ত্তমান।

ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে আমরা যাহাকে মহাভূত বলি, তাহা পঞ্চতন্মাত্রের সমষ্টি মাত্র, কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট জড় দ্রব্য নহে। বহির্জগতের সাদৃশ্য হইতেই এই পঞ্চ মহাভূতের (অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রের সমষ্টিবিশেষের) যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই নামকরণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহারা পঞ্চতন্মাত্রের সমবায় বিশেষ, সমবেত

গুণসমষ্টিকে একটী নামে অভিহিত করিবার জন্য আকাশাদি বলা হইয়াছে। 'শব্দতন্মাত্র + স্পর্শতন্মাত্র + রূপতন্মাত্র' না বলিয়া কেবলমাত্র 'তেজঃ' বলা হইয়াছে। পৃথিবী বলিতে মৃত্তিকা বা কর্দ্দম বুঝায় না, পাঁচটী তন্মাত্রের সমষ্টি বুঝায়; ঐরূপ অপ্ বলিতে চারিটী তন্মাত্রের, তেজঃ তিনটী, বায়ু দুইটী ও আকাশ একটীর সমষ্টি বুঝায়।

জড় পদার্থ—উক্ত পঞ্চ মহাভূতের তর-তমাদি সংযোগে জগতের সমুদায় জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহাকে 'পঞ্চীকরণ' বলে। কোনও দ্রব্যে যখন পৃথিবীত্ব বা পৃথিবীমহাভূত বহুল পরিমাণে থাকিবে এবং অন্য চারিটী মহাভূত থাকিবে অল্প পরিমাণে তখন সেই দ্রব্যকে আমরা পার্থিব বলিব। সুশ্রুত বলিতেছেন,—

"পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূতের সমবায়ে সমস্ত দ্রব্যেরই উৎপত্তি হয়। তবে আধিক্যেরই ব্যপদেশ হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে দ্রব্যে যে ভূতের অংশ অধিক সেই দ্রব্যকে তদ্ভূত বলিয়া বর্ণন করা যায়। যেমন, ইহা পার্থিব, ইহা আপ্য, ইহা তৈজস, ইহা বায়বা, ইহা আকাশীয়। বস্তুতঃ দ্রব্য মাত্রেই পাঞ্চভৌতিক।" সু, সূ, অ, ৪১

মৃত্তিকাখণ্ড পার্থিব, লৌহখণ্ডও পার্থিব; কিন্তু লৌহখণ্ড অধিক পার্থিব, কারণ উহা মৃত্তিকাখণ্ড অপেক্ষা অধিক কঠিন। কিন্তু ঐ মৃত্তিকাখণ্ড যদি অধিক পরিমাণ জলে মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে এই মিশ্রণ পদার্থ আপ্য দ্রব্য হইবে, কারণ দ্রবত্বই জলের বিশেষ গুণ। এইরূপ আবার যদি উক্ত লৌহখণ্ডকে উত্তপ্ত করিয়া দীপ্ত করা যায়, তবে উহা পার্থিব পদার্থ হইতে তৈজস পদার্থে পরিণত হইবে, কারণ তৈজস পদার্থ উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও রূপগুণ-বহুল। গন্ধক সাধারণতঃ পার্থিব; কিন্তু উত্তাপসংযোগে উহা ক্রমশঃ আপ্য এবং তৈজস্ পদার্থে পরিণত হইবে, শেষে বায়বীয় আকার ধারণ করিবে।

পঞ্চমহাভূত ও শরীর—শরীর পঞ্চমহাভূতাত্মক। শরীরের উপাদান এই পঞ্চমহাভূতের ক্ষয় ও বৃদ্ধিই রোগ। কিন্তু শরীরের এই পঞ্চমহাভূতের পরিমাণ অসংখ্য প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কারণ অংশাংশ ভেদে পঞ্চভূতের সংযোগও অসংখ্য। এদিকে আবার জগতেও অসংখ্য দ্রব্য আছে, ইহারা একটী অপরটী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; সুতরাং ইহাও নিশ্চিত যে, পঞ্চভূতের পরিমাণবিশেষের জন্য শরীরে যে ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরিমাণের বিপরীত পরিমাণবিশিষ্ট পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্য পাওয়া যাইবে। এই দ্রব্য ঔষধরূপে প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বের বিকৃতভাব দূর হইয়া পুনর্ব্বার পঞ্চভূতের সাম্যভাব আসিবে, সুতরাং ব্যাধিও দূর হইবে। [ধরুন রক্ত দূষিত হইয়াছে; এখন রক্ত পঞ্চভূতাত্মক, মনে করা যাক, রক্ত—পার্থিব অংশ ১ ভাগ + জলীয় অংশ ৩ + তৈজস ভাগ ২ + বায়ব্য অংশ ২ + আকাশীয় ভাগ ২। এই পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হইয়া তৈজস ভাগ ১ ও জলীয় ভাগ ৪ হইল; রক্তও দূষিত হইল। আবার মনে করুন, লৌহ = পার্থিব ৫ + জলীয় ১ + তৈজস ২ + বায়ব্য ১ + আকাশীয় ১। এই লৌহ ঔষধরূপে প্রয়োগ করিলে তৈজস ভাগ বৃদ্ধি করিবে এবং পার্থিব-ভাগের বাহুল্য বশতঃ জলীয় ভাগ হ্রাস করিয়া ঐ দূষিত রক্তের সাম্যাবস্থা আনয়ন করিবে।]

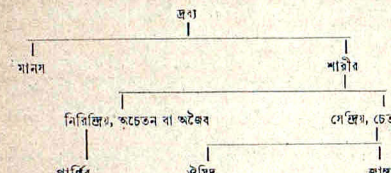

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জগতে এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা ঔষধরূপে ব্যবহার করা যায় না। আমরা নিম্নে দ্রব্যের বিভাগ দেখাইতেছি :—

- দ্রব্য
  - মানস
  - শারীর
    - নিরিন্দ্রিয়, অচেতন বা অজৈব
      - পার্থিব (সুবর্ণ, লৌহ প্রভৃতি)
    - সেন্দ্রিয়, চেতন, বা জৈব
      - ঔদ্ভিদ (মূল, ত্বক, পত্র প্রভৃতি)
      - জাঙ্গম (মধু, বসা, মজ্জা, মাংস, অস্থি প্রভৃতি)

মানবদেহের উপাদান—সমগ্র জগতের মূল উপাদান দ্রব্যের কথা আমরা বলিয়াছি, এতৎপ্রসঙ্গে মানবদেহের আরম্ভক দ্রব্যাদি ও দেহে বিকার হইলে তাহার শমনোপায়ের নিমিত্ত ঔষধাবলির কথাও বলিয়াছি। কিন্তু কার্য্যতঃ চিকিৎসাক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষের পঞ্চমহাভূতের পরিমাণাদির পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারণ করা এবং সেই ব্যাধি নিবারণের জন্য দ্রব্যাদির পঞ্চমহাভূতের পরিমাণ সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদ এক স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। প্রাচীন ঋষিরা শরীরের মূল উপাদান দ্রব্যকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—দোষ, ধাতু ও মল,—

"দোষধাতুমলমূলং হি শরীরম্" (সু. সূ. অ. ১৫)

"দোষধাতুমলমূলং সদা দেহস্য" (বা. সূ. অ. ১১)

ধাতু ও উপধাতু—এই তিন দ্রব্য পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের বলা আবশ্যক যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে 'ধাতু' শব্দ দুইটী বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ধা— ধারণপোষণে; এই 'ধা' ধাতু হইতে 'ধাতু' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা শরীরকে ধারণ করে এবং পোষণ করে তাহাই ধাতু। সুতরাং নিরোগ অবস্থায় শরীরে যে দ্রব্য বর্ত্তমান থাকে তাহাই ধাতু। কিন্তু দেহের ক্ষয় পূরণের নিমিত্ত আমরা নিত্য যে আহার করি, উহা পরিপাক হইয়া শরীরে মূলতঃ যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, আমরা সাধারণতঃ সেই সকল দ্রব্যকেই ধাতু বলিয়া থাকি। বাকী সমস্ত উপধাতু। সেইজন্য ত্বক্, স্নায়ু, শিরা, কণ্ডরা প্রভৃতি উপধাতু। কারণ যদিও উহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে, তথাপি এই উপধাতু হইতে শরীরোপযোগী অন্য দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না। আগন্তুক ব্যাধি না হইয়া যদি শরীরে নিজ-ব্যাধির আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে প্রথমে ধাতুর পরিমাণাদির পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রথমাবস্থাতে উপধাতুর পরিবর্ত্তন হয় না; যদি ব্যাধি স্থায়ী হয় তবেই শেষে উপধাতুরও বিকৃতি ঘটে। চরকের টীকাকার চক্রদত্ত বলিয়াছেন, "ধাতুসমূহের পরিমাণের ন্যূনত্ব বা আধিকত্বই ব্যাধি।" (চ. সূ. অ. ৯)

স্থূলতঃ ঐ পরিমাণ এইরূপ :—(চ. শা. অ. ৭) শরীরে জল ১০ ভাগ, রস ৯, রক্ত ৮, পুরীষ ৭, শ্লেষ্মা ৬, পিত্ত ৫, মূত্র ৪, বসা ৩, মেদ ২, মজ্জা ১ মস্তিষ্ক ½, শুক্র ½, এবং ওজঃ ধাতু ½ ভাগ। ধাতুর ন্যূন অথবা অধিকভাগ দূর করিয়া সাম্যভাব স্থাপন করাই চিকিৎসা। ইহাই আয়ুর্ব্বেদের মুখ্য প্রয়োজন; যথা—

"ধাতু সাম্যক্রিয়া চোক্তা তন্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনম্" (চ. সূ. অ. ১)

দোষ ও দূষ্য—ধাতু ও উপধাতুর ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া আমরা এখন শরীরের উক্ত ত্রিবিধ উপাদানের কথা বলিব।

দোষ তিনটী—বায়ু, পিত্ত ও কফ

ধাতু সাতটী—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র

মল—মূত্র, পুরীষ ও স্বেদাদি

এই সমস্ত দ্রব্যই শরীর ধারণ ও পোষণ করে বলিয়া ধাতু বলিয়া অভিহিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি বাকী অন্য দ্রব্যকে দূষিত করিয়া শরীরে বিকার জন্মাইতে পারে বলিয়া ঐ তিনটী দ্রব্যকে 'দোষ' বলা হয়। অপর রসাদি সাতটী ও মূত্রাদি মলকে 'দূষ্য' বলা হয়, কারণ উহারা স্বকীয় প্রভাবে রোগ জন্মাইতে পারে না। মূত্র, শকৃৎ ও স্বেদাদিকে 'মল' বলা হইয়াছে, কারণ যদিও উহারা প্রথমাবস্থায় শরীর ধারণ ও পোষণ করে, তথাপি উহারা সর্ব্বদা বহির্ম্মুখ এবং পরিশেষে দেহ হইতে পরিত্যক্ত হয়। বায়ু, পিত্ত ও কফ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন শরীর ধারণ ও পোষণ করে। অন্যান্য ধাতু যখন অভিব্যক্ত হয় না, তখনও এই তিনটী ধাতু শরীরে বর্ত্তমান থাকে; গর্ভসৃষ্টির প্রথম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে ইহারা শরীরে থাকে, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে বুঝিতে পারা যায়।

"নিত্যাঃ প্রাণভৃতাং দেহে বাতপিত্তকফাস্ত্রয়ঃ।

বিকৃতাঃ প্রকৃতিস্থা বা তান্ বুভুৎসেত পণ্ডিতঃ॥" চ. সূ. অ. ১৮

ধাতুবৈষম্য দূরীকরণের সাধারণ উপায়—শরীরের বিভিন্ন উপাদান দ্রব্যের কথা আমরা বলিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, এই উপাদান দ্রব্যের মধ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটীর হ্রাস-বৃদ্ধিতেই রোগ হয়। এখন দেখা যাক, এই ধাতুবৈষম্য দূর করিয়া কিরূপে ধাতুসাম্য পুনঃস্থাপন করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে চরকের মূলনীতিই প্রধান—

"সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারণম্। হ্রাসহেতুর্বিশেষশ্চ" চ. সূ. অ. ১

বাগভট্ বলেন,—"বৃদ্ধিঃ সমানৈঃ সর্ব্বেষাং বিপরীতৈর্বিপর্য্যয়ঃ" (বা, সূ, ১২)। ইহার টীকায় অরুণদত্ত বলেন, "সর্ব্বেষাং দোষধাতুমলাদীনাং শরীরাশ্রিতানাং সমানৈস্তুল্যসম্প্রাপ্তৈর্বৃদ্ধিঃ স্বপ্রমাণাধিক্যম্।"

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, দেহে কোন ধাতুর পরিমাণের হ্রাস হইলে যদি

ঐ ধাতু কিংবা উহার সমানগুণধর্ম্মী অন্য কোন দ্রব্য প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ ধাতুবৈষম্যও দূর হইবে। এইরূপ আবার যদি কোন ধাতুর পরিমাণের বৃদ্ধি হয়, তবে উহার বিপরীত গুণাবলম্বী দ্রব্য প্রয়োগে উক্ত ধাতুবৈষম্য দূর হইবে। ধরা যাক এক ব্যক্তি অতিরিক্ত রক্তক্ষয় হেতু ম্লান হইয়া পড়িয়াছে; তখন অপর ব্যক্তির রক্ত লইয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করাইতে হইবে,—

"গরগোস, হরিণ, কুক্কুট, বিড়াল, মহিষ, মেষ, ছাগ ইহাদের সদ্য রক্তের সহিত মৃদুদীপ্য দ্রব্যের কল্ক মিশাইয়া বিশুদ্ধ শোণিতস্রাবে তাহার বস্তি প্রয়োগ করিবে।" চ. সিদ্ধি. অ. ১০

কিংবা অন্য যেরূপে হউক তাহাকে রক্তপান করাইতে হইবে। সেইরূপ মাংসের দ্বারা মাংসের, মজ্জা দ্বারা মজ্জার, শুক্র দ্বারা শুক্রের, আমগর্ভের (যথা ডিম) দ্বারা গর্ভের পুষ্টি সাধন হয়। কিন্তু ঘৃণা হেতু লোকে রক্ত প্রভৃতি দ্রব্য খাইতে চাহে না। সেইজন্য কোন ধাতুর বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হইলে ঐ ধাতুর সমানগুণ-বিশিষ্ট আহারবিকারের উপযোগ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, যে যে কর্ম্মের দ্বারা ঐ ধাতুর বৃদ্ধি হয়, সেই সেই কর্ম্মেরও উপসেবা করিতে হইবে।

বাস্তবিক শরীরের কোন ধাতুর হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়াছে কি না, তাহা সাধারণতঃ বুঝা যায় না, সেই ধাতুর গুণ বা কর্ম্মের হ্রাসবৃদ্ধি লক্ষণ দ্বারা উহা অনুমান করিতে হয়। সুতরাং আমাদের এখন দেখিতে হইবে যে, শরীরধাতুসমূহের দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম কি। বায়ু, পিত্ত, কফ যখন সকল রোগের মূল কারণ, তখন এই ত্রিধাতুর দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং ঐ দোষবৈগুণ্য নিবারণের জন্য যখন তদ্বিপরীত গুণ-ভূয়িষ্ঠ দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হইবে, তখন জগতের যাবতীয় পদার্থের দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে। আয়ুর্ব্বেদের সুস্থস্থানে ধাতুসমূহের দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার এবং নিঘণ্টুগ্রন্থে শেষোক্ত পরীক্ষা করা হইয়াছে।

ত্রিদোষ—ত্রিদোষ বা ত্রিধাতুই মানবদেহের প্রধান উপাদান, সেইজন্য আমরা প্রথমতঃ উহাদের দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার করিব।

ত্রিদোষ অথবা ত্রিধাতু যে শরীরের উপাদান-দ্রব্যবিশেষ প্রথমে আমরা তাহাই প্রতিপন্ন করিব। "দোষধাতুমলমূলং হি শরীরম্" এই বাক্য দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, শরীরোপাদান দ্রব্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—দোষ, ধাতু ও মল। তন্মধ্যে সাতটী ধাতু ও তিনটী মল যে যথার্থ দ্রব্য (matter) তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, কারণ ঐ গুলিকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া পরীক্ষা করা সম্ভবপর। তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ, গুণ ও কর্ম্ম আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে, যদিও সে বর্ণনা খুব সংক্ষেপ। এখন কথা হইতেছে যে, তিনটী দোষও শরীর হইতে পৃথক্ করা যায় কিনা, এবং উহাদের পরীক্ষা করিবার উপায় আছে কি না? এ সম্বন্ধে চরক, সুশ্রুত ও বাগভট্ট কি বলেন দেখা যাক।

(১) "বায়ুঃ পিত্তং কফশ্চোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।" চ. সূ. অ. ১

দোষকে শরীরজ বলা হইয়াছে, সুতরাং উহা দ্রব্য। আবার দোষ শরীরের একটী মূল পদার্থ; সুতরাং সৎকার্য্যবাদ অনুসারেও দোষ একটী দ্রব্য; কারণ শরীর দ্রব্য, সেই শরীর যখন দোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তখন দোষও দ্রব্য। এখানে শরীর অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতাত্মক শরীর বুঝিতে হইবে, মন ও আত্মা সম্বলিত রাশি-পুরুষ নহে।

(২) চরক দ্রব্যের লক্ষণ করিয়াছেন যে, যাহাতে কর্ম্ম ও গুণ সমবায়সম্বন্ধে আশ্রিত থাকে তাহা দ্রব্য। আবার পরে বায়ু, পিত্ত ও কফের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ত্রিদোষ দ্রব্য।

(৩) আহার প্রসঙ্গে চরক উপদেশ দিতেছেন (চ. বি. অ. ২) যে, কুক্ষিকে তিন অংশে বিভক্ত কল্পনা করিবে, এক অংশ কঠিন আহারবিকারের জন্য, এক অংশ তরল আহার্য্য দ্রব্যের এবং অপর এক অংশ বাতপিত্তশ্লেষ্মার জন্য। এখন দ্রব্যের একটী প্রধান সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, উহা কিঞ্চিৎ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সুতরাং চরক যখন উপদেশ দিতেছেন যে বায়ু, পিত্ত ও কফের জন্য কুক্ষির এক-তৃতীয়াংশ স্থান রাখিয়া দিতে হইবে, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ত্রিদোষ দ্রব্য। অতঃপর আমরা বায়ু, পিত্ত ও কফ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিব।

আমাদের এই পাঞ্চভৌতিক দেহ জীবকোষ (cells) দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক জীবকোষে জীবপঙ্ক (protoplasm) এবং কোষকেন্দ্র (nucleus) আছে। এই জীবপঙ্ক অনতিস্রব (semi-liquid,; জীবিত জীবপঙ্ক কি উপাদানে গঠিত তাহা জানিবার উপায় নাই, কারণ যে মুহূর্ত্তে উহা পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই উহা নির্জ্জীব হইবে। মৃত জীবপঙ্ক হইতে প্রতিদ (protein) নামক দ্রব্য পাওয়া যায়। এই প্রতিদের প্রকৃতি colloid তুল্য। কোলয়ড্ সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয় না, ইহা শুক্ল, মধুর, পিচ্ছিল এবং স্নিগ্ধ (যেমন তৈল) এবং ইহা গুরু ও স্থির অর্থাৎ অব্যাপ্তিশীল, শীতল ও মন্দ অর্থাৎ চিরকারী। এদিকে আয়ুর্ব্বেদে শ্লেষ্মার গুণ উক্ত হইয়াছে—

"গুরুশীতমৃদুস্নিগ্ধমধুস্থিরপিচ্ছিলাঃ" (চ. সূ. অ. ১)

সুতরাং আমরা 'কোলয়ড্'কে শ্লৈষ্মিক বলিতে পারি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে

(১) শ্লেষ্মা ঘন দ্রব্যবিশেষ (আঠার ন্যায়)

(২) জীবকোষের প্রতিদ ভাগই শ্লেষ্মা।

প্রায় প্রত্যেক জীবকোষ হইতে ফেন্দনায়ি (enzyme) উৎপত্তি হয়। এই ফেন্দনের প্রকৃতি দ্রাবক (acid) তুল্য [যেমন অম্লদ্রাবক (HCl) বা গন্ধকদ্রাবক (H_2SO_4)]। পিত্ত এইরূপ দ্রাবকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। পিত্তের গুণ যথা—

"সস্নেহমুষ্ণং তীক্ষ্ণং দ্রবমম্লং সরং কটু" (চ. সূ. অ. ১)

"পিত্তং কটু বিস্রং" (বা. সূ. অ. ১)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পিত্ত উক্ত দ্রাবকের ন্যায় দ্রব (liquid) এবং কিঞ্চিৎ স্নেহযুক্ত (oily)। ইহা তীক্ষ্ণ অর্থাৎ "শীঘ্রকারীমন্দবিপরীতঃ সূচীব ভিনত্তি", সুতরাং দ্রাবকের ন্যায় খাদ্য প্রভৃতি অন্য দ্রব্যের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিবদ্ধ হইতে সমর্থ। ইহা বায়ু এবং কফ অপেক্ষা উষ্ণস্পর্শ এবং লঘু অর্থাৎ কফ অপেক্ষা লঘু (কিন্তু বায়ু অপেক্ষা গুরু)। দ্রাবকের ন্যায় ইহা কটু ও অম্লরসবিশিষ্ট। ইহা বিস্র অর্থাৎ আমগন্ধযুক্ত,—শরীরজাত দ্রাবক বা স্পন্দনের এইরূপ গন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে

(১) পিত্ত দ্রব-দ্রব্যবিশেষ (দ্রাবকের ন্যায়)

(২) জীবকোষের স্পন্দনোৎপাদক ভাগই পিত্ত।

এইবার আমরা বায়ুর স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিব। চরক বায়ুর লক্ষণ বলিয়াছেন,—

"রৌক্ষ্যং লাঘবং বৈশদ্যং শৈত্যং গতিরমূর্ত্তত্বং চেতি বায়োরাত্মরূপানি ভবন্তি।"

চ. সূ. অ. ২০

আত্মরূপ অর্থাৎ স্বরূপ (চক্রদত্ত), সুতরাং এইগুলি বায়ুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। চক্রদত্ত টীকায় অমূর্ত্তত্ব অর্থে অদৃশ্যত্ব লিখিয়াছেন। বাহ্য বায়ুর ন্যায় দেহের এই বায়ুধাতুও অদৃশ্য। বাহ্য বায়ু আমরা দেখিতে পাই না; কারণ নীল, লোহিত প্রভৃতি কোন বিশিষ্ট রূপ ইহার নাই। ইহা ছাড়া বায়ুর যে সকল গুণ উক্ত হইল, তাহা যে কোনও বায়বীয় দ্রব্যে বা বাষ্পে (gas) আছে। [যদিও বাষ্প শব্দে ঠিক gas বুঝায় না, vapour বুঝায়, তথাপি সুবিধার জন্য আমরা gas অর্থে বাষ্পশব্দ ব্যবহার করিব।] ইহা কঠিন বা দ্রব দ্রব্য অপেক্ষা অধিক লঘু। বায়ু সূক্ষ্ম; পিত্ত প্রায়শঃ স্থূল এবং কফ সর্ব্বদা স্থূল; মূর্ত্তি এবং রূপ আছে বলিয়া এই দুইটীকে দেখিতে পাওয়া যায়। পিত্ত ও কফের তুলনায় বায়ু সূক্ষ্ম; সূক্ষ্ম বলিতে যে সকল সময়েই ইন্দ্রিয়গোচরবহির্ভূত হইবে তাহা নহে,—সূক্ষ্ম অর্থাৎ স্রোতঃপ্রবেশিত্ব। যে কোনও বাষ্পের ন্যায় বায়ু শরীরের সূক্ষ্মতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

সেই পুরাকালে এক বৈদ্য-সম্মিলনীতে মহর্ষিরা পরস্পর মিলিত হইয়া বায়ুর প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচারকালে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন,—"বায়ু নিরাকার (অসঙ্ঘাত) ও চঞ্চলস্বভাব, ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। সুতরাং ইহাকে প্রাপ্ত না হইয়াই বা কিরূপে প্রকোপকারক বা শান্তিকারক দ্রব্যসকল ইহাকে প্রকুপিত বা প্রশমিত করে?" (চ. সূ. ১২)। এস্থলে বায়ুকে অসঙ্ঘাতবান্ এবং অনবস্থিত বলা হইয়াছে। চক্রদত্ত টীকায় অসঙ্ঘাত অর্থে 'পিত্তশ্লেষ্মবদ্ অবয়বসঙ্ঘাতরহিতঃ' বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, কফ ও পিত্ত উভয়েই অবয়বসঙ্ঘাত অর্থাৎ উহাদের মূর্ত্তি আছে, উহারা দ্রব বা অনতিদ্রব, উহাদের বিশিষ্ট রূপ, গন্ধ প্রভৃতি আছে। কিন্তু বায়ুর (বায়ুধাতুর) এইরূপ কোনও গুণ নাই, উহা বাহ্যবায়ুসদৃশ, কেবলমাত্র স্পর্শগুণ আছে। এইরূপ আবার অনবস্থিত অর্থে চক্রদত্ত 'চলস্বভাবঃ' বলিয়াছেন অর্থাৎ কফ বা পিত্তকে যদি কোন আধারে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তাহারা সেই স্থানেই নির্দ্দিষ্ট

স্থান অধিকার করিয়া স্থির হইয়া থাকিবে। কিন্তু বায়ুকে যদি কোনও বোতলে রাখা যায়, উহা তৎক্ষণাৎ বোতলের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসে, স্থির হইয়া থাকে না। বোতলের মুখ খোলা থাকিলে ঐ বায়ু চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া বহির্বায়ুর সহিত মিশিয়া যাইবে। সেইজন্যই বায়ুকে চলস্বভাব বলা হইয়াছে। চল অর্থাৎ 'গমনশীলঃ নৈকত্র তিষ্ঠতি'। পিত্ত সর অর্থাৎ ব্যাপ্তিশীল।

বায়ু রূক্ষ অর্থাৎ ইহাতে স্নিগ্ধতা নাই। বাষ্প মাত্রেই রূক্ষ। বায়ু শীতল; পিত্ত উষ্ণ, কফের উষ্ণতা অত্যল্প, কিন্তু বায়ু সম্পূর্ণ শীতল। সাধারণ বাষ্পও শীতল বা উষ্ণ নহে, বাহ্য কারণের দ্বারা উহা উষ্ণ বা শীতস্পর্শ হয়। সেইজন্য অরুণ দত্ত বলিয়াছেন,—"বায়ু যোগবাহী, তেজঃ বা অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইলে উহা দাহকারী হয়, এবং সোমগুণের দ্বারা যুক্ত হইলে শীতকারী হয়। কিন্তু যোগবাহিত্ব হেতু দাহকারী হইলেও বায়ুর স্বাভাবিক শৈত্য বিনষ্ট হয় না। বায়ুর গুণ শীতল, ইহা বলায় এই বুঝিতে হইবে যে, উষ্ণক্রিয়ার দ্বারা বায়ুর উপশম হয়" (বা. সূ. অ. ১ টীকা)। বায়বীয় দ্রব্যে উত্তাপ সংযোগ করিলে উহার আয়তন (volume) বৃদ্ধি হয় এবং শেষে উহাকে কোনও স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারা যায় (উপশাম্যতি)।

বায়ু খর অর্থাৎ অমসৃণ, কফ শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ মসৃণ। বায়ু বিশদ অর্থাৎ পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ, পিত্ত বিস্র এবং কফ পিচ্ছিল। দ্রব বা কঠিন দ্রব্য পিচ্ছিল হইতে পারে, কিন্তু বায়বীয় দ্রব্য সকল সময়েই বিশদ।

জীবকোষ নানারূপ ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্র; মানবদেহের সমস্ত প্রধান কার্য্য একটী মাত্র জীবকোষের দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে। এই সমস্ত কার্য্য প্রধানতঃ কোষকেন্দ্র (nucleus) দ্বারা নিয়োজিত হয়। যদি কোনও কৃত্রিম উপায়ে আমরা একটী কোষকে এমন দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি যে, জীবপঙ্কের এক অংশে কোষকেন্দ্রটী থাকিবে এবং অপর অংশে উহা থাকিবে না, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, শেষোক্ত অংশ শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পড়িবে। কিন্তু যে অংশে কোষকেন্দ্র থাকিবে, উহা সাধারণ কোষের ন্যায় পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া জীবকোষের সমুদয় কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই কোষকেন্দ্রতে বায়ুধাতুর প্রকৃতিযুক্ত কোনও দ্রব্য আছে। কোষকেন্দ্রস্থিত এই বায়ুই কোষসমূহকে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন ধাতুতে (tissue) পরিণত করে ('বিভাগকরণাদ্যতঃ' —শার্ঙ্গধর)। এই বায়ুই জীবপঙ্কের গতির কারণ এবং ইহাই সমুদায় স্নায়ুকোষের কার্য্যের নিয়ামক। [যদিও আয়ুর্ব্বেদের স্নায়ু nerve নহে, তথাপি nerve অর্থে স্নায়ু শব্দের প্রয়োগ সাধারণে প্রচলিত থাকায় আমরা nerve-এর পরিবর্ত্তে স্নায়ু শব্দই ব্যবহার করিলাম।] অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে

(১) বায়ু বাষ্পদ্রব্যবিশেষ

(২) ইহা কোষকেন্দ্রের মধ্যে নিহিত।

সুতরাং আমরা প্রতিপাদন করিলাম যে, বায়ু, পিত্ত, কফ শরীরের উপাদান দ্রব্য, শক্তি-বিশেষ নহে। পিত্ত ও কফের রূপ আছে, সুতরাং উহাদিগকে চাক্ষুষ দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ুর রূপ নাই, সেইজন্য উহা অদৃশ্য। কিন্তু তাহা বলিয়া বায়ুকে শক্তি (force) বলা যায় না। "বা—গতিগন্ধনয়োঃ।" এই 'বা' ধাতু হইতে বায়ুশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ বায়ুর গতি আছে এবং উহার গন্ধন অর্থাৎ অন্য পদার্থকে গতিমান্ করিবার ক্ষমতা আছে। স্নায়ুকোষসমূহ যে দ্রব্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু স্নায়বিক শক্তি (nerveimpulse বা nerve force) যাহা স্নায়ুকোষ হইতে উদ্ভূত হয় তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। বায়ুধাতু দ্রব্য, কিন্তু উহা শরীরের সমস্ত কার্য্যের চালক ও নিয়ামক। বায়ুর শক্তিউৎপাদক ক্ষমতা আছে, এই ধর্ম্ম বলেই বায়ু পিত্ত ও কফ এবং শরীরের সমস্ত কোষসমূহের স্ব স্ব কার্য্যের কর্ত্তা।

(ক্রমশঃ)

ইলেক্‌ট্রন

শ্রীহীরালাল দত্ত

কোন পাত্র হইতে বায়ু প্রায় নিষ্কাসিত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক স্ফুরণ (discharge) বিষয়ক গবেষণা প্রসঙ্গে বিগত শতাব্দীর শেষভাগে কতকগুলি বহুমূল্য আবিষ্কারের সূত্রপাত হয়। পাত্রের ভিতর বায়ুর চাপ খুব কম হইলে তাহাতে ঋণরশ্মি (cathode ray) নামক এক প্রকার রশ্মি দেখা যায়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সার জে, জে, টমসন প্রমাণ করেন যে, এই রশ্মি সাধারণ আলোকের মত কোন তরঙ্গবিশেষ নহে, ইহা ঋণবিদ্যুদ্‌বাহী কণামাত্র। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রত্যেকটি কণার ভার ও বিদ্যুৎপরিমাণের (charge) অনুপাত নির্দ্ধারণ করেন। অণু বা কণা (particle) জাতীয় পদার্থের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে পৃথক্ করিয়া গুণনির্দ্ধারণ ইহাই প্রথম। ইতিপূর্ব্বে রাসায়নিকেরা অণু সম্বন্ধে অনেক তথ্যই বর্ণনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অসংখ্য অণু সম্পর্কে গড়ে প্রযোজ্য হইলেও কোন নির্দ্দিষ্ট একটি অণু সম্বন্ধেও উহা সত্য কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ছিল। অক্সিজেন পরমাণুর ওজন গড়ে হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের ১৬গুণ বলিয়া জানা ছিল সত্য, কিন্তু প্রত্যেকটি অক্সিজেন পরমাণু যে প্রত্যেকটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ১৬ গুণ ভারী, তাহা প্রমাণ করিবার কোন উপায় ছিল না।

ঠিক ঐ সালেই রন্টেন কর্ত্তৃক রঞ্জেন-রশ্মি আবিষ্কৃত হয়। দেখা গেল যে, যে স্থানে রঞ্জেন-রশ্মি লইয়া কার্য্য করা যায়, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বিদ্যুদ্‌বাহী পদার্থসমূদয় নিজেই বিদ্যুন্মুক্ত (discharged) হইয়া পড়ে। এই বিদ্যুন্মুক্তি চতুর্দ্দিকের বায়ুর ভিতর দিয়া সংঘটিত হয়, অর্থাৎ বিদ্যুতের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য (nonconducting) বায়ু রঞ্জেন রশ্মি-প্রভাবে সুলঙ্ঘ্য (conducting) হইয়া যায়। এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেকে এই মত প্রকাশ করেন যে, যেমন অনেক পদার্থ দ্রব অবস্থায় ঋণ ও ধনবিদ্যুদ্‌যুক্ত দুই অংশ বা ion-এ বিভক্ত হয় এবং তাহার ফলে সুলঙ্ঘ্যত্ব লাভ করে, সেইরূপ বায়ুও রঞ্জেন রশ্মিপ্রভাবে দুই প্রকার ion-এ বিভক্ত হইয়া বিদ্যুদ্‌বাহী পদার্থের প্রবাহরূপে পৃথিবীতে প্রবেশের পথ করিয়া দেয়। কিন্তু অনেকে ইহার প্রতিবাদ করেন। পরে উইলসনের বিখ্যাত "মেঘ পরীক্ষা" দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। নিম্নে এই পরীক্ষার বিবরণ দেওয়া গেল।

উইলসনের "মেঘ পরীক্ষা"

উন্মুক্ত তরল পদার্থের উপরিভাগ হইতে অণুসকল অনবরত বাহির হইয়া বাষ্পাকারে বাতাসে উড়িয়া যায়। কিন্তু কোন আবৃত পাত্র জল বা অন্য কোন তরল পদার্থে আংশিক ভাবে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলে দেখা যাইবে যে, পাত্রের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বাষ্প সঞ্চিত হইবার পর আর নূতন বাষ্প জন্মে না। এই সময়ে ঐ বাষ্পের যে চাপ, তাহাকে "পূর্ণ-বাষ্পচাপ" কহে। তরল পদার্থের উষ্মা যত অধিক হয়, পূর্ণ-বাষ্পচাপও তত অধিক হয়। অতএব, পূর্ব্বোক্ত জলপূর্ণ পাত্রটি যদি উত্তপ্ত করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব-সঞ্চিত বাষ্পের চাপ উত্তপ্ত অবস্থার পূর্ণচাপের অপেক্ষা কম হইবে, সুতরাং আরও কতকগুলি অণু উড়িয়া আসিয়া অপূর্ণ বাষ্পচাপকে পূর্ণ করিয়া দিবে। আবার যদি ঐ পাত্রটি হঠাৎ ঠাণ্ডা করা হয়, তাহা হইলে সঞ্চিত বাষ্পের চাপাধিক্য বশতঃ কতকাংশ তরলীভূত হইয়া যাইবে।

কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, যদি তরল পদার্থের উপরিস্থিত বায়ুতে ধূলিকণা বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে অনেক সময় ঠাণ্ডা করা সত্ত্বেও বাষ্পের চাপ কমে না, অর্থাৎ কোন বাষ্প তরলীভূত হয় না। এইরূপ অবস্থায় তরল পদার্থের উপরিস্থিত বাষ্পের চাপকে "অতিপূর্ণ" বলা চলে। বলা বাহুল্য, এ অবস্থা বাষ্পের স্থায়িভাব (stable equilibrium) নহে, সামান্য কারণেই আংশিক তরলীভূত হইয়া স্বাভাবিক পূর্ণচাপে পরিণত হইতে পারে। এই "অতিপূর্ণ" চাপ স্বাভাবিক পূর্ণচাপের আটগুণের অধিক হইলে ধূলিকণার অভাবেও বাষ্প তরল হইতে আরম্ভ করে। ধূলিকণার এই গুণের কারণ এই যে, তরল পদার্থের উপরিভাগ কুব্জ (convex) হইলে তাহার উপর বাষ্পের স্বাভাবিক পূর্ণচাপ সমতল উপরিভাগের উপরিস্থিত পূর্ণচাপ অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। আবার গোলাকার পদার্থের ব্যাস যত ক্ষুদ্র, তাহার কুব্জতাও তত অধিক। সুতরাং অতিপূর্ণ চাপবিশিষ্ট বাষ্পকণা অতি ক্ষুদ্র ব্যাস লইয়া তরল হইতে আরম্ভ করিলে কুব্জতা অত্যধিক থাকে বলিয়া উহার স্বাভাবিক পূর্ণ বাষ্পচাপও অত্যধিক হয়। অবশ্য, যে বাষ্প বিদ্যমান আছে, তাহার চাপ নিম্নস্থিত সমতল তরল পদার্থের পক্ষে অতিপূর্ণ হইলেও নবগঠিত কুব্জপৃষ্ঠ ক্ষুদ্রকণার পক্ষে অপূর্ণ। ফলে জন্মমাত্র উহা পুনরায় বাষ্পীভূত হইয়া যায়। কিন্তু ধূলিকণার ব্যাস অতিক্ষুদ্র নহে; সুতরাং তাহার উপর সহজেই বাষ্প জমিতে পারে।

উইলসন বক্ষ্যমাণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ধূলিকণার পরিবর্ত্তে যদি কোন 'আয়ন' বিদ্যমান থাকে তাহা হইলেও বাষ্প সহজে তরল হইতে পারে। ইহার কারণ অবশ্য ভিন্ন; কেন না, আয়ন-এর ব্যাস ধূলিকণার মত বৃহৎ নহে, পরন্তু অণুর সমান, অথবা তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র। পূর্ব্বোক্ত নবগঠিত জলকণা যদি কোন আয়ন-এর উপর জমিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে বৈদ্যুতিক বিপ্রকর্ষণের (repulsion) ফলে উহা বাড়িতে চাহে। কারণ,

কণার প্রত্যেক অংশে যে বিদ্যুৎ আছে, অন্য সমস্ত অংশের বিদ্যুৎ তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দেয়। ফলে পরস্পরের "ঠেলা"য় বা বিপ্রকর্ষণে ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি দূরে সরিয়া যাইতে (অর্থাৎ কণাটি বাড়িতে) চায়। পক্ষান্তরে তলাকর্ষণের (surface tension) ফলে কণাগুলি আরও ক্ষুদ্রতর হইবার চেষ্টা করে। সুতরাং বিদ্যুতের অস্তিত্ব, তলাকর্ষণের প্রভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া, বাষ্পচাপের অপেক্ষাকৃত অপূর্ণতা সত্ত্বেও নবগঠিত জলকণাকে সহজে পুনরায় বাষ্পীভূত হইতে দেয় না।

একটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠে যৎপরোনাস্তি জল রাখিয়া দিলে, উপরের স্থান বাষ্পে পূর্ণ হইয়া থাকিবে। যদি কোন উপায়ে উষ্মা কমান যায়, তাহা হইলে ধূলিকণার উপর জল জমিতে আরম্ভ করিবে। তখন ধূলিকণাসমূহ নীচে পড়িয়া যাইবে। দুই একবার এইরূপ "ধৌত" করিলে প্রকোষ্ঠটি ধূলিশূন্য হইয়া যাইবে। প্রকোষ্ঠ ঠাণ্ডা করিবার জন্য উইলসন গ্যাসের সহসা সম্প্রসারণের ফলে উষ্মাহ্রাসের সাহায্য গ্রহণ করেন। সহসা গ্যাসের আয়তন বর্দ্ধিত করিলে উহা ঠাণ্ডা হইতে চাহে। কিন্তু আস্তে আস্তে ঢাকনী টানিয়া আয়তন বাড়াইলে, বাহিরের বায়ুমণ্ডল হইতে তাপ আসিয়া উহাকে গরম করিয়া দেয়। এইজন্য ঠাণ্ডা করিতে হইলে হঠাৎ ঢাকনী টানিয়া আয়তন অনেকখানি বাড়াইয়া ও চাপ অনেকখানি কমাইয়া ফেলিতে হয়, যেন বাহিরের তাপ ভিতরে প্রবেশ করিবার অবসর না পায়। কতখানি বাড়াইলে কতটুকু উষ্মা কমিবে অর্থাৎ ঠাণ্ডা হইবে, তাহা বয়েল ও চার্লসের নিয়ম অনুসারে সহজেই হিসাব করা চলে। হঠাৎ সম্প্রসারণের জন্য উইলসন এইরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, প্রকোষ্ঠের ঢাকনীটি বাহিরের অন্য একটি পাত্রের বাতাসের চাপে ধৃত হয়; এই দ্বিতীয় পাত্রটি কোন "পাম্পের" সহিত সংযুক্ত, অতএব অত্যন্ত অল্প বায়ুপূর্ণ তৃতীয় পাত্রের সহিত সহসা সংযুক্ত করিয়া দিলে, উহার বায়ুচাপ সহসা কমিয়া প্রকোষ্ঠের ঢাকনীটি হঠাৎ সরিয়া যাইবে। ফলে প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ বায়ু সহসা সম্প্রসারিত হওয়ায় উহার উষ্মা কমিবে। প্রকোষ্ঠটি কোন চাপমান নলের সহিত সংযুক্ত থাকে। পরীক্ষার আরম্ভে ও শেষে এই নলের প্রতি লক্ষ্য করিলে চাপের হ্রাস ও বৃদ্ধি এবং কার্য্যকালে উষ্মাহ্রাসের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায়। কত উষ্মা হইলে বাষ্পের পূর্ণচাপ কত হয় তাহা জানিবার জন্য 'টেবল' বা তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকা হইতে, পরীক্ষারম্ভে প্রকোষ্ঠের বা পরীক্ষাগারের উষ্মার ও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে নির্দ্ধারিত বর্দ্ধিত অবস্থার উষ্মার বাষ্পের পূর্ণচাপ লইয়া তুলনা করিলে, কত গুণ "অতিপূর্ণতা" সাধিত হইয়াছিল সহজে নির্ণীত হয়।

এই উপায়ে পরীক্ষা করিয়া উইলসন দেখিয়াছেন যে, আটগুণ অতিপূর্ণতায় ধূলিকণার অভাবেও বাষ্প জমিতে আরম্ভ করে। কিন্তু যদি ধূলিশূন্য প্রকোষ্ঠে সূর্য্য হইতে রঞ্জেন-রশ্মি প্রবেশ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কম অতিপূর্ণতায় বাষ্প জমিয়া ঘনমেঘের সৃষ্টি করে। এই জন্যই পরীক্ষাটির নাম "মেঘ পরীক্ষা"। কোন বিদ্যুদ্যুক্ত পদার্থ নিকটে আনিলে এই মেঘ আকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট হয়। সুতরাং উহা যে বৈদ্যুতিক পদার্থ আয়ন-এর কার্য্য

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই আয়নগুলিকে ধন ও ঋণ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াও উইলসন স্বীয় পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়াছেন। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, চারিগুণ মাত্র অতিপূর্ণতায় ঋণ আয়ন-এর উপর বাষ্প জমে; কিন্তু ধন আয়ন-এর উপর মেঘ সৃষ্টি করিতে ছয়গুণ অতিপূর্ণতার আবশ্যক। অতএব, ঋণ আয়ন এবিষয়ে অনেক বেশী কার্যকরী। উইলসনের "মেঘ" রঞ্জনরশ্মি, আলফারশ্মি, বিটারশ্মি প্রভৃতির আয়ন উৎপাদনের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব, আয়নে বিদ্যুতের পরিমাণ নির্দ্ধারণ উপলক্ষে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রাণ ইলেকট্রনের আবিষ্কার।

আয়নে বিদ্যুতের পরিমাণ

টমসনের প্রণালী

উইলসনের মেঘের কণাগুলি পরস্পর সমান; কেন না, যদি তাহারা ছোট বড় হইত, তাহা হইলে সমস্ত মেঘ একসঙ্গে নীচে পড়িত না, বড় কণাগুলি আগে পড়িত, সুতরাং সমস্ত মেঘ বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হইয়া যাইত। এস্থলে একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। বায়ুশূন্য স্থানে পতনশীল পদার্থের বেগ ওজন বা আয়তনের উপর নির্ভর করে না; ছোট বড় সমস্ত পদার্থই সমান বেগে পতিত হয়। কিন্তু বাতাসের প্রভাব ছোট ও বড় পদার্থের উপর সমান নহে। অতি ক্ষুদ্র পতনশীল পদার্থের পক্ষে বাতাসের বাধাই একমাত্র নিয়ামক। এ সম্বন্ধে একমাত্র ষ্টোক্‌সের নিয়মই প্রযোজ্য। এই নিয়মে পদার্থ যত ক্ষুদ্র হয়, ইহার বেগও তত অল্প হয়। এই জন্যই বলা হইল যে, বড় কণাগুলি আগে পড়িত। যাহা হউক, ক্যাথিটোমিটার নামক দুরবীক্ষণবিশেষের সাহায্যে সংজেই উইলসনের মেঘের পতনবেগ নির্ণীত হইতে পারে, এবং ষ্টোক্‌সের নিয়ম প্রয়োগ করিয়া সহজেই প্রত্যেকটি কণার আয়তন ও ওজন বাহির করা যায়।

আবার, সমস্ত মেঘটির ওজন নিরূপণ করাও দুরূহ নহে। কারণ, প্রকোষ্ঠের বাষ্পপূর্ণ স্থানের আয়তন ও বাষ্পের ঘনত্ব জানা থাকিলে এই স্থানে যত বাষ্প আছে, তাহার সমুদয় ওজন পাওয়া যায়। অতএব পরীক্ষার আরম্ভে যে উষ্মা ছিল, তাহাতে সমুদয় বাষ্পের ওজন, এবং মেঘ সৃষ্টি হওয়ার সময় যে বাষ্প অবশিষ্ট থাকিবে তাহার ওজন—ঐ দুই সময়ের উষ্মা জানা থাকিলে সহজেই পাওয়া যায়। এই দুই ওজন বিয়োগ করিলে, কতখানি বাষ্প জল হইয়া গিয়াছে বুঝা যাইতে পারে। অবশ্য এস্থলে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে একবার বাষ্প জমিতে আরম্ভ করিলে সমস্ত অতিরিক্ত বাষ্প জল না হইয়া থামে না।

এইরূপে প্রত্যেকটি জলকণার ও সমুদয় মেঘের ওজন বাহির হওয়ায় জলকণার সংখ্যা সহজেই নির্দ্ধারিত হয়। টমসনের পরীক্ষায় বাষ্পচাপের অতিপূর্ণতা ছয়গুণের কম রাখা হইয়াছিল। সুতরাং কেবলমাত্র ঋণবিদ্যুতের উপর মেঘ জমিয়াছিল। মেঘ নীচে পড়িয়া গেলে বিদ্যমান যন্ত্রের (electrometer) সাহায্যে ইহার বিদ্যুতের পরিমাণ পাওয়া যায়।

বিদ্যুতের পরিমাণকে কণার সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে প্রত্যেকটি কণায় সুতরাং প্রত্যেক আয়নে, বিদ্যুতের পরিমাণ জানা যায়। এস্থলে কোনও কণা দুইটি বা অধিক আয়ন-এর উপর জমে নাই বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

এই পরীক্ষার প্রধান দোষ, প্রকোষ্ঠ ঠাণ্ডা হওয়ার পর আবার ক্রমে গরম হইতে থাকে; সুতরাং পরীক্ষাকালের মধ্যেই প্রত্যেকটি কণার কিয়দংশ আবার বাষ্পীভূত হইয়া যায়, এবং উহার আয়তন কমে।

মিলিকানের নিম্নলিখিত বিখ্যাত পরীক্ষায় এই দোষ সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইয়া ইলেকট্রনের অস্তিত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

মিলিকানের তৈলবিন্দু পরীক্ষা

মিলিকানের পরীক্ষায়, প্রকোষ্ঠের উপরের ও নীচের খণ্ড দুইটি ধাতুনির্ম্মিত এবং পার্শ্বের খণ্ডগুলি বিদ্যুতের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য (nonconducting) পদার্থে নির্ম্মিত, সুতরাং উপরের ও নীচের খণ্ডের মধ্যে ব্যাটারী সংযোগ করিয়া তুঙ্গতাভেদ (potential difference) উৎপন্ন করা যায়। প্রকোষ্ঠের মধ্যভাগে তৈলের (অথবা পারদের) বাষ্পে "পূর্ণ" থাকে এবং বাহির হইতে তৈলবিন্দু ছিটাইয়া দেওয়া হয়। প্রকোষ্ঠের ভিতর রঞ্জন-রশ্মি দ্বারা আয়ন উৎপাদিত হয়। প্রকোষ্ঠের একটি জানালা আছে, উহার ভিতর দিয়া অণুবীক্ষণ সাহায্যে একটি তৈলবিন্দু লক্ষ্য করা হয়। আয়ন-এর সহিত সংঘর্ষের ফলে তৈলবিন্দু বিদ্যুদ্যুক্ত হইলে, উহা বৈদ্যুতিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে উপরের বা নীচের দিকে চলিতে আরম্ভ করে। তখন তুঙ্গতাভেদ নিয়ন্ত্রিত করিয়া উহাকে শূন্যে স্থিরভাবে ঝুলাইয়া রাখা যায়। আবার স্বল্পক্ষণ পড়িতে দিয়া পূর্ব্বোক্ত ষ্টোক্‌স নিয়মের সাহায্যে উহার আয়তন ও ওজন হিসাব করা হয়। তুঙ্গতাভেদ জানা থাকায় এক পরিমাণ বিদ্যুতের উপর কত বল প্রযুক্ত হইল, তাহা জানা সহজ। অতএব তৈলবিন্দুতে কতটুকু বিদ্যুৎ থাকিলে উহার ওজনের সমান বল ঊর্দ্ধদিকে প্রযুক্ত হয় এবং বিদ্যুৎ ঝুলিয়া থাকিতে পারে, তাহা হিসাব করা চলে। ফলে, তৈলবিন্দুর বিদ্যুতের পরিমাণ নির্ণীত হয়।

প্রকোষ্ঠটি তৈলের বাষ্পে পূর্ণ থাকায় তৈলবিন্দু বাষ্পীভূত হয় না, উহার ওজন স্থির থাকে। এই নিমিত্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরীক্ষা চালাইতে কোন বাধা নাই। একজাতীয় কয়েকটি আয়ন তৈলবিন্দুতে সংলগ্ন হইতে পারে; কিন্তু বিকর্ষণের ফলে কতকগুলি আয়ন সংলগ্ন হইবার পর আর আয়ন কাছে ঘেঁষিতে পারে না। পক্ষান্তরে যে কোন সময়ে বিপরীত প্রকারের আয়ন আনিয়া বিদ্যুতের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিতে পারে। এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের হ্রাসবৃদ্ধি হয় এবং তুঙ্গতাভেদ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বিদ্যুতের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

ইলেকট্রন

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া মিলিকান এইরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিদ্যুতের পরিমাণ অনেকবার কমিয়াছে, অনেকবার বাড়িয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখিয়াছেন যে, বৃদ্ধি বা হ্রাস, অথবা বিদ্যুতের নিজের পরিমাণ $৪\cdot৭৭৪ \times ১০^{-১০}$ (electrostatic units) -এর সমান, অথবা ২, ৩, ৪ বা ৫ গুণ। ইহা হইতে বিদ্যুতের আণবিক প্রকৃতি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। কোনস্থলে, $৪\cdot৭৭৪ \times ১০^{-১০}$-এর $২\frac{১}{২}$, $২\frac{১}{৪}$, $৩\frac{৩}{৪}$ ইত্যাদি ভগ্নাংশ গুণ বিদ্যুৎ পাওয়া যায় নাই। তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ পরিমাণ বিদ্যুৎকে আর ভাগ করা চলে না; উহাই বিদ্যুতের যথার্থ একক। যে কণায় এই একক পরিমিত ঋণবিদ্যুৎ আছে, তাহারই নাম ইলেকট্রন।

তর্ক করা যাইতে পারে যে, মিলিকানের পরীক্ষায় অনেকগুলি সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের গ, সা, গু লইয়া এককের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে; এরূপ গ, সা, গু দিয়া ভাগ করিলে সর্ব্বত্রই ভাগফল মিলিয়া যাইতে বাধ্য। সুতরাং মিলিকানের ঐ সকল সংখ্যার পরিবর্ত্তে যদি অন্য রকম কতকগুলি সংখ্যা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাহাদেরও এই গুণ থাকিত। এইরূপ তর্কের প্রথম উত্তর এই যে, ইচ্ছামত কতকগুলি সংখ্যা লইয়া প্রত্যেককে তাহাদের গ, সা, গু, দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল অখণ্ড সংখ্যা হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যামাত্র হইবে না, অনেক সময় ১০০, ১০০০ প্রভৃতি বড় বড় সংখ্যা হইয়া যাইবে। ইহার দ্বিতীয় উত্তর এই যে, মিলিকান একটি মাত্র পরীক্ষার উপর নির্ভর করেন নাই; বিভিন্ন পরীক্ষায় বিভিন্ন প্রকার তৈল বা অন্যপ্রকার বিন্দুর ব্যবহার করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রকারে উৎপাদিত আয়ন লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র এই একই সংখ্যা পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যুতের একক অর্থাৎ ইলেকট্রন সত্য সত্য বিদ্যমান না থাকিলে কখনও এইরূপ ঘটা সম্ভবপর হইত না। শুধু তাহাই নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকোষ্ঠে প্রবেশের পূর্ব্বেই তৈলবিন্দু ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুদ্‌যুক্ত হইয়াছে এবং তাহাতে এই একই সংখ্যার কয়েক গুণ বিদ্যুৎ পাওয়া গিয়াছে। অতএব ঘর্ষণজাত বিদ্যুৎ (frictional electricity) ইলেকট্রনের ক্রিয়া বটে।

ব্রাউনীয় সঞ্চরণ

প্রসঙ্গ ক্রমে, ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ মাপিবার আর একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপায় বর্ণিত হইতেছে। ব্রাউনীয় সঞ্চরণ সাহায্যে পেরাঁ দুই গ্রাম হাইড্রোজেনে কতগুলি অণু আছে গণিয়া বাহির করিয়াছেন। ফ্যারাডের আবিষ্কৃত সুপরিচিত Electrolysis-এর নিয়ম হইতে কতটুকু বিদ্যুৎ দ্বারা ২ গ্রাম হাইড্রোজেন বাহির করা যায়, তাহা বহু পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। অতএব বিদ্যুতের পরিমাণকে অণুর সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে, প্রত্যেক

অণুর সহিত কতটুকু বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট আছে জানা যায়। এই উপায়ে পেরাঁ দেখিয়াছেন যে, এক একটি হাইড্রোজেনের আয়নে $৪\cdot২ \times ১০^{-১০}$ পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে। মিলিকানের ইলেকট্রনের সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য সন্তোষজনক বলিতে হইবে। অতএব যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, Electrolysis-এ এক আয়ন হাইড্রোজেনে একটিমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তাহা হইলে দেখা যায় যে, হাইড্রোজেন পরমাণুতে অন্ততঃ একটি ইলেকট্রন আছে। অবশ্য একাধিক ইলেকট্রনের অস্তিত্ব ইহাতে অপ্রমাণিত হয় না।

পরমাণু

টমসন্, মিলিকান্ ও পেরাঁর পরীক্ষা ব্যতীত অন্য উপায়েও বিদ্যুতের আণবিক প্রকৃতি ও ইলেকট্রনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে আর এখন সন্দেহের অবকাশ নাই। সমস্ত বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ইলেকট্রনের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক, এবং অধিকাংশ ক্রিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেও। বিদ্যুৎবিজ্ঞানের প্রাণ ওম্-এর (Ohm) নিয়মও এইরূপে ইলেকট্রন এবং Kinetic Theoryর সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অণুর গঠন-রহস্যে ইলেকট্রন ধ্রুবতারার মত বৈজ্ঞানিকগণের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, এক একটি পরমাণু এক একটি ক্ষুদ্র সৌরজগৎ। নিউক্লিয়াস সূর্য্যের মত কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, চতুর্দ্দিকে নিজ নিজ কক্ষে গ্রহের মত ইলেকট্রনসমূহ পরিভ্রমণ করে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সকল বৃত্তান্ত বিবৃত হইবে না। এবার আমরা ইলেকট্রনের আয়তন এবং ওজন নির্ণয়ের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

ইলেকট্রনের ওজন এবং বেগনির্ণয়

টমসনের প্রণালী

জে, জে, টমসন্ ক্যাথোড রশ্মি নামক ইলেকট্রনপ্রবাহের বেগ এবং বিদ্যুৎপরিমাণ ও ওজনের অনুপাত নির্ণয় করিয়াছিলেন। সাধারণ বিদ্যুৎযুক্ত পদার্থের সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে যে, গতিশীল বিদ্যুৎ এবং বিদ্যুৎপ্রবাহ অভিন্ন; উভয়েরই চতুর্দ্দিকে চৌম্বক ক্রিয়া (magnetic field) প্রকাশ পায়। সুতরাং যে কোন প্রকার ইলেকট্রনপ্রবাহ বা রশ্মি (যেমন ক্যাথোড-রশ্মি, বিটা-রশ্মি ইত্যাদি) বৈদ্যুতিকপ্রবাহের মত নিকটবর্ত্তী চুম্বক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। আবার, ইলেকট্রন বিদ্যুতের আধার বলিয়া, তাহার উপর স্বভাবতঃই বিদ্যুৎযুক্ত সকল পদার্থের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ক্রিয়া লক্ষিত হয়। যদি ক্যাথোড রশ্মির পথে একই স্থানে বিদ্যুদযুক্ত ধাতুপত্র ও চুম্বক এমনভাবে রাখা যায় যে, উভয়ের প্রভাব রশ্মি বা ইলেকট্রনপ্রবাহের উপর বিপরীত দিকে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে, উভয় ক্রিয়া সমান করা হইলে, রশ্মি সরলরেখাক্রমে চলিতে থাকিবে। এরূপ অবস্থায় প্রমাণ করা যায় যে,

ইলেকট্রনের বেগ, বৈদ্যুতিকপ্রভাব (অর্থাৎ এক পরিমিত বিদ্যুতের উপর প্রযুক্ত বল) এবং চৌম্বক প্রভাবের (অর্থাৎ এক পরিমিত চুম্বকের উপর প্রযুক্ত বলের) অনুপাতের সমান। এই উপায়ে টম্‌সন্ ক্যাথোড রশ্মির বেগ নির্দ্ধারণ করেন।

আবার যদি একা বিদ্যুৎ বা চুম্বক বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহার প্রভাবে রশ্মির দিক্‌পরিবর্ত্তন ঘটিবে। বলা বাহুল্য যে, বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক যে কোন বলের জন্যই হউক এই দিক্‌পরিবর্ত্তনের পরিমাণ প্রত্যেক ইলেকট্রনের ওজনের উপর নির্ভর করিবে। হাল্‌কা জিনিষের উপর অল্প বল প্রয়োগ করিলে যতখানি দিক্ ও বেগ পরিবর্ত্তন ঘটে, ভারী জিনিষের উপর প্রয়োগ করিলে ততখানি ঘটে না। আবার বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, বলের পরিমাণও ইলেকট্রনের বিদ্যুৎপরিমাণের আনুপাতিক। গণিত সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রশ্মি কতখানি ঘুরিয়া যায়, তাহা মাপিয়া ইলেকট্রনের বিদ্যুৎপরিমাণ ও ওজনের অনুপাত জানা যায়। অতঃপর মিলিকানের গণিত ধরিয়া বিদ্যুৎপরিমাণ হিসাব করিলে ওজন মাত্রও সহজেই নির্ণীত হয়।

এইরূপে মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইলেকট্রনের উৎপত্তিস্থান ও বেগের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, বিদ্যুৎপরিমাণ ও ওজনের অনুপাত সর্ব্বত্রই এক। বিদ্যুৎপরিমাণ সর্ব্বত্র এক বলিয়া ধরিয়া লইলে বলা যায় যে, ইলেকট্রনের ওজন সর্ব্বত্রই এক। কিন্তু দ্রুতগামী বিটা-রশ্মির সম্বন্ধে এই উক্তি বিফল হইতে দেখা গিয়াছে।

রেডিয়ম প্রভৃতি ধাতু হইতে বিটা প্রভৃতি রশ্মি স্বতোনির্গত হয়। এই রশ্মি ঋনবিদ্যুৎযুক্ত কণা মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন কণার বেগের পরিমাণ বিভিন্ন। টম্‌সনের উপায়ে মন্দগামী বিটারশ্মির বিদ্যুৎপরিমাণ এবং ওজনের অনুপাত বাহির করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা অন্যান্য প্রকার ইলেকট্রনপ্রবাহের সমান। সুতরাং দেখা যায় যে, বিটারশ্মি ইলেকট্রন প্রবাহ মাত্র।

টম্‌সনের প্রণালীর অনুরূপ কিন্তু কিঞ্চিৎ জটিলতর উপায়ে পরীক্ষা করিয়া বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক প্রভাবান্বিত রশ্মিকে ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর পড়িতে দিয়া দেখা গিয়াছে যে, একটি অখণ্ড বক্ররেখা পাওয়া যায়। তাহা কিন্তু Parabola নহে।

যদি রশ্মিস্থিত সমস্ত কণার বেগ সমান হইত, তাহা হইলে প্লেটের উপর একটি বিন্দু মাত্র পাওয়া যাইত। বক্ররেখা হইতে বুঝা যায় যে, সকল কণার বেগ এক নহে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, যদি বিদ্যুৎপরিমাণ ও ওজনের অনুপাত সকল কণার পক্ষে সমান হইত, তাহা হইলে ঐ বক্ররেখাটি Parabola হইত। সুতরাং বিটারশ্মির সকল কণার পক্ষে এই অনুপাত এক নহে। বক্ররেখাটি অখণ্ড; সুতরাং বিভিন্ন প্রকারের কণার অস্তিত্ব কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। বিদ্যুৎপরিমাণের পার্থক্যও সম্ভবপর নহে; সুতরাং বলিতে হইবে যে, বেগভেদের সঙ্গে সঙ্গে ওজনেরও পার্থক্য ঘটিয়াছে। উত্তরকালে বুকারার আরও সুন্দর উপায়ে নিঃসংশয়ে একথা প্রমাণ করিয়াছেন।

বেগবৃদ্ধি ও ওজনবৃদ্ধি

বেগবান্ পদার্থ মাত্রেরই বেগজনিত কিছু বীর্য্য (energy) আছে। এই বীর্য্য উহার ওজনের ও বেগের বর্গের আনুপাতিক। আবার পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, গতিশীল বিদ্যুৎ বিদ্যুৎপ্রবাহের কার্য্য করে, সুতরাং ইহার চারিদিকে চৌম্বক ক্রিয়া ও চৌম্বক বীর্য্য প্রকাশ পায়। এই বীর্য্যও বেগের বর্গের আনুপাতিক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ওজনের জন্য ইলেকট্রনের যে বীর্য্য আছে, তাহার সঙ্গে বিদ্যুতের জন্য আরও কিছু বীর্য্য যোগ হয় (অর্থাৎ নিজস্ব ওজনের সহিত কিছু "বৈদ্যুতিক ওজন" যোগ হয়)। এক কথায় বলা চলে যে, বেগের জন্য ইহার ওজন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই বেগ যদি আলোকের বেগের তুলনায় নগণ্য হয়, তাহা হইলে "বৈদ্যুতিক ওজন" ইহার পরিমাণের উপর একপ্রকার নির্ভরই করে না; বেগ অল্পই হউক আর অধিকই হউক, "বৈদ্যুতিক ওজন" একই থাকে। আলোকের অনুরূপ বেগস্থলে এই ওজন আরও অনেক বেশী বাড়ে।

বিটা রশ্মি লইয়া যে সকল পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, আলোকের অনুরূপ বেগস্থলে বেগ যত বাড়ে, ওজনও তত বাড়ে। যদি গতিজনিত ভিন্ন ইলেকট্রনের অন্য কোন প্রকার স্বাভাবিক ওজন থাকে, তাহা হইলে এই ওজন অপেক্ষাকৃত কম হইবার কথা। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, ইলেকট্রনের নিজস্ব কোন ওজন নাই; বেগের জন্যই উহার যাহা কিছু ওজন।

ইলেকট্রনের আয়তন

সাধারণ বেগস্থলে, উপরোক্ত বেগ এবং ওজনের সম্বন্ধনির্ণয় করিতে গিয়া দেখা যায় যে, ওজন বাতাসের চৌম্বক গুণ, বিদ্যুতের পরিমাণ ও ইলেকট্রনের ব্যাসার্দ্ধের উপর নির্ভর করে। ওজন এবং বিদ্যুতের পরিমাণ ইতিপূর্ব্বে নির্ণীত হইয়াছে, বাতাসের চৌম্বকগুণও সুবিদিত; সুতরাং বৈদ্যুতিক ওজন জানার পরে ইলেকট্রনের ব্যাসার্দ্ধ নির্ণয় করা সহজ। এইরূপে নির্ণীত হইয়াছে যে, ইলেকট্রনের ব্যাসার্দ্ধ ১.৯×১০^{-১৩} সেন্টিমিটার।

অতএব,

ইলেকট্রনের বিদ্যুৎপরিমাণ		৪.৭৭৪×১০^{-১০} (Electrostatic unit)
,,	ওজন	৮.৯×১০^{-২৮} গ্রাম্
,,	ব্যাসার্দ্ধ	১.৯×১০^{-১৩} সেন্টিমিটার

বাংলার মৎস্যগুলির বৈজ্ঞানিক নাম

ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ

একই মৎস্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ঐ সকল স্থানের নাম বন্ধনীর ভিতর দেওয়া গেল।

অংচাচেয়া (পূর্ণিয়া)—কজ্জলা।
অংচাটা (পাটনা)—রাম টেংরা।
অংরুয়ারি (পাটনা)—খরশুলা।
অঁদেয়ারি (ভাগলপুর)—খরশুলা।
অথড়া (করতোয়া নদী)—খড়কিবাটা (Labeo bata acra HB)।
অগর (দার্জ্জিলিং)—বৈজ্ঞানিক নাম জানা নাই।
অঙ্গি (লক্ষ্মীপুর, আসাম)—Pseudeutropius atherinoides (Bloch)।
অঞ্জনা (পূর্ণিয়া)—ডাইনকোনা।
অঞ্জনি—কজ্জনা।
অড়িয়া (ভাগলপুর)—আড়ি।
অদোই (আসাম)—Schizothorax progastus (Mc Clell)।
অনন্তা—কয়লা মাছ।
অনিয়া (বাংলা)—অঙ্গি।
অনয়ারি, অঁদয়ারি (চাটিগাঁ, মুর্শিদাবাদ সাহাবাদ)—খরশুলা।
অন্ধই, অঁধই (পাটনা)—কুচিয়া।
অন্ধাহি—কুচিয়া।
অনুহই (পূর্ণিয়া)—কুচিয়া।
অনাস্থিক—নিহাড়ি।
অপ্রিয়া—(১) শিঙ্গী ; (২) বোয়াল
অবগ্রাহ—হাঙ্গর।
অবহার, অবহারক—হাঙ্গর।
অভিষ্যন্দী—ফলুই।
অভিসার—শউল।
অরঙ্গ (বিহার)—রেঙ্গ।
অরোয়ারি (গয়া, দ্বারভাঙ্গা, শরণ)—খরশুলা।
অর্দ্ধশফর—দাঁড়িকা।
অম্লহি—কুচিয়া (?)।
অহাক্ষা—(চাটিগাঁ)—এঁজে।
আইড়—(১) আড় মাছ ; (২) আড় টেংরা।
বাঘ আইড় (পূর্ণিয়া)—বাঘ আড়।
আংরা (গোয়ালপাড়া)—Labeo angra HB।
আঁদরি (ঢাকা)—কুচিয়া।
আড়, আড়ি—(১) Arius arius (HB) (২) ; আড় টেংরা ; (৩) (পূর্ব্ববঙ্গ) মাগুর।
আড়িয়া, আড়ি মাগরা (পূর্ণিয়া)—আড়।
বাঘ আড়—Bagarius bagarius (HB)।
আড়গেল—১·২ হাত ; পুকুর ও নদীতে পাওয়া যায় ; শাদা। কাঁকিলা হওয়া সম্ভব।
আড়িকুচি (কেরী সাহেবের অভিধানে)—Arius coelatus Cuv. and Val.(?)।
আড়িয়া (পূর্ণিয়া)—আড় (১)।
আড়িষ, আড়ষি—Pseudorhombus arsius HB।

আতুশী—বাতাউসী।
আমকরাতি—রাম করাতি।
আম্লেট—Megalops cyprinoides (Brouss.)।
আরিক্সা (মহীশূর)—অথরা।
আল, কাঁটা—কাঁটাবউল।
আলি (বালেশ্বর)—আড় টেংরা।
আলিসে (পুরী, বালেশ্বর)—Pellona motius (HB)।
কাঁটাবলা আলিসে (উড়িষ্যা)—সুবর্ণ খড়িকা।
আহাক্ষা (চাটিগাঁ)—এঁজে।
ইংলি (উত্তর বঙ্গ)—খরশুলা।
ইজ্জল—হিজল।
ইক্ষাক—বালিয়া মাছ।
ইটা—রিটা।
ইলিশ—Clupea ilisha (HB.)।
খোকা ইলিশ (দক্ষিণবঙ্গ)—Dorosoma nasus (Bleeker)।
নার ইলিশ (চাটিগাঁ)—Clupea sinensis Bloch.।
নোনা ইলিশ—চাকুন্দা।
পাইট ইলিশ (পূর্ব্ববঙ্গ)—পুং ইলিশ।
ইল্লিশ—ইলিশ।
ইল্শা (পুরী)—ইলিশ।
ইবল—হিজল।
উত্রাহি (মহানদী)—Chela untrahi Day।
উদিল (বিহার)—খরশুলা।
উকুণ চাঁদা—রাঙ্গাচাঁদা।
উচনয়না—পল্‌তা।
উটকিনা—কালো ও শাদা রং ; ৪ আঙ্গুল লম্বা ; ছোট ছোট আঁশ ; মুখ গরু ; নদী, পুকুর ও বিলে থাকে। টাটকিনা হওয়া সম্ভব।
উড়ুয়া (দিনাজপুর)—Pseudeutropius atherinoides (Bloch.) [urua HB.]
উৎপল—চ্যাং মাছ।
উদরদীর্ঘা—বোয়াল।
উদ্দন্তপাল—দাঁড়িকা।
উপর চকুআ (আসাম)—খরশুলা।
উপল—চ্যাং মাছ।
উরস্তা (দার্জিলিং)—উড়ুয়া।
উরাট (দিনাজপুর)—উড়ুয়া।
উরিয়ালি (উড়িষ্যা)—Coilia dussumieri Cuv. and Val.।
উরুল (পূর্ব্ববঙ্গ)—খরশুলা।
উর্‌সি (পুরী, বালেশ্বর)—আলিসে।
উলুক—দাতস্থা।
উলূপী—চ্যাং মাছ।
উল্কা—দাতস্থা।
ঋষশ্রেষ্ঠ—রুই।
ঋষি—তপস্যা মাছ [Polynemus paradiseus Linn. (risua HB.)]।
ঋষিয়া (চাটিগাঁ)—ঋষি।
ঋষুয়া (নোয়াখালি)—ঋষি।
এওড়—আড় টেংরা।
এঁজে (বংলা)—Symbranchus bengalensis (McClell)।
একঠুঁটা—Hemiramphus ectunctio (HB)।
এটপের—Perilampus atpar (HB.)।
এবরো—৩।৪ ইঞ্চি লম্বা ; শাদা ; পুকুরে পাওয়া যায়।
এরঙ্গ—এলঙ্গ।

এলঙ্গ (১) (জলপাইগুড়ি)—Rasbora elanga (HB.); (২) (দিনাজপুর) —Rasbora rasbora (HB.)।

এলেং—এলঙ্গ।

এলনা—(বগুড়া)—এলঙ্গ।

ওকাল (ত্রিপুরা)—গাচুয়া।

ওভোলা (আসাম)—বালিভোলা।

কই—Anabas scandens (Daldorff)।

কাঠ কই—(১) Therapon jarbua (Torskal); (২) Therapon puta Cuvier (Coius trivittatus HB.)।

কালকই—Sciaena coitor (HB.)

গাং কই—(১) দাড়ি, (২) পল্তা।

ধোপাকই—Lutianus johnii (Bloch); Coius catus HB)।

সমুদ্র কই (আসাম)—Lobotes surinamensis (Bloch)।

সাগর কই (আসাম উপত্যকা, রংপুর)— সমুদ্র কই।

কইল (জলপাইগুড়ি)—কই।

কউ (পুরী, বালেশ্বর)—কই।

সমুদ্র কউ (পুরী)—সমুদ্র কই।

কউনিয়া (জলপাইগুড়ি)—কান্নি।

কউয়ল (পাটনা, ভাগলপুর)—কাঁকিলা।

কংরি, কংঘরি (পুর্ণিয়া)—লতিয়া।

কংসাটা (গোরকপুর)—বকুলচেলা।

কঁকোচি (লক্ষীপুর)—মৌরলা।

কঁটাবলঙ্গি (পুরী)—Labeo kontius (Jerdon)।

কাঁটিয়া (বালেশ্বর)—Maciones vittatus (Bloch)।

ককূলি (পুরী)—কাঁকিলা।

ককুন্দা (পুরী)—খরশুলা।

কগজ (পূর্ব্ববঙ্গ)—Stolephorus (Engraulis) indicus (V. Hasselt)।

কগর (সাহাবাদ)—পুকুরিয়া টেংরা।

কঙ্কত্রোট, কঙ্কত্রোটি—(১) কাঁকিলা; (২) খালিশা।

কচ (আসাম)—গিলন্দ।

কচকি—কাউচি।

কচা (জলপাইগুড়ি)—কাউচি।

কজর, কজরা (পাটনা)—তোড়।

কজুর (মুঙ্গের) মহাশউল।

কজোলি (রংপুর)—কজ্জলী।

কজ্জলা—(১) কালবসু; (২) কজ্জলী।

কজ্জলী—Ailia coila (HB.)।

কটি, কটিসাবরা (দিনাজপুর)—ঝিলচাঁদা।

কট্‌কটিয়া (বাংলা)—Tetrodon cutcutia HB.

কট্‌কিয়া—কট্‌কটিয়া।

কন্টাকাষ্ঠাগ—কুলিশ।

কণ্ডাতুরি (পুরী)—গুঁতে।

কতলা (ভাগলপুর)—কাতলা।

কথরা (দ্বারভাঙ্গা)—খলিশা।

কবজী—কই।

কবয়ী—কই।

কবিকা—কই।

কবল—বেলে গুড়গুড়ি।

কমলা—পাঁশুটে রং; ২-৩ হাত লম্বা; পুকুর নদীতে থাকে।

কয়লা (কলিকাতা, দক্ষিণ বাংলা)—কজ্জলী।

করন্দী (পুরী, বালেশ্বর)—চোলা পুঁটী।

কর্‌তি (পুর্ণিয়া) খয়রা।

করাতি (আসাম)—খয়রা।

করাল (চাটিগাঁ)—ভোলকরাল।

করাল চট্‌কি—Serranus sonnerati Cuv. and Val.।

করুনিয়ান (গয়া)—কালবসু।

করুল (চাটিগাঁ)—Mugil dussumieri Cuv. and Vol.।

করোটি—খয়রা।

কর্ণক—কাইন।

কর্ণফল, কর্ণমল—কাণলি।

কর্ণমদ্গুর—কানমাগুর।

কর্তি (মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পূর্ণিয়া)—খয়রা (গাং খয়রা)।

কর্বা (মুঙ্গের)—কাঁকিলা।

কর্‌বুটি (জলপাইগুড়ি)—চোলা পুঁটী।

কর্মুকা (মহীশূর)—Barbus curmuca (HB.)।

কর্শা (মহানন্দা নদী)—আংরা।

কর্ষু (চাটিগাঁ)—আংরা।

কলক—(ক) শউল; (খ) চুনা খলিশা; (গ) বড় খলিশা।

কলুস—আংরা (?)

কশ্যপ—কস্‌বাটি (?)

কসবাটি—Barbus casuatis (HB.)।

কহরা—Someleptes gongota (cucura HB.)

কাইখা—গাং দাড়া।

কাইন (চাটিগাঁ)—কান্নি।

কাইক্কালং (চাটিগাঁ পাহাড়)—Olyra longicauda McCl.।

কাউচি (বাংলা)—Perilampus atpar (cachius HB.)।

কাউটি (চম্পারণ)—কটি।

কাইন মাগুর (সুন্দরবন)—কানমাগুর।

কাউন মাগুর (নোয়াখালি)—কানমাগুর।

কাউয়া ঠুটী (সুন্দরবন)—Belone strongylura Van Hasselt.

কাউয়াল (সাহাবাদ)—কাঁকিলা।

কাউলিয়া (ঢাকা)—পাঁকাল।

কাওরা (চম্পারণ)—খয়রা।

কাওলি (বিহার)—তিত পুঁটী।

কাঁকলা (দিনাজপুর)—কাঁকিলা।

কাঁকল—Doryichthys cunculus (HB.)

কাঁকলিয়া (বাংলা)—Trichiurus haumala Forsk.

কাঁকলে (নোয়াখালি, মালদহ)—কাঁকিলা।

কাঁকিলা (বাংলা)—Belone cancila (HB.)।

কাঁচকি (নোয়াখালি)—কাচকি।

কাঁটা আল, কাঁটা বউল (চাটিগাঁ)—Pristis pectinatus (HB.)

কাঁটালকুষী—(১) নাদোয; (২) ঝিলচাঁদা।

কাঁটাল পাতা—Solea ovata Richardson।

কাঁটিয়া (উড়িয়া)—পুকুরিয়া টেংরা।

কাকিয়া, কাক্যা (ত্রিপুরা)—কাঁকিলা।

কাকোচিক, কাকোচা—কাউচি।

কাঙ্খিলা (জলপাইগুড়ি)—কাঁকিলা।

কাঙ্গন (লক্ষীপুর)—বাচা।

কাচ (আসাম)—গিলন্দ।

কাচি, কাছি—কাউচি।

কাচ্‌কি (পূর্ব্ববঙ্গ)—Mugil cascasia HB.

কাচ্‌কিগুড়া (পূর্ব্ববঙ্গ)—কাচ্‌কি।

কাজল, কাজুলি—কয়লা।

কাঁটালপাতা (বাংলা)—Solea ovata Richardson.।

কাটারি (পূর্ব্ববঙ্গ)—বকুনচেলা।

কাটারিয়া (চাটিগাঁ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা)—Chirocentrum dorab (Forsk.)

কাটে পাকাল—ধূসরবর্ণ, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, প্রস্থ আধ ইঞ্চি।

কাঠা (মুর্শিদাবাদ)—Lutianus johnii (Bloch) [Coius catus HB.]

কানপোনা—(ত্রিপুরা) সুবর্ণগড়িকা; (পূর্ব্ববঙ্গ) তেচোকা।

কাণবে—গড়ুই (ফুটকির পরিবর্ত্তে লম্বা লম্বা দাগ আছে)।

কাণমাগুর—Plotosus canius HB.।

কাণি মাগুর—কাণমাগুর।

কাতর—কাতলা।

কাতলা—Catla catla (HB.)। কুশীনদীতে বাচা মাছ কাতলা নামে পরিচিত।

কাতলি (দার্জ্জিলিং)—কাতলা।

কাদা—গুলো।

কানকুরি (উড়িষ্যা)—তেচোকো।

কানচটি (ভাগলপুর, পাটনা)—ফলুই।

কানছুলি (আসাম) ফলুই।

কানলা (পূর্ব্ববঙ্গ)—ফলুই।

কানাচ (বগুড়া, মুঙ্গের)—শিঙ্গী।

কনিয়া—জিবিপুঁটী।

কাহ্নিয়ান—কালবসু।

কানিখল্লা (পাবনা)—কাঁকিলা।

কাব্দি—মৌরলা।

কামাচ শিঙ্গী (দিনাজপুর)—শিঙ্গী।

কাম্টা—Physodon muelleri Mueller and Henle.।

কায়ঙ্গন—রাম টেংরা।

কারনা (পূর্ণিয়া)—আংরা।

কারিসা (চাটিগাঁ)—Chorinemus lysan (Forsk.)

কালকুনি—কালবসু।

কালকুনী (লক্ষ্মীপুর)—কালবসু।

কালঘোনি—কালবসু।

কালবটলি (উড়িষ্যা)—বোগাভাঙ্গন।

কালবসু—Labeo calbasu (HB.)।

কালবাঁইসে—কালবসু।

কালবেঁইস (উড়িষ্যা)—কালবসু।

কালবাউস (ঢাকা)—কালবসু।

কালবোস—কালবসু।

কালবাঁস (ভাগলপুর, পাটনা)—কালবসু।

কালি—বোয়াল।

কালি বাউস (ঢাকা)—কালবসু।

কালিয়ার (পূর্ব্ববঙ্গ)—কালবসু।

কাল্যা, কাল্যালোর (পূর্ব্ববঙ্গ)—কালবসু।

কালিপোই (উড়িষ্যা)—ভেদামাছ।

কাহি (ভাগলপুর)—আলিসে।

কিরকিরে—রূপাপাতি।

কিলি—ঝাট্‌ক্যা।

কুঁকুকি (উড়িষ্যা)—দাড়িখুসি।

কুঁচা (মুর্শিদাবাদ)—কুচিয়া।

কুঁচিয়া—কুচিয়া।

কুঁচে (রঙ্গপুর)—কুচিয়া।

কুঁতা (১) (রঙ্গপুর)—চাগুনি; (২) (লক্ষ্মীপুর)—এলঙ্গ।

কুঁদা (উড়িষ্যা)—Pristis perrotteti Mueller and Henle.

কুঁদালা (উড়িষ্যা)—Etroplus suratensis (Bloch)।

কুঁদনা (ভাগলপুর)—কালবসু।

কুকুরজিহ্বা (চাটিগাঁ)—Cynoglossus cynoglossus (HB)।

কুঁকুকি (উড়িষ্যা)—ভেদা।

কুকুরা (পূর্ণিয়া)—ঘর্গোটা।

ছোট কুকুরা (পূর্ণিয়া)—কহরা।

কুক্‌সি—Mugil cascasia HB.

কুঙ্কি—Labio kunki Choudhuri (Records of the Indian Museum, ৭ম খণ্ড, ১৯১২, পৃ. ৪৩৭)।

কুচিক—কুচিয়া।

কুচিয়া—(১) Amphipnous cuchia (HB). (২) (চাটিগাঁ) Anguilla anguilla (HB)।

কুজ্জিশ—কুরচি।

কুঞ্চিকা—কুচিয়া।

কুটারা (বিহার)—টেংরা।

কুটুনি (আসাম) Nemacheilus guttatus (Mcelell.)।

কুটুরপো (উড়িষ্যা)—জিলিপুঁঠী।

কুড়িশ—কুরচি।

কুড়্চি, কুড্‌চিবাটা—কুড়্চি।

কুত্তিঙ্গা (উড়িষ্যা)—আমলেট।

কুমুরদাঁত (উড়িষ্যা)—Doryichthys cuncalus (HB)। (কাঁকল)।

কুন্তা—(১) (লক্ষ্মীপুর) এলঙ্গ, (২) (রঙ্গপুর) চাগুনি।

কুন্দনা (ভাগলপুর)—কালবসু।

কুজ—কুজোভেক্‌টি।

কুমড়ি (পূর্ণিয়া)—চোলপুঁটী।

কুমীরদাঁত—কাঁকল।

কুম্ভীল—গড়ুই।

কুরাইল (জলপাইগুড়ি)—বৃহদাকার ভাকুট

কুয়াফাসা—ফাসা

কুরি—(১) (বাংলা) খয়রা। (২) (আসাম) কুরচি।

কুরুট (পুরী)—Gerres filamentosus Cuv. and Val.

কুরকুরিয়া (১) (উড়িষ্যা)—চাকা। (২)) (আসাম) দেওখাটা।

কুর্চি, কুরচিপোনা—Labeo gonius curchius (HB)।

কুরছা—(১) (কামরূপ) কুরচি; (২) Labeo gonius cursa (HB)।

কুরজা (চাটিগাঁ পাহাড়)—কুরছা (২)

কুরশি—কুরচি।

কুরসা (পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, পাটনা)—কুরছা (২)

কুরসি—কুরসা।

কুরসো (দিনাজপুর)—কুরসা।

কুলাট—নাদোষ।

কুলীশ, কুলিশ—কুরচি।

কুলটা—Pteroplatea Mueller and Henle।

কুসুয়াল (উড়িষ্যা)—খলিশা।

কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপৃষ্ঠ—রুই।

কেঈ—চাপিল মাছের ছানা।

কেঁকলা (রাজসাহী)—কাঁকিলা।

কেঁচকি (ত্রিপুরা)—কাচকি।

কেঙ্গিয়া, কেঙ্গ্যা—রামটেংরা।

কেয়ছরি—কালবসু।

কেয়াই (চম্পারণ)—কই।

কেয়ালি (দিনাজপুর) বোয়াল।

কেরালপাতা—Cynoglossus bengalensis (Bleeker).

কেরুন্দি (বাংলা)—চোলপুঁটী।

পিতা কেরুন্দি (উড়িষ্যা)—চোলপুঁঠী।

কুজি কেরুন্দি (উড়িষ্যা)—(১) তিতপুঁঠী ; (২) ফুটুনিপুঠী।

কক্‌চিয়া কেরুন্দি (উড়িষ্যা) টেরিপুঠী।

পোটিয়া কেরুন্দি (উড়িষ্যা) শফরীপুঠী।

কেস্‌কি—কাচ্‌কি।

কৈতর—কাঠভোলা।

কৈবর—Sciaena coibar (HB).

কৈপোরাল—১০-১২ ইঞ্চি লম্বা ; ৩ ইঞ্চি চওড়া ; নদীতে থাকে।

কৈভোলা, কৈভোল (বাংলা)—Sciaenoides pama (HB).

কৈলামাছ (চাটিগাঁ)—Muraenesox talabou (Cuvier).

কৈলিয়া (উড়িষ্যা)—খলিশা।

কোকিলা—কাঁকিলা।

কোকো—এঁটেল মাটির রং ; ৫ ইঞ্চি লম্বা ; গোল দেহ (চোঙ্গার মত)।

কোকুলি (পুরী)—কাঁকিলা।

কোচা—(১) (তিস্তা নদী) ঘরুয়া ; (২) (রঙ্গপুর) শুংয়ারি।

কোটি (দিনাজপুর)—ঘিলা চাঁদা।

কোতরা—(১) (গোরকপুর) সাদাখলিশা ; (২) (পূর্ণিয়া) বড় খলিশা।

কারিয়া কোতরা (পূর্ণিয়া)—খলিশা।

লাল কোতরা (১) (পূর্ণিয়া)—বড় খলিশা (২) (পাটনা) লাল খলিশা।

কোনিয়ারি—Saurus myop (Forsk).

কোম (উড়িষ্যা)—পোকা ইলিশ।

কোরাং (আসাম)—Barilins bola (HB).

কোরাল (চাটিগাঁ, ঢাকা)—বড় ভেকুটি।

ছোট্‌কি কোরাল (পূর্ব্ব-বাংলা)—সোন ভেট্‌কি।

ভোলকোরাল—Serranus lanceolatus (Bloch).

কোরুল (চাটিগাঁ)—পোয়া।

কোলা—৫-৭ ইঞ্চি লম্বা, শাদা ; সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

কোলিহোনা—(আসাম)—খলিশা।

কোহরী—ডাংরা।

কৌনিয়া (জলপাইগুড়ি)—কাণনি।

কৌয়া—কাঁকিলা।

কৌরি—কুরি (২)।

ক্রকচপৃষ্ঠি—কই।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

ইঙ্গুদী

শ্রীগণপতি সরকার

আমার "কালিদাসের বৃক্ষলতা" প্রবন্ধে "ইঙ্গুদী" বাহির হইলে পর শ্রীযুক্ত মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য্য (এম্-এ) মহাশয় আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি এই "ইঙ্গুদী" সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, পত্রে তাহার বিবরণ আছে। সে পত্রটি এই,—

Shastri Road
Naihati 18. 8. 28

সবিনয় নিবেদন,

গণপতি বাবু, ইঙ্গুদী সম্বন্ধে Mayurbhanj-এর Deputy Conservator of Forests এক চিঠি দিয়াছেন। নকল পাঠাইলাম। চিঠিখানি কিছুদিন হইতে পড়িয়া আছে। ভাবিয়াছিলাম সাক্ষাৎ হইলে আলোচনা করিব, কিন্তু দেরী হইয়া যাইতেছে দেখিয়া এই পত্র দিতেছি।

"Ingudi has been identified as Putranjiva Roxburghii which in Bengali is called Ingota (ঈঙ্গোট) or Jiaputa (জিয়াপুতা) and is called by the latter name (Jiaputa) and also Putijia in Hindi. It has got a peculiar smell like country liquor and its fruit has a very hard Putamen which it is possible to break with stone. The fruits (nuts) are strung up in rosaries and tied round childrens' neck to keep off disease and also worn by women during pregnancy to prevent abortion. It is also said to cure leprosy and a kind of oil is extracted from its seed. For description of the tree you may refer to Flora of British India, Brandis Flora or Gambles Manual of Indian Timber."

পিঙ্গু ও মহুয়া সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন :—"I think Pingu has nothing to do with Ingudi as the description of Putranjiva Roxburghii coincides with the characters of Ingudi........ Mahua fruits are not very hard and can be broken without the aid of stone."

আশা করি এই চিঠিতে আপনার কিছু কাজ হইবে। ময়ূরভঞ্জের Dy. Conservator of Forests-এর নাম শ্রীনৃপালচন্দ্র গুপ্ত।......

যখন বিলাতী নাম পাওয়া গিয়াছে, তখন Indian Medicinal Plants-এও হয় তো খুঁজিলে কিছু নূতন সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।......ইতি—

ভবদীয়
শ্রীমঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য্য

এই পত্রখানি পাইয়া অবধি আমি "ইঙ্গুদী" সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছি এবং কিছু নূতন হদিস্ পাইবার জন্য পুস্তকাদিও নাড়াচাড়া করিয়াছি ; এমন কি দুই একজনের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও করিয়াছি। ফলে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা লিখিতেছি।

কেহ ইঙ্গুদীকে Terminalia Catappa বলিয়াছেন এবং অর্জ্জুন, বহেড়া, হরিতকী, বিজয়শাল প্রভৃতি জাতীয় গাছের দলভুক্ত করিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে Roxburgh বলিয়াছেন —T. Catappa. Willd. 4.967. Branches horizontal, verticelled. Leaves obovate. Racemes axillary. Drupe and nut compressed. A most beautiful, large tree, found in gardens etc. near towns and villages, when indigenous, I have not been able to ascertain. On the Coromandal coast it is in flower and fruit almost the whole year. Trunk straight. Bark smooth. Flowers numerous, small, dull-whitish colour. Bengali name Budam. ইহা বাঙ্গালার বাদাম গাছ।

The Materia Medica of the Hindus by Uday Chand Dutt with a glossary of the Indian plants by George King পুস্তকের glossary হইতে পাওয়া যাইতেছে যে, ইঙ্গুদী বলিতে Hingan (হিন্দী), Ingua (হিন্দী)। ইহার বোটানিক নাম Balanites Roxburghii, Planchon. Synonym—Ximenia ægyptiaca Roxb.। রক্ষাগর্গ Ximenia জাতির মধ্যে ইহাকে ধরিয়া লইয়া বলিয়াছেন—হিন্দী নাম Higen ; তেলিঙ্গ নাম Garee. In the Memoris sur L'Egypt is a paper on this plant, by M. A. Dehib, where he says the fruit passes in Egypt for Chebulic myrobalans.

This seems to me a new genus rather than a species of Ximenia. It is an hostile-looking, small tree, or large shrub, grows on the most inhospitable, dry, barren, uncultivated places in the Circars. Flowering in May. Trunk erect. Bark ash-coloured, crooked. Branches few, erect, with extremities spreading, and often drooping. Thorns axillary, single, large, strong, very sharp, frequently leaf and flower-bearing. Leaves scattered, petioled, binate. Leaflets short-petiolated, from oval to oblong, smooth, shining, when young downy ; above an inch and a half long, and three quarter broad, spreading. Petals five, very like the calyx : flowers small, greenish-white, pedicelled, Nut exceedingly hard, one-celled, one-seeded.

এই গাছ পূর্ব্বের বাদাম নহে।

বনৌষধিদর্পণে ইঙ্গুদীকে Balanites Roxburghii, B. Indica, B. Egyptica বলিয়াছে। হিন্দী নাম হিঙ্গনও বলিয়াছে। The bark yields a principle allied to saponin. From the seeds is extracted the oil known as Zachum oil or Zaitun oil of Africa. The oil resembles that of Arachis hypogœa ; it congeals at zero. It contains fatty acids. It is a slow drying oil, and becomes white when exposed to the sunlight. The pulp contains an organic acid, saponin, mucilage and sugar. The oil expressed from the seeds is applied to burns and excoriations, and also to freckles. গাত্রের চর্ম্ম উঠিয়া যাইতে আরম্ভ হইলে, রৌদ্রদগ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ অঙ্গে, কিংবা গ্রীষ্মাতিশয্যে ত্বক্ দগ্ধপ্রায় হইলে, ইঙ্গুদীবীজজাত তৈল অভ্যঙ্গ করিবে। এই পুস্তক ইঙ্গুদী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ আছে।

নগেন্দ্রবাবু পুত্রজীবকে ইঙ্গুদী বলিয়াছেন। রক্ষাবর্গ এই Putranjiva (Pootrunjeeva) সম্বন্ধে তাঁহার Flora Indica'র ৭১৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন—Nageia. Geert. A native of the various mountainous countries of Coromandel and Hindoostan, where it grows to be a large timber tree with an erect straight trunk ; and a large spreading shady head, composed it innumerable expanding branches with bifarious branchlets. Flowering time March and April, and the fruit ripens in January. The wood is white, close grained and very hard. Leaves alternate, short-petioled, bifarious, lanceolate oblong, acutely serrulate, rather obtuse, with base generally oblique, smooth, shining, waved a little round the margin, from three to four inches long and one and half broad. Flowers triandrous. Male flowers short-peduncled, numerous, minute, yellow, collected into small globular heads in the axills, sometimes on short, axillary, glomerate racemes. Female flowers larger than the male ones, green. Filaments more or less coalesced. Drupes ovate. Male calyx from four to five leaved. Female calyx from there to five leaved. Germ three celled. Embryo inverse, and furnished with a perisperm. Nut oval, more or less pointed at both ends, somewhat triangular, very hard, rugose, one celled. Seed solitary, conform to the nut. Inleguments two ; the exterior one which adheres to the nut, harder and lighter coloured ; the inner one free, darker coloured, and spongy. Cells two-seeded.

ইঙ্গুদী সম্বন্ধে "কালিদাসের বৃক্ষলতা" প্রবন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা লিখিয়াছি। কেহ যদি ইঙ্গুদী বিষয়ে নূতন কিছু জানেন এবং তাহা 'প্রকৃতি'তে বা অন্যত্র প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে মীমাংসায় পৌঁছান সম্ভবপর হইবে।

বিবিধ

প্রফুল্ল জয়ন্তী

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবনের সপ্ততিবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই চিরকুমার দেশহিতব্রত মহাপুরুষের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা আমাদের সমাজের তথা জাতির স্থায়ী গৌরবের বিষয়। কেবলমাত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া তিনি এই সত্তর বৎসর অতিবাহিত করেন নাই, সাধারণ শিক্ষকের মত ছাত্রদিগকে কেবল দৈনিক পাঠ শিক্ষা দিয়াই তিনি নিরস্ত হন নাই; তাহাদের মনে জ্ঞানের বর্ত্তিকা যাহাতে অম্লান ঔজ্জ্বল্যে চিরদিন প্রজ্জ্বলিত থাকে, জ্ঞানরাজ্যের গূঢ় হইতে গূঢ়তর রহস্যের মধ্যে যাহাতে তাহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া প্রবেশ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই যত্নবান রহিয়াছেন। চরিত্রের দৃঢ়তায় ও স্বভাবের মাধুর্য্যে যাহাতে তাঁহার ছাত্ররা মহনীয় ও বরণীয় হয়, তদর্থে নিজের সরল নিরহঙ্কার জীবনের জীবন্ত আদর্শ ছাত্রদের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। শুষ্ক উপদেশ দিয়া তিনি আপনার কর্ত্তব্য কখনও শেষ করেন নাই, প্রকৃত শিক্ষকের মত প্রত্যেক উপদেশটি নিজে আচরণ করিয়া ছাত্রগণকে তদনুরূপ আচরণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নিজে রসায়নের গবেষণাক্ষেত্রে কি অমূল্য রত্ন দান করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা তাঁহার History of Hindu Chemistry পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন। এই বিপুল গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি যে কেবল তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে; প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ বিজ্ঞানরাজ্যে কি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল জগৎসমক্ষে তাহা প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের গবেষণাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি নহে। তাঁহারই উৎসাহে, সহায়তায়, অক্লান্ত চেষ্টায় এবং অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে রসায়ন-বিজ্ঞানের যে প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছে, দেশবিদেশের মনীষিসভায় তাঁহার ছাত্রগণ যে যশের আসন পাইয়া মাতৃভূমির জন্ম জয়মাল্য আহরণ করিয়া আনিয়াছে তাহাই আচার্য্যের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব এবং উজ্জ্বলতম কীর্ত্তি।

এই মহাপুরুষের সত্তর বৎসরের জন্মোৎসব দেশবাসী মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করিতে মনস্থ করিয়াছে। এতদুপলক্ষ্যে একটি সংবর্দ্ধনাসমিতি গঠিত হইয়াছে এবং উৎসবের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। উৎসবের দিনে আচার্য্যকে দেশবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি স্বরূপ একখানা প্রফুল্লসংবর্দ্ধনলেখমালা উপহার প্রদান করা হইবে। এই গ্রন্থে দেশবিদেশের বিশেষজ্ঞগণের লেখা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, আচার্য্যের স্তুতি প্রশস্তি, কর্ম্মজীবনী প্রভৃতি প্রকাশিত হইবে। আমরা এই উৎসবের সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা মানসে সকলের শুভেচ্ছা কামনা করিতেছি। আচার্য্যের জীবন দীর্ঘ হউক! তিনি দেশের, দশের—বিশেষ করিয়া ছাত্রগণের সম্মুখে আরও অনেককাল তাঁহার কল্যাণ মূর্ত্তি লইয়া বিরাজ করুন!

দন্তক্ষতে ভিটামিন ডি

সভ্যজগতে দন্তক্ষত রোগের আধিক্য বহুদিন হইতে লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আঁঠাল মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ ইহার কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং আঁশযুক্ত ফল খাওয়া ও দাঁতনকাঠির উপযুক্ত ব্যবহার ইহার প্রতিষেধক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি মিসেস মেলানবির পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে ভিটামিন ডি দন্তসংরক্ষণ কার্য্যে প্রধান সহায়। Tristan da Cunha নামক স্থানের অধিবাসিগণের দাঁতের অবস্থা সম্বন্ধে লেফ্‌টেনাণ্ট কমাণ্ডার সাম্প্‌সন্ যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ঐ স্থানের অধিবাসিবৃন্দের দন্তের অবস্থা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অথচ উহারা মোটেই দন্ত পরিষ্কার করে না। দন্তক্ষত উহাদের মধ্যে নাই বলিলেই চলে, মাত্র দুই জনের Pyorrhœa রোগ দেখা গিয়াছে, এবং তাহারাও ঐ দ্বীপে জন্মে নাই, বিদেশ হইতে ওখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। তাহাদের খাদ্য প্রধানতঃ মাছ, আলু, দুধ, ডিম ও শাকসব্জী, উহাদের মধ্যে চিনি বা ময়দার ব্যবহার একপ্রকার অপ্রচলিত। আফ্রিকা, এসিয়া প্রভৃতি স্থানের কয়েক জাতীয় অধিবাসীর মধ্যেও লক্ষিত হইয়াছে যে, যাহারা দুধ মাছ মাংস প্রভৃতি খায়, তাহাদের মধ্যে দন্তক্ষত অপেক্ষাকৃত অল্প; কিন্তু যাহারা চিনি, ময়দা, ভাত প্রভৃতি ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। দেখা গিয়াছে যে, এস্কিমোরা যতদিন মাছ, সিল বা সিন্ধুঘোটকের মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে তাহাদের দন্ত নীরোগ থাকে, কিন্তু সভ্যজনোচিত খাদ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেই তাহাদের দন্তরোগ জন্মে।

এই সকল দেখিয়া ইহাই অনুমান করা যায় যে, খাদ্যদ্রব্যই দন্তক্ষতের প্রকৃত কারণ; জলবায়ু, বংশানুগতিক প্রভাব বা দন্ত মার্জ্জন প্রভৃতি গৌণভাবে দন্তের উপর ক্রিয়া করে মাত্র, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াও এই নিয়মের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইয়াছে। Bunting ও তাঁহার সহকারিগণ একদল শিশুকে উল্লিখিত নিয়মে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া এবং অন্যদলের মধ্যে দন্তমার্জ্জন প্রভৃতি উপায় প্রয়োগ করিয়া, কিন্তু চিনি প্রভৃতির ব্যবহার নিষেধ না করিয়া দেখিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত দলে শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ জনের কোন দন্তক্ষত হয় নাই, শতকরা মাত্র ছয় জনের প্রবল দন্তক্ষত দেখা দিয়াছিল। পক্ষান্তরে, অপর দলের মধ্যে তাঁহারা শতকরা ৫০ জনের প্রবল দন্তক্ষত লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং শতকরা মাত্র ১৮ হইতে ২০ জনকে দন্তরোগমুক্ত অবস্থায় পাইয়াছিলেন। মিসেস মেলানবিও ছয়মাস ধরিয়া ২২ জন শিশুর খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং ভিটামিন 'ডি'র জন্য কড্‌লিভার অয়েল প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যদিও পরীক্ষারম্ভে অধিকাংশের দন্তক্ষত ছিল, পরীক্ষা শেষে কাহারও দন্তক্ষত কিছুমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই।

খাদ্যদ্রব্যের বিশেষতঃ ভিটামিনের প্রভাবে দন্তক্ষত বিনাশ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কোন মতভেদ নাই। দাঁতের ফাঁকে খাদ্যদ্রব্য, বিশেষতঃ শর্করাজাতীয় খাদ্য জমা হয়। ইহাতে একপ্রকার

জীবাণু উৎপন্ন হয়, এই জীবাণুই সাধারণতঃ দন্তক্ষতের কারণ হইয়া থাকে। ভিটামিন ডি ও চূণজাতীয় খাদ্য দন্তবৃদ্ধির সাহায্য করে। কেবলমাত্র দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই যে খাদ্যদ্রব্যের প্রভাব দন্তের গঠনে কার্য্যকরী হয় তাহা নহে; পরন্তু দন্তোদ্গমের পরেও খাদ্যদ্রব্য দন্ত সংগঠনে প্রভূত সাহায্য করে। বাস্তবিক পক্ষে, ভিটামিন বাহির হইতে দন্তরোগ নাশে যতটা সাহায্য করে, তদপেক্ষা অনেক বেশী সাহায্য করে দন্তের সংগঠনে, এবং তজ্জন্যই দন্তরোগ নাশে ইহা অধিক ফলপ্রদ হয়।

বিজ্ঞান ও মানবজীবন

রেলওয়ে ইঞ্জিন, বেতার প্রভৃতি বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অঙ্গগুলি সাধারণ লোকের দৃষ্টি এত বেশী আকর্ষণ করিয়াছে যে, তাহাদের নিকট এই সকল লোকহিতকর আবিষ্কারগুলিতেই বিজ্ঞানের চরম সার্থকতা বিদ্যমান। বেতার, এরোপ্লেন প্রভৃতির জন্য নব্যবিজ্ঞান যে গর্ব্ব অনুভব করে, তাহা অসঙ্গত নহে; কিন্তু এই সকল আবিষ্কারই যে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের একমাত্র গর্ব্বের স্থল, তাহা নহে। বাস্তবিক লর্ড কেল্‌ভিনের মত প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরা নাবিকের দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র বা "মাষমেরিণ কেবল্" অর্থাৎ সমুদ্রগর্ভে মগ্ন তার প্রভৃতি ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কদাচিৎ মনোনিবেশ করেন, অধিকাংশ সময়েই তাঁহাদের গবেষণাকার্য্য প্রকৃতির গুপ্তরহস্যোদ্ঘাটনে নিরত থাকে। আর একদল বৈজ্ঞানিক আছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে এডিসন্ প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাশালী লোকেরও অভাব নাই, যাঁহাদের গবেষণার একমাত্র লক্ষ্য মানবের ব্যবহারোপযোগী নূতন নূতন যন্ত্রের নির্ম্মাণ করা, যে কার্য্য করিতে এক বৎসর লাগে তাহা একদিনে শেষ করা, যে স্থানে একটি ধান গাছ জন্মে সেইস্থানে দুইটি ধান গাছ উৎপন্ন করা ইত্যাদি। ইঁহারাই ব্যবসায়বাণিজ্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিয়া লক্ষপতি, ক্রোড়পতি হইয়া উঠেন, এবং ইতর ভদ্র সকলের নিকট অসাধারণ বৈজ্ঞানিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু অপর শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরা একমাত্র প্রাকৃতিক রহস্য-যবনিকা উত্তোলনেই পরম আনন্দ লাভ করেন। কোন অসাধারণ আবিষ্কার সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা মনে মনে জিজ্ঞাসা করেন না যে, 'ইহাতে মানবের কতদূর উপকার সাধিত হইবে'; তাঁহাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য এই যে, 'ইহাতে প্রকৃতির গুপ্ত কথা কতদূর ব্যক্ত হইবে'। আমাদের দেশের আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, অধ্যাপক রমণ, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রভৃতিও এই শেষোক্ত দলের বৈজ্ঞানিক।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন্ বক্তৃতা শেষ করিবার কালে স্যার সি, ভি, রমণ মানবজীবন ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া ঠিক এই ভাবেরই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সাধারণের বিশ্বাস, বিজ্ঞান যত সম্পত্তির সৃষ্টি করিতে পারিল, মানবজাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির উপকরণ যত বেশী আবিষ্কার করিতে পারিল, ততই ইহা সার্থক শাস্ত্ররূপে পরিচিত হইল। রমণের মতে, এ বিশ্বাস যে ভ্রান্ত, তাহার প্রমাণ, বিজ্ঞান কেবলমাত্র মানবের মঙ্গলজনক পদার্থ সৃষ্টি করে না, পরন্তু ঘোর অমঙ্গলের নিদান বহু পদার্থেরও সৃষ্টি করে। শুধু সম্পত্তির সৃষ্টি করে না, সম্পত্তির বিনাশও করিয়া থাকে। বস্তুতঃ মানবের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি বিজ্ঞানের গৌণ স্বার্থকতা, বিজ্ঞানালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য, জগতের সম্বন্ধে নূতন জ্ঞানের উন্মেষ করা, পৃথিবীতে মানবজীবনের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য জ্ঞাপন ও মানবের সহিত বিশ্ব প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়। রমণের মতে, মানবজীবনের সর্ব্ববিধ কার্য্য ও চিন্তার আলোচনায় ও নিয়ন্ত্রণে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ব্যবহারে যতদূর সাফল্য লাভ করা যায়, তাহারই উপর মানবজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিমাণ নির্ভর করে। বিজ্ঞান নিত্য নূতন চিন্তাসূত্র আবিষ্কার করিয়াছে এবং নূতন কল্পনারাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এমন কি, নূতন ধর্ম্ম ও নূতন দর্শন প্রবর্ত্তন করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আচার্য্য রমণ আশা করেন যে, কালে এই ধর্ম্ম ও এই দর্শনই অন্ধবিশ্বাসমূলক ধর্ম্ম ও দর্শনের স্থান অধিকার করিতে এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর পরস্পরের মধ্যে যে বিরোধ বহুকাল ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে, তাহা চিরতরে বিদূরিত হইবে।

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

কীটভুক্ ছত্রক—শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা (কৃষি-সম্পদ, বৈশাখ ১৩৩৯)

গাছপালার জন্ম ও জীবনযাত্রা—শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যাদিত্য (কৃষিলক্ষ্মী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯)

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন (মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৩৮)

নূতন মনোবিদ্যা—ডক্টর শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, এম-এ, পি-এইচ-ডি (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯)

ভাইটামিন-তত্ত্ব— (স্বাস্থ্য সমাচার, বৈশাখ ১৩৩৯)

মৌমাছি-পালন—শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ বি, এ (কৃষি-সম্পদ, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯)

শর্করা-শিল্প—শ্রীআশুতোষ দত্ত, বি-এস-সি (মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯)

স্বপ্ন-রহস্য—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯)

Printed and published by Sj. Ragunath Seal, at the Calcutta Oriental Press, 9, Panchanan Ghose Lane, Calcutta.

প্রকৃতি

৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কণাদল

(কোলয়ড্)

শ্রীসত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও ডাঃ শ্রীসুবোধগোবিন্দ চৌধুরী

আমরা সাধারণতঃ পদার্থকে তিন অবস্থায় দেখিতে পাই—কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। জলকে সাধারণ অবস্থায় আমরা তরল দেখিতে পাই, কঠিন হইলে উহা জমিয়া বরফ হয় এবং ফুটাইলে উহা বাষ্পীয় আকারে পরিণত হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল পদার্থকেই অবস্থা বিশেষে এই তিন রূপে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। আমরা আজ অন্য একটী অবস্থার কথা বলিব—যাহাকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থাও বলা যাইতে পারে।

আমরা চিনির জল এবং দুধ এই জিনিষ দু'টি দেখিয়াছি। দুই-ই সাধারণ অবস্থায় তরল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বিজ্ঞান এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছে। দুধকে কাচের পাত্রের মধ্যে রাখিয়া তাহার ভিতর দিয়া যদি সোজাসুজী একটী সূক্ষ্ম আলোক রশ্মি চালান যায় এবং উপরিভাগ হইতে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আকাশে তারাবিন্দুর মত শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল কণাদল ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু চিনির জলের মধ্যে এই ব্যাপারের কিছুই দৃষ্ট হইবে না।

অবস্থাটা কিরূপ হয় একটা সাধারণ উদাহরণ দিলেই বেশ বুঝা যাইবে। ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা সাধারণতঃ বুঝিতে পারি না যে, ঘর ধূলায় পরিপূর্ণ। কিন্তু দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘর অন্ধকার করিলে দরজা কি জানালার একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া যদি সূক্ষ্ম আলোক-রশ্মি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে পায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, অসংখ্য ধূলিকণা ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কণাদলের অবস্থার কথা বুঝিতে হইলে পদার্থের অণুর আকৃতির পরিমাণ জানা দরকার। পদার্থকে ক্রমান্বয়ে ছোট করিতে থাকিলে উহা অবশেষে এরূপ ছোট হইয়া পড়ে যে, উহাকে আর অধিকতর ছোট করা চলে না। পদার্থের এই ক্ষুদ্রতম অবস্থাকে অণু বলা হয়। জলের মধ্যে

পদার্থ যদি এই ক্ষুদ্রতম আকৃতিতে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তখন উহার সাধারণ জলের মত তরল অবস্থা এবং উহাকে সাধারণ দ্রবণীয় পদার্থ বলা হয়; যেমন লবণ মিশ্রিত জল, চিনি মিশ্রিত জল, ইত্যাদি। কিন্তু সাঁধারণ চক্ষে সকল বিষয়ে দ্রবণীয় পদার্থের মত দেখা গেলেও কণাদল অণুর অপেক্ষা আকারে অনেক বড়।

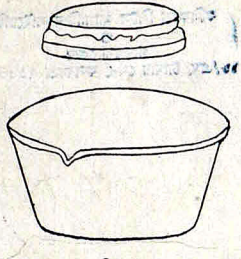

চিত্র—১

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে গ্রেহাম্ সর্ব্বপ্রথম কণাদল হইতে দ্রবণীয় পদার্থ পৃথক করিবার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১নং চিত্র হইতে তাঁহার যন্ত্রের ব্যাপারটা বোঝা যাইবে। একটী কাঠের অথবা অন্য কোন পদার্থের চক্রের উপর পার্চমেণ্টের কাগজ আঁটা থাকে এবং উহা একটী বড় পাত্রের মধ্যে পরিষ্কার জলের ভিতর ভাসাইয়া রাখা হয়। কণাদল ও দ্রবণীয় পদার্থমিশ্রিত তরল দ্রব্য সেই পার্চমেণ্টের থলির মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। দ্রবণীয় পদার্থের অণুগুলি খুব ছোট বলিয়া পার্চমেণ্ট-কাগজের ছিদ্রের ভিতর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়; কিন্তু কণাদল অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতি বলিয়া ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। এই পরীক্ষা দ্বারা গ্রেহাম প্রতিপন্ন করেন যে, কণাদলের আকৃতি প্রকৃত অণুর আকৃতি অপেক্ষা অনেক বড়। গ্রেহাম আরও দেখাইলেন যে, সাধারণ ফিল্‌টার পেপারের (ছাঁকিবার কাগজ) ভিতর দিয়া এই সকল বৃহদাকৃতি কণাদল অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে—কারণ সাধারণ ফিল্‌টার পেপারের ছিদ্রসকল পার্চমেণ্টের ছিদ্র অপেক্ষা অনেক বড়। গ্রেহামই সর্ব্বপ্রথম এই সকল পদার্থকে কণাদল (কোলয়ড্) এই আখ্যায় অভিহিত করিলেন। ইহাদিগকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা যাইতে পারে।

কণাদলের বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে টিন্‌ডাল্ আরও উন্নত করিয়া তুলেন। যে কণাদলকে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখা যাইত না, তিনি তাহাদিগকে একটী কাচের পাত্রের ভিতর রাখিয়া উহার মধ্য দিয়া শক্তিশালী আলোক-রশ্মি চালনা করেন। তাহার পরে

আলোকপথের উপরিভাগ হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখেন যে, ছোট ছোট উজ্জ্বল কণাদল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে—যেন আকাশ-পথে অসংখ্য তারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সিগ্‌মণ্ডী ও সিডেণ্টফ্ উক্ত যন্ত্রকে আরও কার্য্যকরী করিয়া তুলেন। ২নং চিত্রে তাঁহাদের যন্ত্র দেখা যাইবে। একটী অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে লম্বভাবে দণ্ডায়মান করিয়া উহার

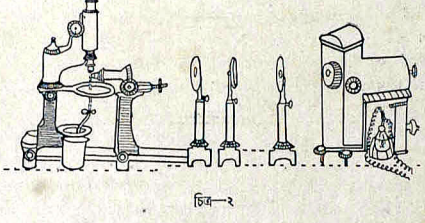

চিত্র—২

মঞ্চের উপরে একটী ছোট কাচের অথবা স্ফটিকের পাত্রমধ্যে তরল পদার্থ রাখা হয়। সূর্য্য হইতে অথবা কোনও শক্তিশালী বৈদ্যুতিক বাতি হইতে আলোক-রশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া একটী ছোট পর্দ্দার উপর নিক্ষিপ্ত করা হয় এবং পর্দ্দার মধ্যস্থিত একটী খুব ছোট ফাঁক দিয়া সূক্ষ্ম আলোক-রশ্মি আসিয়া উক্ত তরল পদার্থের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে আলোকিত করে। এইরূপ বন্দোবস্তের ফলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর কেবল কণাদল কর্ত্তৃক বিচ্ছুরিত আলোক-রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে—অন্য কোনও আলোক-রশ্মি পারে না। এখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উপরিভাগ হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, আকাশপথে উজ্জ্বল তারাবিন্দুর মত অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় কণা তরলপদার্থ মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। এই শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে অতি-অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Ultra microscope)। ইহা দ্বারা কণাদল-রসায়নের প্রসার সুসাধ্য হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে আরও জানা গিয়াছে যে, কণাদলের মধ্যে আণুবীক্ষণিক হইতে আণবিক পরিমাণ পর্য্যন্ত সকল প্রকারেরই কণা বিদ্যমান থাকে। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট যে কণা দেখা যায় তাহার ব্যাস এক ইঞ্চির একলক্ষভাগের একভাগ মাত্র। উপরোক্ত অতি-অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্ট ক্ষুদ্রতম কণার ব্যাস এক ইঞ্চির পঁচিশলক্ষভাগের একভাগমাত্র। কাজেই আমরা বলিতে পারি যে, যদি যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী আলোক-রশ্মির সাহায্য লওয়া যায়, তাহা হইলে হাইড্রোজেন্ গ্যাসের অণু মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইবে।

কণাদলের আকৃতির ক্ষুদ্রতা উহার প্রকৃতি নির্ণয় করে। কণাদলকে প্রকৃতপক্ষে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা যাইতে পারে, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। একটী কণা কতকগুলি ছোট ছোট অণুর সমষ্টিমাত্র। এই সকল কণার পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান আছে।

কণাদল প্রস্তুত করিবার উপায় সাধারণতঃ দুইপ্রকার। প্রথম হইতেছে কোন উপায়ে পদার্থকে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা। এই প্রক্রিয়া অনেক রকমে সাধিত হইতে পারে। সাধারণ নিয়ম হইতেছে বড় পদার্থখণ্ডকে পিষিয়া ছোট করা অথবা দুইটী ধাতুখণ্ডের মধ্যে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করা। ব্রেডিগ্, সোয়েডবার্গ প্রভৃতি মনীষিগণ এই উপায়ের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছেন এবং এই উপায়ে তাঁহারা অনেক ধাতব কণাদল প্রস্তুত করিয়াছেন। ব্রেডিগ্ যে নিয়মে ধাতুখণ্ড হইতে কণাদল প্রস্তুত করিতেন, ৩নং চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল। যে তরল পদার্থের মধ্যে কণাদল প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা একটী পাত্রে লইয়া 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত দুইটী মোটা ধাতুর তারের

চিত্র—৩

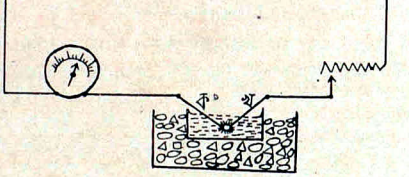

মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ চালাইতে হয়। ইহার ফলে ধাতুর তার দুইটী খুব ছোট ছোট কণাতে বিভক্ত হইয়া যায়। ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক তারটী ক্রমান্বয়ে ক্ষয় হইয়া কণাদলে পরিণত হয়—ধনাত্মক বৈদ্যুতিক তারটী সাধারণতঃ ওজনে কিছু বাড়ে। ব্রেডিগের পর সোয়েডবার্গ এই উপায়ের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। এই প্রণালীতে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনম্ প্রভৃতি ধাতুর কণাদল প্রস্তুত করা সুসাধ্য হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপায়ে কতকগুলি আণবিক অংশকে জড় করিয়া আণুবীক্ষণিক আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত করা হয়। উপযুক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে পদার্থের কতকগুলি অণু মিলিয়া একটী বড় অণু বা কোলয়ডকণাতে পরিণত হয়।

পদার্থের খুব ছোট ছোট কণাকে তরল পদার্থের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে তাহারা যে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় ইহা লেবেনহোক্ অষ্টবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লক্ষ্য করেন। তিনি মনে করিলেন যে, এই চঞ্চলগতি কোনওরূপ জীবনীশক্তি হইতে উদ্ভূত। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ব্রাউন্ দেখাইলেন, কয়লা, গন্ধক, প্রভৃতি পদার্থ যাহাদের আদৌ কোন জীবনীশক্তি থাকিতে পারে না, তাহারাও অবস্থাবিশেষে এইরূপ চঞ্চলগতি লাভ করে। এই চঞ্চলগতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রাউন্ বলিলেন যে, উহা জলের অণুবৃন্দের তাপজনিত কম্পনের ফল। তিনি দেখাইলেন যে, সকল ধাতব পদার্থই অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় জলের মধ্যে ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়। তাঁহার এই আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকের নিকট এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিল। উত্তাপজনিত অণুর সঞ্চরণ সাধারণ চক্ষে প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব ছিল; এই পরীক্ষা দ্বারাই আণবিক গতিবিধির অস্তিত্ব প্রমাণ করা সুসাধ্য হইল। পদার্থ-কণার এইরূপ ইতস্ততঃ চঞ্চলগতি পরে 'ব্রাউনীয় সঞ্চরণ' আখ্যা ধারণ করিয়াছে। পদার্থ-কণার এই সঞ্চরণ একেবারে নিয়মশূন্য—কোন্ দিকে কতখানি যাইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। পূর্ব্বে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিক কোনও শক্তি হইতে ব্রাউনীয় সঞ্চরণ উদ্ভূত। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, বহুবৎসর ধরিয়া চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ পাত্রে অবস্থিত কণাদলের মধ্যেও এই চঞ্চলগতি সমভাবে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং জলের অণুগুলির উত্তাপজনিত স্পন্দন হইতে যে কণাগুলির এই ইতস্ততঃ গতি উদ্ভূত, এই ব্যাখ্যা স্বীকার করা ভিন্ন উপায় নাই; যেহেতু কোনও বৈদ্যুতিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়াই চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

কণাদল লইয়া জিগমণ্ডি, সোয়েডবার্গ, ফ্রয়ণ্ডলিক্, অষ্টওয়াল্ড, ডনান্, ক্রয়িট্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। আমাদের দেশে ডাঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীনীলরতন ধর এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

এখন সকল বৈজ্ঞানিকই স্বীকার করেন যে, কণাদলের উপরিভাগে একপ্রকার বৈদ্যুতিক শক্তি আছে যাহার জন্য উহারা স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই বৈদ্যুতিক শক্তির উপরই কণাদলের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এই শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য এলিস্, পাউইস্, বার্টন্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনেক সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক কণাদলের বৈদ্যুতিক শক্তি নির্ণয়প্রণালীর প্রভূত উন্নতিসাধিত হইয়াছে এবং সম্প্রতি কলিকাতা সায়েন্স কলেজে এই বিষয় লইয়া যথেষ্ট গবেষণা হইতেছে।

কণাদলের বৈদ্যুতিক শক্তি নির্ণয় করিবার সাধারণতঃ তিন প্রকার প্রণালী প্রচলিত আছে—

(১) সীমারেখা প্রণালী (Boundary method).
(২) আণুবীক্ষণিক প্রণালী (Microscopic method).
(৩) পরিচালন প্রণালী (Transport method).

১। সীমারেখা প্রণালী

এই প্রণালীতে ৪নং চিত্রে প্রদর্শিত যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটী সর্ব্বপ্রথম ডাঃ বার্টন্ আবিষ্কার করেন, পরে ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উহার বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছেন। 'ক' চিহ্নিত পাত্রে কণাদল রাখিতে হয়। 'খ' চিহ্নিত কাচের নলের মধ্যে কোনও প্রকার

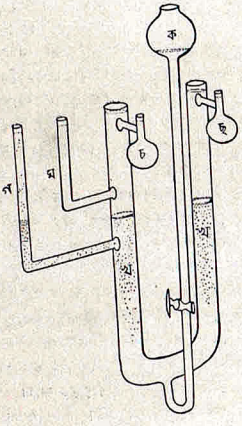

চিত্র—৪

লবণমিশ্রিত পরিষ্কার জল দিয়া প্রায় অর্দ্ধেক পূর্ণ করিতে হয়। এই অবস্থায় মধ্যের কলটী খুব আস্তে আস্তে খুলিয়া দিলে দেখা যাইবে যে, কণাদল লবণাক্ত জল ঠেলিয়া ক্রমে উপরে উঠিতেছে। এই দু'য়ের মধ্যবর্ত্তী সীমারেখার গতি পর্য্যবেক্ষণ করা আদৌ কঠিন নয়। কণাদল যদি রঙ্গীন হয় তাহা হইলে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যই যথেষ্ট। কিন্তু কণাদল যদি শাদা অথবা খুব সামান্য রঙ্গীন হয়, তাহা হইলে ফটোগ্রাফীর সাহায্য লইলেই সীমারেখার গতি খুব সহজে অনুসরণ করা চলে। যখন সীমারেখা 'গ' ও 'ঘ' চিহ্নিত দুইটী কাচনলের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক উঠিয়াছে, তখন মাঝের কলটী বন্ধ করিয়া দিলে সীমারেখার গতি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। 'চ' ও 'ছ' চিহ্নিত বিস্ফারিত কাচগোলক দুইটী উপরোক্ত

লবণাক্ত জলে পরিপূর্ণ থাকে এবং প্লাটিনম্ ধাতুর সাহায্যে ঐ দুইটী গোলকের মধ্য দিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালনা করা হয়। ইহার ফলে, বৈদ্যুতিক-শক্তি-সম্পন্ন কণাদল নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে থাকে। এই চলার পরিমাণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয়। ইহা হইতে কণাদলের উপরিভাগে বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ হিসাব করা যায়।

২। আণুবীক্ষণিক প্রণালী

কণাদলের বৈদ্যুতিক শক্তি নির্ণয় করিবার এই প্রণালী সর্ব্বপ্রথম এলিস্ ও পাউইস্ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয়। তাঁহারা দেখান যে, যদি একটী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মঞ্চের উপরে চারিদিক বন্ধ একটী কাচপাত্রের মধ্যে কণাদলকে রাখিয়া পাত্রের দুই পার্শ্ব হইতে দুইটী ধাতুখণ্ডের সাহায্যে কণাদলের ভিতর দিয়া তড়িৎ চালনা করা যায়, তাহা হইলে উপর হইতে অণুবীক্ষণ সাহায্যে কণাগুলির বৈদ্যুতিক-শক্তি-নিবন্ধন গতি দেখা যায়। এই উপায়ে এলিস্ কণাদলের বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পাউইস্ ইহার পরে এলিসের উপরোক্ত যন্ত্রের উন্নতিসাধন করেন। তিনি বৈদ্যুতিক শক্তিকে বারংবার উল্টাইতে বলেন অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর বিপরীত পথে উহাকে চালনা করিতে বলেন। বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণের জন্য তিনি প্লাটিনম্ তারের পরিবর্ত্তে তামার তার ব্যবহার করেন।

এলিস্ ও পাউইসের উপরোক্ত প্রণালীতে একটী বিশেষ দোষ ছিল যে, উহার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি চালনা করিতে হইত। ফলে তড়িৎপ্রবাহজনিত দ্রবের বিশ্লেষণ কণাদলের প্রকৃত গতি নির্ণয়ে বাধা প্রদান করিত। সোয়েডবার্গ ও এণ্ডার্সন অতি-অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই দোষ দূরীভূত করেন। তাঁহাদের অনুসৃত প্রণালীতে খুব অল্প সময়ের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তি চালনার প্রয়োজন হয় এবং ফটোগ্রাফীর সাহায্যে একটী কণার স্থানচ্যুতি নির্ণয় করা হয়। এলিস্ ও পাউইসের প্রণালী অপেক্ষা এই প্রণালীর সুবিধা এই যে, ইহাতে তড়িৎপ্রবাহনিবন্ধন রাসায়নিক বিশ্লেষণের দোষ খুব সামান্য হয়। সোয়েডবার্গ ও এণ্ডার্সনের পরে ট্রিলা, ম্যাটসন্, বুল্লাগ্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রণালীর আরও উন্নতিসাধন করিয়াছেন।

৩। পরিচালন প্রণালী

ডুক্রো ও ভিক্টজেন সর্ব্বপ্রথম এই প্রণালী উদ্ভাবন করেন। এই প্রণালী অনুসারে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ কণাদলের মধ্য দিয়া পরিচালনা করা হয় এবং কি পরিমাণ কণাদল একটী বৈদ্যুতিক দ্বারের (electrode) নিকট গিয়া জমে তাহার হিসাব রাখা হয়। ইহা হইতে কণাদলের উপরিভাগের বৈদ্যুতিক শক্তির মোটামুটী একটা ধারণা জন্মে।

কণাদলের সহিত উপযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ মিশাইলে কণাদলকে দ্রব হইতে অবক্ষিপ্ত (coagulate) করা যায়। ইহা অনেকটা দুধের মধ্যে টকরস দিয়া ছানা-কাটার মত।

মানুষের জীবনের সহিত কণাদল রসায়ন গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। আমাদের অধিকাংশ খাদ্য, দুধ, চা প্রভৃতি পানীয়, পরিধানের বস্ত্র, এমন কি যে পৃথিবীর উপর আমরা বিচরণ করি সে সমস্তই কোলয়ডময়। উপযুক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথিবীর যে কোন পদার্থকেই কণাদলের সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করা যায়। নানাপ্রকার রঙ্, সাবান প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালীকে কণাদল সম্পর্কীয় নবগন্ধ জ্ঞানই এত বেশী উন্নত করিতে পারিয়াছে।

কণাদলের জ্ঞান চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রচুর উন্নতিসাধন করিয়াছে। অনেক প্রকার ব্যাধির বীজ আমাদের শরীরের মধ্যে কোলয়ডরূপে বর্ত্তমান থাকে। অল্প একটী কোলয়ডের সাহায্যে ঐ সকল দূষিত বীজ নষ্ট করা খুব সুসাধ্য। সুতরাং ঐ ব্যাধিসমূহের ঔষধ কোলয়ডের আকারে প্রস্তুত করিতে পারিলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে কণাদলের বিশেষ জ্ঞান যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। জমির ভিতরে নানাপ্রকার এ্যাসিড্ কোলয়ডরূপে অবস্থান করে। এই সকল এ্যাসিডের প্রকৃতি জানা থাকিলে বিশিষ্ট সার দিয়া জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা খুব সহজ। তা ছাড়া আমরা জানি যে, জমির উপরিভাগে কোলয়ডরূপী একটী আস্তর থাকার জন্য জমির মধ্যস্থিত দ্রবণীয় পদার্থগুলি বৃষ্টির জলে ধুইয়া যাইতে পারে না।

পৃথিবীর দেহগঠন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

আদিম বা জীবারম্ভ মহাযুগ

ঠিক যে কোন্ সময়ে কতকাল আগে ধরাবক্ষে সর্ব্বপ্রথম প্রাণ ও প্রাণীর উৎপত্তি হয়, তা সঠিক করে বলতে না পারলেও সমস্ত ভূতত্ত্ববিৎ ও প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, অন্ততঃ এক শত কোটী বৎসরের আগে (হু দশ কোটী বৎসর আগুপিছু হতেও পারে) বসুন্ধরা জীবজননী হন।

তার পর এমন এক যুগ আরম্ভ হয়, যখন ভূপঞ্জরের স্তর-পাথরে জীবশরিচয়-সূচক বহু প্রমাণ সঞ্চিত হয়ে উঠে। এ প্রমাণ হচ্ছে fossil অর্থাৎ প্রাণিদেহের পাষাণচিহ্ন; এই fossilই হ'ল পাষাণলিপি। এই সময় হতেই প্রাচীন-মহাযুগ আরম্ভ। প্রাচীন জীব-মহাযুগের আরম্ভ এবং প্রথম জীবজন্মকাল এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে বিপুল সময়, তাকেই বলা হয় আদিম বা জীবারম্ভ মহাযুগ।

মানুষের ইতিহাসে কালকে চারটী বড় বড় ভাগে ভাগ করা হয়; (১) প্রাগৈতিহাসিক কাল; এ হ'ল কাহিনী বা কিংবদন্তীর যুগ; (২) প্রাচীনকাল; (৩) মধ্যকাল এবং (৪) আধুনিক কাল। ভূতত্ত্বশাস্ত্রে প্রাণিবংশের আয়ুষ্কালকে ঠিক ঐ ভাবেই ভাগ করা হয়েছে। আদিম জীব-মহাযুগটী প্রাণিবংশের প্রাগৈতিহাসিক কালের সমান। যে ধরণের প্রমাণের উপর নির্ভর করে যুগ-নির্ণয় হয়, সে ধরণের প্রমাণ আদিম কালের ভূস্তরে পাওয়া যায় না। অনুমান ও কার্য্যকারণ বিচার দ্বারা স্থির করা হয়েছে যে, আদিম ভূস্তরের গঠনকালেই জীব প্রথম উৎপন্ন হয় এবং তার দৈহিক গঠনও ক্রিয়ৎ পরিমাণে জটিলতা লাভ করে; এমনকি মৌলিক বংশভেদও ঐ কালে ঘটে।

যে সব যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা স্থির হয়েছে যে, আদিম মহাযুগে জীব প্রথম দেখা দেয়, তার অল্পই সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অধিকাংশই যুক্তি সাহায্যে অনুমান করা প্রমাণ। আদিম মহাযুগের ভূস্তর পরিচয় হ'লে তবে এই সব যুক্তির সারবত্তা বুঝা যাবে।

আদিম বা আরম্ভ মহাযুগের পাথর-স্তর খুব গভীর। মোট গভীরতার পরিমাণ প্রায় ১৮০ হাজার ফুট অর্থাৎ ৩০ মাইল। এই সমস্ত পাথরকে তার আকৃতিপ্রকৃতিভেদে তিনটী বড় বড় থাক (system) ভাগ করা যায়। উপরে এক থাক, মাঝে এক থাক, সব নীচে এক থাক। পরবর্ত্তী বড় বড় যুগের পাথর ও প্রস্তর-থাকের যেমন একটী সর্ব্ববাদীসম্মত নামকরণ হয়েছে, আদিম মহাযুগের থাকগুলির সেরূপ নামকরণ হয় নি। একারণে প্রতি থাকের পাথর যে দেশের যেস্থানে পাওয়া গিয়েছে, সেই স্থানের নাম অনুসারেই পণ্ডিতরা তার নাম দিয়েছেন। যথা :—আদিম ভূস্তরভাগ; ইহা তিন প্রস্তর-থাকে বিভক্ত। উর্দ্ধ-থাকের নাম Torridonian বা Alongkian; মধ্য-থাক Lewisian বা Huronian; অধঃ-থাক Caledonian বা Laurentian। এই নামগুলির প্রথমটী ইংলণ্ডীয়; দ্বিতীয়টী মার্কীনদেশীয়।

পাথরের প্রকৃতি ও গঠনভেদে এই স্তরভেদ। অধঃস্তর ও মধ্যস্তর উভয়ের পাথরই ভয়ানক শক্ত—অগ্নিপক জমাট, দানাদার (crystalline) পাষাণ। সব উপরের পাথর এরূপ দানাবাঁধা অগ্নিপক পাষাণ নহে; সাধারণ পলিমাটী পাথর (চুণে, বেলে, মেটে এই তিন জাতীয় পাথর) নিয়ে এই স্তর গঠিত হয়েছে। অধোভাগের পাথরের দানাগুলা বেশ বড় বড়। মধ্য-থাকের পাষাণের দানা কিন্তু খুব মিহি, যেমন স্ফটিক পাথর বা মর্ম্মর পাথর; এদের দানা চোখে দেখাই যায় না। সব উপরের থাকের পাথরে কোনো রূপান্তর ঘটে নি, কাজেই এ পাথর দানাবাঁধা পাষাণে পরিণত হতে পারে নি। সব থাকেই ভূগর্ভোদ্গিত আগ্নেয় পাথর (erruptive rock) অল্পবিস্তর পূর্ব্বোক্ত পাষাণের সঙ্গে মেশানো আছে। সব চেয়ে নীচের ছুটী থাক্‌কে একসঙ্গে বলা হয় Archean বা আদিম ভূস্তর। উপরের থাক্‌টীকে বলা হয় পূর্ব্বক্যাম্‌ব্রীয় বা আরম্ভ থাক। এই তিনটী প্রধান থাক্ নিয়ে হ'ল আদিম ভূস্তরভাগ বা Eozoic group।

এই ভূস্তরভাগের তিন থাকে প্রাণীর চিহ্ন বা fossil যা পাওয়া গিয়েছে, তা নগণ্য বললেই হয়। সব নীচের যে দানাদার পাষাণ থাক্, তারই অন্তর্গত দু'একটা পাথরের গায়ে এক রকম আঁকাবাঁকা দাগ দেখা যায়, অনেকটা মিহি খোদাই করা আল্‌পনার দাগের মত। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ অনুমান করেন এ এক রকম আদিম কীটের বা কৃমিকেঁচোর চলাফেরার দাগ। জীবঘটিত চিহ্ন অনুমান করে এর নাম হয়েছে *Eozoon canadense* (কানাডাদেশীয় আদি জীবাণু)। অধিকাংশ ভূতত্ত্ববিৎ এই সিদ্ধান্তকে আদৌ আমল দেন না।

এরি উপরের Huronian স্তরে শঙ্খ, কেঁচোজাতীয় কীট ও জলশেওলা (sea weed) প্রভৃতি প্রাণীর কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।

সব উপরের যে Torridonian বা Alongkian স্তর (পূর্ব্বকাম্ব্রীয় বার বিশেষণ), তাতে আদি জীবাণু, শুক্তি শামুক বা শামুক ধরণের বহু জীবের স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। বড় বড় সামুদ্রিক কাঁকড়া-বিছারও দেহচিহ্ন বা জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে।

তবে এই সব জীবাশ্মের পরিমাণ এতই কম আর চিহ্ন এতই অস্পষ্ট যে, এসব লক্ষণ ধরে এই বিপুল পাষাণরাশির স্তরভাগ ও স্তররচনা-কালের বিভাগ সম্ভব হয় নি। এই ২০।২৫ মাইল গভীর পাথর-থাকের সব-উপরের মাত্র হাজার দশেক ফুট গভীর পাথরে যা কিছু স্পষ্ট জীবাশ্মচিহ্ন পাওয়া যায়। আরো অধোভাগের স্তরে প্রাণীর চিহ্ন না থাক্‌লেও প্রাণী যে সেকালে উৎপন্ন হয়েছিল তার একটা প্রবল যুক্তি এই যে, পরের মহাযুগের অর্থাৎ ক্যাম্ব্রীয় যুগের ঠিক আরম্ভেই সমুদ্রজলে হঠাৎ এত জীবজাতির সংখ্যাবাহুল্য ঘটলো কি করে? অমেরুদণ্ডী জীবরা আটটা মূল বংশে বিভক্ত; এই আটটা বংশেরই জীব বহু জাতিতে বিভক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে প্রাচীন জীবনমহাযুগ আরম্ভ হ'তে না হ'তেই। এসব জীব সেকেলে প্রাচীন ধরণের হলেও তাদের দেহে জটিলতা বেশ দেখা দিয়েছে, আকার বৈচিত্র্যও ঘটেছে, আয়তনেও অনেক জীব বেশ বৃহৎ হয়েছে। সুতরাং কার্য্যকারণের সঙ্গতি বিচার করলে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে, এর পূর্ব্বযুগে (আদিম বা আরম্ভযুগে) নিশ্চয়ই নানাবংশীয় ও নানাজাতীয় জীবের সূত্রপাত হয়েছিল। শুধু সূত্রপাত নয়; তাদের দেহে গঠনজটিলতাও ঘটেছিল বিলক্ষণ।

অতঃপর প্রশ্ন হ'বে, 'তা যদি হয়, তা'হলে তাদের দেহচিহ্ন কিছুই কুত্রাপি পাওয়া যাচ্ছে না কেন? ক্যাম্ব্রীয় যুগের বিশ হাজার ফুট গভীর অধঃস্তরে এত জীবাশ্ম বাহির হ'ল, আর ২০।২৫ মাইল গভীর পাথর-থাকে তার কোনো চিহ্নই রইল না, এর মানে কি?—কারণই বা কি?'

কারণ এই অনুমান হয় যে, আদিম কালের সে সকল জীবের দেহ ছিল কোমল, শাঁসালো; দেহের ভিতরে বা বাহিরে হাড় বা খোল কিছুই তখনো গড়ে ওঠেনি, অধিকন্তু সেকালের পাথর আগুনের তাপে গলে ও ভারের চাপে পিষে গিয়ে জমে এমন রূপান্তরিত হয়েছিল যে তাতে কোনো জীবদেহেরই চিহ্ন অটুট থাকতে পারেনা। খুব সম্ভব এই সব কারণেই আদিম যুগে জীব দেখা দিলেও সে যুগের পাথরস্তরে কোনো চিহ্ন রেখে যেতে পারেনি।

আদিম মহাযুগের সুদীর্ঘ অবসর কালমধ্যে অন্ততঃ তিন বার ভূপঞ্জরের বড় রকমের বিপ্লব ঘটে। বিপ্লবের ফলে স্থলভাগ উঁচু হয়ে ওঠে, পাহাড়পর্ব্বত উৎপন্ন হয়, সমুদ্রতল বসে গিয়ে গভীর হয়ে পড়ে। ভূস্তর ফেটে ফুটে যায়, গলিত গৈরিক ধাতু পাথর উপরে উৎক্ষিপ্ত হয়। তিন বারের বিপ্লবের মধ্যে দুবার বিরাম ও শান্তির যুগ আসে। মহাদেশগুলার ক্ষয় হয়ে সমুদ্রতল পলিস্তরে বুজে যেতে থাকে, সমুদ্রজল উঁচু হয়ে উঠে স্থলভাগের বেশী অংশ গ্রাস করে ফেলে।

আদিম মহাযুগের শেষ দিকে যে বিপ্লব ঘটে এবং তার ফলে যে নূতন মহাদেশ ও নূতন নূতন পাহাড়পর্ব্বত উৎপন্ন হয়, তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মহাযুগের (Paleozoic era) আরম্ভ। এই প্রাচীন মহাযুগের আরম্ভের সঙ্গে যাকে বলে geological age ও geological record তারই সূত্রপাত হয়; অর্থাৎ প্রাণিরাজ্যে ক্রমবিকাশের প্রামাণিক লিখিত বা প্রস্তরাঙ্কিত ইতিহাস আরম্ভ হয় এই Paleozoic মহাযুগের সব নীচের ক্যাম্ব্রীয় যুগারম্ভ হতে।

প্রাচীন জীবমহাযুগ

প্রাণ ও প্রাণীর সূচনা করে দিয়ে আদিম মহাযুগের অবসান হ'ল। হয় সঙ্গে সঙ্গেই, না হয় একটা দীর্ঘ বিশ্রামের পরে প্রাচীন জীববংশের লীলাকাল আরম্ভ। এই মহাযুগের স্তরে স্তরে যত জীব বা উদ্ভিদ্ দেখা দিয়েছিল, তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি আধুনিক প্রাণী হ'তে একেবারেই ভিন্ন। যদি কলমের ক্রমোন্নতির ইতিহাস লেখা হয়, তা হলে দেখা যাবে, উহার এ পর্য্যন্ত চার অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়েছে। প্রথমাবস্থা সরের কলম, দ্বিতীয়াবস্থা পালকের (quill) কলম, তৃতীয় ষ্টীল পেন, চতুর্থ ফাউনটেন পেন। সরের কলমের সঙ্গে ফাউনটেন পেনের যে সম্বন্ধ, প্রাচীন (paleo) প্রাণীর সঙ্গে আধুনিক প্রাণীর আকার প্রকারের সেই সম্বন্ধ।

আধুনিক কালে প্রাণিরাজ্যে যে সব 'গণ' (genus) ও 'জাতি' (species) বর্ত্তমান, এ সব 'গণ' বা 'জাতি' প্রাচীন যুগে ছিল না। সে সময়কার প্রাণীদের 'গণ' ও 'জাতি' যা বেঁচেছিল, তা সব লোপ পেয়েছে কোটী কোটী বছর আগে।

প্রাচীন মহাযুগ স্থিতিকালপরিমাণে ও সঞ্চিতপ্রস্তরস্তরগভীরতায় খুব বিশাল যুগ। এই জন্য এ মহাযুগকে ছয়টি বড় বড় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কালের হিসাবে এক এক ভাগকে 'যুগ' বা period বলা হয় এবং স্তরের হিসাবে এক এক ভাগকে বলা হয় থাক বা system।

যুগের ও যুগ-স্তরের নাম। যথা:—(১) ক্যাম্ব্রীয় (২) অর্ডভিনীয় (৩) শীলুরীয় (৪) ডিভনীয় (৫) কয়লা যুগ (৬) পারমীয়। এর মধ্যে প্রথম তিনটীকে একত্রে বলা হয় মহাযুগের প্রথমার্দ্ধ, শেষ তিনটীকে একত্রে বলা হয় শেষার্দ্ধ। উভয়ের ভেদ লক্ষণ খুব স্পষ্ট। প্রথমার্দ্ধ (তিন যুগ) হ'ল অমেরুদণ্ডী জীবের রাজ্যকাল; শেষার্দ্ধ হ'ল মেরুদণ্ডী,

মাছ ও ব্যাং প্রভৃতি জীব এবং স্থলজ উদ্ভিদের প্রভাবকাল। এ বিষয় বিস্তৃতরূপে যথাস্থানে বর্ণিত হবে। সবিশেষ যুগ পরিচয় হ'বে ছয়টী বিষয় পর পর বিচার ও আলোচনা করে ; যথা—(১) আরম্ভ ও স্থিতিকাল, (২) ভূস্তর ও প্রস্তর, (৩) ভৌগলিক অবস্থা, (৪) ভূতাত্বিক ঘটনা, (৫) উদ্ভিদ পরিচয় ও (৬) জীবপরিচয়।

যুগান্তর ও স্থিতিকাল। এই বিষয় নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে মতভেদ কালমাত্রার হিসাব নিয়ে। এ বিষয়ের যে হিসাব পণ্ডিতরা করেন, তা যে সন, তারিখ, দিন, ঘণ্টা ধরে তা ঠিক নয়। যেমন, একটা অতি পুরাণো বাড়ীর বয়স ঠিক করতে তার গঠন ও বাহির-ভিতরের অবস্থা, মালমসলার অবস্থা প্রভৃতি দেখে বিশেষজ্ঞরা একটা অনুমান করেন। ভিন্ন ভিন্ন অনুমানে ১০।২০ বা জোর ৩০ বৎসর তফাৎ হয়। পৃথিবীর বয়স ও যুগের কাল পরিমাণ সম্বন্ধেও তেমনি ১০,২০ কোটী বৎসর তফাৎ হ'য়ে থাকে। মানুষের বয়স বিচারে যেমন দু'এক বছর এদিক ওদিক তেমন ধর্ত্তব্য নয়, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহদেরও বয়স বিচারে দু-দশ-বিশ কোটী বৎসর এদিক-ওদিক কিছুই নয়।

পণ্ডিতদের অনুমান, মহাযুগ আরম্ভ হয় অন্যূন পক্ষে ৫০ কোটী বৎসর আগে। খুব বেশী হয় তো ৬০ কোটী বৎসর। আর মহাযুগের স্থিতিকাল ৪২ কোটী, মতান্তরে ৩২½ কোটী বৎসর। এক সময় ছিল, যখন পণ্ডিতরা পৃথিবীর বয়স বিচারে কালপরিমাণকে অল্পের দিকে টানতে চেষ্টা করতেন। এখন ঝোঁক উল্টা দিকে। রেডিয়াম প্রভৃতি ভাস্বর (radioactive) পদার্থের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিষয়েই পূর্ব্বমত সব ভেঙ্গে চুরে গিয়েছে। পৃথিবীর বয়স সম্পর্কেও তাই হয়েছে। রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতির পরমাণুর ইলেকট্রন আপনা হ'তে খসে গিয়ে মূল পদার্থটা সীসাতে (lead) পরিণত হয়। কত কাল অন্তর এটা হয়, তারও হিসাব হয়েছে। গভীরতম পাথরের উপাদানে এইসব ভাস্বর পদার্থ ধরা পড়েছে এবং তাদের সীসা হওয়ার ঘটনাও জানা গিয়েছে। সেই ঘটনার কালপরিমাণ হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, আদিম মহাযুগের ভিত্তিস্থানে যে সব আগ্নেয় পাষাণ আছে, তার কোনো কোনোটায় এই সব ভাস্বর পদার্থ বিদ্যমান। হিসাবে জানা গিয়েছে যে, খুব প্রাচীন যে পাষাণ তার বয়সও ন্যূনপক্ষে ১২০ হ'তে ১৫০ কোটী বৎসর। এই নূতন গণনাপদ্ধতিতে প্রত্যেক যুগকে এক বা অধিক কালচক্রে (cycle) ভাগ করা হয়েছে, এবং স্থূল গণনায় প্রতি কালচক্র তিনকোটী বৎসরব্যাপী বলে স্থির হয়েছে। স্তরগঠনকাল একাধিক পদ্ধতি ধরে নির্ণীত হয়েছে, কিন্তু সকল পদ্ধতিতেই মোট গণনাফল প্রায় এক।

প্রাচীন মহাযুগ ছয় যুগে এবং ১৪টা কালচক্রে বিভক্ত। প্রথম ক্যামব্রীয় যুগে দু'টি, দ্বিতীয় যুগে তিনটি, তৃতীয় যুগে একটি, চতুর্থ যুগে তিনটি, পঞ্চমযুগে তিনটি, ষষ্ঠ বা শেষ (পারমীয়) যুগে দু'টি—সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টি কালচক্র। মোট কালমাত্রা ৩ কোটী হিসাবে ৪২ কোটী। পৌরাণিক মহাযুগের কালমাত্রা পূর্ব্বোক্ত কালচক্রের চেয়ে কত কম!

ভূস্তরের পরিচয়। প্রাচীন মহাযুগের জীবোদ্ভিদের দেহচিহ্ন যে সব স্তর-পাথরে পাওয়া যায়, তাদের মোট গভীরতা প্রায় ১৮৫,০০০ ফুট ; অর্থাৎ সমস্ত স্তরগুলাকে উপর-উপর সাজালে উচ্চতা হয় ৩০ মাইলেরও বেশী। কিন্তু এভাবে সমস্ত স্তর তো কোথাও সাজানো নাই। নানা স্থানে অল্প বা অধিক সংখ্যায় এই সব পাতলা বা পুরু স্তর পেঁয়াজের খোসার মত মূল পাথরের আবরণকে ছেয়ে আছে। এদের সজ্জাপ্রণালীর পার্থক্য বর্ত্তমান। কোথাও লম্বালম্বি, কোথাও আড়াআড়ি, কোথাও খাড়া, কোথাও বা ট্যারচা—এই রকম নানাভাবে সাজানো। মাঝে মাঝে যখন ভূবিপ্লব হয়, সেই সময় বাহিরের খোসাটী ধ্বস খেয়ে নীচে নামে বা ঠেলা পেয়ে উপরে ওঠে। তখন এই সব সজ্জার ব্যতিক্রম ঘটে।

ছয়টা যুগের ছয়টা স্তর বা থাক ; প্রত্যেকের গভীরতা ভিন্ন ভিন্ন। সব নীচের প্রথম থাক ৪০,০০০ ফুট গভীর, দ্বিতীয় থাক ৪০,০০০, তৃতীয় ১৫,০০০, চতুর্থ ৩৭,০০০, পঞ্চম ৪০,০০০ এবং ষষ্ঠ ১৩,০০০ ফুট গভীর।

সমস্ত থাকই চার রকম পলিপাথরে (sedimentary) উপর-উপর সাজানো মাত্র। বেলে পাথর, চুণে পাথর, মেটে পাথর ও কয়লা পাথর। এ ছাড়া এইসব পাথর-থাকের ফাটলে, খাঁজে ও গহ্বরে ভূগর্ভ হ'তে আগ্নেয় বিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত গলিত লাভার জমাট স্তূপ বা চাদর (sill, dyke) দেখতে পাওয়া যায়।

এক দিক দিয়ে প্রাচীন মহাযুগের পাথরের মূল্য মানুষের কাছে খুবই বেশী। মানুষের সভ্য জীবনের ব্যবহারোপযোগী যে সব দ্রব্য, তার বেশীর ভাগ এই ছয় যুগের ভূস্তর হ'তে পাওয়া যায়। সোনা, রূপা, তামা, নিকেল, লোহা, কয়লা, প্যারাফিন তেল, পাথুরে লবণ (rock salt), ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্য ভাল বেলে বা চুণে পাথর, শ্লেট, মার্ব্বেল পাথর প্রভৃতি সমস্তই এই প্রাচীন ভূস্তর হ'তে পাওয়া যায়।

ভৌগলিক অবস্থা। প্রাচীন মহাযুগের আরম্ভের ঠিক পূর্ব্বেই অর্থাৎ আদিম মহাযুগের শেষভাগে যে প্রকাণ্ড এক ভূবিপ্লব ঘটে, যার ফলে উত্তর-গোলার্দ্ধে একটা মহাদেশ জেগে ওঠে, অনেক পাহাড়পর্ব্বত মাথা তুলে দাঁড়ায়, তার পর হ'তে শান্তি যুগের আরম্ভ। এই মহাদেশ ও পাহাড়পর্ব্বতের ক্ষয় হয়ে তারি পলিমাটী হ'তে ক্যামব্রীয় প্রভৃতি তিনটী যুগের সমুদ্রে নূতন দেশ মহাদেশের সৃষ্টি হয়। এই প্রথম যুগ হ'তে শীলুরীয় (তৃতীয়) যুগের আদিভাগ পর্য্যন্ত একটা বিশাল শান্তির যুগ—সৃষ্টির যুগ। পূর্ব্ব যুগের উৎপন্ন দেশমহাদেশ ও পাহাড়-পর্ব্বত ধীরে ধীরে ক্ষয় হচ্ছে, অন্যদিকে সমুদ্রতল ধীরে ধীরে উপরে ফুলে উঠছে এবং স্থলভাগের উচ্চতা কমে আসছে। এমনিভাবে চলতে চলতে শীলুরীয় যুগের অন্তে আবার এক বিপ্লব ও ধ্বংসের কাণ্ড আরম্ভ হয়। এই বিপ্লব চলতে থাকে চতুর্থ (ডিভনীয়) যুগের আদিভাগ পর্য্যন্ত ; অর্থাৎ ৬ কোটী বৎসর ধরে এই পাহাড়পর্ব্বত উৎপত্তির ব্যাপার চলেছিল। আমেরিকা ভূখণ্ডেও এই বিপ্লব যুগ দেখা দেয়। সেখানে দ্বিতীয় (অর্ডভিসীয়) যুগের শেষ

দিক হতেই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। পূর্ব-ভূখণ্ডে এই বিপ্লবের ফলে স্কট্‌ল্যাণ্ডের উচ্চভূমিগুলি গড়ে ওঠে।

এই বিপ্লবের অবসানে আবার এক বিরামের যুগ। ডিভনীয় যুগের মধ্য ও অন্তভাগ এবং কয়লাযুগের আদি ও মধ্যভাগ এই চার কালচক্র ব্যাপ্ত হয়ে এই শান্তির ও সৃষ্টির যুগ। এর পরিমাণ ১২ কোটী বছর। প্রথম যে বিরাম কাল নিয়ে মহাযুগের আরম্ভ, তাও চারটী কালচক্র জুড়ে বিদ্যমান ছিল। কয়লাযুগের অন্তভাগ হ'তে আবার এক বিপ্লবের সূত্রপাত, এই বিপ্লব পারমীয় যুগের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত চলেছিল। ইহার স্থিতিকাল, পূর্ব্বগত বিপ্লব যুগের মতই ছয় কোটী বৎসরব্যাপী। প্রাচীন মহাযুগে এইটীই শেষ ভূবিপ্লব। এরি সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন জীবযুগের অবসান ও মধ্য মহাযুগের সূত্রপাত।

এত কোটী বৎসরব্যাপী একটা দীর্ঘ মহাযুগের মধ্যে ভূপৃষ্ঠে জলস্থলের সমাবেশ ও আয়তন একরূপে থাক্‌তেই পারে না। প্রতিযুগেই ভাঙ্গা-গড়া, অবল-বদল, জলবাতাসের পরিবর্ত্তন কতবার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু খুব বৃহৎ ও বিপুল পরিমাণে নূতনত্বের আবির্ভাব হয়েছে মাত্র দু'বার। প্রাচীন মহাযুগের আরম্ভে ভূবক্ষে একটা নূতন মহাদেশ জেগে উঠেছিল; সেই মহাদেশ ও পাহাড়পর্ব্বত সমূলে ক্ষয় হ'য়ে সমুদ্রগর্ভস্থ হ'ল তিনটী বড় বড় যুগ ধরে, যার মোট কাল-পরিমাণ ১২ কোটী বছর। এর পরে যে ভূবিপ্লব তৃতীয় যুগশেষে দেখা দেয়, তার ফলে উত্তর-আট্‌লাণ্টিক সমুদ্রের স্থান অধিকার ক'রে এক বিশাল মহাদেশ জেগে ওঠে। এই মহাদেশ ক্ষয় হ'য়ে ভূপৃষ্ঠ সমতল হয়ে গেলে কিছুকাল পরে আবার কয়লাযুগের শেষ দিক হ'তে পারমীয় যুগ পর্য্যন্ত আর এক ভূবিপ্লবের ফলে নূতন নূতন মহাদেশের উৎপত্তি ঘটে। দক্ষিণ-ভূখণ্ডে গণ্ডবনভূমি (Gondwana Land) নামে যে এক বিশাল মহাদেশ দেখা দেয়, সেটী দক্ষিণ-আমেরিকা, আফ্রিকা, দাক্ষিণাত্য ও অষ্ট্রেলিয়া সব যোগ করে একাকার হ'য়ে প্রকাশিত হয়।

শুধু যে এই সব ভৌগোলিক পরিবর্ত্তনই হ'য়েছিল তা নয়; ভূপৃষ্ঠের জলবাতাস সব যুগে সব দেশে একরকম ছিল না। ভূদেহ যে আদিম কাল হ'তে তপ্তাবস্থা থেকে ক্রমশঃ শীতল হ'য়ে আস্‌ছে এ ধারণা ভুল। নানা কারণে যেখানের আবহাওয়া গ্রীষ্মপ্রধান ছিল, এখন সে সব স্থান হিমপ্রধান হয়েছে; যেখানের জলবাতাস ঠাণ্ডা ছিল, এখন সে সব স্থান গরম হ'য়ে উঠেছে। যুগে যুগে জলবাতাসের পরিবর্ত্তনের অনেকগুলা কারণ দেখা যায়। একটা মোটা কথা এই যে, যখন ভূপৃষ্ঠ স্থলপ্রধান হয়—মহাদেশ, পাহাড়পর্ব্বত মাথা তুলে ওঠে, তখন সারা ভূপৃষ্ঠ ব্যাপ্ত করে স্থলভাগের জলবাতাস বা আবহাওয়া শুক্‌নো হয়; শীতাতপের মাত্রা ঋতুভেদে চরম হয়,—শীতে খুব ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মে খুব গরম হয়। আর যখন ভূপৃষ্ঠ জলপ্রধান হয়, পাহাড়পর্ব্বত ক্ষয় পেয়ে সমতল হয়, স্থলভাগ নীচু হয়ে পড়ে, তখন জলবাতাস বা আবহাওয়া রসা ও উষ্ণ হয়; শীতগ্রীষ্মে তাপমাত্রার তারতম্য কম হয়। প্রাচীন মহাযুগে এইরূপ জলবাতাসভেদ ক্রমান্বয়ে চার বার হয়েছিল। এ ছাড়া আর একটা কারণেও দীর্ঘ যুগ-মহাযুগ অন্তর ভূপৃষ্ঠে সর্ব্বত্রব্যাপী শীত ও গ্রীষ্মের আবির্ভাব হয়। সে কারণ হচ্ছে জ্যোতিষিক। এ প্রবন্ধে তা বুঝানো সম্ভবপর নয়। অতিশয় জটিল এই কারণটির জন্যই

পৃথিবীর উপরভাগটা একবার খুব উষ্ণ হ'য়ে ওঠ, আবার অর্দ্ধ ভূখণ্ড জুড়ে একেবারে তুষারের পুরু আবরণ পড়ে যায়। আজ হতে প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর আগে একটা এইরূপ হিমযুগ ধরাবক্ষে এসেছিল, হাজার ২০ বছর আগে তার প্রভাব শেষ হ'য়ে গিয়েছে। প্রাচীন মহাযুগের সুদীর্ঘ কাল মধ্যে যে এ হিমযুগ অন্ততঃ দু'বার এসেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহাযুগের জীবোদ্ভেদ। যদিও সবচেয়ে সুদীর্ঘ মহাযুগ এইটী, তবু প্রাণীর প্রসার ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে এ যুগ খুব দীন। সমস্ত জীবরাজ্য নয়টী যুগ বংশে বিভক্ত, তার মধ্যে অমেরুদণ্ডী জীবই আটটী বংশ জুড়ে আছে; মেরুদণ্ডী জীব নবম বংশ এবং তার অন্তর্গত পাঁচটী শাখা বংশ। কিন্তু প্রাচীন মহাযুগে সমস্ত অমেরুদণ্ডী জীব দেখা দিলেও মেরুদণ্ডীর মধ্যে মাছ ও উভচর ব্যাঙ ও নিউট ছাড়া অন্য কোনো উচ্চবংশীয় জীব দেখা দেয় নি।

মহাযুগের প্রথমার্দ্ধে অর্থাৎ প্রথম তিন যুগে সমস্ত স্থলভাগ একেবারে প্রাণিশূন্য ছিল; একটা পোকামাকড়, বা শেওলা, বা ঘাস পর্য্যন্ত স্থলভাগে দেখা দেয় নি। ১৮ কোটী বছর ধরে ধরাবক্ষে প্রাণী কেবলমাত্র জলচর, সমুদ্রবাসী। একেবারে আদিম সেকেলে জীব গেঁড়ি শামুক, কাঁকড়া স্পঞ্জ, প্রবাল, জেলি মাছ এবং উদ্ভিদের মধ্যে জলশেওলা (Sea weeds)। এই প্রাণীরাই সমুদ্রের জলে তাদের অন্ধ মূক জীবন কোটী কোটী বছর ধরে বহন করে চলেছিল। প্রাণের যা কিছু বিকাশ, প্রাণীর যা কিছু জীবনলীলা সমস্তই ঘটেছিল দৃষ্টির অগম্য বরুণপুরীতে। স্থলভাগ একেবারেই নির্জীব নরুময় ধূ ধূ প্রান্তর! বাতাসে পক্ষীর পক্ষচালনা তো দূরের কথা, একটা তুচ্ছ কীট পতঙ্গেরও নাম নাই।

কিন্তু পরবর্ত্তী যে শেষার্দ্ধ তিন যুগ তাদের কাহিনী আলাদা। স্থলভাগে উদ্ভিদ ও জীব দুই-এরই আবির্ভাব হয়েছে। মেরুদণ্ডী জীব জল ছেড়ে স্থলে বাস করবার চেষ্টা করে উভচরবৃত্তি ধারণ করেছে। উদ্ভিদও জল-স্থল দুই-এর মাঝামাঝি স্থানে প্রাণধারণ করতে শিখেছে। একেবারে উঁচু শুষ্ক ভূমিতে এসে দাঁড়াতে এদের আরো কিছু কাল লেগেছিল।

প্রাণিরাজ্যের ক্রমবিকাশের অবস্থা ধ'রে মহাযুগকে তিন ভাগে ভাগ করাই সুবিধা। আদিভাগে (প্রথম দুই যুগে) সমস্ত প্রাণীই (জীব ও উদ্ভিদ) জলচর। জীব নিম্নবংশীয়, মেরুদণ্ডহীন; ক্রিঃড়িবংশীয় (crystacea) একপ্রকার ত্রিকুণ্ডলী জীব (trilobite) ঐ কালের আদর্শ (typical)। উদ্ভিদের মধ্যে জলশেওলা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরে মধ্যভাগে অর্থাৎ শীলুরীয় ও ডিভনীয় যুগে প্রাণিরাজ্যে এক ধাপ উন্নতি দেখা যায়। এক শ্রেণীর জীবে মেরুদণ্ড দেখা দিয়েছে; মাছ তার প্রধান দৃষ্টান্ত। ডিভনীয় যুগে নূতন জীবের সূত্রপাত হ'লেও মৎস্য এই কালের অবতার বা 'অধিপতি' জীব।

মহাযুগের অন্তভাগ কয়লাযুগ ও পারমীয় যুগ এই দুই নিয়ে; ঐকালে পূর্ব্ব দুই ভাগের জীবদের প্রাধান্য কমে আসে; নূতন জীবের অবতারণা হয়। উভচরবংশীয় এক শাখাবংশের জাতি হ'তে সরীসৃপ উৎপন্ন হয়। এই সরীসৃপই পরবর্ত্তী জীবমহাযুগে আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তার করে।

উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন মহাযুগের প্রথমার্দ্ধে সামুদ্রিক জলশেওলা ছাড়া আর কোনো গাছপালা দেখা দেয়নি। স্থলভাগ একেবারেই তরুলতা ও তৃণহীন ছিল। ডিভনীয় যুগ হ'তে স্থলচর উদ্ভিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ সমস্ত উদ্ভিদ্ ফার্ণ, অশ্বপুচ্ছ (Horse tail) ও লাঠি-শেওলা (Club-moss) এই তিন বংশীয়। উদ্ভিদ্রাজ্যে অপুষ্পক গাছপালা সপুষ্পক গাছপালা হ'তে আদিম ও হীন। অপুষ্পক গাছপালার মধ্যেও আবার উচ্চনীচ হিসাবে দুই শ্রেণীভেদ আছে। জলঘাস, জলশেওলা, ব্যাংছাতা এরা হ'ল নিম্নবংশীয়; এদের উপর হ'ল ফার্ণবংশীয় গাছপালা। ফার্ণ, অশ্বপুচ্ছ, লাঠিশেওলা—এই তিন বংশের গাছপালায় ফুল হয় না, সুতরাং বীজসাহায্যে এদের বংশবিস্তৃতি ঘটে না। এই বিশাল মহাযুগটা শুধু অপুষ্পক গাছপালারই যুগ। হীন শ্রেণীর অপুষ্পক গাছপালা প্রায় সবই জলজ ও জলবাসী, আর উন্নত শ্রেণীর অপুষ্পক গাছপালা মোটের উপর স্থলজ ও স্থলবিহারী। তা হ'লেও ডিভনীয় যুগে যখন স্থলজ উদ্ভিদ্ প্রথম দেখা দেয়, তখন তারা উভচর জীবের মত উভচর উদ্ভিদ্রূপে দেখা দেয় অর্থাৎ জলসংলগ্ন ভিজে স্যাঁৎসেঁতে স্থানেই প্রথম জন্মে। ক্রমে এই যুগের শেষ দিক হ'তে কয়লা যুগের সমস্ত কাল ধরে স্থলচর এই সব গাছ শুষ্ক উচ্চভূমি পূর্ণ ক'রে বিশাল ঘন অরণ্যের সৃষ্টি করে। এখনো এই আধুনিক যুগে পার্ব্বত্য স্থানে, ভিজা স্যাঁৎসেঁতে জলা বা বনভূমিতে বড় গাছের আওতায় এই সব ফার্ণ গাছ দেখা যায়। কিন্তু এ যুগের ফার্ণ কত ছোট ও নগণ্য! অথচ এরাই ছিল প্রাচীন মহাযুগের বৃক্ষরাজ! ফার্ণ, অশ্বপুচ্ছ ও লাঠিশেওলা তখন ছিল বিরাট আয়তনের,—আজকালকার তালগাছের মত দীর্ঘ দেহ ও মোটা গুঁড়ি নিয়ে তারা অরণ্যের অধিপতিত্ব করতো।

এ' সকল ফার্ণঅরণ্যই আধুনিক কালের কয়লাস্তরের মূল উপাদান। ভীমকায় বৃক্ষসমূহ মাটী চাপা পড়ে গিয়ে পুঞ্জীভূত স্তরের চাপে (মুক্ত স্থানে বাতাসে পচতে না পেরে) কয়লায় রূপান্তর লাভ করেছে। যে যে স্থানে বিশাল ফার্ণঅরণ্য ছিল, হাজার হাজার মাইল ব্যাপ্ত করে সেই স্থানগুলি আভ্যন্তরীণ ভূবিপ্লবে ধ্বসে গিয়ে বসে যায়; তার উপর পর পর যুগ ধরে পলিমাটী জমে স্তর গড়ে উঠেছে। এইরূপে যুগ যুগান্তর ধরে অসংখ্য বিশাল অরণ্যপাদপ শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে মাটীর তলায় কয়লায় পরিণত হয়েছে। প্রাচীন মহাযুগের শেষ যুগ পারমীয়। এই যুগের আদিভাগের ও অন্তভাগের ভূপ্রকৃতিতে বেশ একটু ভেদ আছে। দিনরাতের মধ্যে সায়ংসন্ধ্যা বা প্রাতঃসন্ধ্যা যেমন, পারমীয় যুগও প্রাচীন এবং মধ্য মহাযুগদ্বয়ের মধ্যে তেমনি সন্ধ্যাস্থানীয়। এরূপ যুগকে সন্ধ্যাযুগ বলাই ভাল। এই সন্ধ্যাযুগ মধ্য ও আধুনিক মহাযুগদ্বয় মধ্যে এবং আদিম ও প্রাচীন মহাযুগদ্বয় মধ্যেও দেখা দিয়েছিল।

আদি-পারমীয় কালের প্রাণীর চরিত্র ও স্তরপাথরের প্রকৃতি অঙ্গার বা কয়লা যুগেরই সমান। আর অন্ত-পারমীয় যুগে আগামী মধ্য-জীবমহাযুগের পূর্ব্বাভাস্ পাওয়া যায়। এজন্য এ দুই গর্ভযুগের নামের বিশেষণ পূর্ব্ব ও পরযুগের নামানুযায়ী হ'য়েছে।

কয়লা যুগের অন্তভাগ ও পারমীয় যুগের আদিভাগ জুড়ে যে এক প্রচণ্ড পাহাড়সৃষ্টিকারী বিপ্লব ঘটে, তারই শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্য জীবমহাযুগের সূত্রপাত হয়। (ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদের ত্রিধাতু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়

আমরা এখন বায়ু, পিত্ত ও কফ শরীরের কোথায় এবং কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং সাধারণ ধাতু-সাম্যক্রিয়ায় তাহাদের কি কার্য্য তাহা দেখিব। মানবদেহ কতকগুলি যন্ত্রের (organs) সমষ্টি। বিশেষ বিশেষ কার্য্যভেদে এই যন্ত্রসমূহকে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—রক্তমার্গ (circu'atory system), শ্বাসমার্গ (respiratory s.), স্নায়ুমার্গ (nervous s.), পাকমার্গ (digestive s.), ইত্যাদি। শরীরে নিয়ত যে ক্ষয় হইতেছে, একমাত্র খাদ্যের দ্বারাই স্বভাবতঃ তাহার পূরণ হয়। সেই হিসাবে পাকযন্ত্র সমস্ত যন্ত্র অপেক্ষা প্রধান। শরীরের যে মহাস্রোত (alimentary canal) মুখগহ্বর হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, উহারই মধ্যে প্রধানতঃ পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ এই মহাস্রোতকে মুখ্যতঃ তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

১। আমাশয় (stomach)

২। পক্কামাশয়-মধ্য বা গ্রহণী নাড়ী (duodenum)

৩। পক্কাশয় (small and large intestines)

এই তিনটী যথাক্রমে কফ, পিত্ত ও বায়ুর প্রধান স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে,—

"পক্কাশয়ঃ বাতস্য, পক্কামাশয়মধ্যং পিত্তস্য, আমাশয়ঃ শ্লেষ্মণঃ।" সু. সূ. অ. ২১

এই মহাস্রোতের অন্তপ্রাচীরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটী শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির (mucous membrane) আবরণ আছে, সুতরাং মহাস্রোতের সর্ব্বত্রই কফ বর্ত্তমান। কিন্তু মুখ ও আমাশয়ে উহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া আমাশয়কে কফের প্রধান স্থান বলা হয়।

এখন দেখা যাক, আমরা যে আহার করি তাহা কিরূপভাবে শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে এবং কিরূপভাবেই বা বিভিন্ন ধাতু ও অণুকোষের পুষ্টিসাধন করে। দুই হাজার বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে চরকমুনি বায়ু, পিত্ত ও কফের উৎপত্তি এবং শরীর-ধাতুর পুষ্টি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর; আধুনিক শরীর-বিজ্ঞানের (Physiology) মতের সহিত উহা বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইতেছে। চরক বলিতেছেন,—

"অন্নস্য ভুক্তমাত্রস্য ষড়্রসস্য প্রপাকতঃ।
মধুরাখ্যাৎ কফোভাবাৎ ফেনভাব উদীর্য্যতে॥
পরন্তু পচ্যমানস্য বিদগ্ধস্যাম্লভাবতঃ।
আমাশয়াচ্চ্যবমানস্য পিত্তমচ্ছমুদীর্য্যতে॥

পক্বাশয়স্ত প্রাপ্তস্য শোষ্যমানস্য বহ্নিনা।
পরিপিণ্ডিত পক্বস্য বায়ু স্যাৎ কটুভাবতঃ॥"

চ. চি. অ. ১৫

আমরা ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিব।

কফোৎসেক—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায় এই ষড়্‌রসবিশিষ্ট খাদ্য আমরা আহার করি। দন্ত দ্বারা খাদ্য চর্ব্বিত হইবার পর যখন উহা আমাশয়ে উপস্থিত হয়, তখন কফ নামক একটী দ্রব্য স্বতঃই ক্ষরিত হইয়া থাকে। এই কফ ফেনীভূত, অর্থাৎ ফেনা বা লালার ন্যায়। অন্ন চর্ব্বিত হইবার সময় লালাগ্রন্থি এবং শ্লৈষ্মিক গ্রন্থিসমূহ হইতে রস ক্ষরিত হইয়া অন্নের সহিত মিশ্রিত হয়। এই সমস্ত রস মধুর, সুতরাং ইহারা খাদ্যের মধুর রসকে আপ্যায়িত করিয়া ফেনভাব প্রাপ্ত হয়; ইহাই কফ। বেশ বুঝা যায় যে অন্ন কঠিন অবস্থায় না থাকিয়া যদি দ্রব বা অনতিদ্রব অবস্থায় থাকে, তবে উহা সহজেই কোন দ্রাবক পদার্থের দ্বারা পরিপক্ক হইতে পারে। আমাশয়জাত রসই (gastric juice) অন্নের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে তরলভাবাপন্ন (কাদার মত) করে। সুশ্রুত বলেন, "আহারের মাধুর্য্য, পিচ্ছিলত্ব ও প্রক্লেদিত্ব হেতু আমাশয়ে মধুর ও শীতল শ্লেষ্মা সম্ভূত হয়।" সু. সূ. অ. ২১

এই আমাশয়জাত রসই ক্লেদক কফ। ক্লেদক কফ ঔদকগুণভূয়িষ্ঠ, আর আমাশয়জাত রসেও শতকরা ৯৯·৫ ভাগ জল আছে। আমাশয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ক্লেদক কফ উৎপন্ন হইয়া অন্নের সহিত মিশ্রিত হয়। এই সংমিশ্রণ হইতে রসধাতুর (chyle) উৎপত্তি। পরে ইহা রক্তধাতুকে পোষণ করে। শরীরের সর্ব্বত্র রক্তবহ শিরা আছে, সুতরাং যে যে স্থানে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বর্ত্তমান, সেই সেই স্থানে রসধাতু রক্তের সহিত বাহিত হইয়া কফস্যন্দন জন্মায়। সুশ্রুতও বলেন,—

"স ক্লেদকঃ কফঃ তত্রস্থ এব স্বশক্ত্যা শেষাণাং শ্লেষ্মস্থানানাং শরীরস্য চ উদককর্ম্মণাঽনুগ্রহং করোতি।" সু. সূ. অ. ২১

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে আমাশয়ই কফের প্রধান স্থান; আমাশয়ে কফ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া পরে রক্তের সহিত বাহিত হইয়া শরীরের অপরাপর স্থানের কফকে পোষণ করে।

আবার চরক বলেন, "শ্লেষ্মজনিত রোগে সমুদয় চিকিৎসার মধ্যে বমন করানকেই বৈদ্যরা প্রধানতম চিকিৎসা বলিয়া স্বীকার করেন। বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ মাত্রেই আমাশয়ে প্রবেশ করিয়া, বিকারোৎপাদক শ্লেষ্মার মূলকে ধ্বংস করে। আমাশয়গত শ্লেষ্মা ছিন্নমূল হইলে শরীরান্তর্গত শ্লেষ্মবিকার আপনা আপনিই প্রশমিত হইয়া থাকে।" চ. সূ. অ. ২০

সুতরাং চরকের মত এই যে, কফজন্য ধাতুবৈষম্য দূর করিতে হইলে বমনকারক ভেষজ প্রয়োগ করা উচিত। তাহা হইলে আমাশয় খালি হইবে, সুতরাং তত্রস্থ শ্লেষ্মাও শরীর হইতে অপনীত হইবে; এবং আমাশয়স্থ শ্লেষ্মাই যখন শরীরের সমস্ত শ্লেষ্মার পোষক, তখন এই দুষ্ট শ্লেষ্মা দূরীভূত হইলে শরীরের অন্য সমস্ত দুষ্ট শ্লেষ্মারও নিরাকরণ হইবে। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আমাশয়গত এই ক্লেদক কফ শরীরের অন্যান্য কফদুষ্টির মূল কারণ। যদি এই ক্লেদক কফ পরিমিত মাত্রায়

উৎপন্ন হয় তাহা হইলে শরীরে কোন কফজ বিকার ঘটে না। কিন্তু বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ কোনও কারণে যদি এই ক্লেদক কফের বৃদ্ধি ঘটে, তবে সাধারণতঃ বমনক্রিয়ার দ্বারা উহা অপনয়ন করিতে হইবে।

যে মুহূর্ত্তে আহার জিহ্বাসংলগ্ন হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কফ স্বতঃ উদীরিত হয়। আধুনিক পরীক্ষার দ্বারাও ইহা মীমাংসিত হইয়াছে। যথাঃ—

"Pavloff কুকুরের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে,

(১) খাদ্য অধিক পরিমাণে দিলে ক্লেদক কফও (gastric juice) অধিক পরিমাণে ক্ষরিত হয়।

(২) পাকক্রিয়ার আরম্ভভাগেই এই বৃদ্ধি অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়।"* cf. "বয়োহোরাত্রিভুক্তানাং অন্তমধ্যাদিগঃ ক্রমাৎ।"

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পরিপাকের আদিভাগেই কফ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটু অন্নও অপরিপক্ক অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কফ উদীরিত হয়। মহাস্রোতের মধ্যে যখন অন্ন থাকে না, তখন পাচক রসও থাকে না; কিন্তু আহারের বা চর্ব্বণের ভান করিলেও এই রস নিঃসৃত হয়। এই রস যে জলবহুল, সুতরাং অন্নকে দ্রবীভূত এবং ক্লেদিত করে, তাহা নিম্নলিখিত উক্তিতে বুঝা যায়—

"কপট আহার দ্বারা দেখা যায় যে, আমাশয়জাত রস বহুল পরিমাণে নিঃসৃত হয়, ইহা আহারের ৫ মিনিট পরেই আরম্ভ হয়। যদি মাংসের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ বা জল খাওয়া যায় তবে ঐ রস নিঃসৃত হয় না।"

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যখন তরল দ্রব্য আহার করা যায় তখন ক্লেদন ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ক্লেদক কফেরও উৎপত্তি হয় না। উপরোক্ত বিচার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাশয়জাত রসই ক্লেদক কফ। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ 'উদীরয়তি', 'উদীর্য্যতে', 'ঈরয়েৎ' প্রভৃতি যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার বিশেষ অর্থ আছে। ভোজনমাত্রই বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের স্যন্দন হয়, তাঁহারা ইহাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আর আমরা ইহাও অনুমান করিতে পারি যে, তাঁহারা জীবিত প্রাণীর উপর বিশেষ পরীক্ষা দ্বারাই ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ক্লেদনক্রিয়া আমাশয়েই বিশেষভাবে হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা আহারের প্রথম হইতেই আরম্ভ হয়। পাচক রসের মধ্যে লালা সর্ব্বপ্রথম অন্নের সহিত মিশ্রিত হয়। এস্থলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, মহাস্রোতের মধ্যে পাকক্রিয়ার সাহায্যের জন্য যে সমস্ত রস ক্ষরিত হয় তাহাদের সকলকেই সামান্যতঃ পাচক রস বলা হয়। ক্লেদন অর্থাৎ আর্দ্রীকরণ দ্বারা অন্ন পরিপাকের সহায়তা করে বলিয়া লালাকেও পাচক রস বলিতে পারা যায়। লালা স্বচ্ছ এবং

* Halliburton.

পিচ্ছিল, আমাশয় জাত রস স্ফটিকবর্ণ এবং ইহাতে শতকরা ছুই ভাগ অম্লদ্রাবক আছে। লালা এবং অন্নের সহিত মিশ্রিত হইয়া শেষোক্ত রসের অম্লভাব অনেকটা নষ্ট হয়। লালা এবং আমাশয়জাত রসের মিশ্রণই ক্লেদক কফ। এই ক্লেদক কফ মহাস্রোতের উর্দ্ধভাগে উৎপন্ন হয় এবং আহারের প্রথম হইতেই অন্নের সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্নকে সমানভাবে ক্লেদিত এবং দ্রবীভূত করিয়া গ্রহণীনাড়ীস্থিত তীক্ষ্ণতর অম্ল (acid) দ্রব্যাদির পাচক শক্তির সহায়তা করে।

পিত্তোৎসেক—আমাশয় এবং গ্রহণীনাড়ীর মধ্যে একটী অর্গলবৎ ব্যবস্থা আছে (বা. শা. ৬) সুতরাং ঐ ক্লেদিত অন্ন একেবারে অধিক পরিমাণে আমাশয় হইতে বহির্গত হইতে পারে না, ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া উহা গ্রহণীনাড়ীতে চ্যুত হয়। এখন উহার পচ্যমান অবস্থা, কারণ যদিও গ্রহণীস্থ ক্লেদক কফে জলীয় ভাগ অধিক, তথাপি তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ অম্লদ্রাবক বর্ত্তমান থাকায় অন্নের পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং উহার মধুরভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া ঈষৎ অম্লভাব হয়।

গ্রহণীনাড়ীতে পূর্ব্বোক্ত ক্লেদিত অন্ন অপর একটী দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়, ইহাকে আয়ুর্ব্বেদে পাচক পিত্ত বলে। ক্লেদক কফের ন্যায় এই পাচক পিত্তও গ্রহণীতে অন্ন আসিলেই স্বতঃক্ষরিত হইতে থাকে। সেইজন্য চরক বলিয়াছেন,—

"পরন্তু চ্যবমানস্য বিদগ্ধস্যাম্লভাবতঃ।

আমাশয়াচ্চ্যবমানস্য পিত্তমচ্ছমুদীর্য্যতে ॥ চ. চি. ১৫॥

এস্থলেও 'উদীর্য্যতে' এই শব্দ প্রয়োগদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই দ্রব দ্রব্যও স্যন্দনবিশেষ। আমাশয় হইতে যখন অন্ন গ্রহণীনাড়ীতে চ্যুত হয় তখন উহা সেই অন্নের সহিত মিশ্রিত হয়। বাগভট্ তাঁহার উভয় গ্রন্থেই এই পিত্তের চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন, যথা অষ্টাঙ্গসংগ্রহ, (সূ. অ.২০),—

"তত্র যদামপক্কাশয়মধ্যস্থং পঞ্চমহাভূতাত্মকত্বেঽপি তেজোগুণোৎকর্ষাৎ ক্ষপিতসোমগুণঃ ততশ্চ ত্যক্তদ্রবস্বভাবং সহকারিকারণৈর্বায়ুক্লেদাদিভিরনুগৃহ্যাদ্ দহনপচনাদি ক্রিয়য়া লব্ধাগ্নিশব্দং পিত্তমন্নং পচতি, সারকিট্টৌ বিভজতি, শেষাণি চ পিত্তস্থানানি তত্রস্থমেবানুগৃহ্ণাতি তৎ পাচকমিত্যুচ্যতে।"

এখন পাচক পিত্তের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক।

(১) প্রথমতঃ, ইহা পঞ্চমহাভূতাত্মক, অর্থাৎ ইহা রসরক্তাদির ন্যায় একটী দ্রব্য, শক্তি বা সূক্ষ্ম পিত্ত নহে।

(২) দ্বিতীয়তঃ পক্ক-আমাশয়মধ্যস্থলে ইহার উৎপত্তি হয়; অর্থাৎ আমাশয় এবং পক্কাশয় এই উভয়ের মধ্যে মহাস্রোতের যে ক্ষুদ্র অংশ আছে, যাহাকে আধুনিক শারীরবিজ্ঞান শাস্ত্রে (duodenum) বলে, উহাই পাচক পিত্তের প্রধান স্থান।

(৩) তৃতীয়তঃ, পাচক পিত্ত দ্রব; কিন্তু তৈজস গুণের উৎকর্ষহেতু ইহার উত্তাপ জন্মাইবার শক্তি আছে। ফলে এই হয় যে ইহার সোমগুণ বা জলীয় ধর্ম্মের জন্য অপর বস্তুর উপর যে ক্রিয়া হওয়া উচিত, তাহা ক্ষপিত অর্থাৎ বিনাশিত হয় এবং সেইজন্য উহার দ্রবস্বভাব অর্থাৎ দ্রবদ্রব্যের সাধারণ ধর্ম্ম নষ্ট হয়। একটী উদাহরণের দ্বারা আমরা ইহা বুঝাইতেছি। একটী টিনের (বা অন্য ধাতুময়) পাত্রে কয়েক বিন্দু জল ফেলিলাম এবং একটু চিনিতেও জল দিলাম। টিনের

উপর জলের কোনও ক্রিয়া হইল না। আর চিনি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া দ্রবীভূত হইল। এস্থলে জল একটী দ্রব পদার্থ, শর্করার সহিত মিশ্রিত হইয়া উহা তাহাকে দ্রবীভূত করিয়াও নিজের দ্রবস্বভাব ত্যাগ করে না। এখন মনে করুন যে, ঐ জলের সহিত আমরা সামান্য একটু (২·৮ ভাগ) তীক্ষ্ণ অম্লদ্রাবক যোগ করিলাম। এই মিশ্রণপদার্থে দ্রবত্বগুণ থাকে, কিন্তু উহার স্বভাব পরিবর্ত্তন হয়। এখন উহা টিনের উপরে ফেলিলে টিনের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া হইবে এবং টিনের কিঞ্চিৎ অংশ দ্রবীভূত বা পরিপক্ক হইয়া অন্য পদার্থে পরিণত হইবে। সুতরাং এই মিশ্রণপদার্থের আকৃতি দ্রব থাকিলেও সে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম—দ্রবণক্রিয়া—ত্যাগ করিয়াছে। দ্রাবক সংযোগই এই স্বভাবপরিবর্ত্তনের হেতু, কারণ ঐজন্য উহার তেজোগুণোৎকর্ষ হওয়ায় পূর্ব্বের সোমগুণ (জলের স্বাভাবিক গুণ) বিনাশিত হয়।

(৪) চতুর্থতঃ, কেবলমাত্র সাদৃশ্য হেতুই পাচক পিত্তকে অগ্নি বলা হয়। যেমন চাউল ও জল একত্র করিয়া অগ্নির উপরে চড়াইলে উহা আহারোপযোগী অন্নে পরিণত হয়, সেইরূপ খাদ্য যখন আমাশয় হইতে গ্রহণীতে আসে তখন পাচক পিত্তের সংযোগে উহা শরীরোপযোগী রসধাতুতে পরিণত হয় এবং পরে এই রসধাতু হইতে রক্তাদি শরীরপোষক অন্যান্য ধাতু উৎপন্ন হয়। কিন্তু কেবল যে এই পাচক পিত্তই সমস্ত পচনক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহা নহে।

(ক) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্লেদক কফ আমাশয়ে অন্নের সহিত মিলিত হইয়া উহাকে ক্লেদিত করে, সুতরাং পাকক্রিয়ার ইহা একটী সহকারী কারণ।

(খ) আবার ঐ ক্লেদিত এবং পচ্যমান আহার যখন পক্কাশয়ে গমন করে, তখন রসবাহী নালীর (lacteals) দ্বারা রসশোষণ ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ফলে বাষ্পের উৎপত্তি ঘটে; ইহার মধ্যে অঙ্গারাম্ল বাষ্প প্রধান। আমরা পরে দেখাইব যে, স্নায়ুসমূহ অতি সহজে এই অঙ্গারাম্ল বাষ্পকে শোষণ করিতে পারে। ইহাতে স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হয় এবং তজ্জন্য পিত্তোৎসেকের বৃদ্ধি হয়। সুতরাং পচনক্রিয়ায় এই বাষ্প বা বায়ুকেও আমরা সহকারী কারণ বলিতে পারি। সেইজন্য বাগভট্ বলিতেছেন,—

"সহকারিকারণৈর্বায়ু ক্লেদাদিভিরনুগ্রহাদ্ দহনপচনাদি ক্রিয়য়া লব্ধাগ্নিশব্দম্।"

এইরূপে পাচক পিত্ত আহার পরিপাক করিয়া উহাকে ছুই ভাগে ভাগ করে—১ম, সারভাগ (রসধাতু), ২য়, কিট্ট। সেইজন্য বলা হয় যে পিত্ত "বিভজতে সারকিট্টৌ পৃথক্ তথা।"

(৫) পঞ্চমতঃ, পাচক পিত্ত অন্নের সহিত মিলিত হইয়া উহাকে রসধাতুতে পরিণত করে। পচনক্রিয়ার পর যে পিত্ত অবশিষ্ট থাকে তাহা রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের অন্যান্য পিত্তকে পোষণ করে,—"শেষাণাং পিত্তানাং বলদানেনানুগ্রহং করোতি।" আমাশয়জাত ক্লেদক কফ যেমন শরীরের অপরাপর সমস্ত কফকে পোষণ করে, গ্রহণীস্থ পাচক পিত্তও সেইরূপ অপরাপর পিত্তকে পোষণ করে।

গ্রহণীনাড়ীই যে পাচক পিত্তের স্থান এবং ইহা যে শরীরের অন্যান্য সমস্ত পিত্তোৎসেকের মূল কারণ তাহা নিম্নলিখিত চরকবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়,—

"বিরেচনকেই বৈদ্যেরা পিত্তরোগের প্রধানতম চিকিৎসা বলিয়া স্বীকার করেন। বিরেচক ঔষধ

প্রথমতঃ আমাশয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক বৈকারিক পিত্তমূলকে আকর্ষণ করতঃ নিঃসৃত করিয়া দেয়। আমাশয়গত পিত্ত নিবৃত্ত হইলে, শরীরান্তর্গত পিত্তবিকারসমূহ প্রশমতা লাভ করে। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে পর গৃহ যেমন আপনা আপনিই শীতল হয়, সেইরূপ আমাশয়গত পিত্তনাশে শরীরস্থ অপরাপর পিত্তবিকারসমূহ আপনা আপনিই নিবৃত্ত হইয়া থাকে।" চ. সূ. অ. ২০.

আমরা দেখিলাম যে, আয়ুর্ব্বেদমতে পিত্ত একটী দ্রব্যবিশেষ; অন্ন গ্রহণীনাড়ীতে উপস্থিত হইলে এই পিত্ত স্বতোনিঃসৃত হয়। এখন দেখা যাক যে, আধুনিক শারীরবিজ্ঞানমতে এই নিঃসৃত দ্রব্যটী কি?

নব্যবিজ্ঞান বলে যে, শরীরে দুইটী প্রকাণ্ড গ্রন্থি বা পিণ্ড আছে। তন্মধ্যে বৃহত্তম পিণ্ড যকৃৎ,—ইহা উদরগুহার দক্ষিণে অবস্থিত; অপর গ্রন্থি অগ্ন্যাশয় (pancreas) বামদিকে অবস্থিত। এই উভয় গ্রন্থি হইতে স্যন্দন জন্মে। "যকৃতের স্যন্দনকে পিত্তোৎসেক (bile) বলে। ইহা যকৃৎ হইতে গ্রহণীনাড়ীতে প্রবাহিত হয়। ইহা পক্বাশয়ে নিয়তই প্রবাহিত হয় বটে, কিন্তু গ্রহণীতে আহার উপস্থিত হইলে এই স্যন্দনের বৃদ্ধি হয় (উদীর্য্যতে)। পক্বাশয়ে অর্দ্ধপরিপক্ক অন্ন আসিবার পর কয়েক ঘণ্টা পরে আবার একবার ঐ স্যন্দনের বৃদ্ধি হয়। অনুমান করা যায় যে, আহারের পরিণাম রস (digestive products) রক্তের সহিত যকৃতে উপস্থিত হইয়া যকৃৎকোষগুলিকে (hepatic cells) উত্তেজিত করিবার ফলেই এই দ্বিতীয় উৎসেক ঘটে। এই অনুমানের আরও এক কারণ এই যে, প্রতিদবহুল (proteids) আহারের দ্বারা পিত্তোৎসেক বৃদ্ধি পায়; কিন্তু স্নেহবহুল (fatty) আহারের দ্বারা তাহা হয় না, কারণ স্নেহের শোষণ রসবাহী শিরার দ্বারা হয়, যাকৃৎশিরা (portal vein) দ্বারা হয় না। পিত্তোৎসেক একক অবস্থায় তাহাদের উপর কোনও ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না, অগ্ন্যুৎসেকের (pancreatic juice) সহিত মিশ্রিত হইয়াই উহা ক্রিয়াশীল হয়। প্রতিদ ও অঙ্গারোদকীয় পদার্থ পরিপাকে, বিশেষভাবে স্নেহপরিপাকে ইহা লক্ষিত হয়।" *

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পিত্তোৎসেক এবং অগ্ন্যুৎসেক উভয়ে গ্রহণীতে আসিয়া মিলিত হইয়া আহার পরিপাক করে; এই মিশ্রণ দ্রব্যই পাচক পিত্ত। আবার পিত্তোৎসেকের গুণ হালিবার্টন্ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"পিত্তোৎসেকনিহিত দুইটী প্রধান বর্ণকদ্রব্যের (pigments) তর-তম অনুসারে উহার বর্ণ পীত, হরিৎ বা পিঙ্গলাভ হয়। ইহার গন্ধ মৃগনাভির ন্যায় এবং স্বাদ কটু-মধুর।" আয়ুর্ব্বেদমতে পিত্তের বর্ণ 'শুক্লারুণবর্জ,; গন্ধ 'বিস্র'; রস 'কটুকাম্লৌ'। অবশ্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আয়ুর্ব্বেদের বর্ণনা প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের। সুতরাং আধুনিক বর্ণনার সহিত যে কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

* Halliburton.

আয়ুর্ব্বেদের পাচক পিত্তই যে পিত্তোৎসেক ও অগ্ন্যুৎসেকের মিশ্রণ ছাড়া অপর দ্রব্য নহে, তাহা প্রমাণ করিয়া এখন মহাস্রোতের শেষাংশে কি ব্যাপার ঘটে এবং কিরূপে বায়ুধাতুর পোষণ হয় তাহা দেখিব।

বায়ুধাতু—অন্ন প্রথমে ক্লেদক কফের (লালা+আমাশয়জাত রস) সহিত এবং পরে পাচক পিত্তের (পিত্তোৎসেক+অগ্ন্যুৎসেক) সহিত মিলিত হইয়া শেষে পক্বাশয়ে আসে। প্রধানতঃ ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিণামরস শোষিত হইয়া থাকে। গ্রহণীনাড়ীতে এই শোষণক্রিয়া আরম্ভ হয়; সুতরাং যখন পরিপক্ক অন্ন স্থূলান্ত্রে আসে, তখন বেশীর ভাগ পরিণামরস অন্তর্হিত হইয়াছে। অন্ত্রসমূহের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ হাত, ইহার ফলে অন্ন বহুক্ষণ ধরিয়া অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরের সংস্পর্শে থাকে; সুতরাং উহা হইতে রসধাতু সম্পূর্ণ পৃথকীভূত হইবার এবং রক্তবাহী ও রসবাহী শিরাসমূহ দ্বারা শোষিত হইবার যথেষ্ট সময় পায়। ক্লেদক কফ ও পাচক পিত্ত দ্বারা অন্ন দ্রবীভূত হয়, উহা হইতে জাত রসধাতু ঘন দ্রব পদার্থ। সুতরাং এই রসধাতু যতই শোষিত হইতে থাকে, অন্ত্রস্থিত দ্রব্যও ততই কঠিনতর হয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে এই শোষণ ক্রিয়া—রূপকের ভাষায়—অগ্নিদ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভিজা কাপড় রৌদ্রে রাখিলে শুকাইয়া যায়, কারণ সূর্য্যরশ্মি বস্ত্রস্থিত জলকে শোষণ করে। সেইরূপ রসধাতুর শোষণক্রিয়াও পিত্ত বা অগ্নিদ্বারা নিষ্পন্ন হয় বলা যায়। পাচক পিত্তই অন্নকে সার ও কিট্ট এইরূপ পৃথক্‌ভাবে বিভক্ত করে।

এইরূপে পচ্যমান অন্ন যখন অন্ত্রে উপস্থিত হয় এবং যখন রসধাতু শোষিত হইতে থাকে, তখন পাচকরসের সহিত ঐ অন্নের রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা অন্ন কটুভাব প্রাপ্ত হয়; এই কটুভাব হেতু বায়ুনামক দ্রব্যের উৎপত্তি হয়; যথা—

পক্বাশয়ন্তু প্রাপ্তস্য শোষ্যমানস্য বহ্নিনা।
পরিপিণ্ডিতপক্বস্য বায়ুঃ স্যাৎ কটুভাবতঃ॥ চ. চি. অ. ১৫

এখন দেখা যাক যে, পাচকরসসমূহ এবং অন্ত্রস্থ জীবাণুর সহিত অন্নের কিরূপভাবে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে।

হালিবার্টন্ বলেন, "অঙ্গারোদক একটী প্রধান খাদ্য, ইহা উদ্ভিজ্জ। ইহার মধ্যে শ্বেতসার (starch), দ্রাক্ষাশর্করা (glucose) এবং দুগ্ধশর্করা (milk-sugar) প্রধান। লালা এবং অগ্ন্যুৎসেকস্থিত স্যন্দনাগ্নি (enzyme) শ্বেতসারের সহিত সংযুক্ত হইয়া ঔদ্ভিদশর্করা (maltose) উৎপন্ন করে। এই শ্বেতসার ঔদ্ভিদ দ্রব্যে বহুল পরিমাণে থাকে। পক্বাশয়জাত রসস্থিত পরিবর্ত্তনকারী (inverting) স্যন্দনাগ্নি ঔদ্ভিদশর্করাকে দ্রাক্ষাশর্করাতে পরিণত করে। দ্রাক্ষাশর্করার একটী ধর্ম্ম এই যে, কিণ্বের (yeast) প্রভাবে উহা ethylalcohol বা সাধারণ সুরা ও অঙ্গারাম্লে পরিণত হয়; যথা

$C_6H_{12}O_6$	$= 2C_2H_6O$	$+ 2CO_2$
দ্রাক্ষাশর্করা	সাধারণ সুরা	অঙ্গারাম্ল

দ্রাক্ষাশর্করা বহুবিধ ফল ও মধুতে এবং অল্পপরিমাণে রক্তে এবং শরীরের অন্যান্য ধাতুতে পাওয়া যায়। দুগ্ধশর্করা (lactose) দুগ্ধে পাওয়া যায়। অস্থিত জীবাণু অঙ্গারোদকীয় দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া বেশীর ভাগ দুগ্ধাম্ল (lactic acid) উৎপন্ন করে। আবার পরে ইহা হইতে ক্ষীরাম্ল (butyric acid), আর্জ্জন ও অঙ্গারাম্ল উৎপন্ন হয়, যথা—

(১) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O = 4C_3H_6O_3$
Lactose — Lactic acid

(২) $4C_3H_6O_3 = 2C_4H_8O_2 + 4CO_2 + H_2O.$
দুগ্ধাম্ল — ক্ষীরাম্ল — অঙ্গারাম্ল

কাষ্ঠসার (cellulose) শ্বেতসারের সহিত মিশ্রিত থাকে; অন্ত্রে জীবাণুর সহিত মিলিত হইয়া উহা অঙ্গারাম্ল ও methane বাষ্পে পরিণত হয়। অন্ত্রসমূহে বায়ু জন্মাইবার ইহাই প্রধান কারণ। এমিনো-এসিডসমূহের সহিত জীবাণু মিলিত হইয়াও অঙ্গারাম্ল বায়ু উৎপন্ন করে।"

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বিভিন্ন ফেনন (ferment) এবং জীবাণুর দ্বারা পক্বাশয়ে অন্ন পরিপাকের সময় যে সকল বাষ্পের উৎপত্তি হয়, তাহার মধ্যে অঙ্গারাম্ল প্রধান। সেইজন্য শরীরের বিভিন্ন ধাতুর উপর এবং বিশেষভাবে স্নায়ুর উপর এই অঙ্গারাম্ল বাষ্পের কি কার্য্য আমরা এখন তাহাই দেখিব। পক্বাশয়স্থিত বাষ্পকে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অপান বায়ু বলে, যথা, সুশ্রুত,—"পক্বাধানা লয়োঽপানঃ।" পক্বাশয়ই বায়ুর প্রধান স্থান,—

"পক্বাশয়কটীসন্ধি শ্রোত্রাস্থিস্পর্শনেন্দ্রিয়ম্।
স্থানং বাতস্য তত্রাঽপি পক্বাধানং বিশেষতঃ॥"

সুতরাং আমাশয়স্থ ক্লেদক কফ এবং গ্রহণীস্থ পাচক পিত্তের ন্যায় যদি এই অঙ্গারাম্লবহুল-অপানবায়ুও পক্বাশয়ে উপযুক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পাকক্রিয়া (digestion) শোষণ ক্রিয়া (absorption) এবং অপনয়নক্রিয়া (excretion) ঠিক ভাবে ঘটিবে। কিন্তু যদি কোনও কারণে এই অপানবায়ু বেশী পরিমাণে জন্মে, তাহা হইলে শরীরের বায়ু বৃদ্ধি হইবে। এই বায়ুবৃদ্ধি দমনের জন্য চরক নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

"বায়ুরোগের যত প্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে অনুবাসন ও আস্থাপনকেই (পিচ্‌কারী) ভিষকেরা প্রধানতম বলিয়া মনে করেন। কারণ আস্থাপন ও অনুবাসন প্রথমেই পক্বাশয়ে প্রবেশ করতঃ বিকারোৎপাদক বায়ুর মূলদেশ উচ্ছেদ করে। পক্বাশয়গত বিকৃতবায়ু নষ্ট হইলে, অতঃপর শরীরাস্থগত সমস্ত ঋতুবিকার শান্ত হইয়া থাকে। বনস্পতির মূলদেশ ছিন্ন করিলে যেমন উহার স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা, কুসুম, ফল ও পত্রাদি আপনাআপনি নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ পক্বাশয়গত বিকৃতবায়ু ছিন্নমূল হইলে, শরীরাস্তর্গত অপরাপর স্থানের বায়ুবিকারসকল প্রশমিত হইয়া থাকে।" চ. সূ. অ. ২৫

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পক্বাশয়স্থ এই অপানবায়ুই (অঙ্গারাম্লবহুল) শরীরের অন্যান্য সমস্ত বায়ুর মূল।

শ্বাসক্রিয়ার প্রথমে বহির্বায়ু হইতে অক্ষজন গৃহীত হয় এবং শেষে অঙ্গারাম্ল বায়ু অপনীত হয়। এই দুই ক্রিয়ার মধ্যসময়ে শরীরের সর্ব্বত্র অণুকোষের শ্বাসক্রিয়া (tissue respiration) ঘটে। শ্বাসক্রিয়া হইলেই ঈষৎ অঙ্গারাম্ল উৎপন্ন হয়, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শরীরের সর্ব্বত্রই উহা অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। তবে পক্বাশয়ে উহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে বলিয়া পক্বাশয়কে শরীর বায়ুর প্রধান স্থান বলা হইয়াছে।

দেহের স্নায়ুসমূহের উপর এই অঙ্গারাম্ল বাষ্পের এক বিশেষ প্রভাব আছে। যদি ইহা স্বাভাবিক পরিমাণে জন্মে তাহা হইলে স্নায়বিক কার্য্যসমূহও যথাযথ সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু ইহা অধিক বা কম পরিমাণে উৎপন্ন হইলে স্নায়বিক কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে।

কতকগুলি পরীক্ষার দ্বারা ওয়ালার ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে "বেশী পরিমাণে অঙ্গারাম্লবাষ্প থাকিলে স্নায়ুসকল ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া শেষে একেবারে ক্রিয়ারহিত হইয়া যায়। আবার উহার পরিবর্ত্তে যদি অক্ষজন শরীরে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে স্নায়ুসকল আবার ক্রিয়াশীল হয়। অঙ্গারাম্ল খুব অল্প পরিমাণে শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইলে স্নায়ুসকল অধিকতর কার্য্যকারী হয়। স্নায়ুর উত্তেজিত অবস্থায় অঙ্গারাম্ল বাষ্পের উদ্ভব ঘটে। Bayer এবং Frolich ও দেখাইয়াছেন যে, সীমাস্থিত (peripheral) স্নায়ুসমূহে শ্বাসক্রিয়া হয়, তাহারা অক্ষজন গ্রহণ করিয়া অত্যল্প পরিমাণে (কিন্তু মাপযোগ্য) অঙ্গারাম্ল উৎপন্ন করে।" ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, শরীরের ভিতর বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে অঙ্গারাম্ল, অথবা অঙ্গারাম্ল ও অক্ষজন বাষ্পের মিশ্রণপদার্থই স্নায়ুর উপর কার্য্যকরী হয়। এই স্নায়ুমার্গ (nervous system) শরীরের অন্যান্য মার্গের কর্ত্তা এবং অনুশাসক (presides over, controls and regulates); সেইজন্য আয়ুর্ব্বেদে বায়ুকে 'স্বর্গঃ,' 'সর্ব্বতন্ত্রানাং বিধাতা', 'বায়ুরেব ভগবান্' প্রভৃতি বলা হইয়াছে। চক্রদত্ত গ্রন্থলে 'তন্ত্র' অর্থে কর্ম্ম বলিয়াছেন। সান্যাবস্থায় বায়ুর নিম্নলিখিত গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে,—

"দোষধাত্বগ্নিসমতাং সম্প্রাপ্তিং বিষয়েষু চ।
ক্রিয়ানামানুলোম্যঞ্চ করোত্যকুপিতোঽনিলঃ॥"

স্নায়বিক ক্রিয়ার দ্বারা দেহের বিবিধ স্পন্দন (কফোৎসেক, পিত্তোৎসেক প্রভৃতি) জন্মে এবং উহারা আহার পরিপাক করিয়া রস, রক্ত প্রভৃতি ধাতুর পুষ্টিসাধন করে। সুতরাং স্নায়ুমার্গই দোষ, অগ্নি এবং ধাতুর মধ্যে পরস্পরের সমতা রক্ষা করে। ইহার মধ্যে বোধন (sensory) স্নায়ুসমূহ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সাহায্যে মনের জ্ঞান জন্মায় (বিষয়েষু সংপ্রাপ্তিং) এবং চালক (motor) ও স্বয়ংশাসিত (autonomous) স্নায়ুসমূহ দেহের মলনিঃসরণ এবং উৎক্ষেপনাদি বিভিন্ন কর্ম্মকে নিয়োজিত করে।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, বায়ুর যে সমস্ত ক্রিয়ার বর্ণনা আছে, তাহা স্নায়ুমার্গের বা উহার কোন বিশেষ অংশের ক্রিয়া। বায়ুকে 'তন্ত্রযন্ত্রধর' বলা হইয়াছে; এখানে তন্ত্র অর্থে শরীরের কার্য্য। স্নায়ুমার্গ শরীরক্রিয়ার প্রযোজক। এই স্নায়ুমার্গের কার্য্য আবার শরীরের সর্ব্বত্র যথাবিহিত অঙ্গারাম্ল

বাষ্পের উৎপত্তির উপর নির্ভর করে। এই বায়ু 'প্রবর্ত্তকশ্চেষ্টানামুচ্চাবচানাং বিবিধানাং।' উহা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইলে স্নায়ুসকলকে অবসন্ন করিয়া তাহাদের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটায়। এই বায়ু 'নিয়ন্তা প্রণেতা চ মনসঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ানামুদ্যোতকঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়ানামভিবোঢ়া, প্রবর্ত্তকো বাচঃ, প্রকৃতিঃ স্পর্শশব্দয়োঃ' ইত্যাদি। (চ. সূ. অ. ১২)। এই সমস্ত ক্রিয়াই বোধক এবং চালক স্নায়ুর কার্য্য। ইহা আবার 'সমীরণোঽগ্নের্দোষসংশোষণঃ'; অগ্ন্যাশয়স্থিত স্নায়ুসকল যথন উত্তেজিত হয়, তথন অগ্ন্যুৎসেকের বৃদ্ধি হয় এবং স্নায়ুর কার্য্যের দ্বারা অগ্ন্যুৎসেকের ক্ষরণ নিয়মিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত বায়ুর প্রত্যেক কার্য্য স্নায়ুমার্গ হইতে উদ্ভূত।

এইরূপে আমরা দেখাইলাম যে, সাতটী ধাতু ও তিনটী মলের ন্যায় বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনটী দোষও প্রকৃত দ্রব্য পদার্থ। ইহারা প্রধানতঃ মহাস্রোতের মধ্যে উৎপন্ন হয়। কফ আমাশয়ে এবং পিত্ত গ্রহণীতে ক্ষরিত হয়, আর বায়ু পক্কাশয়ে উপজাত দ্রব্য (by-product) হিসাবে উৎপন্ন হয়। মহাস্রোতজাত এই বায়ু, পিত্ত, কফ রস-রক্তবাহী শিরাসমূহ দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র নীত হইয়া অপরাপর (সূক্ষ্ম বা স্থূল) বায়ু, পিত্ত ও কফের পুষ্টিসাধন করে। রক্তশিরাজাল (capillaries) হইতে নিঃসৃত লসীকা (lymph) শরীরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে ধাবিত হয়, সুতরাং বায়ু, পিত্ত, কফ অতি অল্প পরিমাণেও ঐ সমস্ত স্থানে উপনীত হয়। চরক বলিয়াছেন,—

"বায়ু, পিত্ত ও কফ সর্ব্বশরীরচর। ইহারা কুপিত ও অকুপিতভাবে শরীরের শুভাশুভ বিধান করে। ইহারা অকুপিত বা প্রকৃতিস্থ থাকিলে শরীরের পুষ্টি, বল, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়াদির প্রসাদ সংঘটন করে। ইহারা কুপিত বা বিকৃত হইলে শরীরে নানাপ্রকার রোগ ও অশুভ সংঘটন করায়।"

চ. সূ. অ. ২০.

এ স্থলে 'সর্ব্বশরীরচর' কথাটী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য; কারণ ইহা হইতে বুঝা যায় যে রস ও রক্তবহ স্রোতের সহিত ত্রিদোষও শরীরের সর্ব্বত্র চলিয়া বেড়ায়। এই কথাই নিম্নের শ্লোকে বলা হইয়াছে,—

"কুপিতানাং হি দোষাণাং শরীরে পরিধাবতাম্।
যত্র সঙ্গঃ স্ববৈগুণ্যাদ্ ব্যাধিস্তত্রোপজায়তে॥" সু. সূ. ২৪।

প্রত্যেক ধাতুর পরমাণুতে দোষের অংশ আছে। সুতরাং শিরাবাহিত দুষ্টদোষ যথন ধাতুর সংস্পর্শনে আসে, তথন তত্রস্থ দোষকে দূষিত করিয়া ধাতুকে দূষিত করে,—"এতাবত্যেব দুষ্টদোষ গতির্যাবৎ সংস্পর্শনাৎ শরীরধাতূণাম্।" (চ. শা. অ. ৬)। আবার যথন দোষসকল ধাতুদিগকে যথাবিহিত পোষণ করে, তথন শরীরও সুস্থ থাকে,—

"প্রকৃতিভূতানাস্তু খলু বাতাদীনাং ফলমারোগ্যং, তস্মাদেষাং প্রকৃতিভাবে প্রযয়িতব্যং বুদ্ধিমদ্ভিঃ।" (চ. শা. অ. ৬)

অন্যান্য কফের মধ্যে বোধক, তর্পক ও অবলম্বক যথাক্রমে জিহ্বা, নাসা ও ফুসফুসের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির স্যন্দন; 'শ্লেষক' কফ শরীরের সন্ধিসমূহস্থিত আবরণের (synovial membrane) স্যন্দন। রঞ্জক ও ভ্রাজক পিত্ত স্যন্দন, আর সাধক ও আলোচক পিত্ত সূক্ষ্ম। প্রাণবায়ু সাধারণ বায়ু, অথবা উহার অক্সিজেন অংশ; কারণ বহির্বায়ুর মধ্যে যে অক্সিজেন থাকে, তাহাই শরীর ধারণের উপযোগী। অপানবায়ু অঙ্গারাম্লবহুল এবং শরীরান্তর্গত অন্যান্য বায়ুতেও এই দুইটী বাষ্পের কমবেশী কিছু ভাগ বর্ত্তমান থাকে। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন। তবে ইহা সুনিশ্চিত যে বায়ু, পিত্ত ও কফ যথার্থ পদার্থ (matter), শক্তিবিশেষ নহে।

প্রসাদ ও মল ধাতু—আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ প্রসাদ ও মল ধাতুর কি ভেদ করিয়াছেন, আমরা এখন তাহাই দেখিব।

চরক বলেন যে আমরা প্রত্যহ যে খাদ্য গ্রহণ করি তাহা রস ও কিট্টে পরিণত হয়, যথা—

"চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি বিবিধপ্রকার হিতজনক অন্ন, স্ব স্ব উষ্মা ও জঠরাগ্নি সহযোগে সম্যক্ প্রকারে পরিপাক হইয়া, নিত্যগামী কালের ন্যায় নিরন্তর পরিণতিশীল ধাতুসমূহবিশিষ্ট এবং অব্যাহত ধাতুষ্মা, সর্ব্বশরীরগ ব্যান বায়ু ও স্রোতঃসমন্বিত সমস্ত শরীরের উপচয়, বল, বর্ণ, সুখ ও আয়ুর উপাদানভূত হয়। অন্ন দেহস্থিত ধাতুসমূহকে পোষণ করে এবং রসরক্তাদি ধাতুসমূহও পরস্পর পরস্পরের আহারভূত হইয়া স্বাস্থ্যের অনুগামী হয়।

আহারদ্রব্য হইতে প্রসাদনামক রস ও কিট্ট নামক মল জন্মিয়া থাকে। কিট্টাংশ হইতে মূত্র, স্বেদ, বিষ্ঠা, বায়ু, পিত্ত, কফ, এবং কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, মুখ, লোমকূপ, জননেন্দ্রিয় ও দন্তের মল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও নখাদি অবয়ব সমুদায়ও কিট্টাংশ হইতে পরিপুষ্ট হয়।"
চ. সূ. অ. ২৮

ইহা হইতে আমরা বুঝিতেছি যে, শরীরের বিভিন্ন স্যন্দন অন্নকে রস ও কিট্ট এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শরীরধারণের উপযোগী করে। রসই অন্নের প্রসাদ বা সার ভাগ। কিন্তু এখানে কিট্ট বলিতে যে অসার বা অপ্রয়োজনীয় কিছু, তাহা নহে। কারণ এই কিট্ট হইতে কেশ, নখাদি এবং বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতি অবয়বের পোষণ হয়। চক্রদত্তও বলেন, "পুরীষবাতাদয়োঽপি শরীরাবষ্টম্ভকাঃ প্রসাদ এব গুণকর্ত্তৃত্বাৎ।" আবার, "ত্রয়ো দোষাঃ ধাতবশ্চ পুরীষং মূত্র এব চ। দেহং সন্ধারয়ন্তে।" সুতরাং এখানে কিট্ট বলিতে উপজাত দ্রব্য বুঝিতে হইবে। এখন দেখিতে হইবে যে, এই কিট্ট দ্বারা যে বায়ু, পিত্ত ও কফের পোষণ হয় সেই ত্রিধাতু কি? অন্নকে রসে পরিণত করিবার জন্য যে কফোৎসেক ও পিত্তোৎসেকের উৎপত্তি হয়, এই কফ ও পিত্ত তাহা নহে। কারণ চরক বলিয়াছেন,—

"ভুক্ত আহারের কিট্ট ভাগ হইতে মল ও মূত্র; পরিপক্ক রসের মলভাগ হইতে কফ, রক্তের মলভাগ হইতে পিত্ত, মাংসের মলভাগ হইতে কর্ণাদিগত মল, মেদের কিট্ট ভাগ হইতে স্বেদ, অস্থির কিট্টাংশ হইতে কেশ ও লোম, এবং মজ্জার কিট্টাংশ হইতে চক্ষু ও ত্বকের মল উৎপন্ন হয়। আহারপরিণামজ ধাতুসমূহের সম্যক্ পাক হইতেই উক্তবিধ প্রসাদ ও কিট্ট ভাগ জন্মিয়া থাকে।" চ. চি. অ. ১৫

কিট্ট যে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নহে, তাহা নিম্নলিখিত চরকবাক্য হইতে বুঝা যায়,—

"স্বপ্রমাণাবস্থিত রস ও মল সমধাতুবিশিষ্ট দেহের ধাতুর সাম্যবিধান করে। কোন কারণ বশতঃ যদি শরীরের প্রসাদাখ্য ধাতুসমূহ ক্ষীণ বা বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে বর্দ্ধিত বা ক্ষীণ আহার-রস দ্বারা ধাতুসাম্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেহে ধাতুসাম্য বিহিত হইলেই আরোগ্যলাভ ঘটে। কিট্টভাগও এইরূপ মলপদার্থসকলের সমতা রক্ষা করে। কিট্টনামক মলভাগ স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, বমন-বিরেচনাদি দ্বারা নির্হরণ, অথবা শীতোষ্ণাদি বিপরীত চিকিৎসা দ্বারা অর্থাৎ শীতসমুত্থ মলে উষ্ণক্রিয়া এবং উষ্ণসমুত্থ মলে শীতক্রিয়া রূপ উপচর্য্যা করিলে দেহধাতুর সমতা সম্পন্ন হইয়া থাকে।" চ. সূ. অ. ২৮

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মলাখ্য কিট্ট দেহধারক, সুতরাং ইহাও ধাতুবিশেষ। যখন ইহা শরীরে পরিমিত মাত্রায় থাকে, তখন ধাতুসাম্যও থাকে; কিন্তু যখন ইহা 'স্বমানাতিরিক্ত' হয়, তখন শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যায়। সুতরাং বিশেষক্ষেত্রে মলও ধাতুসাম্যকর।

রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্তধাতুর উৎপত্তি ও পোষণের জন্য যে পাকক্রিয়া বা রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা হইতেই কিট্টনামক দ্রব্যের উৎপত্তি হয়।

প্রথম পাক,—অন্ন + বিবিধ পাচক রস = রসধাতু + মলমূত্র।

দ্বিতীয় পাকে রস হইতে রক্তধাতুর উৎপত্তি হয়। নব্যবিজ্ঞান বলেন যে পাচক-রস অন্ন হইতে রস উৎপন্ন করে, পক্বাশয়ে উহা পৃথক্কীভূত হইয়া রসবাহীস্রোতঃ-পয়ঃস্বিনীসমূহের (lacteals) দ্বারা শোষিত হয়। এইরূপে সঞ্চিত হইয়া সেই রসধাতু বক্ষস্থিত রস নলিকায় (thoracic duct) উপস্থিত হইয়া পরে হৃদয়ের নিকটে একটী বড় শিরায় সংযুক্ত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। অতঃপর উহা রক্তের সহিত ফুস্ফুসে উপস্থিত হইয়া অক্সজনের সহিত মিলিত হইয়া রক্তে পরিণত হয়। এই সময়ে ফুস্ফুসের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির অন্তর্নিহিত গ্রন্থিসমূহ হইতে একটা স্যন্দন ক্ষরিত হয়। ইহা ফুস্ফুসের বিভিন্ন অংশকে স্নেহযুক্ত করিয়া উহার ক্ষয় নিবারণ করে। অতএব এই স্যন্দন কফবিশেষ, ইহা দ্বিতীয় পাকক্রিয়া হইতে জাত। আমরা দেখিতে পাই যে, আহারের পর মুখ ধুইবার সময় কতকটা কফ বাহির হইয়া যায়। ইহা উপরোক্ত স্বমানাতিরিক্ত কফস্যন্দন, স্বমানাতিরিক্ত সুতরাং উৎসর্জ্জনীয়। খাদ্য আমাশয়ে উপস্থিত হইলে স্যন্দনোৎপাদক গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়া হওয়া প্রয়োজন, সেই হেতু ঐ সকল গ্রন্থিতে অধিক রক্ত সঞ্চারিত হয়। এই কারণে আহারের সময় হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দ্রুত হয়, সুতরাং ফুস্ফুসেও অবিশুদ্ধ রক্তের অধিকতর সঞ্চারণ হয়। এইজন্য অধিক অক্সজন বায়ুর প্রয়োজন হয়, ফলে ফুস্ফুসের কার্য্য দ্রুততর হওয়ায় সেই সময় ফুস্ফুস হইতে কফস্যন্দন অধিক হয় বলিয়া উহা তখন স্বমানাতিরিক্ত এবং পরে মুখ দিয়া পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উরস্থ কফ একটী উপজাত দ্রব্য। অবিশুদ্ধ রক্তের (venous blood) সহিত মিশ্রিত রসধাতু যখন রক্তধাতুতে পরিণত হয়, তখন ঐ কফের উৎপত্তি ঘটে। যখন এই মলকফ পরিমিত মাত্রায় থাকে, তখন উহা শরীরধারণে সাহায্য করে, কিন্তু স্বমানাতিরিক্ত হইলেই উহা শরীর হইতে বহিষ্কৃত হয়।

রস হইতে রক্ত হইবার সময় রসের শুক্লবর্ণ হইতে রক্তের লোহিতবর্ণে যে পরিণতি, তাহা

একদিনে ঘটে না, ক্রমে ক্রমে হয়। হারীত এই বর্ণের ক্রমবিকাশ সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন,—

"রসঃ সপ্তাহাদর্দ্ধাক পরিবর্ত্তমানঃ শ্বেতকপোত-হরিত-হারিদ্র-পদ্ম-কিংশুকালক্তরসপ্রখ্যশ্চায়ং যথাক্রমং দিবসপরিবর্ত্তাদ্বর্ণপরিবর্ত্তমানঃ পিত্তোষ্মোপরাগাচ্ছোণিতত্বমাপদ্যতে।"

তৃতীয় পাকে রক্ত হইতে মাংসধাতুর উৎপত্তি হয়। "রক্তস্রোতের এক অংশ অন্ত্রাদি যন্ত্রস্থিত কৈশিক শিরাজলে সঞ্চারিত হয় এবং পরে পুনর্ব্বার একীভূত হইয়া হৃদয়ে পৌঁছাইবার পূর্ব্বে আর একবার যকৃতে উপস্থিত হয়। যকৃদ্গত এই গৌণ রক্তস্রোতকে যাকৃত রক্তসংবহন (portal circulation) বলা হয়।" "এইরূপে দুইটী ভিন্ন স্রোতদ্বারা যকৃতে রক্ত প্রবেশ করে, —১ম, যাকৃত শিরা (portal vein) হইতে, ২য় অভিযাকৃত ধমনী (hepatic artery) হইতে। পরে অভিযাকৃত শিরা (hepatic vein) দ্বারা রক্ত যকৃৎ হইতে অধরা মহাশিরায় (inferior Nenacava) উপনীত হয়। যকৃতের স্যন্দন পিত্ত; উহা যাকৃতী পিত্তনলিকা (Hepatic duct) দ্বারা গ্রহণীতে ক্ষরিত হয়, কিংবা যখন পাকক্রিয়ার প্রয়োজন থাকে না, তখন পিত্তকোষ নলিকা (cystic duct) দ্বারা পিত্তাশয়ে (gall bladder) উপস্থিত হইয়া সঞ্চিত হয়।" *

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রক্ত হইতে মাংস উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে উহাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মল করিবার জন্য যকৃতের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এই তৃতীয় পাকে রক্ত হইতে মলাখ্য পিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিত্তাশয়ে সঞ্চিত এই যে পিত্ত, ইহাই রঞ্জকপিত্ত। (পিত্তোৎসেক ও অম্ল্যুৎসেকের মিশ্রণ পদার্থ পাচক পিত্ত)। ইহাকে রঞ্জক বলা হয়, কারণ "যখন পিত্ত নলিকা (bile duct) বদ্ধ হইয়া যায়, তখন পিত্তোৎসেক গ্রহণীতে যাইতে পায় না। বাধা প্রাপ্ত হইয়া সেই পিত্ত লসীকায় অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং রক্তস্রোতে মিলিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া থাকে। তখন ত্বক্ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিসমূহ হরিদ্রাবর্ণ এবং মূত্রও হরিদ্রা বা রক্তবর্ণ হয়।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পিত্তাশয়ে সঞ্চিত পূর্ব্বোক্ত পিত্তই রক্তের বর্ণের হেতু, সেইজন্য উহাকে রঞ্জকপিত্ত বলে। যথা—

"রঞ্জিতাস্তেজসা ত্বাপঃ শরীরস্থেন দেহিনাম্।
অব্যাপন্নাঃ প্রসন্নেন রক্তমিত্যভিধীয়তে॥"

সু. সূ. অ. ১৪

তথা—

"যত্তু যকৃৎপ্লীহ্নোঃ পিত্তং তস্মিন্ রঞ্জকোঽগ্নিরিতি সংজ্ঞা। স রসস্য রাগকৃদুক্তঃ।"

সু. সূ. অ. ২১

প্লীহার সহিতও যে রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা নব্যবিজ্ঞান স্বীকার করে। যথা হ্যালিবার্টন বলেন,—"অন্যান্য কার্য্য ভিন্ন যাকৃৎ রক্তসংবহনেও প্লীহার বিশিষ্ট ক্রিয়া আছে।"

---

* জব্বলপুরের কবিরাজ শ্রীত্রিকাজী বিনায়ক ডেখেকর, এম্-এ, এম্-এস্-সি, এল্-এল্-বি, মহাশয়ের ইংরাজি প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

আমরা নিম্নে ধাতুর পাকক্রিয়া দেখাইতেছি—

(১) অন্ন + বিবিধ পাচক রস

= রসধাতু + মলমূত্র

(২) রসধাতু + অস্ফজন বায়ু + রঞ্জকপিত্ত

= রক্তধাতু + উরস্থ কফ (মলাখ্য)

(৩) রক্তধাতু + বায়ু ও জলের তেজ

= মাংসধাতু + মলাখ্য পিত্ত

(৪) মাংসধাতু + নিজ তেজ ও অম্বুগুণ

= মেদ ধাতু + কর্ণাক্ষিনাসাদিমল

(৫) মেদ ধাতু + পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য উষ্মা

= অস্থিধাতু + স্বেদ

(৬) অস্থিধাতু + উষ্মা

= মজ্জা ধাতু + কেশ, নখ

(৭) মজ্জাধাতু + উষ্মা

= শুক্রধাতু + অক্ষিবিট্

শুক্রের কোনও মল নাই, তাহা হইতে গর্ভের উৎপত্তি এবং ওজোধাতুর পুষ্টি হয়। রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে গেলে তাপের প্রয়োজন। প্রত্যেক ধাতুস্থিত ধাত্বগ্নিই উপরোক্ত প্রক্রিয়াসমূহের তাপের হেতু।

ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বিভিন্ন পাকক্রিয়া হইতে জাত যে মলাখ্য ধাতু তাহা মহাস্রোতে ক্ষরিত ধাতু হইতে ভিন্ন। এই মলাখ্য ধাতুসমূহ সাধারণতঃ অপ্রয়োজনীয় বা পরিত্যাজ্য নহে; কেবল স্বমানাতিরিক্ত হইলে উহারা শরীর হইতে বহিষ্কৃত হয়।

মল—এই 'মল' শব্দ আয়ুর্ব্বেদে অন্য এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মল সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখ। যথা—

"শরীর ধাতুসমূহ সংক্ষেপতঃ দুই প্রকার, মলভূত ও প্রসাদভূত। তন্মধ্যে যে সকল ধাতু শরীরের বাধাজনক তাহারাই মলভূত, যেমন শরীরছিদ্রজাত মলসমূহ। ইহারা পৃথক্‌ভাবে জন্মে এবং বহির্গমনে উদ্যুখ। পরিপক্ক ধাতু ও প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা এবং শরীরস্থ অন্যান্য যে সকল পদার্থ শরীরের হানিকর তাহারাও মল নামে অভিহিত হয়। ইহা ভিন্ন অপর সমুদায় ধাতু প্রসাদভূত।"

চ. শা. অ. ৬

এখানে মলভূত অর্থে এই বুঝায় যে যখন কোন ধাতু একটী বিশিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে শরীর হইতে অপনীত করিবার প্রয়োজন ঘটে। এই মলশব্দে শরীরের যে কোনও অসার এবং অপ্রয়োজনীয় বিষকারক দ্রব্য বুঝায়, তাহা বিশিষ্ট অবস্থাপ্রাপ্ত দোষ, ধাতু বা মল হইতে পারে। যথা—

দোষ—প্রকুপিত বাতপিত্তশ্লেষ্মা

ধাতু—পরিপক্ক ধাতুসমূহ

মল—শরীরছিদ্রের উপলেপকর, পৃথক্‌জন্মী, বহির্ম্মুখ মল।

এমন কি শরীরে প্রবিষ্ট শল্যকেও সামান্যতঃ মল বলা যাইতে পারে, কারণ উহা শরীরের বিষ্কর।

সুতরাং, (১) **মলভূত** ধাতু বলিতে উৎসর্জ্জনীয় দ্রব্য এবং (২) **মলাখ্য** ধাতু বলিতে উপজাত দ্রব্য বুঝায়; স্বমানাতিরিক্ত হইলে এই মলাখ্য ধাতু মলভূত ধাতুতে পরিণত হয়; (৩) **মলধাতু** বলিতে মূত্র, শুক্র এবং স্বেদাদি ধাতু বুঝায়,—অবশ্য যতক্ষণ তাহারা শরীর ধারণ ও পোষণের উপযোগী থাকে।

আমরা সংক্ষেপে ত্রিধাতুর স্বরূপনির্ণয় করিবার চেষ্টা করিলাম। এই প্রবন্ধে আমরা দোষ, ধাতু ও মল এই তিনের মধ্যে পরস্পর প্রভেদ কি, তাহা বর্ণনা করিবার এবং ত্রিদোষ যে প্রকৃতই শারীর দ্রব্য তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এ বিষয়ে আরও গবেষণা এবং অনুসন্ধান প্রয়োজন। আশা করি, দেশের বৈদ্যমণ্ডলী প্রাচীন ঋষিদিগের পন্থা অনুসরণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ সময়ও ব্যয় করিবেন।

বাংলার মৎস্যগুলির বৈজ্ঞানিক নাম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ

খইঙ্গা (পুরী)—Mugil cephalus Linn.

খইয়া (চাটিগাঁ পাহাড়)—খলিশা।

খগুন (চাটিগাঁ)—কানমাগুর।

খট (জলপাইগুড়ি)—ঘিলাচাঁদা।

খড়িকা (১) (পূর্ব্ববঙ্গ, পূর্ণিয়া) Nemacheilus corica (H B.); (২) সোনাখড়িকা। (৩) Ichthyocampus carce (H B.). কুমির খড়িকা—খড়িকা (৩)।

সবন খড়িকা (বাংলা)—Nemacheilus savona (H B.).

সুবর্ণ খড়িকা, সোনাখড়িকা—Corica soborna (H B.)

খড়িকাজিরা (আসাম)—কাঁকিলা (ছোট আকারের)।

খড়িঙ্গা (পুরী)—Caranx carangus (Bloch).

খড়িয়া (বাংলা)—সুবর্ণ খড়িকা।

খড়্‌কি—(১) কুমির খড়িকা;

(২) (দিনাজপুর) খড়্‌কি বাটা;

(৩) খড়িকা (১)।

খড়্‌গমৎস্য—কাটারিয়া (খাণ্ডা)।

খড়্‌গিয়া—খড়্‌গমৎস্য।

খমই (ভোলাহাট)—চাঁড়ারমারা।

* Halliburton.

খয়রা (১) (রংপুর, পাটনা) Clupea chapra (H B.); (২) (কলিকাতা, গোয়ালপড়া) Chatoeseus cortius manmina (Cortius H B.); (৩) (পুরী) Opisthopterus tartoor Gill.

গাংখয়রা (কলিকাতা)—Chatoessus manmina (H B.).

বড় খয়রা (মহানন্দ নদী)—খয়রা (১)

লাল খয়রা—Clupea lile (Cuv. and Val.).

খরা (পূর্ণিয়া)—খস্‌খসিয়া।

খরকুল্লো—খরশূলা।

খর্‌রা (চম্পারণ)—খস্‌খসিয়া।

খরশূলা (১) (বাংলা)—Liza corsula (H. B.); (২) বাটা।

খরসান (মুর্শিদাবাদ)—আংরা।

খলসশ হিন্দি)—খলিশা।

খলা (ঢাকা)—খরশূলা (১)।

খলিশ—খলিশা।

খলিশা—(দিনাজপুর, রংপুর) Trichogaster fasciatus (colisa HB.)।

কাল খলিসা—Trichogaster chuna sota (H B.).

চুনা খলিসা—Trichogaster chuna (H. B).

পাটাখলিশা—কাল খলিশা।

বড় খলিশা—খলিশা।

বেজি খলিশা (রংপুর)—Trichogaster fasciatus (bejeus H B.)

লাল খলিশা (রংপুর)—Trichogaster lalius (H B.).

সাদা খলিশা। (রংপুর)—চুণা খলিশা।

খলেশ, খলেশয়—খলিশা।

খল্লা (নোয়াখালি)—খরশূলা।

খল্লিশ—খলিশা।

খল্‌শে—(১) খলিশা;
(২) চুণা খলিশা।

খশেট—খলিশা।

খস্‌খসিয়া (রংপুর, দিনাজপুর)—Mugil cascasia H P.).

থাংরি (কুশীনদী)—শরণ পুঁটী।

থাথাইয়া (আসাম)—খস্‌খসিয়া।

থাকই—কই।

থাগুন (চাটিগাঁ)—কানমাগুর।

থাজি—Clupanodon cagius H B.

থাণ্ডা (১) (উড়িষ্যা) Pristis perrotteti Muell. and Henle; (২) (পুরী) থাণ্ডাবালা।

থাণ্ডাবালা (পুরী)—কাটারিয়া।

থাণ্ডানাগর (উড়িষ্যা)—Pristis cuspidatus Latham.

থাপ্পা (পুরী)—Tetrodon oblongus (Bloch)।

থাবলাং (খাসিয়াপাহাড়)—ফলুই।

থাবাগ (মণিপুর)—(১) আংরা;
(২) পাঙ্গুসিয়া।

থামাই (ভোলাহাট)—রামটেংরা।

থামুকুল (খাসিয়াপাহাড়)—মাগুর।

থারিউ (খাসিয়া পাহাড়)—রুই।

থারোই (নাগাপাহাড়)—Monopterus albus (Zuiew.)।

থার্‌সা (পূর্ব্ববাংলা) আংরা।

থার্‌সান—আংরা।

থাশা লিনাই (খাসিয়াপাহাড়)—শফরীপুঁটী।

থাসমিরা (বালেশ্বর)—Lutianus bengalensis (Farsk).

থায়েস্কি (খাসিয়াপাহাড়)—শিঙ্গী।

থিস্‌রা (ভাগলপুর)—সাদা খলিশা।

থুক্‌সি—বরিলা।

থুদি (পূর্ণিয়া)—কাঞ্চন পুঁটী।

ছোট্‌কা থুদি (পূর্ণিয়া) কুটুনি পুঁটী।

থুদে (পূর্ণিয়া)—ভিলিপুঁটী।

থুর মাছ (চাটিগাঁ)—Pristis pectinatus (H B.).

থুর্‌নে—থুরস্তি।

থুরস্তি (পুরী)—Pagrus spinifer Forsk.

কাল থুরস্তি- Crenidens indicus Day.

থুস্‌কি (ভাগলপুর)—জায়া।

খেশ্‌রা (পূর্ণিয়া)—লাল খলিশা।

বড় খেশরা (পাটনা)—খলিশা।

খোইঙ্গা—আঁশভাঙ্গন।

খোইবেল—Cromileptes altivelis (Cuv. and Val.).

খোক্‌সা (মহানদী)—Barilius bendelisis cocsa (H B.).

খোক্‌সি (মহানন্দা)—বরিলা।

খোস্তা (মহানন্দা)—Erethistes conta (H B).

খোলিহানা—খলিশা।

গঁত্তি—গোঁতি।

গগইর (রাজসাহী)—গাগর।

গগরা (গয়া)—গাগর।

গঙ্গাজলি (পূর্ণিয়া)—ভেচোকো।

গঙ্গাতুরি, গঙ্গাতুরা (উড়িষ্যা)—Hemirhamphus limbatus Cuv. and Val. এবং Hemirhamphus cantori Bleeker.

গচি (পূর্ণিয়া, কুশিনদী)—পাঁকাল।

ছোট গচি (ভোলাহাট)—পাঁকাল।

তোড়া গচি—পাঁকাল।

পাতল গচি (পূর্ণিয়া)—Rhynchobdella aculeata (Bloch).

গছি (পূর্ণিয়া)—পাঁকাল।

গজর (মুঙ্গের)—শউল।

গজলি (নাথপুর)—শাল।

গজাড় (ত্রিপুরা)—শাল।

গজ্জাল (দিনাজপুর, রংপুর, লক্ষ্মীপুর)—শাল।

গড়—(১) গড়ই মাছের বাচ্ছা।
(২) লাম্‌টা।

গড়ই (পাটনা, মুঙ্গের, দিনাজপুর)—Ophiocephalus punctatus (Bloch).

গড়ক—গড়ই।

গড়া—লাম্‌টা।

গড়াই (চম্পারণ)—গড়ই।

গড়ালি (জলপাইগুড়ি)—গড়ই।

গড়ুই (রংপুর)—গড়ই।

গতি (মালদহ)—গোতি।

গদ্‌গদি (আসাম)—নাদোষ।

গদাই, গধাই (উড়িষ্যা)—স্বুবর্ণখড়িকা।

গণি (নোয়াখালি)—গড়ই।

গবাচি—পাঁকাল।

গবতা (মুঙ্গের)—চেচরা।

গরই, কারতুয়া গরই—গড়ই।

গরক—গড়ই।

গরয়, গরয়ী—গড়ঁই।

গর্গর—গাগরা (Arius gagora H B.).

লঘুগর্গ—ছোট গাগরা টেংরা (Gagata cenia H. B.)

গর্গাট—গাগট।

গর্চা—গর্গর।
গর্জ্জক—শাল।
গর্দা (ভাগলপুর)—খিলাচাঁদা।
গল—লাম্‌টা।
গলক—গড়ই।
গলপুরি (রংপুর)—ভেদা (Badis badis H B.).
গলফুলান—কট্‌কটিয়া।
গলগলে—কট্‌কটিয়া।
গলসা, টেংরা (জলপাইগুড়ি, ঢাকা)—Macrones vittatus (Bloch).
গসিপোবা—নাদোষ।
গলহি—চিতল।
গাং (ঢাকা)—গাঙ্গীন।
গাংলা (ঢাকা)—গঙ্গাতুরি।
গাগট (১) (পূর্ব্ববঙ্গ, চাটিগাঁ)—Arius gagora (H B.).
(২) দিনাজপুর—Gagata cenia (H B.)
গাগর—(১) (উত্তরবঙ্গ, দিনাজপুর)—Arius gagora (H. B.).
(২) (পূর্ণিয়া)—Mucrones carsula (H B.).
(৩) (গোয়ালপাড়া)—G igata cenia Corsula (H B.).
গাগরা—Arius gagora (H B.)
আড়ি গাগরা—Arius arius (H B.)
জাতি গাগরা—Arius jatius (H B.)
তেলগাগরা (মহানন্দা নদী)—Mucrones (H B.)
নল গাগরা—Arius sagar (H B.)
নেঙ্গা গাগরা—Arius nenga (H B.)
রাঙ্গা গাগরা—সোন গাগরা।
সোনা গাগরা—Arius sona (H B.)
গাঙ্গীন—Batrachus gangene (H B.)
গাঙ্গেয়—ইলিশ।
গাছুয়া—চেঙ্‌।
গাজা (নোয়াখালি)—গজাল।
গাটু—কুটুনি (Nemacheilus guttatus (Mc. Clell.).
গাচান (পূর্ণিয়া)—চাগুনি পুঁটী।
গার্দ্দা (চম্পারণ)—খিলাচাঁদা।
গিছুয়া (লক্ষ্মীপুর)—চেঙ্‌।
গিদি কেওলি (উড়িষ্যা)—শরণ পুঁটী।
গিলন্দ (বাংলা)—বরিলা।
গুঁচ (মুঙ্গের)—বাঘ আড়।
গুঁটা (বাংলা)—খিলাচাঁদা।
গুঁটিয়া (উড়িষ্যা)—কাবাসি টেংরা।
গুঁদা (উড়িষ্যা)—খিলাচাঁদা।
গুঁদে (সিরাজগঞ্জ)—ইলিশমাছের মত।
গুঁড়ি, বড় (উড়িষ্যা)—Rhynchobdella aculeata (Bloch) (তারাবান)।
গুঁতিয়া—গুঁতে (১)।
গুঁতে—(১) Lepidocephalichthys guntea (H B.).
(২) Botia dario (H.B.) (দাঁড়ি)।
গুঁপো—পুকুরের মাছ; ১½ হইতে ২ হাত; সাদা।
গুঁয়ারি—Pseudeutropius goongwaree (Sykes).
গুগনি (বাংলা)—Barbus gugunio (H.B.).
গুঘতি (চম্পারণ)—কালি পাবদা।
গুচর (দিনাজপুর, বিহার)—গুয়াচেরা; তেলচিটা—Glyptothorax telchitta (H B.).

গুচা (মুর্শিদাবাদ)—পাঁকাল।
গুজিকর্ম্মা (উড়িষ্যা)—Sillago sihama Forsk.
গুটা (পূর্ণিয়া)—খিলাচাঁদা।
গুটেলা (বিহার)—কুরা বাটা।
গুঠা (বাংলা)—নাদোষ।
গুড়গুড়ী, গুড়গুড়ে—বেলে গুড়গুড়ি।
গুড়ুয়া (উড়িষ্যা)—খয়রা (১)
গুতম (নোয়াখালি)—গুতমবালিয়া।
গুতিয়া, গুতে (সুন্দরবন)—গুঁতিয়া।
গুথালি আংরা (পূর্ণিয়া)—কালি টেংরা।
গুদর (মুঙ্গের)—লাম্‌টা।
গুয়া চেরা—তেলচিটা।
গুনু (উড়িষ্যা)—কাটকই।
গুয়াচোপি (পুরী)—নামচাঁদা।
গুরোমি (উড়িষ্যা)—Osphromanus olfax Commerson.
গুর্জাওলি—তেড়েভাঙ্গন।
গুর্দা (বিহার)—খিলাচাঁদা।
গুল্‌দিয়া (চাটিগাঁ)—Glyptosternum striata (Mc.Clell.).
গুলা (বিহার)—বেলে গুড়গুড়ি।
বালি গুলা (উড়িষ্যা)—বেলে গুড়গুড়ি।
গুলিয়া (চাটিগাঁ)—বেলে।
গুলে—কুলি বেলে।
গুল্লা (পূর্ণিয়া)—বেলে গুড়গুড়ি।
গুস্তা (গয়া)—মহাশউল।
গেঁতো (রংপুর)—গেতো।
গেওয়া (শাহারণপুর)—Labeo diplostomus Heck.
গেতো (রংপুর)—Botia geto (H. B.).
গৈঁচি (ভাগলপুর)—পাঁকাল।
পাত গৈঁচি (ভাগলপুর)—তারাবান।
গৈচা—পাঁকাল।
গৈচি (চম্পারণ)—গচি।
গোঁইচা (গয়া)—পাঁকাল।
গোঁতি (১) (দিনাজপুর) তারাবান;
(২) (ভাগলপুর) Gagata tengana (H B.)
গাংএর গোঁতি (দিনাজপুর)—পাঁকাল।
গোচি (রংপুর)—পাঁকাল।
গোচিয়া (বালেশ্বর)—পাঁকাল।
গোচতা—(১) (সাহাবাদ, চম্পারণ) তারাবান;
(২) Otolithus argentus (Huhl. and V. Hass.)
গোড়ি (আসাম, উড়িষ্যা)—গড়ই।
গোড়িয়া (১) (আসাম)—Labeo dyocheilus (McClell.). ; (২) বাঘ আইড়।
গোডিসা (আসাম, উড়িষ্যা)—গড়ই।
গোদিয়ারি (ভাগলপুর)—লাম্‌টা।
গোনি (আসাম)—Labeo gonius (H. B.)
গোবতা (মুঙ্গের)—চেরা (Callichrous bimacultus chechra H B.)
গোমৎস্যালি—শিঙ্গী।
গোমীন, গোমৎস্য—Batrachocephalus mino (H. B.)
গোয়াচুপি (পুরী)—নামচাঁদা।
গোরুয়া—Pseudeutropius garua (H. B.)
গোলঙ্কা (বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া)—খিলাচাঁদা।
গোলন্দ (উড়িষ্যা)—Rohtee vigorsii Sykes.
গোলা (পুরী)—Sillago maculata (Quoyand and Gaim)।
গোলহি (ভাগলপুর)—চিতল।

গোসিপোবা (উড়িষ্যা)—নাদোষ।

গোহট (পুর্ণিয়া)—ফলই।

গোহমা (পাটনা)—ড্যাংরা।

গোহা (পুর্ণিয়া)—Barilius bola goha (H B.).

গ্রাম্য মদ্গুরিকা—শিঙ্গী।

ঘউরা (পুর্ব্ববঙ্গ)—গোরুয়া।

ঘংরা (চাটিগাঁ, নোয়াখালী)—গাগর।

ঘটঘটে—Pristipoma hasta Bloch; Coius gudgutia (H. B.).

ঘাটি—কোটি।

ঘড়িয়া (গোয়ালপাড়া, রংপুর)—কাঁকিলা।

ঘড়ুয়া (কলিকাতা, রংপুর)—গোরুয়া।

ঘবল (দিনাজপুর)—খরশুলা।

ঘরুয়া (রংপুর, দিনাজপুর, কলিকাতা)—ঘড়ুয়া।

ঘর গোটা (রংপুর, বিহার)—Somileptus gangota (H. B).

ঘরশোভা—শাদা নোনা জলের মাছ; পায়রা চাঁদার ন্যায়।

ঘর্ঘট—(১) সংস্কৃত—গাগর। (২) গাগরা টেংরা।

ঘলসা (নোয়াখালী)—গলসা।

ঘাইড়া (বগুড়া)—গোরুয়া।

ঘাওবুজলী (পুরী)—Stolephorus tri (Bleeker).

ঘাওড়—গাগরা টেংরা।

ঘাটপোনা (পুর্ণিয়া)—তেচোকো।

ঘাড়ুয়া (জলপাইগুড়ি)—গোরুয়া।

ঘাড় বেঁকড়া—ধূসরবর্ণ; ঘাড় পিছনে কিছু বাঁকা; পেট মোটা; আঁশ আছে; ১২ ইঞ্চি লম্বা; নাদেয়।

ঘিঅলা, ঘিকলা—ঘিলাচাঁদা।

ঘিতুলী—কুলিবেলে।

ঘুগিনী (রংপুর)—গুগনি।

ঘুংগা (পুর্ব্ববঙ্গ)—কাবাসী টেংরা।

ঘুজি—খরশুলা।

ঘুড়ই (চাটিগাঁ)—গড়ই।

ঘুণ্যা (বগুড়া)—Labeo gonius (H. B).

ঘুলসা (নোয়াখালী)—গলসা।

ঘেনা (ঢাকা বিভাগ)—ঘুণ্যা।

ঘোঘুতি (শরণ)—ঘরগোটা।

ঘোড়িয়া (১) (গোয়ালপাড়া, রংপুর) কাঁকিলা (২) (আসাম) গোড়িয়া (১)।

ঘোণি (ত্রিপুরা)—ঘুণ্যা।

ঘোণ্যা—ঘুণ্যা।

ঙকারা (মণিপুর)—মাগুর।

ঙাওয়া (মণিপুর) (১) বরিলা; (২) Barilius dogarsinghi Hora (Records of the Indian Museum, ২২শ বর্ষ, পৃ, ১৭৪, ১৯১)।

ঙকিজরৌ (মণিপুর)—Lepidocephalichthys berdmorei (Blyth).

ঙাখা (মণিপুর)—তিতপুঁটী, কাঞ্চনপুঁটী, ফুটুনি পুঁটী।

ঙাখ্ শ্রৌ—ঙাকিজরৌ।

ঙা চেপ (মণিপুর)—Macrones bleekeri.

ঙাতিন (মণিপুর)—কানিপাবদা।

ঙাতুপ্ (মণিপুর)—(১) Nemacheilus sikmaiensis Hora (Records of the Indian Museum, ২২শ বর্ষ, পৃ. ২০)। (২) Nemacheilus prashadi Hora (পৃ. ২০৩)।

ঙথালেদো (মণিপুর)—Botia hymenophysa (Bleeker)

ঙানাপ্ (মণিপুর)—Lepidocephalichthys irrorata Hora (Rec. Ind. Mus, ২২শ বর্ষ, পৃ ১৯৬)।

ঙনোই (মণিপুর)—Barbus sarana caudimarginatus Blyth.

ঙাপুরম (মণিপুর)—Monopterus albus Weber and Beaufort.

ঙাপাং (মণিপুর) (১) Glyptothorax dorsalis Vinguerra. (২) Glyptothorax minutus Hora.

ঙামাহি (মণিপুর)—রাঙ্গাচাঁদা।

ঙামু (মণিপুর)—Ophiocephalus harcourtbutleri Annandale.

ঙামুসাঙুম (মণিপুর)—Garra nasutus McClelland.

ঙারাং (মণিপুর)—(১) গোলি টেংরা; (২) Mucrones affinis (Blyth).

ঙারেম (মণিপুর)—Nemacheilus zonalternans (Blyth)।

ঙারোহি, ঙারোহিমাপি (মণিপুর)—লতি।

ঙারিণ (মণিপুর)—Mastacembelus manipurensis Hora.

ঙাশিকশা (মণিপুর)—Rohtee alfredina (Cuv. and Val).

ঙাসর্বা (মণিপুর)—Nemacheilus manipurensis Choudhuri.

ঙাসাং (মণিপুর)—পাঙ্গিয়া।

জ্যাতুং (লুসাই পাহাড়)—কালবসু।

জ্যাশেন (লুসাই পাহাড়)—মহাশউল।

চইতি (গোরকপুর)—সোনাপুঁটী।

চকা (রঙপুর)—চক্রমৎস্য।

চকুন্দা (দিনাজপুর)—চাকুন্দা।

চক্রমৎস্য—চাকা।

চক্রশকুল—শাল।

চড়িঙ্গে—সুকটি (?)।

চন্দক—চাঁদা।

চন্দনা (নোয়াখালি)—খয়রা।

চন্দ্রক—চাঁদা।

চন্দ্রকলা—বাচা।

চন্দ্রচঞ্চলা—চাঁদা।

চন্দ্রমার—চাঁড়রমারা।

চন্দ্রিকা—চাঁদা।

চপলি—চম্পোলি।

চপরা (১) (বিহার) গাংখয়রা; (২) (বগুড়া, মুঙ্গের) খলিশা।

চম্পকুন্দ—চাপিলা।

চম্পোলি—Chatoessus chanpole (H. B.)

চরঙ্গ—চেঙ্।

চলং (রাজসাহী)—এলঙ্গ।

চলওয়া (চম্পারণ)—চেলা।

চলকর্ণ—চক্ষক।

চলৎপুর্ণিমা—চাঁদা।

চলদঙ্গ—চেঙমাছ।

চলদণ্ডক—চেঙ্গুয়া।

চলিসা—নীল, লাল ও কালোরং; দেড় হাত হইতে দুই হাত; আঁশ আছে; পুকুরে থাকে।

চলুয়া—(শাহাবাদ) চেলুয়া।

চাঁদকুড়া—চাপিলা।

চাঁদা—(১) (কলিকাতা, রংপুর)—নামচাঁদা।
(২) (পাটনা)—বকুল চাঁদা।
(৩) (পুর্ণিয়া)—লালচাঁদা।
(৪) (ঢাকা বিভাগ)—রুক্মিণীচাঁদা।
(৫) (মুঙ্গের)—বগুড়া চাঁদা।

(৬) (উড়িষ্যা)—Mene maculata (Bl. and Schn.).

(৭) (উড়িষ্যা)—Monodactylus argenteus (Linn.)।

এঁটিয়াটুটিয়া চাঁদা—Equula insidiator (H. B.)

উকুনচাঁদা—Equula notatus (Bloch Mss).

কাটচাঁদা—(১) Gerres setifer (H. B.); (২) (কলিকাতা) লালচাঁদা।

কেটোচাঁদা—কাটচাঁদা।

কেলিরা চাঁদা (পূর্ণিয়া) ফুলচাঁদা; (২) (পূর্ণিয়া) বগুড়া চাঁদা।

খয়রা চাঁদা—শাদা; আধ ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি লম্বা। পুকুরের মাছ।

গাংচাঁদা—চাপ্‌টিভোলার শিশুশাবক।

ঘিলাচাঁদা—Rohtee cotio.

চূণাচাঁদা—চাঁদামাছের বাচ্ছা।

ছোটচাঁদা (ভাগলপুর)—রাঙ্গা চাঁদা।

টাকাচাঁদা (১) (উড়িষ্যা, পূর্ব্ববঙ্গ)—Leiognathus equulus (Forskal); (২) (পূর্ণিয়া) রাঙ্গাচাঁদা।

টেকচাঁদা (ঢাকা)—টাকাচাঁদা।

নামচাঁদা (দিনাজপুর)—Chanda nama H. B.

নালুয়া চাঁদা—Chanda nalua H. B.

ফুলচাঁদা (রংপুর)—Chanda nama (phula H. B.).

ফোপচাঁদা (আসাম)—বকুলচাঁদা।

বকুলচাঁদা (রংপুর)—Chanda baculis.

বগুড়াচাঁদা (রংপুর)—Chanda nama H. B.)

রাঙ্গাচাঁদা (দিনাজপুর)—Chanda rauga lagoda H. B.

রামচাঁদা (রংপুর)—রদবড়া।

রুক্মিণীচাঁদা—Leiognathus ruconius H.B.

রূপচাঁদা (চাটিগাঁ)—Stromateus cinereusBloch.

রুপিচাঁদা (চাটিগাঁ)—Drepane punctata (Gmel.)

লালচাঁদা (রংপুর)—শিশু রাঙ্গাচাঁদা।

সুহিচাঁদা (পূর্ণিয়া)—নামচাঁদা।

হরচাঁদা (চাটিগাঁ)—Drepane longimana Cuv. and Val.

হাইলচাঁদা (চাটিগাঁ)—Stromateus sinensis Euph.

(ক্রমশঃ)

মকরধ্বজ ও আধুনিক বিজ্ঞান

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মকরধ্বজ আয়ুর্ব্বেদের একটি অত্যন্ত কল্যাণকর রাসায়নিক পদার্থ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে অনেকের অনেক মত থাকিবার কথা। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ এবং তাহার সাহায্যে ইহার প্রস্তুতপ্রক্রিয়াগুলি কিরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তাহা বিবৃত করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মকরধ্বজের প্রাচীনত্ব—বহুকাল পূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ হইতে সনাতন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। মকরধ্বজ যখন আয়ুর্ব্বেদোক্ত, তখন তাহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ না হইবারই কথা। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে মকরধ্বজের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বেদান্তর্গত রসেন্দ্র-সার-চিন্তামণি, রস-প্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। "অনুপান বিশেষেণ করোতি বিবিধাগুণাঃ," অনুপানের তারতম্যে বিবিধ প্রকার জটিল ব্যাধির উপশম মকরধ্বজে হইয়া থাকে। বৈদেশিক গ্রন্থাদিতেও ইহার প্রাচীনত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজেরা ইহার গুণ পূর্ব্বে আদৌ স্বীকার করিতেন না। আজকাল কোন কোন ইংরাজ ইহার ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়াছেন এবং এদেশীয় অনেক বড় বড় ডাক্তার অকুণ্ঠিতচিত্তে ইহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

রাসায়নিক তথ্য—"মকরধ্বজঃ রসসিন্দূরবিশেষঃ" ইতি আয়ুর্ব্বেদঃ। ইংরাজী রাসায়নিক নাম Mercury Sulphide (রসগুন্ধিদ বা পারদগুন্ধিদ) অর্থাৎ লালচটি (red sublimate of Mercury) অর্থাৎ পারা ও গন্ধক এই দুই পদার্থের পরস্পর রাসায়নিক সংসক্তি-প্রযুক্ত বৈধর্ম্ম* সংযোগে যে একটি সমবায়ী পদার্থ জন্মে, তাহাকেই রসগুন্ধিদ বলে। ইহার অণুর গুরুত্ব ২৩২, অণুর সংখ্যা পরিমাণ (molecular volume) [ ] । কঠিনাবস্থায় ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮'২, বায়বীয় অবস্থায় ৫'৫। ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন HgS। এই রস বা পারদগুন্ধিদ-এর অপর নাম সিন্দূর (cinnabar, vermilion)। ইহা অপরিষ্কৃত ও পরিষ্কৃত উভয় অবস্থাতেই স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা অপরিষ্কৃতরূপে চীনদেশ হইতে 'চীনে সিন্দূর' বলিয়া রপ্তানি হইয়া থাকে। আমাদের দেশে অন্য এক প্রকার পারদগুন্ধিদ বিক্রয় হয়, তাহাকে 'হিঙ্গুল' বলে। পরিষ্কৃতভাবে পৃথিবীর অনেক স্থলে ইহার স্ফটিক (crystal) পাওয়া যায়। এই স্ফটিকের বর্ণ রক্ত-ধূসর এবং ইহার আকৃতি ছয়কোণবিশিষ্ট (hexagonal); দেখিতে অতি সুন্দর এবং খলে মাড়িলে অতি সুন্দর ঘন লালবর্ণ দেখায়।

* বৈশেষিক দর্শন হইতে স্বধর্ম্ম ও বৈধর্ম্ম সংযোগ এই শব্দ দুইটি পাইয়াছি, ইহা chemical ও physical union-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ।

রাসায়নিক প্রস্তুত প্রণালী—ইংরাজী রসায়নশাস্ত্রে বহুদিবস হইতে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। একখানি পুরাতন ইংরাজী রসায়ন-পুস্তকে ইহার কৃত্রিম প্রস্তুত প্রণালী নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—১ ভাগ গন্ধক ও ৬ ভাগ পারদ একত্রে একটি পাত্রে একেবারে বন্ধ করিয়া উত্তপ্ত করিলে উহা উবিয়া যায় (sublimation)। এইরূপে যে একটি লালবর্ণ পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাকে কৃত্রিম সিন্দূর (Jackson's cinnabar) বলে। ইহাকে গুঁড়া করিলে ইহার বর্ণের উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি পায়।* এই পদার্থের গুণ এই যে উহাকে বায়ুর অসংযোগে কোন পাত্রে উত্তপ্ত করিলে, ইহা না গলিয়া উবিয়া যায় এবং পাত্রের উপরে লাগিয়া থাকে। উহা প্রথমে কালো দেখায়, পরে ঠাণ্ডা হইলে লালবর্ণ হয়। বায়ুর সংযোগে উত্তপ্ত করিলে ইহা হইতে গুবারি দ্বিঅক্সিদ্ (sulphur dioxide) নামক বাষ্প বাহির হইয়া যায় এবং পাত্রের গায়ে পারদ লাগিয়া থাকে। ইহা কোন অম্লে (acid) দ্রবীভূত হয় না। কিন্তু রাজাম্লে (aqua regia) এবং ক্ষারগুঘিদে (alkaline sulphide) সহজেই দ্রবীভূত হইয়া থাকে। ইহা অন্যান্য ধাতুঘটিত গুঘিনগুলির ন্যায় বায়ুদ্বারা অক্সিদ্ (oxide) রূপে পরিণত হয় না। ইহাই এই পদার্থের একটি প্রধান ধর্ম্ম।

মকরধ্বজের প্রস্তুত প্রণালী (সংক্ষিপ্ত)—পারদ ও গন্ধক উভয়কে একত্র করিয়া একখানি খলে মাড়িলে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে আমাদের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে "কজ্জলী" ও ইংরাজী রসায়নে black sulphide of Mercury বলে। এই কজ্জলীকে উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া উত্তাপ দেওয়া হয়। তাহাতেই কজ্জলী পাত্রের নিম্ন হইতে উর্দ্ধগাতনে উবিয়া গিয়া পাত্রের উপরে ও গায়ে লাল সিন্দূরের চটির ন্যায় লাগিয়া থাকে। এই চটি পদার্থকেই আয়ুর্ব্বেদে 'রসসিন্দূর', কিংবা স্বর্ণঘটিত হইলে 'স্বর্ণসিন্দূর' বলে। ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে প্রায় শতকরা ৮৪ ভাগ পারদ এবং প্রায় ১৬ ভাগ গন্ধক পাওয়া যায়।

মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার উপাদান পারদ ও গন্ধক। ইহারা শোধিতরূপে ব্যবহৃত হয়। বিনা শোধনে ইহাদিগকে ব্যবহার করা বিধেয় নহে। পারদকে সর্ব্বপ্রথমে খলে সুরকির গুঁড়া দ্বারা দুই তিন দিবস উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার পর প্রথমে পানের রসের সহিত দুইদিন, পরে রসুনের রসের সহিত সাতদিন মাড়িয়া একখানি পরিষ্কার মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। এইরূপে পারদ শোধিত হয়। কবিরাজেরা বলেন যে, হিঙ্গুল হইতে পারদ বাহির করিয়া সেই পারদ ব্যবহার করিলে মকরধ্বজ উত্তম হয়। এই উদ্দেশ্যে হিঙ্গুলকে কয়েক খণ্ড কাপড়ের টুকরার দ্বারা বাঁধিয়া একটী ঘড়ায় রাখা হয়। পরে উহাতে দুই তিনখানি টিকা ধরাইয়া আগুন দিয়া ঘড়ার মুখে একখানি জলভরা সরা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। ২৪ ঘণ্টা পরে ঐ ঘড়ার মুখ খুলিলে দেখা যায়, ঘড়ার গায়ে ও সরার নীচে পারদ জমিয়া আছে। এই পারদ লইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে শোধন করিতে হয়। গন্ধকও শোধন করিয়া লইতে হয়। লৌহের একখানি হাতায় কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত দিয়া তাহাতে অল্প গন্ধক লইয়া হাতাখানি আগুনে ধরিলে গন্ধক গলিয়া যায়। তখন

* Dr. Turner's Chemistry (1835) p. 634; Dr. Tidy's Chemistry (1878) p. 478.

উহা ছুঁচে ঢালিয়া দিতে হয়। এইরূপে যে গন্ধক পাওয়া যায়, তাহাই শোধিত গন্ধক। এক ভাগ শোধিত পারদ এবং দুই ভাগ শোধিত গন্ধক একখানি পরিষ্কৃত খলে বেশ করিয়া মাড়িলে 'কজ্জলী' প্রস্তুত হয়। এই 'কজ্জলী' দুই তিন দিবস ধরিয়া মাড়িতে হয়, কারণ কবিরাজেরা বলেন যে, যত মাড়িবে ততই ভাল মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে।

স্বর্ণসিন্দূর অর্থাৎ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে হইলে, আট ভাগ বিশুদ্ধ পারদের সহিত একভাগ বিশুদ্ধ চীনেপায়রা সোনা মিশ্রিত করিয়া খলে মাড়িলে স্বর্ণ পারদের সহিত বেশ মিশিয়া যায়। পরে উহাতে ১৬ ভাগ শোধিত গন্ধক দিয়া চারি পাঁচ দিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে স্বর্ণঘটিত কজ্জলী প্রস্তুত হয়। একটী খর্ব্বাকৃতি অথচ স্থূল বোতলের (তলার ব্যাস ৪।৫ ইঞ্চি, উচ্চে ৬ ইঞ্চি) মুখের দিকে সমান করিয়া অগ্রভাগের কতকটা (প্রায় দেড় ইঞ্চি) কাটিয়া ফেলিয়া গোময় ও মৃত্তিকা দ্বারা বোতলটী ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া কিয়ৎকাল সূর্য্যতাপে রাখিয়া দিলে বোতলটীর সমস্ত জল শুকাইয়া যায়। সেই বোতলটীর গায়ে মাটির প্রলেপ দিয়া তাহার উপর কাপড়ের টুকরা জড়াইয়া আবার মাটির প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইতে হয়। ঐ শুক বোতল কজ্জলী সহ একটি মৃৎভাণ্ডে (ব্যাস ৮।১০ ইঞ্চি,

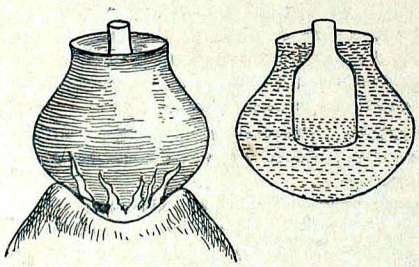

চিত্র—১
বালুকা যন্ত্র।

গভীরতা ৬ ইঞ্চি) রাখিয়া বোতলের গলা পর্য্যন্ত পরিষ্কার বালিদ্বারা পূর্ণ করা হয় (১নং চিত্র ক)। ইহাকে বালুকা যন্ত্র (sand-bath) বলে। এই যন্ত্রটী একটি খোলা জায়গায়—ময়দানে বা ছাদের উপরে যেখানে মানুষের বেশী গতায়াত নাই, সেইখানে একটী উনুনের উপর রাখিয়া কাঠের মৃদুজ্বালে কয়েক ঘণ্টা ক্রমাগত পাক করিতে হয় (২নং চিত্র খ)। বোতলটীর

মুখ খোলা থাকে। সচরাচর রাত্রেই পাক করা হয়, কারণ রাত্রে লোকের ভিড় থাকে না এবং জাল দেখিবারও সুবিধা হয়। দিবসেও ইহার পাক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা অতি বিরল। পারার ধোঁয়া লাগা ভাল নহে বলিয়া অন্য লোক নিকটে থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে। পাঁচ ছয় ঘণ্টা পাকের পর একটি লোহার শিক্ ঐ বোতলের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। ঐ শিকের গায়ে গন্ধক লাগিলে পাক হয় নাই, আর যদি না লাগে, তাহা হইলে পাক ঠিক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পাক ঠিক হইলে, জাল ক্রমে ক্রমে কমাইয়া ২০ মিনিটের মধ্যে একেবারে নিভাইয়া দেওয়া হয়। মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে পাকের শেষভাগে বোতলের উপরে একটি রক্ত গোলক অথবা লালবর্ণের শিখা দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও ঐ শিখা মোটেই প্রকাশিত হয় না। সেরূপ স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মকরধ্বজ বোতলটীর মুখ পর্য্যন্ত আসিয়া উহা একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। তখন ঐ লোহার শিক্ দুই তিনবার প্রবেশ করাইয়া দিলে ছিদ্রপথে অতি অল্প পরিমাণ রক্তশিখা দেখা যায়, কখনও বা দেখা যায়ও না। তখন কেবলমাত্র শিকের সাহায্যে পাকের অবস্থা স্থির করিতে হয়। পাক হইয়া গেলে বার ঘণ্টাকাল যন্ত্রটীকে না নাড়িয়া ঠাণ্ডা করিতে হয়। পরে বোতলটী ভাঙ্গিলে উহার গাত্রে এক প্রকার চটি জমিয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই চটি পদার্থই আয়ুর্ব্বেদমতে 'রসসিন্দুর' অথবা স্বর্ণঘটিত হইলে স্বর্ণসিন্দুর নামে অভিহিত হয়। স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুতকালে বোতলের নিম্নে স্বর্ণ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের সহিত পড়িয়া থাকে, উহাকে পোড়াইয়া সোহাগা দ্বারা গলাইয়া স্বর্ণ বাহির করিয়া লওয়া যায়। সেই স্বর্ণ পুনরায় মকরধ্বজে ব্যবহৃত হয়। প্রস্তুত প্রণালীর এই বর্ণনা ঠিক প্রাচীন শাস্ত্রানুযায়ী নাও হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলির রাসায়নিক ব্যাখ্যা—মকরধ্বজ প্রস্তুত প্রণালী আধুনিক বিজ্ঞানমতে ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমে উহার উপাদানগুলির গুণ বর্ণনা করা আবশ্যক।

রস বা পারদ (Mercury)—ইহা একপ্রকার জলীয় ধাতুবিশেষ; সংস্কৃতে ইহাকে সেই কারণে "রস" বলে। ইহা জল অপেক্ষা ১৩'৫ গুণ ভারি। বিশুদ্ধাবস্থায় ইহা সাধারণ উত্তাপে ভিজা কিংবা শুষ্ক বাতাসে আদৌ খারাপ হয় না। সাধারণ বায়বীয় চাপে অর্থাৎ ৭৫৬ মিলিমিটার বা ৩০ ইঞ্চি পারদের চাপে ইহা ৩৫৭'২৫০ শতক্রমে (centi-grade) ফুটিতে থাকে। সাধারণ উত্তাপেই ইহা উবিয়া যায়। একখণ্ড স্বর্ণপাত দ্বারা ইহা প্রতিপাদন করা খুব সহজ; স্বর্ণপত্রখানি পারদের উপর ধরিলে ক্ষণকাল পরেই সাদা হইয়া যায় অর্থাৎ পারদ উবিয়া গিয়া উহার গায়ে লাগে। পারদের বাষ্প জীবশরীরে বিষক্রিয়া করে; ইহাতে কুষ্ঠ, অন্ধতা, পক্ষাঘাত * প্রভৃতি ব্যাধি আনয়ন করে। ৩৫০° শতক্রমের উপর উত্তপ্ত হইলে ইহা বাতাস হইতে

* Dr. Tidy.

আস্তে আস্তে অক্‌সজন (oxygen) গ্রহণপূর্ব্বক একপ্রকার লালগুঁড়াতে পরিণত হয়। ইহাকে ইংরাজীতে red oxide of mercury (রক্তরসাক্‌সিদ্) বলে। ইহা গন্ধকের সহিত স্বাভাবিক অবস্থাতে সদ্য সদ্য মিশিয়া থাকে।

গন্ধক (Sulphur)—ইহা একপ্রকার স্ফটিক (crystal) কঠিন ও ভঙ্গুর পদার্থবিশেষ। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২'৭। ইহা সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। উত্তপ্ত হইলে ১১৪'৫° শতক্রমে ইহা খড়ের ন্যায় বর্ণযুক্ত জলীয় বা তরল পদার্থে পরিণত হয়। পরে উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা ফুটিতে (boil) থাকে এবং ঈষৎ পীত-ধূসরবর্ণের ধূমনির্গত করে; তখন ইহাকে ঠাণ্ডা করিলে পূর্ব্বলিখিত নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অর্থাৎ যেরূপভাবে ক্রমে ক্রমে ফুটন্ত অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল সেই সমুদয় অবস্থার মধ্য দিয়া শীঘ্রই পুনরায় সাধারণ গন্ধকে পরিণত হইয়া যায়।

সুবর্ণ (Gold)—বিশুদ্ধাবস্থায় ইহা উজ্জ্বল হলুদবর্ণযুক্ত ধাতুপদার্থ। ইহাকে গলান অত্যন্ত কঠিন। ইহা ১০৩৫° শতক্রমে গলে; কিন্তু তখনও ইহা হইতে বাষ্প নির্গত হয় না। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯·৩। ইহা শুষ্ক বাতাসে খারাপ হয় না কিম্বা গন্ধকের দ্বারা অভিভূত হয় না। ইহা নেত্রাম্র কুল্‌হরিকাম্লের (nitro-muriatic acid) দ্বারা দ্রবীভূত হয়। কুল্‌হরিণ (chlorine) ইহাকে শীঘ্রই আক্রমণ করিতে পারে। বাজারে যে খাঁটী সোনা পাওয়া যায়, তাহা একেবারে বিশুদ্ধ নহে, তাহাতে কিছু তাম্র থাকে। বিশুদ্ধ স্বর্ণ পারদের মধ্যে দিলে ক্ষণকাল মধ্যেই মিশিয়া যায়। ইহাকে ইংরাজীতে 'Gold amalgam' (পারদখাদযুক্ত স্বর্ণ অথবা পারদঘটিত স্বর্ণ) বলে। পূর্ব্বোক্ত তথ্যগুলি জানিয়া লইলে মকরধ্বজ প্রস্তুত সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বুঝিবার সুবিধা হইবে।

সর্ব্বপ্রথমে পারদ ও গন্ধকের শোধন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যে প্রক্রিয়ায় আয়ুর্ব্বেদমতে পারদ শোধিত হয়, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি কয়েকবার রসুনের রস ও পানের রস দিয়া পারদ শোধন করিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস যে, অনেক আধুনিক ইউরোপীয় পারদ-শোধন প্রণালী অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। আমার অধ্যাপক পরমশ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ ক্রুলকে আমি ইহা দেখাইয়াছিলাম। তিনি বৈদেশিকমতে ও আয়ুর্ব্বেদমতে পরিষ্কৃত পারদ তুলনা করিয়া শেষেরটিকে উৎকৃষ্টতর বলিয়াছিলেন। রসুনের ভিতর এমন কি পদার্থ আছে, যদ্দ্বারা পারদকে এমন সুন্দররূপে শোধন করে, তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করিয়া এতৎসম্বন্ধে আমি মৌলিক গবেষণা করিতে প্রবৃত্ত হই; তাহার ফল মৎকৃত জার্ম্মাণ প্রবন্ধে* প্রকাশিত হইয়াছে।

* "Die Einwerkung der Sulfide der Allylgruppe auf Bleiamalgam und Quecksilber—Die völlige Reinigung von Quecksilber"—published in Der Zeitschuftfür Anorganische Chemic (Leipzig), Band (1913).

এই প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল (২০শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩২০ সাল ।

হিঙ্গুল হইতে যে পারদ বাহির হয়, অনেকের মনে ধারণা আছে যে, তাহা বিশুদ্ধ; কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ নহে, কারণ হিঙ্গুল বিশুদ্ধ পারদশুদ্ধিদ নহে *। ইহার সহিত সীসক (lead) পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ ইহার সহিত মেটে সিন্দুরও (read lead) মিশ্রিত থাকে। বিশুদ্ধ পারদশুদ্ধিদ ষট্‌কোণী স্ফটিকরূপে পাওয়া যায়। এই কারণে অনেক কবিরাজ হিঙ্গুলোত্থ পারদকেও পুনরায় শোধিত করিয়া লন। আয়ুর্ব্বেদমতে গন্ধকের শোধনপ্রণালী ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। কেন ঘৃত দিয়া গলান হয়, আর কেনই বা দুগ্ধের মধ্যে ফেলা হয়, তাহার বিশিষ্ট রাসায়নিক তথ্য অনুসন্ধানের উপযোগী। বাজারে যে গন্ধক পাওয়া যায় তাহাতে একটু ধূলাবালি ছাড়া আর কিছু ময়লাই থাকে না, পরিষ্কৃত হইলে ঐগুলি চলিয়া যায় মাত্র।

পারদ ও গন্ধকের পরিমাণ—এক ভাগ পারদে দুই ভাগ গন্ধক দেওয়া হয় কেন? কেহ কেহ ছয়গুণ গন্ধক দিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করেন, সে বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। রসায়নশাস্ত্রমতে মকরধ্বজে ১০০ ভাগে ১৬ ভাগ গন্ধক ও ৮৪ ভাগ পারদ অর্থাৎ এক ভাগ গন্ধক ও ৫·২৫ ভাগ পারদ বর্ত্তমান আছে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইংরাজী পুস্তকে লালচট অর্থাৎ আমরা যাহাকে রসসিন্দুর বা মকরধ্বজ বলি, তাহাতে এক ভাগ গন্ধক ও ৬ ভাগ পারদ একত্র করিয়া বদ্ধযন্ত্রে পাক করিবার ব্যবস্থা আছে; সুতরাং বিজ্ঞানের চক্ষুতে দেখিলে সমভাগ পারদ ও গন্ধক লইলে গন্ধকের প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রয়োগই বুঝায়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই প্রক্রিয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি মকরধ্বজ প্রস্তুত প্রণালীতে বোতলের মুখ খোলা রাখা হয়। ইহাতে গন্ধকের কিয়দংশ মকরধ্বজপাকের মধ্যাবস্থায় কিম্বা প্রায় শেষাবস্থায় ঘুম হইয়া যায়। সুতরাং যথারীতি গন্ধক প্রয়োগ করিলে, মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে যতটুকু গন্ধক আবশ্যক, তাহার অভাব হইবারই সম্ভাবনা। আরও একটী কথা আছে। কজ্জলী হইতে মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে কজ্জলীস্থিত পারদের কিয়দংশ বাহির হইয়া যায়। এই পারদের জন্যও কিঞ্চিৎ বেশী গন্ধক আবশ্যক।

এক্ষণে স্বর্ণসিন্দুরের উপাদানগুলি লইয়া একটু আলোচনা করিব। ইহার প্রস্তুত প্রণালীতে একটু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে পারদের সহিত অগ্রে সুবর্ণ মিশ্রিত করা হয়। ইহা যে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে উপাদানগুলির গুণবর্ণনাকালে বলা হইয়াছে যে, পারদে সুবর্ণ দিলেই পারদের সহিত উহা শীঘ্র মিশিয়া যায়। পারদের পরিমাণ বেশী হওয়ায় সুবর্ণকে দ্রবীভূত করিলেও তরল অবস্থানিবন্ধন গন্ধককেও বেশ টানিয়া লয় এবং কয়েক দিবস উহাদের একত্র-মর্দ্দন করিলে কজ্জলী প্রস্তুত হয়। এখানেও গন্ধকের অধিক প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। খর্ব্বাকৃতি অথচ স্থূল বোতল ব্যবহারের কারণ এই যে, উহাতে কজ্জলী ঢালিলে উহার তলার পরিসর বেশী বলিয়া ছড়াইয়া পড়ে এবং উচ্চে বেশী উঠে না। তজ্জন্য কজ্জলীর সর্ব্বস্থানে উত্তাপ সমান লাগে। বোতলটীর মুখ একটু চওড়া হওয়া আবশ্যক, কারণ মুখ সূক্ষ্ম

* Dr. Ostwald's Principles of Inorganic Chemistry, p. 667.

হইলে পাকের সময় বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। বোতলের গায়ে কাপড় জড়াইয়া মাটীর প্রলেপ দিবার অর্থ এই যে, তাহাতে বোতলটী উত্তাপ বেশ সহ্য করিতে পারে এবং যদি ফাটে (এরূপ ফাটা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি) তাহা হইলেও ভিতরের সামগ্রী নষ্ট হয় না। মকরধ্বজ পাকে বালুকাযন্ত্র একটি অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া, কারণ ইহাতে একই সময়ে সর্ব্বস্থানে সমভাবে উত্তাপ লাগিয়া থাকে। কাঠের জালের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার নাই। মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে জাল প্রয়োগ ব্যাপারটী আয়ত্ত থাকা বিশেষ আবশ্যক, কাঠের জালেই তাহা পূর্ণভাবে নির্ম্পন্ন হয়। অল্প অল্প মৃদু জাল দিয়া কিছুক্ষণ সমভাবে পাক করা বিধেয়, জাল প্রখর হইলে গন্ধকাদি ধূম হইয়া যাইবে। পারদ ৩৫৭°৭৭° শতক্রমে এবং গন্ধক ৪৪৮° শতক্রমে ফুটিতে থাকে। এই গুণগুলি জানা থাকিলে কিরূপভাবে জাল দিতে হইবে তাহা সহজে অনুমান করা যায়। কজ্জলী হইতে মকরধ্বজ সম্ভবতঃ ২৫০° ক্রম হইতে ৩৫০° ক্রম উত্তাপে প্রস্তুত হয়। পুনরায় বদ্ধযন্ত্রে পাক করিলে ইহা ২৫০° ক্রম হইতে ৩৫০° ক্রম উত্তাপের মধ্যে উবিয়া যায় অর্থাৎ প্রায় ২৫০° ক্রম তাপে উত্থিত অস্থিত করে এবং প্রায় ৩৫০° ক্রমে নিঃশেষ হয়। ইহা শীঘ্র বিশ্লিষ্ট হয় না। ৪৫০° ক্রমের বেশী উত্তপ্ত হইলে পারদ ও গন্ধক পৃথক হইয়া যায়। উদ্লিখিত সিদ্ধান্তগুলির প্রমাণ এই যে, পাকের শেষভাগে তলায় গন্ধক পড়িয়া থাকে, ঐ গন্ধককে তখন গলা অবস্থা এবং লৌহশলাকা দ্বারা পরীক্ষা করিলে উহার স্নেহত্ব ধরা যায় না; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, উত্তাপ তখন ২৫০° ক্রম হইতে ৩০০° ক্রমের মধ্যে আছে। বোতলের গলায় তখন সিন্দুর অর্থাৎ মকরধ্বজ দেখিতে পাওয়া যায় এবং লৌহশলাকা পরীক্ষায় তখনও গন্ধকের সহিত একটু কজ্জলী দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, মকরধ্বজ পাক সম্পূর্ণ হয় নাই। ইহার কিছু পরেই মকরধ্বজ পাক সম্পূর্ণ হয়। তখন তাপ প্রায় ৩৫০° ক্রম হওয়া সম্ভব। ঠিক এই সময়েই বোতল হইতে একরূপ রক্তবর্ণ ধূম নির্গত হয়, এবং জাল বন্ধ করা হয়। পারদ প্রভৃতি উত্তপ্ত হইয়া যে বাষ্প নির্গত করে তাহা অনিয়াই রক্তবর্ণ শিখা প্রকাশিত হয়। ইহা ঠিক রক্তবর্ণ নহে, রক্তবর্ণের সহিত সামান্য নীল মিশ্রিত থাকে। তখন উত্তাপ ৪৪৮° ক্রমের উপর। আর অধিক উত্তপ্ত করিলে পাছে মকরধ্বজ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ জাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে এই যে সমস্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, তাহার কোনটীই বৈজ্ঞানিক প্রথাবিরুদ্ধ নহে। স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত সম্বন্ধে এইবার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় এক সময় প্রবাসী পত্রিকায় (কার্ত্তিক, ১৩১৬) এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় তিনি মকরধ্বজ প্রস্তুতকরণে সুবর্ণ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহেন, কারণ সুবর্ণ মকরধ্বজের সহিত মিশ্রিত হয় না বা হইতে পারে না; উহার "catalytic action" হইয়া থাকে মাত্র। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখিয়াছেন,—মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে স্বর্ণ পাত্রের তলায় পড়িয়া থাকে। "রসপ্রদীপ" গ্রন্থও এই সুবর্ণপ্রয়োগ সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ

করিয়াছেন এবং মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে স্বুবর্ণ পরিত্যাগ করিলেও চলিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। আমি আচার্য্যদেবের ও নিয়োগীমহাশয়ের মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, কারণ আমি নিজে পরীক্ষা দ্বারা ঐরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বুবর্ণ বাস্তবিকই পাত্রের তলায় পড়িয়া থাকে এবং এইরূপ পড়িয়া থাকাই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বুবর্ণাদির পূর্ব্ববর্ণিত গুণগুলি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে মকরধ্বজে স্বুবর্ণ প্রয়োগের অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করা বেশী কঠিন হইবে না। স্বুবর্ণ ১৩৩৫° তাপে গলে এবং গন্ধক কিংবা অন্যান্য পদার্থের সহিত সহজে এবং সম্যক্‌প্রকারে মিশ্রিত হয় না। স্বুবর্ণ স্বভাবতঃই একটী সুস্থির বা স্থবির (stable) পদার্থ, পারদ কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থাতেই উবিয়া যায় এবং ৩৫৮° তাপে ফুটিতে থাকে। পারদঘটিত স্বুবর্ণ উত্তপ্ত করিলে পারদ উবিয়া যায়, স্বুবর্ণ পড়িয়া থাকে। এস্থলে গন্ধকের সহিত স্বুবর্ণের কিছুতেই কোন সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে ৪৫০° ক্রমের বেশী তাপ লাগে না, সে তাপে স্বর্ণের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। এই সব অবস্থা বিচার করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মকরধ্বজ প্রস্তুতের কোন প্রক্রিয়াতেই স্বুবর্ণ কোন প্রকারে যোগদান করে না। তবে ইহাকে প্রয়োগ করিতে প্রাচীন ঋষিরা কেন বলিয়াছেন? এবিষয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র * লিখিয়াছেন, "General belief is that by association with gold the mercury acquires most efficacy" অর্থাৎ সাধারণের বিশ্বাস স্বর্ণঘটিত হইলে পারদের রোগনাশ শক্তি বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে লেখা আছে যে, পারদের পক্ষচ্ছেদ (non-volatilisation) করিতে পারিলে, পারদ স্বুবর্ণের ন্যায় স্থিরত্ব লাভ করিতে পারে; অর্থাৎ যাহাতে পারদ উবিয়া না যায়, স্বুবর্ণের ন্যায় স্থির থাকে, এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে স্বুবর্ণ ও পারদ একসঙ্গেই উবিয়া যাইবে †। কিন্তু এরূপ কোন প্রক্রিয়া আধুনিক কোন কবিরাজ জানেন বলিয়া অবগত নহি; আর ইহা যে হইতে পারে, তাহাও আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করে না। পারদের পক্ষচ্ছেদ অর্থে আমি বুঝি যে, ইহার স্বাভাবিক চঞ্চলতা অর্থাৎ উবিয়া যাওয়া নিবারণ ‡। প্রাচীন কবিরাজমহাশয়গণ হয় তো এ প্রক্রিয়া সম্যক জানিতেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার পুস্তকে "রসবন্ধ" বা Fixation of mercury অর্থে লিখিয়াছেন পারদের দ্রবত্ব কঠিনত্বে পরিণতকরণ। এরূপ করিলে পারদ আর শীঘ্র শীঘ্র উবিয়া যাইবে না। এইরূপ পারদের সহিত ছয়গুণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক

* History of Hindu Chemistry, vol. I, p. 73.

† কোন কোন রসগ্রন্থে কজ্জলীকে কতিপয় অদ্যুনা দুষ্প্রাপ্য এবং অজ্ঞাত তরুলতাপাতার রস দিয়া কয়েক দিবস মাড়িবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে নাকি পারদের পক্ষচ্ছেদ হয় এবং সেই পারদের সহিত স্বর্ণ মিশিয়া একত্রে উবিয়া স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করে।

‡ Fixing of the Mercury, that is, making it more volatile.—Ostwald's Principles of Inorganic Chemistry, p 656.

করিলে সাধারণ রসসিন্দুর মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়। আবার ঐরূপ পারদে স্বুবর্ণ প্রয়োগ করিয়া গন্ধকের সহিত পাক করিলে স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুত হয়। উল্লিখিত প্রমাণাদি সত্ত্বেও মকরধ্বজে স্বুবর্ণপ্রাপ্তি না ঘটাই সম্ভব। প্রাচীনকালে স্বুবর্ণ মকরধ্বজের সহিত মিলিত কি না, তাহা লইয়া এস্থলে বাক্‌বিতণ্ডার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। আয়ুর্ব্বেদীয় রসশাস্ত্রে এ'সম্বন্ধে এত ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে যে, তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়াও হয় তো চলে না।

এফণে "catalytic action" সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক। অনেকের ধারণা থাকিতে পারে যে, সোনা মকরধ্বজে catalytic agent-এর কার্য্য করিয়া থাকে। Catalysis কাহাকে বলে এবং catalytic-এর ক্রিয়া কি, তাহা উত্তমরূপ না বুঝিলে এরূপ ভ্রান্তিমূলক ধারণা অবশ্যম্ভাবী। যে সকল দ্রব্যের সংযোগে অন্য পদার্থ স্বল্প উষ্ণাপে শীঘ্র বিশ্লিষ্ট হয়, অথচ সেই দ্রব্যগুলির ঐরূপ প্রক্রিয়াতে নিজের কোন অবস্থাপরিবর্ত্তন হয় না, তাহাদিগকে catalytic agent এবং ঐ প্রক্রিয়াকে catalysis বলে। আধুনিক কয়েকজন খ্যাতনামা রাসায়নিককৃত কয়েকখানি উচ্চাঙ্গের রাসায়ন পুস্তকে catalysis শব্দ বা তাহার ব্যাখ্যা আদৌ স্থান পায় নাই। ইহার কারণ ঐ শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিম্নলিখিত কয়েকটী রাসায়নিক ক্রিয়া লইয়া তৎকালীন খ্যাতনামা রাসায়নিকগণের মধ্যে বহু তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল,—

(১) চিনির রসে yeast অর্থাৎ তাড়ি প্রয়োগ করিলে সুরা প্রস্তুত হয়। তাড়ি চিনির সহিত মিশ্রিত হয় না, যেমন তেমনই থাকে।

(২) মাড় (starch) তাড়ির প্রভাব দ্বারা চিনিতে পরিণত হয়, অথচ তাড়ি যেরূপ অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, সেই অবস্থাতেই থাকে।

(৩) পাত্‌সিয়াম ক্লোরেত-এর (Potassium Chlorate $KClO_3$) সহিত মাঙ্গনীজ্ দ্বিঅক্‌সিদ (MnO_2 Manganese dioxide) দিলে স্বল্প উত্তাপেই অক্সজন বাষ্প বাহির হয়। কিন্তু কেবলমাত্র $KClO_3$ হইতে অক্সজন বাহির করিতে হইলে অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয়।

তৎকালীন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক সুইডেননিবাসী বার্জেলিয়স্ মহোদয় উপরোক্ত ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে বিচারপূর্ব্বক 'Catalysis' নাম প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইহা এক প্রকার নবজাত শক্তি দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। এই শক্তিই 'Catalysis'। তিনি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন যে, প্রক্রিয়াটী তিনি বুঝিতে পারেন নাই এবং এই শক্তিটি যে কি তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই *। 'Catalysis' শব্দের সাধারণ অর্থে Fermentation অর্থাৎ পচন বুঝায়। স্বনামখ্যাত জার্ম্মাণ রাসায়নিক লিবিগ্ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, যেমন কয়েকটি দাহ্য দ্রব্য পরস্পর সংলগ্নীভূত হইলে, একটীতে অগ্নি প্রদান করিলে অন্যগুলিতেও তাহা বিস্তৃত হয়, সেইরূপ দুইটী দ্রব্য একত্র এক স্থানে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া রাখিলে, একের পরমাণুর সঞ্চলনপ্রভাব অপর

* Dr. Tidy's Chemistry, Theory of Fermentation, p. 489.

দ্রব্যের পরমাণুর উপর বিস্তার লাভ করে। তাড়ি একটি অস্থির (unstable) পদার্থবিশেষ, শীঘ্রই বিশ্লিষ্ট হয়। সুতরাং যদ্যপি চিনির সহিত তাড়ি থাকে তাহার পরমাণুগুলি যেভাবে সঞ্চলিত হইয়া বিশ্লিষ্ট হয় সেই সঞ্চলনপ্রভাব চিনির উপরও তেমনিভাবে বিস্তৃত হয় এবং চিনিকে শীঘ্র বিশ্লিষ্ট করিয়া সুরাতে পরিণত করে। এক্ষণে সুরা প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু তাড়ি যেমন তেমনই রহিল কেন? তাড়ি বাস্তবিক বিশ্লিষ্ট হয়, কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ রাসায়নিক অষ্টওয়াল্ড অব্দাদি দ্বারা এ সমস্যার মীমাংসা করিয়া উপসংহারে বলেন, "পর্ব্বতের শৃঙ্গ আমাদের নিকট প্রত্যহ একই রকম দেখায়, যেন উহা কালস্রোতের অধীন নহে, যেন উহার উচ্চতার খর্ব্বতা কখন হয় না বা হইবে না; কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রত্যহই অল্পে অল্পে খসিয়া উপত্যকা ভূমিতে পড়িতেছে এবং কালচক্রের প্রভাবে খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইতেছে।" এই সব ক্রিয়া জগতে চক্ষুর অগোচর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহা চিরন্তনভাবে চলিতেছে *। অতঃপর মহামতি পাশ্চর পচনের কারণ নির্দ্দেশ করিলেন যে, উহা জীবাণু দ্বারা হইয়া থাকে। তাড়ি প্রভৃতিতে (yeast ও diastase) যে জীবাণু আছে, তাহাদের প্রভাবেই চিনি হইতে মদ এবং মাড় (starch) হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। ইহাতে লিবিগের মত খণ্ডিত হইল। তৎপরে MnO_2-র (মাঙ্গনীজ্ দ্বিঅক্সিদ) উপর $KClO_3$-র (পাতসিয়াম্ কুলহরেত) ক্রিয়াও ব্যাখ্যাত হইল। মাঙ্গনীজ্দ্বিঅক্সিদ কুলহরেত (Chlorate) হইতে অক্সজন গ্রহণপূর্ব্বক একটী অক্সজনযুক্ত পদার্থের সৃষ্টি করে। তাহা স্বল্প উত্তাপেই বিশ্লিষ্ট হইয়া অক্সজন প্রদান করে এবং পুনরায় মাঙ্গনীজ্দ্বিঅক্সিদে পরিণত হয়। এইরূপে 'Catalysis' শব্দের ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া গেল। এক্ষণে উহা নামে মাত্র আছে। অনেক খ্যাতনামা রাসায়নিক মহোদয়গণের পুস্তকে উহার নামেরও উল্লেখ নাই। কেহ কেহ উহাতে নূতন লক্ষণ আরোপ করিয়া এখনও উহাকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। খ্যাতনামা জার্ম্মাণ পণ্ডিত অষ্টওয়াল্ড catalytic agent মতের পক্ষপাতী †। যাহা হউক, এ সকল কোন মতই মকরধ্বজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। মকরধ্বজ পাক করিতে কজ্জলী সুবর্ণঘটিত হইলেও যে উত্তাপ ও যে সময় লাগে, সুবর্ণঘটিত না হইলেও সেই সময় ও সেই উত্তাপই লাগে। উভয় প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত মকরধ্বজ বিশ্লেষণ করিলে সেই এক ভাগ পারদ ও ৫·২৫ ভাগ গন্ধক ছাড়া সোনার লেশমাত্র পাওয়া যায় না। সুতরাং Catalysis-এর কথা এখানে আদৌ খাটে না। অতএব মকরধ্বজ প্রস্তুত করণে সুবর্ণ নিষ্প্রয়োজন, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কোন দোষ দেখি না। মকরধ্বজের বিশুদ্ধতা ও উপকারিতা, পারদ ও গন্ধকের বিশুদ্ধতার উপরেই নির্ভর করে; রাশিকৃত সুবর্ণ দিলেও সে কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না।

ষড়্‌গুণবলিজারিত মকরধ্বজ—'রসবন্ধ' অর্থাৎ পারদের দ্রবত্ব নষ্টকরণ সম্পর্কে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র লিখিয়াছেন,—৬ ভাগ পারদ ও ১ ভাগ জারিত স্বর্ণ এবং গন্ধক একত্র

* Ostwald's Principles of Chemistry, p. 105.

† Ostwald's Principles of Chemistry, p. 104.

মিশ্রিত করিয়া একটি বর্ত্তুল প্রস্তুত করিবে। পরে উহাতে সমপরিমাণ গন্ধক দিয়া আবৃত 'খুলি'তে পাক করিবে। এইরূপে পারদের সহিত ছয় ভাগ গন্ধক দিলে যে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়া থাকে * তাহাই ষড়্‌গুণবলিজারিত মকরধ্বজ।

কজ্জলী হইতে একপ্রস্থ মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া ঐ মকরধ্বজকে পুনরায় সমপরিমাণ শোধিত গন্ধকের সহিত চারি দিবস মর্দ্দনপূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে পূর্ব্ববর্ণিত প্রক্রিয়ানুসারে পাক করা হইল। এইরূপে ছয়বার পুনঃ পুনঃ গন্ধক মিশাইয়া পাক করিলে যে মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়, তাহাকে ষড়্‌গুণবলিজারিত মকরধ্বজ বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই যে, সাধারণ মকরধ্বজ অপেক্ষা ইহা অধিক বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ মকরধ্বজকে বদ্ধযন্ত্রে উত্তপ্ত করিলে মকরধ্বজ ব্যতীত আর কিছুই বাহির হইবে না, কারণ মকরধ্বজ অর্থাৎ crystalline sulphide of mercury অত্যন্ত স্থবির, শীঘ্র বিশ্লিষ্ট হয় না। সুতরাং উহাকে উত্তপ্ত করিলে, উহা হইতে পারদ সহজে বাহির হইবে না। সাধারণ মকরধ্বজকে উত্তপ্ত করিলে কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে, হিঙ্গুল হইতে যেরূপ পারদ বাহির হয়, সেইরূপ পারদ বাহির হইয়া থাকে। মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে কখনও কখনও দুই তিন রাত্রি ধরিয়া জ্বাল দিতে হয়। সেস্থলে কিঞ্চিৎ রসাক্সিদ (mercury oxide) হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। যদি মকরধ্বজে পারদাক্সিদ থাকে, তবে তাহা জীবশরীরে প্রয়োগ করা বিধেয় নহে, কারণ মকরধ্বজের অনুপানে জল থাকেই। এই জলে পারদাক্সিদ কিয়ৎপরিমাণে দ্রবীভূত হয় এবং বিষের † ন্যায় কার্য্য করে। সুতরাং মকরধ্বজের বিশুদ্ধতা বড়ই প্রয়োজন এবং এই কারণেই ষড়্‌গুণবলিজারিত মকরধ্বজ ব্যবহার প্রশস্ত। পাকের তারতম্যে কতকটা কাঁচা মকরধ্বজ—অর্থাৎ যাহা সহজেই বিশ্লিষ্ট হয় (unstable red variety) এবং কতকটা crystalline বা দানাযুক্ত মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়। ষড়্‌গুণবলিজারিত মকরধ্বজে সে দোষ থাকে না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ছয় ভাগ শোধিত গন্ধকের সহিত এক ভাগ শোধিত পারদ মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহাকে বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে যে মকরধ্বজ হয়, তাহাই ষড়্‌গুণবলিজারিত। আমার নিকট ইহা ভ্রান্তি-মূলক বলিয়া বোধ হয়, কারণ ইহা কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এই প্রক্রিয়াতে সাধারণ মকরধ্বজই প্রস্তুত হইবে এবং উহাকে সাধারণ রসসিন্দূর বলা যাইতে পারে। ষড়্‌গুণবলিজারিত মকরধ্বজকে বদ্ধযন্ত্রে পাক করিলে (বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া পাক করিলে) ষড়্‌গুণবলিজারিত সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়। ইহা তিন চারি দিবস ধরিয়া অত্যন্ত মৃদু জ্বাল দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপ জ্বালে ষড়্‌গুণবলিজারিত

* P. C. Ray's History of Hindu Chemistry, p. 73.

† Cf. "Water standing in contact with mercury assumes poisonsous properties. Whether this is due to the solution of a trace of oxide formed or to the solution of metal in water it has not yet been determined."—Ostwald.

মকরধ্বজ আস্তে আস্তে উবিয়া যায়; তাহাতে সিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বদোষমুক্ত মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়।

মকরধ্বজের বিশুদ্ধতা বিষয়ক পরীক্ষা—(১) ইহাকে একটি বদ্ধযন্ত্রে (অর্থাৎ যে যন্ত্রে বোতলের মুখ বদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় তাহাতে) অত্যন্ত মৃদু আলে তিন চারি দিবস ধরিয়া পাক করিলে বোতলের গাত্রে মাত্র মকরধ্বজই লাগিবে, উহা হইতে পারদ বাহির হইবে না। বিলাতী এইরূপ একটি যন্ত্রের মূল্য ১৫৲ টাকা মাত্র। (২) নেত্রিকাম্ল (nitric acid) বা অন্য কোনও অম্লে ইহার লেশমাত্র দ্রবীভূত হইবে না। (৩) রাজাম্ল (aqua regia) অর্থাৎ তিন ভাগ সদ্যমিশ্রিত আর্দ্রকুলহরিকাম্লে (hydrochloric acid) এক ভাগ নেত্রিকাম্ল (nitric acid) মিশাইয়া যে দ্রাবক হইবে তাহাতে ইহা শীঘ্র দ্রবীভূত হইবে। (৪) ক্ষারগুল্বিদে (alkaline sulphide) ইহা বেশ দ্রবীভূত হইবে এবং উহা হইতে পুনরায় দানা অর্থাৎ crystal বাঁধিবে। এই সকল পরীক্ষা দ্বারা মকরধ্বজের বিশুদ্ধতা জ্ঞাত হওয়া যায়। যে মকরধ্বজ খলে মাড়িলে সুন্দর লাল দেখায়, কবিরাজ মহাশয়েরা তাহাকেই বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন। এরূপ পরীক্ষা আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

পারদ বিশুদ্ধকরণের প্রণালী—মকরধ্বজের বিশুদ্ধতা পারদ ও গন্ধকের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে। গন্ধকে বিশেষ কোন মন্দ পদার্থ থাকে না এবং উহা সহজেই শোধিত হইয়া যায়। পারদ শোধনই কঠিন। আয়ুর্ব্বেদমতে যেরূপে পারদ শোধন করা হয়, তাহা উত্তম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদমতে আরও বহুপ্রকার পারদশোধনপ্রণালী আছে, তাহা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রণীত History of Hindu Chemistry পুস্তকে দ্রষ্টব্য। এসকল ছাড়া আধুনিক প্রথাগুলিও জানা আবশ্যক। পারদের মধ্যে বঙ্গ (tin), দস্তা (zinc) এবং সীসক (lead) থাকে; এই সকল পদার্থ হইতে পারদকে পৃথক করা নিতান্ত বিধেয়; কারণ তাহা না হইলে জীবশরীরে উহা বিষের ন্যায় মন্দ ফল দিয়া থাকে। রসুন দ্বারা পারদ যে সীসক ইত্যাদি পরিশূন্য হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়, আমি তাহা সপ্রমাণিত করিয়াছি *। সাধারণ ভাবে পারদ পরিস্রুত করিতে আরও তিনটী উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(১) অষ্টওয়াল্ড-এর প্রণালী—এই প্রণালী † (২ নং চিত্র) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় ১৩১৮ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে বর্ণনা করিয়াছেন। একটী তিন ইঞ্চি ব্যাসের

* মৎকৃত জার্ম্মাণ প্রবন্ধাদি দ্রষ্টব্য—Die Einwerkung der sulfide der Allylgruppe auf Bleiamalgam und Quecksilber.—Die völige Reinigung von Quecksilber, published in Der Zeitschuft für Anorganische Chemic, Band 83. (1913).

† Ostwald's Principles Chemistry, p. 658.

ও ৪।৫ ফুট দৈর্ঘ্যের কাচনলের এক দিকে একটী ফণ্ডিল (ফুঁদিল) কর্কের ভিতর দিয়া খুব চাপিয়া বসাইতে হয়। ফণ্ডিলটীর নল অতি সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক এবং কাচের নলের অপর দিকটী ক্রমে সরু হইয়া ইংরাজী U অক্ষরের ন্যায় বাঁকিয়া এবং পুনরায় উহার ডাহিনের

চিত্র—২

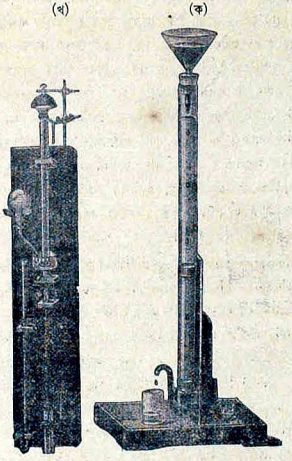

পারদপরিস্রবণ প্রণালী

বাহুটী উল্টাইয়া নিম্নমুখ হইবে। ঐ মুখের নীচে একটী পাত্র রাখিতে হইবে। কিয়ৎ পরিমাণ শুল্বারিকাম্লের জলে একটু পাতসিয়ম দ্বিক্রমেত (potassium bichromate) ফেলিয়া দিয়া দ্রবীভূত করিতে হইবে। পারদকে প্রথমে এই জলে খুব নাড়িয়া লইয়া পরে ভাল জলে ধুইয়া সূর্য্যের তাপে কিম্বা মৃদু আলে শুকাইতে হইবে। পরে মোটা কাপড়ের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া অল্পে অল্পে ঐ যন্ত্রস্থ ফণ্ডিলে দিতে হইবে। ফণ্ডিলের বন্ধনীটী এমন ভাবে ঘুরাইতে হইবে যেন পারা খুব সরু ধারে পড়ে। নলের মধ্যে জলে কিঞ্চিৎ রসনেত্রেত (mercurious nitrate) ও অল্প নেত্রিকাম্ল দিতে হয়। পারা অতি সূক্ষ্ম ধারে এই নলের মধ্যে পড়িলে অন্যান্য

ধাতুগুলি অক্ষজনিত হইয়া যাইবে অথচ পারদ হইবে না; সুতরাং পারদ পরিষ্কৃত হইয়া নলের শেষভাগ দিয়া পড়িবে। যত ময়লা নলের মধ্যে জলেই থাকিয়া যাইবে। পারদ পরিষ্কার করিবার ইহা একটী উত্তম উপায়। এই যন্ত্রের মূল্য ১৫৲ টাকা মাত্র (২ক নং চিত্র)।

২। Hermann Kolbe-র প্রণালী*—পারদকে মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া একখানি প্রশস্ত চীনেমাটীর থালায় রাখিয়া তাহার উপর জলীয় নেত্রিকাম্ল (dilute nitric acid) দিলে ইহাতে রসনেত্রের উৎপত্তি হইবে। এই পদার্থ হইতে অক্ষজন বহির্গত হইয়া সীসক ইত্যাদি ধাতুকে অক্‌সিদে পরিণত করে। এইরূপে পাঁচ সাত দিবস পারদকে ঐ অম্লে ফেলিয়া নাড়িলে উহার সমুদায় ময়লা কাটিয়া যায়। পরে উহাকে পরিশ্রুত জলে বেশ করিয়া ধুইয়া ফণ্ডিলের সাহায্যে জল পৃথক্ করিয়া শুকাইয়া লইলে উহা বেশ বিশুদ্ধ থাকে।

৩। Clarke এবং Dunstan-এর প্রণালী—পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় পারদ একেবারে বিশুদ্ধ হয় না। বিশিষ্ট পরিশ্রবণকারী যন্ত্রে (special pump) দিয়া উহার জল বাহির করিয়া মৃদু তাপে বাষ্পীভূত করিয়া চোলাই করিলে উহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়। Dunstan-এর যন্ত্রের মূল্য ৩০৲ টাকা, Clarke-এর যন্ত্রের মূল্য ৫০৲ টাকা মাত্র (২নং চিত্র খ)। কিন্তু রসুনের রসে যে পরিশুদ্ধ পারদ প্রস্তুত হয়, তাহা উল্লিখিত প্রণালীকৃত বিশুদ্ধ পারদ অপেক্ষা, এমন কি পরিশ্রুত বিশুদ্ধ পারদ অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। উহা আমি সপ্রমাণিত করিয়াছি†। পরিশ্রুত পারদও সীসক-মুক্ত নহে, তাহা বর্ণবিশ্লেষণ যন্ত্রের (spectroscope) দ্বারা দেখান যাইতে পারে।

বিশুদ্ধ পারদের লক্ষণ—কোনও পরিষ্কার শুষ্ক কাচপাত্রে বিশুদ্ধ পারদ ঢালিলে ইহার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না। যদি উহার উপর সাদা ছানি পড়ে তাহা হইলে উহাতে নিশ্চয়ই অন্য পদার্থ বর্ত্তমান আছে বুঝিতে হইবে। এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালিবার সময় বিশুদ্ধ পারদ সুগোল ফোঁটা ফোঁটা হইয়া পড়িবে; যদি সুতার ন্যায় পড়ে বা সুতার ন্যায় পদার্থ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে উহা অশুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে‡।

মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার নূতন প্রণালী—পারদের ধূম লাগান শারীরিক অকল্যাণকর বুঝিয়া অনেকে মকরধ্বজ প্রস্তুত করেন না। সাধারণতঃ এক সম্প্রদায়বিশেষই ইহা করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধ, কেহ কুষ্ঠগ্রস্ত কাহারও বা পক্ষাঘাত হইয়াছে, এরূপ দেখা অথবা শুনা যায়। নিম্নলিখিত বহুপরিক্ষীত প্রণালীমতে মকরধ্বজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই প্রণালীটীর ব্যবহার প্রচলিত হইলে কালে ইহাই প্রশস্ত উপায় বলিয়া গণ্য হওয়াও অসম্ভব নহে। ইহাতে পারা ও গন্ধক অত উত্তাপে পাক করিতে হইবে না। ইহা অতি সহজ, স্বল্পব্যয় ও স্বল্পকষ্টসাধ্য। অবশ্য এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা উদ্ভূত মকরধ্বজ আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। সেই কারণে ইহা

* Kolbe's Inorganic Chemistry.

† পূর্ব্বোল্লিখিত পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

‡ Ostwald's Principles of Chemistry, p. 657.

গ্রহণীয় না হইতেও পারে। কিন্তু মকরধ্বজ বা লালচটি বা রসসিন্দূর এবং ইহা একই পদার্থ। প্রথম প্রণালীকে অর্থাৎ যে প্রথানুযায়ী এ যাবৎ মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, উহাকে ইংরাজীতে Dry process বা (কোনপ্রকার জলীয় পদার্থের সাহায্য ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ) শুষ্ক প্রক্রিয়া বলে। আর বর্ত্তমান প্রণালীটী Wet process (ভিজা প্রণালী) অর্থাৎ ইহাতে জলীয় পদার্থের সাহায্য লইতে হয়। প্রক্রিয়াটী এইরূপ—৩০০ ভাগ পারদ ও ১১৫ ভাগ গন্ধক উত্তমরূপে খলে মর্দ্দন করিয়া ৭৫ ভাগ পাতাস্ ক্ষার (caustic potash) এবং ৪২৫ ভাগ বিশুদ্ধ জলে একত্র ৫০° শতক্রমে ১০।১২ ঘণ্টা কাল পাক করিলে লাল লাল দানা বাঁধিয়া রসসিন্দূর পৃথক্ হইয়া যায়। এই রসসিন্দূর বিশ্লেষণ করিলে গন্ধক ও পারার পরিমাণ যে অনুপাতে পাওয়া যায়, মকরধ্বজেও তাহাই পাওয়া যায়। ইহার গুণপরীক্ষা প্রভৃতিও মকরধ্বজের তুল্য; সুতরাং ইহার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।*

বংশানুবর্ত্তন

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমরা অনেক সময়ই লক্ষ্য করিয়া থাকি যে, স্ত্রী পুরুষগণ অপেক্ষা খর্ব্বকায় হয়। গো-মহিষাদি পশু, মোরগাদি পক্ষী, এমন কি মানবের মধ্যেও এই নিয়মের ব্যত্যয় কম দেখা যায়; গাভী অপেক্ষা বৃষ, মুরগী অপেক্ষা মোরগ যে সচরাচর দীর্ঘকায় হইয়া থাকে, ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ বিষয়। একই পিতামাতার কোন কোন পুত্রকে মেয়েলী-ভাববিশিষ্ট ও কোন কোন কন্যাকে পুরুষ-ভাবযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। পিতামাতার দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণাবলীও কোন কোন সন্তানে বর্ত্তায়, কিন্তু সকল সন্তানে নহে। এই সকল নিত্যপ্রত্যক্ষ ঘটনা কি আকস্মিক, না প্রকৃতই ইহাদের কোন গূঢ় কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে—অর্থাৎ বংশানুবর্ত্তন (heredity) সম্বন্ধে জার্ম্মান পণ্ডিত ফ্লেমিং ওয়াইজম্যান, বভেরি, ষ্ট্রাস্‌বুর্গার; ইংরাজ পণ্ডিত ডনক্যাষ্টার, ফার্ম্মার, জে, এস,* হাক্সলী এবং মার্কিণ পণ্ডিত ই, বি, উইল্‌সন অনেক গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যাহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ:—

উচ্চ শ্রেণীর জীব ও উদ্ভিদ্ মাত্রেরই দেহ কতকগুলি কোষ (cell) লইয়া গঠিত।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৩য় অধিবেশনে (১৩১৬ সাল) ভাগলপুরে পঠিত।

প্রত্যেক কোষের মধ্যে কোষ-পঙ্ক (cystoplasm) বর্ত্তমান, এবং ঐ পঙ্কের একস্থানে গাঢ়তর মূলাধার (nucleus) অবস্থিত। একটি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দেহ কোটি কোটি কোষদ্বারা বিনির্ম্মিত হইলেও উহা যে একটি মাত্র নিষিক্ত ডিম্বাণু (ovum) হইতে সমুদ্ভূত, এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। ডিম্বাণুটি পরিপুষ্ট হইয়া দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই বিভাগের ফলে কোষমধ্যস্থ পঙ্ক প্রায়ই সমান দুই অংশে দ্বিখণ্ডিত হয়। সুতরাং আদিম একটি মাত্র ডিম্বাণু হইতে দুইটি কোষ জন্মে। ঐ দুইটি কোষ আবার যথাকালে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া ৪টি কোষের সৃষ্টি করে। এইরূপে ৪টি হইতে ৮টি, ৮টি হইতে ১৬টি ইত্যাদি ক্রমে কোষসংখ্যা বর্দ্ধিত ও ক্রমশঃ হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল গঠিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, কোষ অপেক্ষা মূলাধারের বিভাগক্রিয়া অনেকটা জটিল ব্যাপার; কেন না উহার মূল-পদার্থ সঙ্কুচিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সূত্র বা দণ্ড (rods) উৎপাদন করে। ঐ সকল দণ্ড নানাবিধ বর্ণে রঞ্জিত হওয়ায় উহাদিগকে রঙীন-দণ্ড বা রঙ-সূত্র (chromosomes) নাম দেওয়া হয়। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে, প্রত্যেক জীব ও উদ্ভিদের কোষমধ্যে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক রঙ-সূত্র বিদ্যমান থাকে। জীব ও উদ্ভিদকোষসমূহ যখন দ্বিধাবিভক্ত হয়, তখন প্রত্যেক রঙ-সূত্রটি লম্বালম্বি ভাবে মাঝামাঝি চিরিয়া দুইটি নূতন সূত্রে পরিণত হয় এবং কোষের প্রতি খণ্ডে এক একটি সূত্র গমন করিয়া থাকে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মূল নিষিক্তডিম্বাণুমধ্যে আদিতে যতগুলি রঙ-সূত্র বিদ্যমান থাকে, পরিণত জীব ও উদ্ভিদদেহ লক্ষ লক্ষ কোষের সমষ্টিতে রূপান্তরিত হইলেও উহাদের প্রত্যেক কোষটির মধ্যে ঠিক ততগুলি রঙ-সূত্রই থাকে, তাহার অন্যথা হয় না। মাতৃগর্ভকোষ হইতে বিচ্যুত একটি ডিম্বাণু পিতৃদেহনিঃসৃত একটি বীর্য্যাণু (spermatozoon) দ্বারা নিষিক্ত হইলে পর, ক্রমশঃ পুষ্ট ও দ্বিধাবিভক্ত হইতে পারে অর্থাৎ নিষেক-ক্রিয়া ব্যতীত ডিম্বাণু হইতে নূতন জীব বা উদ্ভিদের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না।

Chromosome
বা রঙ-সূত্র

যে সকল কোষদ্বারা জীব বা উদ্ভিদের দেহ নির্ম্মিত সাধারণতঃ উহাদের মধ্যে রঙ-সূত্র প্রায় সমান সংখ্যায় বিদ্যমান। তবে কখন কখন উহাদের আয়তন ও আকৃতি বিভিন্ন দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উহাদিগকে সর্ব্বদাই জোড়ায় জোড়ায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। নিষেক-ক্রিয়ার ফলে ডিম্বাণুর অর্দ্ধেক সূত্র বীর্য্যাণুর অর্দ্ধেক সংখ্যক সূত্রের সহিত মিলিত হয় অর্থাৎ একপ্রস্থ মাতৃরঙসূত্র একপ্রস্থ পিতৃরঙসূত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভ্রূণদেহ গঠিত করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উচ্চ শ্রেণীর কি জীব, কি উদ্ভিদ, সকলেরই দেহের প্রত্যেক কোষমধ্যে বিভিন্ন প্রকারের দুই প্রস্থ রঙ-সূত্র বিদ্যমান—এক প্রস্থ পিতৃদেহনিঃসৃত এবং অন্য প্রস্থ মাতৃদেহবিচ্যুত। যতবারই কোষসকল দ্বিধা বিভক্ত হউক না কেন, ততবারই ঐ সকল সূত্র সমভাবে ভাগ হইয়া থাকে।

একদল বৈজ্ঞানিক যেমন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব দুরূহ বিষয়টির সমাধান করিতে ব্যস্ত, অন্য আর এক দল তেমনি জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে নানাপ্রকার বর্ণশঙ্কর উৎপাদন দ্বারা এই দুর্জ্ঞেয় সত্যটির সঠিক তত্ত্ব নির্ণয় করিতে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

বর্ণানুবর্ত্তনরহস্য

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়াদেশবাসী সন্ন্যাসী (monk) গ্রিগর মেণ্ডেল এই বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল লিপিবদ্ধ করেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা প্রকারের উদ্ভিদ (বিশেষতঃ মটর) লইয়া নূতন নূতন শঙ্করবর্ণের উৎপাদনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মতে একই শ্রেণীর জীব (ভেড়া, মোরগাদি) ও উদ্ভিদের (মটরাদি) মধ্যে যে সকল বিশেষত্বকে স্থায়ী বলিয়া বোধ হয়, ঐ সকলকে উত্তর-পুরুষদিগের মধ্যে অব্যবর্ত্তন বা চালনা করা যাইতে পারে, এমন কি যথোপযুক্ত পিতামাতার মিলন দ্বারা উহাদিগকে পৃথক্ করাও সম্ভব। যথা—একটি কালো বর্ণের মোরগ ও একটি কালো তিলবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের অর্থাৎ চিতে-পাথরা বা তিলে-মুরগীর মিলনে যে সকল বাচ্চা উৎপন্ন হয়, তাহারা অনেকটা একরূপ হইলেও অবিকল পিতা বা মাতার বিশেষত্ব কেহই প্রাপ্ত হয় না। উহাদের বর্ণ ঈষৎ নীলাভ কালো দেখা যায়। উহাদিগকে নীলাভ পাথরা (Blue Andalusian) বলা হয়। উহাদের পরস্পরের মিলনে যে সকল শাবক জন্মে, তাহাদের মধ্যে তিন প্রকারের বাচ্চা দেখা যায়—(১) পিতামহীর ন্যায় সম্পূর্ণ তিলে শ্বেত, (২) পিতামহের ন্যায় কালো এবং (৩) পিতামাতার ন্যায় পাথরা বর্ণবিশিষ্ট। অধিক সংখ্যক পক্ষী লইয়া পরীক্ষা করিলে এই তিন ভাব সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে—শতকরা ৫০টি পাথরা, ২৫টি তিলে-শ্বেত ও ২৫টি কালো দেখা যায়। সন্ন্যাসী মেণ্ডেল প্রকৃতপক্ষে মুরগী লইয়া পরীক্ষা করেন নাই; মটর লইয়া পরীক্ষা করেন ও পূর্ব্বোক্তরূপ ফল পান। কি জীব, কি উদ্ভিদ সকলে একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। সুতরাং উদ্ভিদজগতে যে নিয়ম দৃষ্ট হইবে, জীব রাজ্যেও সেই নিয়মের যে ব্যতিক্রম হইবে না, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত হইতে পারে না। উক্তরূপ ব্যাপার ঘটে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে ব্যাখ্যা দেন তাহা এই :—

কালো পিতামাতার প্রজনন কোষ (reproductive cells) মধ্যে এমন কিছু পদার্থ থাকে, যাহার ফলে কালো শাবক উৎপন্ন হয়। আর এই ভাব সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে। আবার শ্বেত মাতার ডিম্বাণু মধ্যে ঐরূপ কিছু পদার্থ থাকে, যাহার প্রভাব শাবকদিগের মধ্যে সংক্রমিত হয়। ঐ পদার্থকে তিনি উৎপাদক (factor) নাম দেন, আর ইহার প্রভাবে শাবকদিগের মধ্যে যে বাহ্য ভাব দেখা দেয়, তাহাকে লক্ষণ (character) বলেন। কালো ও শাদা পাখীর যখন সম্মিলন ঘটে, তখন নিষিক্ত ডিম্বাণু একটি শ্বেত ও আর একটি কালো উৎপাদক গ্রহণ করে। সুতরাং উৎপন্ন লক্ষণ না হয় শ্বেত, না হয় কালো পরন্তু মাঝামাঝি রকমের হয় (bluish andalusian)। আবার যখন এই পাথরা কুকুটগণের

মধ্যে মিলন ঘটে, মণ্ডেলের মতে তখন সমুদয় প্রজননকোষ হয় কালো, না হয় শাদা উৎপাদক গ্রহণ করে, উভয়বিধ উৎপাদক গ্রহণ করে না।

নিম্নলিখিত হিসাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে বিষয়টি অনেকটা বোধগম্য হইবে।

বর্ণশঙ্কর — পিতামাতার — শাবক

১। প্রথম পুরুষ আকৃতি ··উৎপাদক···প্রজনন-কোষ ··নিষেকক্রিয়া ··উৎপাদক ··আকৃতি

কুক্কুট, কালো × শাদা { কালো···কা, কা···সকলগুলিই কালো / শাদা···শা, শা···সকলগুলিই শাদা } → কা+শা ··কাশা···পাথরা

২। দ্বিতীয় পুরুষ

কুক্কুট, × পাথরা { ১ম পুরুষ পাথরা···কা, শা · { ৫০%কা, ৫০%শা } ; ১ম পুরুষ ঐ ···কা, শা·· { ৫০%কা, ৫০%শা }

কা+কা···কাকা·····কাল···২৫%
কা+শা···কাশা··· { পাথরা, পাথরা } ৫০%
শা+শা···শাশা·····শাদা···২৫%

প্রথমতঃ, কোন একটি জাতির (species) লক্ষণসকল নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি উৎপাদক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ঐ উৎপাদকগুলিকে সন্তানে সংক্রমিত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল উৎপাদক জোড়ায় জোড়ায় বর্ত্তমান থাকে; উহাদের একটি পিতা ও অপরটি মাতা হইতে উৎপন্ন। তৃতীয়তঃ, যখন প্রজনন-কোষগুলি উৎপন্ন হয়, তখন প্রত্যেক জোড়ার উৎপাদক দুইটি পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রত্যেক ডিম্বাণু বা প্রত্যেক বীর্য্যাণুতে উহাদের একটিমাত্র বর্ত্তমান থাকে, দুইটিই থাকে না। পরিশেষে বিভিন্ন উৎপাদকগুলি সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হইতে পারিলেও কিন্তু এই সংক্রমণকার্য্যে কোন একটি উৎপাদক অপরটির উপর আদৌ নির্ভর করে না। অতএব বাছিয়া বাছিয়া মিলন ঘটাইতে পারিলে ইচ্ছানুরূপ নূতন নূতন বর্ণশঙ্কর (cross breeds) উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কি বর্ণ, কি আকৃতি, আয়তন, কি প্রজনন-ক্ষমতা (fertility), কি তেজ (vigour), কি রোগনিরোধশক্তি, কি আয়ু সমুদয় লক্ষণই উৎপাদক সাহায্যে সন্তানে সংক্রমিত করা চলে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ লক্ষণ উৎপাদন বিষয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব বিলক্ষণ কার্য্যকরী বলিয়া বোধ হয়।

সারার্থ।

ইংলণ্ডে বেটসন এবং পুনেট, জার্ম্মানিতে বয়ার, হল্যাণ্ডে ডি ভ্রিস, মার্কিনে মর্গান প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা মেণ্ডেলের মতবাদকে (theory) নির্ভুল বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন।

রঙ-সূত্রই বংশানুবর্ত্তনের প্রধান সহায়

বহুসংখ্যক জীব ও উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত নানাবিধ পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে—

(ক) এক এক প্রকার জীব ও উদ্ভিদের বিশেষ বিশেষ লক্ষণসকল কতকগুলি কারণ বা উৎপাদকের ফলস্বরূপ। এই সকল কারণ বা উৎপাদক (unit factor) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নহে, পরন্তু জোড়ায় জোড়ায় (in groups) সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে।

(খ) জোড়ায় জোড়ায় সন্তানে সংক্রমিত হইতে পারিলেও সকল লক্ষণই যে নিশ্চয় সংক্রমিত হইবে এমন নহে।

(গ) বিশেষ বিশেষ জাতীয় জীব বা উদ্ভিদের সাধারণ লক্ষণাবলীর সংক্রমণে কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যায় না; গরুর বাচ্চা গরুর আকারই প্রাপ্ত হয়, ছাগলের ছানা ছাগলের লক্ষণ পাইয়া থাকে; ইত্যাদি।

মর্গান ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ এক জাতীয় মাছি (Drosophila) লইয়া এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। জন্মের ১৫ দিনের মধ্যেই এই সকল মাছি বহুসংখ্যক সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। প্রায় ৫ লক্ষ মাছির মধ্যে দুই শত বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণ (variations) দেখা দিলেও উহারা ৪টি মাত্র উৎপাদকের পুঞ্জ বা জোড়ার ফল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। পরীক্ষকগণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেক জোড়ায় উৎপাদকের সংখ্যার সহিত রঙ-সূত্রের (chromosomes) সংখ্যার আশ্চর্য্যরূপ মিল লক্ষ্য করেন। এই জন্যই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেছেন যে, কোষপক্ষ-মধ্যস্থ রঙ-সূত্রগুলিই পিতামাতার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সন্তানে সংক্রমিত করিবার একমাত্র সহায়।

পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্মের কারণ

মোটামুটি মানুষের পুত্র ও কন্যার সংখ্যা সমান ধরিলে বিশেষ ভুল হয় না, যদিচ কাহার কাহার পুত্র বা কন্যার সংখ্যা অধিক না হয় এমন নহে। স্ত্রী ও পুরুষের উৎপত্তি রহস্য অদ্যাবধি নির্ণীত না হইলেও পিতৃমাতৃ লক্ষণ কিরূপে সন্তানে সংক্রমিত হইয়া থাকে, তাহা অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে।

পুত্র ও কন্যাগণ আপন আপন পিতামাতাকে নানাবিধ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে দেখিলেও পুত্রগণ যে পিতার ও কন্যাগণ যে মাতার কার্য্যেরই অধিক পক্ষপাতী হইয়া থাকে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব যখন একই প্রকার, তখন এরূপ হওয়ার অবশ্যই বিশেষ কোন কারণ আছে, অর্থাৎ কোন গূঢ় কারণেই লিঙ্গানুবর্ত্তন (sex inheritance) ঘটে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীব ও উদ্ভিদ্‌দেহের মূল-উপাদানকোষমধ্যে কোষপক্ষ এবং ঐ পক্ষমধ্যে রঙ-সূত্র জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। উহারাই পিতামাতার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সন্তানে সংক্রমণ করিবার একমাত্র সহায়। অনেক পণ্ডিতের মতে ঐ সকল রঙ-সূত্রের কোন কোনটির মধ্যে লিঙ্গোৎপাদকসমূহ (sex factors) বর্ত্তমান থাকে। তাঁহারা আরো মনে করেন যে, প্রত্যেক স্ত্রীর মধ্যে দুইটি লিঙ্গোৎপাদক এবং প্রত্যেক পুরুষের

মধ্যে একটিমাত্র লিঙ্গোৎপাদক থাকে। রঙ-সূত্র কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় থাকিবার কথা; সুতরাং পুরুষের পক্ষে একটিমাত্র লিঙ্গোৎপাদক থাকা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বুঝিতে হইবে।

লিঙ্গোৎপাদক বিশেষ প্রকারের রঙ-সূত্রগুলিকে সচরাচর X-সূত্র (X-chromosme) বলা হয়। প্রাণিদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির দুইটি ও পুংজাতির একটিমাত্র X-সূত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরুষের অপর সূত্রটির কার্য্য X-সূত্রের অনুরূপ নহে; উহার আকৃতি বা আয়তন প্রায়ই ভিন্ন প্রকারের। উহাকে Y-সূত্র (Y-chromosome) বলে। বংশানুবর্ত্তন বিষয়ে ইহার কোন কার্য্য নাই বলিয়া মনে হয়। মানুষের মেরুদণ্ডের অগ্রভাগ (appendix) যেমন মাতৃগর্ভ মধ্যে কিছুদিন বর্দ্ধিত হইলেও পরে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, ইহাও যেন সেইরূপ নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। X-সূত্র অপেক্ষা Y-সূত্র ক্ষুদ্রতর, কখন কখন বিন্দুবৎ, এমন কি কোন কোন স্থলে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়।

রঙ-সূত্রের কার্য্য অনুসারে, যাবতীয় স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে স্ত্রীজাতি XX এবং পুরুষ জাতি XY রঙ-সূত্রবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে। নিষেক-ক্রিয়ার ফলে যখন নূতন নূতন প্রজনন-কোষ (reproductive cells) উৎপন্ন হয়, তখন সাধারণ রঙ-সূত্রগুলির প্রত্যেক জোড়া আর যুগ্ম থাকে না, পৃথক্ হইয়া পড়ে। স্ত্রীজাতির মধ্যে অনুরূপ দুইটি X-রঙসূত্র বিদ্যমান থাকায় প্রত্যেক ডিম্বাণুমধ্যে একটি করিয়া X-রঙসূত্র থাকিতে পারে; কিন্তু পুরুষ জাতির X-রঙসূত্র, Y-রঙসূত্র হইতে পৃথক্ হওয়ায় পুংকোষসমূহের অর্দ্ধেকগুলিতে X-রঙসূত্র এবং বাকীগুলিতে Y-রঙসূত্র থাকিতে পারে। সুতরাং X-রঙসূত্রবাহী বীর্য্যাণু যখন কোন একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে, তখন ফল হয় এই যে, সেই ডিম্বাণুটির মধ্যে দুইটি X-রঙসূত্র উপস্থিত হয়; তাহার ফলে কন্যা সন্তান জন্মে। কিন্তু যখন Y-রঙসূত্রবাহী বীর্য্যাণু নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করে, তখন ডিম্বাণু মধ্যে XY-রঙসূত্র উপনীত হওয়ায় পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে।

নিম্নলিখিত হিসাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে বোধ হয় বিষয়টি সহজে বোধগম্য হইতে পারে—

	রঙসূত্র	প্রজনন-কোষসমূহ
মাতা	XX	সকলগুলিই X-সূত্রবিশিষ্ট
পিতা	XY	অর্দ্ধেক X-সূত্রবিশিষ্ট অর্দ্ধেক Y-সূত্রবিশিষ্ট

নিষেকক্রিয়ার ফলে

মাতার X সূত্র + পিতার X-সূত্র = XX-সূত্র = কন্যা সন্তানের জন্ম।

পিতার X-সূত্র + পিতার Y-সূত্র = XY-সূত্র = পুত্র সন্তানের জন্ম।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতি বিষয়ে অনেক

পার্থক্য দেখা যায় কেন? যথা—পুংহরিণের শৃঙ্গ জন্মে, হরিণীর জন্মে না; ভারতীয় বৃষের ঝুঁটি জন্মে, কিন্তু গাভীর জন্মে না; আর্য্যজাতীয় পুরুষের দাড়িগোঁফ হয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের হয় না ইত্যাদি।

এই সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে স্ব স্ব লোকের লিঙ্গের লক্ষণগুলি প্রকটভাবে এবং অপর লিঙ্গের লক্ষণগুলি গুপ্ত (latent) ভাবে বিদ্যমান থাকে। কেননা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, একটি সাধারণ Cock-pheasant-এর (পুং) ঔরসে একটি Golden pheasant-এর (স্ত্রী) গর্ভে যে পুংসন্তান উৎপন্ন হয়, তাহার পুং Golden pheasant-এর লক্ষণ দেখা দেয়। মাতার মধ্যে পিতার লক্ষণ অদৃশ্যভাবে না থাকিলে সন্তানে ঐ লক্ষণ কিরূপে সংক্রমিত হইতে পারে? নাস্তি হইতে অস্তির তো কোন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। একটি মুরগীকে জন্মায়ুশুদ্ধ করিলে কিছুকাল পরে উহার দেহে মোরগের লক্ষণ (পালক) দেখা দেয়। জার্ম্মাণ পণ্ডিত ষ্টীনাক্ একটি ইঁদুরের পুংজননেন্দ্রিয় উঠাইয়া লইয়া ঐস্থানে একটি স্ত্রীঅঙ্গ সংযোজিত করিয়া দেন। তাহার ফলে ঐ পুং ইঁদুরটি কি আকৃতি, কি প্রকৃতি সর্ব্ববিষয়ে ইন্দুরীর ন্যায় আচরণ করিতে থাকে। আমাদের দেশে যে সকল গো-বৎসকে খাসি করিয়া বলদ করা হয়, তাহাদের বৃষের ন্যায় ঝুঁটি উঠে না, অধিকন্তু তাহার প্রকৃতি অনেকটা গাভীর ন্যায় শান্ত হইয়া পড়ে। যখন শল্যবিদ্যার (Surgery) সাহায্যে একের স্বাভাবিক জননেন্দ্রিয় পরিবর্ত্তন করতঃ অন্যপ্রকার অঙ্গ কলম (graft) করিয়া দিলে স্ত্রীপুরুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, জননেন্দ্রিয়ের সহিত জীবের আকৃতি ও প্রকৃতির বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ লিঙ্গোৎপাদকের প্রভাব সামান্য নহে।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ লক্ষণ বিদ্যমান। তবে কেবলমাত্র এক প্রকারের উৎপাদক সাধারণতঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং অন্য প্রকারের উৎপাদক সম্পূর্ণ সুপ্তভাবে থাকে, এইমাত্র প্রভেদ। সচরাচর এমন অনেক পুরুষকে দেখা যায়, যাহার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্ত্রীলোকের ন্যায়, তাহারা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সহিত মেশামেশা করিতে বা মেয়েলী কার্য্যে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত; আবার মর্দ্দা-মেয়েরও অভাব নাই। সাধারণ লোকে এই সকল অস্বাভাবিক স্ত্রীপুরুষদিগকে অপছন্দ করিলেও তাহারা প্রকৃতপক্ষে এজন্য দোষী হইতে পারে না। লিঙ্গোৎপাদক যন্ত্রের অংশবিশেষের বিপর্য্যয় বা বিশৃঙ্খলভাবে কার্য্য করার ফলে এরূপ ব্যাপার ঘটে।

সাধারণভাবে আমরা এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, কোষপঞ্জের মধ্যস্থিত রঙ-সূত্রের সহিত স্ত্রী ও পুং জননেন্দ্রিয় তথা স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

মানবের বংশানুবর্ত্তন

গো, মহিষ ও ইঁদুরের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যে পরীক্ষা দ্বারা যে সকল ফল লাভ করা যায়,

মানবের ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যেও যে অবিকল সেই সকল ফল লাভ করা সম্ভব ইহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সকলপ্রকার জীবের মধ্যে একই প্রকার বংশানুবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য জীব অপেক্ষা মানবের মস্তিষ্ক ও মানসিক শক্তি অধিকতর উচ্চ ধরণের কেবল এইমাত্র তফাৎ। বহুসংখ্যক মানুষ লইয়া বংশানুবর্ত্তন পরীক্ষা করা কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নহে, কেন না ২।৪ পুরুষ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকা মানবের পক্ষে অসম্ভব। অথচ অল্পায়ু কীটপতঙ্গ লইয়া তাহাদের বহুপুরুষের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করা অনেকেরই পক্ষে আদৌ অসম্ভব নহে।

ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, অনেক লোক লাল, নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণের পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পারে না। এইরূপ লোককে বর্ণান্ধ বলা হয়। আবার কতক লোকের অঙ্গুলি অযথা খাটো হইয়া থাকে। এই রোগের ইংরাজী নাম brachydactyly। কোন লোকের রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না। এই রোগকে hæmophilia বলা হয়। এইরূপ আরো কতকগুলি রোগ মেণ্ডেলের নিয়ম মত উত্তর পুরুষে সংক্রমিত হইয়া থাকে।

সুবিখ্যাত পণ্ডিত গ্যাল্টন বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পিতামাতার অনেক মানসিক দোষগুণ সন্তানে নির্দ্দিষ্টরূপে সংক্রমিত হইতে পারে, এবং মানসিক শক্তিসকল মস্তিষ্কের স্থানবিশেষের (cortex of the cerebral hemisphere) সহিত প্রগাঢ়ভাবে সংবদ্ধ। সুতরাং পিতামাতার আকৃতি ও প্রকৃতির ন্যায় মানসিক শক্তি সকল সন্তানে বর্ত্তিবে না কেন? আমরাও দেখিতে পাই সাধারণতঃ দয়াবতী মাতার কন্যা দয়াবতী ও মাতালের পুত্র মাতাল হইয়া থাকে।

সুতরাং বংশানুবর্ত্তনের নিয়মগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচিত হইলে বংশের অর্থাৎ দোষগুণসকল ঐ বংশীয় পুত্রকন্যা ও পৌত্রপৌত্রীর মধ্যে কিভাবে সংক্রমিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা জানা থাকিলে লোকে আপন আপন বংশের তথা প্রকারান্তরে সমগ্র সমাজের দোষ পরিহার করতঃ গুণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। কৃষকগণ গোমহিষাদি গৃহপালিত পশু ও কলাইমুগ প্রভৃতি শস্যের দোষ সংশোধন পূর্ব্বক গুণ বৃদ্ধির উপায় জানিতে পারিলে মনুষ্যসমাজের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। *

---

* "Discovery" পত্রিকা হইতে এই প্রবন্ধের অনেক অংশ গৃহীত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিরও সাহায্য লইয়াছি—

১। The Inheritance of Sex by L. Doncastor (Cambridge Press)

২। Mendel's Principles of Heredity by W. Bateson.

৩। Heredity and Society by W. C. D. Whetham (Longmans)

৪। Inbreeding and Outbreeding by East and Jones.

৫। Eugenics by Edgar Schuster (Collins).

ভারতের গাছ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিজনবিহারী দত্ত

ক

ভারতীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	
কৃষ্ণগন্ধা	Morunga hyperanthera	
কৃষ্ণগর্ভ	Same as কটফল	
কৃষ্ণচঞ্চুক (ছোলা)	Cicer arietinum	
কৃষ্ণচূড়া	Cæsalpinia pulcherima	
কৃষ্ণচূড়িকা (গাঁজা)	Cannabis sativa	
কৃষ্ণজীরক	Nigella indica	
কৃষ্ণত্রিবৃৎ	Convolvulus turpethum	
কৃষ্ণদন্তা	Goneliva arborea	
কৃষ্ণপদক	Carissa carondas	
কৃষ্ণপিত্তীতক	Vangueria spinosa	
কৃষ্ণপুষ্পী	Same as কটুকী	M. P.
কৃষ্ণফলা	Serratula anthelmintica	
কৃষ্ণভূবিজা (গোমূত্রিকা)		
কৃষ্ণভেদা, কৃষ্ণভেদী	Same as কৃষ্ণপুষ্পী	
কৃষ্ণমুগ, কৃষ্ণমুদ্গ	Phaseolus max	
কৃষ্ণমূলী	Same as অনন্তমূল	
কৃষ্ণরুহা		
কৃষ্ণল, কৃষ্ণলক (কুঁচ)	Abrus precatorius	
কৃষ্ণলা	Same as কৃষ্ণচূড়িকা	
কৃষ্ণবৃক্ষ	Plumbago zeylanica	
কৃষ্ণনর্ব্বাক	Ocynum pilosum	
কৃষ্ণবল্লী	Same as অনন্তমূল	
কৃষ্ণবীজ (তরমুজ)	Citrullus vulgaris	

ভারতীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	
কৃষ্ণবৃন্তা	Glycine debilis	
কৃষ্ণবৃন্তিকা	Gmelina arborea	
কৃষ্ণসার (মনশা)	Euphorbia nerifolia	M. P.
কৃষ্ণশিগ্রু	Morunga sp.	
কৃষ্ণশিম্বী	Dolichos virosus	
কৃষ্ণসারথি	Same as অর্জ্জুন	
কৃষ্ণসারার (শিশু)	Dalbergia sissoo	
কৃষ্ণস্কন্ধ (তমাল)		
কৃষ্ণা	Nigella indica	
	Serratula anthelmintica,	
	Gmelina arborea	
কৃষ্ণাপরাজিতা (অপরাজিতা)	Clitorea Ternatea	
কেওড়া	Pandanus odonatissimus	
	Sonneratic apetala	F. P.
কেঁউ	Costous speciosus	
	Diospyros melanoxylon	
	„ tomentosa	
কেচুক	Colocasia sp.	
	Diospyros melanoxylon	
কেতক, কেতকী (কেয়া)	Same as কেওড়া	
কেদার-কটুকা		
কেন্দড়া	Commelina madiflora	
কেন্দু	Diospyros tomentosa	
কেন্দুক	„ glutinosa	
কেমুক	Diospiros tomentosa	
কেরতী	Eclipa prostrata	
কেরণী	Capparis aphylla	
কেরালী	Ambrosinia ciliata	
কেলিক (অশোক)		
কেলিকদম্ব	Nauclea cordifolia	

ভারতীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
কেলিয়াকোঁড়া	Menispermum
কেলিবৃক্ষ	Nauclea cordifolia
কেশপর্ণী	Achyranthes aspera
কেশপুষ্টী	Scirpus kysoor
কেশক্রম	Creatoslema vaccinacea
কেশর (নাগকেশর)	Musa ferra
বকুল	Mimuspos elengi
কেশরঞ্জন	Verbesina calendulacea
কেশরাজ, কেশারিয়া	„ „
কেশরিয়া	„ „
কেশরী	Lathyrus sativa
কেশরীমলঙ্গা	Scirpus bispicatus
কেশরূপা	
কেশবায়ুধ (আম)	Mangifera indica
কেশবালয়, কেশবাবাল (অশ্বত্থ)	Ficus religiosa
কেশহন্ত্রী (শমী)	Acasia suma
কেশিকা	Asparagus racemosus
কেশুর	Scirpus kysoor, Cyperus pertenuis
কেশুরিকা	Scirpus kysoor
কেশে	Saccharum spontaneum
কেশ্য	
কেসর	Same কেশর
কেসরী	Lathyrus sativa
কৈটজ (কুর্চ্চি)	Holarrhena anti-dysenteria
কৈটর্য্য (নিম)	Melia Azedarach
কৈডর্য্য	
কৈবর্ত্তমুস্তক, কৈবর্ত্তী	Cyperus rotundus
কোকনদ	Nymphæa rubra
কোকিলনয়ন	Capparis spinosa
কোকিলাবাস	Mangifera indica
কোকিলোৎসব	„ „

ভারতীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
কোকরা	Alnus dicoca
কোটিবর্ধা	Medicago esculenta
কোটী	„ „
কোঠর	Alangium hexapetalum
কোঠঃপুষ্পী	Leltsomia nevvosa
কোদালিয়া	Hedysarum triflorium
কোদ্রব	Palaspalum kora
কোল	Plambago zeylanica
কোলক	Alangium hexapetalum, Cordia myxa
কোলবল্লী	Pothos officianalis, Piper chavya
কোবিদার	Bauhinia variegata
কোশফলা	Convolvulus herpethum
কোশাঙ্গ	A species of Cyperaceæ.
কোশাতকী, কোষাতকী	Luffa acutangula
কৌটজ (কুটজ)	Same as কৈটজ
কৌশিক্যোজ (শেওড়া)	Streblus asper
ক্রকচ	Capparis aphylla
ক্রকচছদ (কেতকী)	Pandanus odoratissimus
ক্রকচা	„
ক্রকণ	Perdix sylvetica
ক্রমপুরক (বক)	Sesbania grandiflora
ক্রমিকণ্টক	Plumbago rosea zeylanica
ক্রমিঘ্ন (বিড়ঙ্গ)	
ক্রমিজ	
ক্রমু	
ক্রমুক	Cyperus rotundas
ক্রমুকী (শুপারী)	Areca catechu
ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা	Hemionites cordifolia
ক্রোষ্টুক মেখলা	„ „
ক্রৈষ্টী	„ „

ভারতীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
ক্রৈষ্টী	Convolvulus paniculata
ক্ষতবিংধ্বংসী	Convolvulus argenteus
ক্ষত্রবৃক্ষ	Pterospermum salicifolium
ক্ষমা	Mimosa catechu
ক্ষমাদংশ (সজিনা)	Moringa pterygosperma
ক্ষমানাশিনী	Celtis orientalis
ক্ষরপত্রা (দ্রোণপুষ্পী)	Sinapis dichotoma
ক্ষব	Achyranthes aspera
ক্ষবক	Artemisia sternutoria
ক্ষবকৃৎ	Same as ক্ষরপত্রা
ক্ষবপত্রা	Solanum melangena
ক্ষবিকা (বেগুন)	
ক্ষরদ্রু (ঘণ্টপটলী)	Achyrenthes aspera
ক্ষারমধ্য	Same as ক্ষরদ্রু
ক্ষারবৃক্ষ	Hibiscus populnesides
ক্ষিপ্রপক্ষী	Convolvulus paniculata
ক্ষীরকন্দ	Euphorbia antiquorum
ক্ষীরকান্তক	Streblus aspor
ক্ষীরনাশ (শেওড়া)	Same as ক্ষমাদংশ
ক্ষীরমোচক (সজিনা)	Same as ক্ষীরকন্দ
ক্ষীরবিদারী	Tragia involucrata
ক্ষীরবিষানিকা	Buchanania latifolia
ক্ষীরবৃক্ষ	Same as ক্ষীরকন্দ
ক্ষীরশুক্তা	„ „
ক্ষীরশুক্লা	Asclepias rosea
ক্ষীরাবী	Pinus sp.
ক্ষীরহব্য	Mimusops kanki
ক্ষীরিকা	„ Lycopodium imbricatum M. P. „ Asclepias rosea
ক্ষীরিণী	Gmelina arborea

ভারতীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
ক্ষীরি	Mimusops kanki
	Asclepias rosea
	Euphorbia antiquorum
	Buchanania latifolia
ক্ষুদিয়া জাম	Antidesma paniculata
ক্ষুদিয়া নটিয়া	Amurantus polyganous
ক্ষুদিয়া রাই	Sinapis ramosa
ক্ষুদ্র ছুরালভা	Hedysarum alhagi
ক্ষুদ্র ফলক	Celtis orientalis
ক্ষুদ্রফলা	Premua herbacea
	Solanum jaquini
	Ardisia solanacea
ক্ষুদ্রমুস্তা	Scirpus kysoor
ক্ষুদ্রবর্ত্তাকিনী	Solanum jaquini
ক্ষুদ্রশীর্ষ	Celosia cristata
ক্ষুদ্রসহা	Phaseolus trilobus
ক্ষুদ্রা (কণ্টাকারী)	
ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ	Premna spinosa
ক্ষুদ্রাপামার্গ	Achyranthes aspera
ক্ষুদ্রেক্ষুজী	Same as ক্ষুদ্রছুরালভা
ক্ষুর	Capparis spinosa
	Tribulus longionus
ক্ষুরক	" "
ক্ষুরাঙ্গ	" "
ক্ষুরিনী	Lycopodium imbricatum
ক্ষেত্রককর্কটী	Cucumis utilatissimus
ক্ষেত্রজা	Solanum jacquini
ক্ষেত্র দূতী	" "
ক্ষেত্রপর্পট	Oldenlandia biflora
ক্ষেত্ররুহা	Same as ক্ষেত্রককর্কটী
ক্ষেত্রামলকী	Flacourtia catapharacta

ভারতীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	
ক্ষেত্রি (চম্পক)	Michelia champaca	F. P.
ক্ষেড়া	Luffa acutangula	

(ক্রমশঃ)

বিবিধ

অধ্যাপক পিকার্ডের গগনপর্য্যটন

গত ১০ই আগষ্ট ব্রুসেল্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ, পিকার্ড ডাঃ ম্যাক্স কজিন্সকে সঙ্গে লইয়া বায়ুমণ্ডলের stratosphere-এ পৌছিবার উদ্দেশ্যে ডুবেনডোর্ফ বিমান-ঘাটী হইতে সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে দ্বিতীয়বার বেলুন আরোহণ করেন। মিলিকান্ আবিষ্কৃত "কস্‌মিক্ রে" সম্বন্ধে অভিনব তত্ত্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খৃঃ অব্দের ২৭শে মে তিনি প্রথমবার বেলুনে আরোহণ করিয়া প্রায় ৯½ মাইল উপরে উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবারও তিনি একই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া বেলুন আরোহণ করেন। এবার তিনি বায়ুমণ্ডলের এই stratosphere-এ প্রায় ১০½ মাইল পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আর কেহ এত উর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রায় ১২ ঘণ্টাকাল উপরে ভ্রমণ করিয়া গার্ডা হ্রদের ৮ মাইল দক্ষিণে Cavallaro di Mouzambano নামক স্থানে অবতরণ করেন। বিবিধ প্রকারের পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী করিয়া বেলুনটিকে বিশেষভাবে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। বেলুনটিকে আধাআধি মাত্র গ্যাসপূর্ণ করিয়া পিকার্ড যাত্রা করেন; কারণ যতই উর্দ্ধে উঠা যাইবে বায়ুর চাপ ততই কমিতে থাকিবে এবং ভিতরের গ্যাস আয়তনে বর্দ্ধিত হইয়া বেলুনকে ফুলাইয়া তুলিবে। অর্থাৎ মাটীতে বেলুনের ব্যাস যদি ১ ইঞ্চি থাকে তবে ১৫,০০০ ফুট উপরে উহা ১½ ইঞ্চি বাড়িয়া যাইবে; এইরূপে ৩১,০০০ ফুট উপরে বাড়িবে প্রায় ১½ ইঞ্চি, ৪৫,০০০ ফুটে প্রায় ১৯ ইঞ্চি এবং ৫০,০০০ ফুট উপরে ২ ইঞ্চির একটু বেশী। কাহারও কাহারও মতে অধ্যাপক পিকার্ড নাকি বলিয়াছেন যে, উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই cosmic rays-এর তীব্রতা এত বৃদ্ধি পায় যে, তাপলেখ যন্ত্রে একপ্রকার গুরুগম্ভীর শব্দ উৎপন্ন হইতে থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন, আলোককণিকাসমূহ তখন বেলুনের উপর যেন বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষিত হয়। ৩০০০ মিটার উপরে উঠিয়াই অধ্যাপক পিকার্ড এবং তাঁহার সঙ্গী cosmic rays-এর পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করেন এবং প্রায় ১৬,৩০০ মিটার পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালাইয়াছিলেন। এই উচ্চতায় শৈত্যের মাত্রা শূন্যের নীচে প্রায় ৩৬° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। পিকার্ড বলিয়াছেন, বেলুনের বসিবার কামরায় শাদা রং-এর আস্তরণ থাকার জন্য সূর্য্যরশ্মি

প্রতিহত হওয়াতেই এত তীব্র শৈত্যের অনুভূতি হইয়াছিল। পূর্ব্ববারে কিন্তু বেলুনের কামরায় কালো রং থাকাতে খুব উত্তাপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ভূমিতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা উভয়েই অনেকক্ষণ অসাড় ভাবে ঘাসের উপর শুইয়া পড়িয়াছিলেন। বোধ হয় উপরের অত্যধিক ঠাণ্ডা হইতে হঠাৎ নীচের গরমে আসায় তাপের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক সিকার্ডের পর্য্যবেক্ষণের বিস্তৃত বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া আছেন, কারণ এ পর্য্যন্ত বায়ুমণ্ডলের stratosphere ও অন্যান্য উর্দ্ধতন মণ্ডল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই। স্বয়ংক্রিয় চাপমান, তাপমান ও অন্যান্য যন্ত্র লইয়া আরোহীশূন্য বেলুন এপর্য্যন্ত ২১ মাইলের কিছু উপরে উঠিতে সমর্থ হইয়া থাকিলেও তদ্দ্বারা ঐ সকল স্থানের অবস্থা সন্তোষজনকভাবে কিছুই জানা যায় নাই। কাজেই সাধারণের—বিশেষতঃ অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরই বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধদেশের অবস্থা জানিবার কৌতূহল পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। এপর্য্যন্ত নানা প্রকার গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা উর্দ্ধতন বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপতঃ এই—

পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে এভারেষ্ট শৃঙ্গের উচ্চতা প্রায় ৫½ মাইলের উপর, ইহার উপরেও প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত মেঘের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, মোটের উপর ৭½ মাইল পর্য্যন্ত মেঘ দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৬½ মাইল পর্য্যন্ত যে বায়ুমণ্ডল, তাহাকে troposphere বলে। এই মণ্ডলের উর্দ্ধে শৈত্য ক্রমশঃই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট সাউকেক্ এরোপ্লেনে প্রায় ৪৩,১৬৩ ফুট অবধি আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৬½ মাইল হইতে ১৮½ মাইল পর্য্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে stratosphere বলে। ৭½ মাইল হইতে প্রায় ১৯ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে তাপের মাত্রা প্রায় সমান দেখা যায়। ১২½ মাইল হইতে ১৮½ মাইল পর্য্যন্ত শৈত্যের মাত্রা তীব্রতম, ইহাকে বায়ুস্তরের হিমমণ্ডল বলা যাইতে পারে। এখানে শৈত্যের মাত্রা শূন্যের নীচে ৬০ ডিগ্রি ফা. হি.। Stratosphere-এর উপর হইতে অর্থাৎ ১৯ মাইলের পর হইতে তাপের মাত্রা বাড়িতে থাকে, ২৫ মাইল হইতে ৩১ মাইল পর্য্যন্ত তাপের মাত্রা ভূপৃষ্ঠের তাপের প্রায় সমান। ৩১½ মাইলের পর দিনের বেলায় heaviside layer-এর অস্তিত্ব অনুভূত হয়, রাত্রিতে কিন্তু এই heaviside layer ৫৬ মাইল উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। ৩১ মাইল হইতে ৩৭ মাইল পর্য্যন্ত উত্তাপের মাত্রা প্রায় ফুটন্ত জলের তাপের সমান। এই heaviside layer-এ প্রতিহত হইয়াই বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে; এই স্থানের বায়ুমণ্ডল উত্তম তড়িৎপরিচালক। ৫০ মাইলের উপর হইতে বায়ুমণ্ডল সৌরকরশোষণকারী ওজোনে (Ozone) পরিপূর্ণ। ৫৬½ মাইল হইতে ৬২½ মাইল পর্য্যন্ত বায়ুমণ্ডল প্রায় ফাঁকা।

কারেণ্ট সায়েন্স

বিগত বর্ষের বসন্ত সংখ্যা প্রকৃতিতে আমরা কারেণ্ট সায়েন্স নামক বৈজ্ঞানিক পত্রিকার শীঘ্রই প্রকাশিত হইবার সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমাদের পাঠকবর্গকে উক্ত আনন্দ সংবাদ জ্ঞাপন করার পর ইতিমধ্যে কারেণ্ট সায়েন্সের তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সাজসজ্জা এবং প্রবন্ধাদি সম্পর্কে পরিচালকবর্গ আমাদিগকে যেরূপ পূর্ব্বাভাস দিয়াছিলেন, সুখের বিষয় তাঁহারা সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছেন। পত্রিকাখানিতে প্রথমে সম্পাদকীয় নিবন্ধ, পরে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা লিখিত একাধিক মূল্যবান প্রবন্ধ এবং তৎপরে মৌলিক গবেষণাসম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত রচনা, বিভিন্ন অভিনব আবিষ্কারের সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় অন্যান্য সংবাদ অথবা সাধারণ মন্তব্যের জন্যও একটি বিশেষ অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে। ইতিমধ্যেই Chemistry & Currency Future of Agriculture in India, Waterfalls as Habitats of Animals, South Indian Neolithic Culture, The Affinities of Chætognatha প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ, বহু গবেষকের মৌলিক গবেষণার সংক্ষিপ্তসার কারেণ্ট সায়েন্স বিজ্ঞানপাঠলিপ্সু জনসাধারণের গোচরীভূত করিয়াছে। লক্ষ্য করিলে ইহা সহজে প্রতীয়মান হইবে যে, কারেণ্ট সায়েন্স এই তিন সংখ্যাতে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বস্তুতঃ সদ্যঃপ্রকাশিত তৃতীয় সংখ্যাটি দেখিলে ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করিতে দ্বিধা হয় না।

কারেণ্ট সায়েন্স ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মুখপত্র। এইরূপ একখানি মুখপত্রের অভাব বহুদিন হইতে অনুভূত হইয়া আসিতেছে। বিজ্ঞান কংগ্রেসের সম্পূর্ণ সংবাদ, মূল সভাপতি এবং শাখা সভাপতিগণের মূল্যবান্ অভিভাষণ প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য নানা বিষয় এইরূপ একখানি পত্রিকার অভাবে সাধারণের গোচরে আসিত না; দৈনিক সংবাদপত্রসমূহই এতদিন একমাত্র সম্বল ছিল। এই অসুবিধা ও অভাব যে এখন দূরীভূত হইবে বিজ্ঞানসেবীগণের পক্ষে ইহা বস্তুতঃ আনন্দের কথা।

ম্যালেরিয়ার নূতন ঔষধ

বাঙলাদেশে ম্যালেরিয়ার অবাধ রাজত্ব; বাঙালী ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। অনামধন্য সার রোণাল্ড রস্ প্রভৃতি মনীষী ম্যালেরিয়ানিবারণ জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন, এখনও যে চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে, এমন নহে। কিন্তু এই দুরন্ত রোগের উচ্ছেদসাধন সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। কুইনিন্ ম্যালেরিয়ার উত্তম ঔষধ সন্দেহ নাই। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত দরিদ্র বাঙালী কুইনিন অবলম্বন করিয়াই এই রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে। কিন্তু দেশ এখন দিন দিন ক্রমেই দরিদ্রতর হইয়া পড়িতেছে; বহু গ্রামবাসী প্রবল জ্বরে ভুগিলেও যে কুইনিন্ কিনিবার সংস্থান করিয়া উঠিতে পারে না, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যদি কোন বৈজ্ঞানিক কুইনিনের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে, এমন কোন সুলভ অথচ

তুল্যগুণসম্পন্ন ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারেন, তিনি দরিদ্র বাঙালীর পরমোপকার করিবেন সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ফলিত-রসায়নের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্র কুমার সেন মহাশয় এইরূপ একটি ঔষধ সম্প্রতি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহার ভেষজ গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। কুইনিনেরই মত ইহার অরূঘ্ন শক্তি বিদ্যমান, কিন্তু কুইনিন্ অপেক্ষা ইহা কম উত্তেজক এবং কুইনিনে মাথা ঘোরা, কান ভোঁ ভোঁ করা প্রভৃতি যে সকল উপসর্গ দেখা দেয়, ইহাতে সেরূপ কিছু ঘটে না। অধ্যাপক সেন বলেন, ইহা কুইনিনের পরিবর্ত্তে অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে। "আইসোকুইনোলিন্" হইতে এই ঔষধটি উদ্ভূত এবং ইহার এ্যামোনিয়াম্ যৌগিক লবণ জলে অল্প দ্রবীভূত হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ দ্রব কুইনিনের অনুরূপ দ্রব হইতে অনেক কম তিক্তস্বাদ হয়। ব্যবসায়বাণিজ্যের জন্য এই ঔষধ প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত করার খরচও খুব বেশী পড়ে না। কারণ এ্যাসেটিক্ এ্যাসিড্ এবং আল্‌কাতরাজাত উপকরণ হইতে মাত্র ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ইহা প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ মূল্যবান্ যন্ত্রপাতিরও আবশ্যক হয় না। নবাবিষ্কৃত ঔষধটির রাসায়নিক নাম অতি জটিল এবং সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য—N. Ammonium salt of 3-keto 4-cyano 1-hydroxy 2 : 3 : 5 : 6 : 7 : 8 Lexahydro isoquinoline.

পুস্তক পরিচয়

পাঞ্চকা—সচিত্র হিন্দী মাসিক পত্রিকা—বেদাঙ্ক (বেদ-বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা); পৌষ, বিক্রম সংবৎ ১৯৮৮, জানুয়ারী ১৯৩২। প্রধান সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ ত্রিবেদী, সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ ঝা ও শ্রীযুক্ত শিবপূজন সহায়। ৩০০ পৃষ্ঠা, বহু চিত্রযুক্ত (তন্মধ্যে তিনখানি চিত্র রঙ্গীন), গঙ্গা কার্য্যালয়, সুলতানগঞ্জ ভাগলপুর বিহার হইতে প্রকাশিত। বেদাঙ্ক সংখ্যার মূল্য ২।০।

হিন্দীভাষা সম্বন্ধে সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষময় একটা বিশেষ উৎসাহপূর্ণ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, উত্তর ভারতের শিক্ষিত জনগণ, বিশেষ করিয়া হিন্দু শিক্ষিত জনগণ, হিন্দীভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতেছেন। হিন্দী আধুনিক ভারতের মুখ্য দেশভাষা, দেশের অধিকাংশের মতে ইহাই স্বাভাবিক রাষ্ট্রভাষা। হিন্দীর সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত ভারতের অন্য সমস্ত প্রদেশে সম্প্রতি যে একটা মমত্ববোধ, একটা গৌরববোধ, এবং হিন্দীকে সাহিত্য ও সমাজের ভাষা করিয়া লইবার জন্য যে একটী সাকাঙ্ক্ষ চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রগতির মধ্যে একটী লক্ষণীয় বিষয়। এই মমত্ব ও গৌরববোধ এবং চেষ্টার ফলে নানা দিক দিয়া হিন্দীভাষার সেবা হইতেছে, এবং ভালমন্দ সার্থকনিরর্থক নানাপ্রকার

সাহিত্য রচনা ও আহরণের মধ্য দিয়া হিন্দীর মারফৎ উত্তর-ভারতের আধিমানসিক উন্নতি-বিধানে বিশেষ সহায়তা হইতেছে। এইরূপ চেষ্টা বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে যে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু আরও বেশী হওয়া উচিত। শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষ বর্দ্ধনের জন্য বাঙ্গালার মত হিন্দীর মাসিক পত্রিকাগুলি যে কার্য্য করিতেছে, তন্মধ্যে 'গঙ্গা' পত্রিকার আলোচ্য 'বেদাঙ্ক'-খানিকে বিশেষ প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিতে হয়। এই পত্রিকার পরিচালকবর্গ ভারতবর্ষের তাবৎ বেদবিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে বেদ ও বৈদিক সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ আহরণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রিচালকগণ সনাতন হিন্দুমতাবলম্বী বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু ইঁহারা সকল মতের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে প্রবন্ধ লইয়াছেন। বেদকে কত দিক্ দিয়া এবং কত ভাবে আলোচনা করা যায়, 'বেদাঙ্ক' হইতে তাহার একটা আভাস পাওয়া যাইবে। বেদ সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর নানা প্রকার অভিমতের এক অপূর্ব্ব সংগ্রহ-গ্রন্থ হিসাবে গঙ্গা পত্রিকার এই 'বেদাঙ্ক' বিশেষ মূল্যবান্ পুস্তক। বহুক্ষেত্রে বেদের অতিপ্রাচীনত্ব বিষয়ে প্রবন্ধলেখকগণের স্থিরবিশ্বাস দেখা যায়, আবার অনেকে যুক্তিতর্ক দিয়া এই অতি-প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়, এ বিষয়েও কেহ কেহ আলোচনা করিয়াছেন। বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি কবিতাও আছে, এবং মেঘের মধ্যে কৃষ্ণ ও শ্বেত দুই ঘোড়ার রথে চতুর্ভুজ ভগবান্ বেদপুরুষের রঙ্গীন ছবিও আছে। নন্দলাল বসুর ছাগবাহন অগ্নি-দেবের সুপরিচিত চিত্রের অনুকরণে রচিত ব্রহ্মা নাম দিয়া আর একখানি রঙ্গীন ছবিও আছে। ইহাতে যে সকল প্রবন্ধ আছে, সকলেই সেগুলির প্রত্যেকটীর বক্তব্যের সহিত সহমত হইবেন না, সবগুলিই যে তুল্যমূল্য, তাহা নহে। নিজ নিজ শিক্ষা ও রুচি অনুসারে সকল শ্রেণীর পাঠক এই প্রবন্ধগুলি হইতে কিছু না কিছু শিক্ষা ও আনন্দ পাইবেন। এই জন্যই এইরূপ প্রবন্ধ-সংগ্রহের সার্থকতা। বেদ ও বেদালোচনা সংক্রান্ত ছোটবড় প্রায় সত্তরটী প্রবন্ধ এই অঙ্কে আছে। সেগুলির নাম উল্লেখ করাও সম্ভব নহে। তবে বর্ত্তমান সমালোচকের যে যে প্রবন্ধগুলি ভাল লাগিয়াছে (তাঁহার শিক্ষা, রুচি ও মতের অনুকূল বলিয়া), সেইগুলির মধ্যে গুটি কয়েকের উল্লেখ মাত্র করিয়া এই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা সমাপ্ত করিব।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের "বেদকী ব্যাখ্যা ঔর উসকী পরম্পরা" প্রবন্ধে গুরুপরম্পরায় বেদের যে ব্যাখ্যা চলিয়া আসিয়াছে, তাহার উপযোগিতা এবং তৎপ্রতি পূর্ণরূপে অবহিত হওয়ার আবশ্যকতা বিশেষ যুক্তি ও উদাহরণ প্রদান দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। কানপুর সনাতন ধর্ম্ম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরদত্ত শর্ম্মা এম্-এ, পী-এচ্-ডীর "বেদ ঔর বিদেশী বিদ্বান্" এবং শ্রীযুক্ত মঙ্গলদেব শাস্ত্রী এম্-এ, ডী-ফিল (অক্সন) প্রণীত "বৈদিক সাহিত্যমেঁ পাশ্চাত্য বিদ্বানোঁকা কার্য্য" এই দুইটী প্রবন্ধ অনুরূপ বিষয় অবলম্বন করিয়া। উভয় প্রবন্ধই সুলিখিত, তথ্যপূর্ণ—তবে ইঁহারা বেশীর ভাগ কতকগুলি নাম করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন,—বিদেশে বেদচর্চ্চা কি প্রকারের ভাব-পরম্পরার দ্বারা অনুপ্রাণিত তাহার ধারাবাহিক আলোচনার চেষ্টা করেন নাই। "বেদকে ব্যাকরণ তথা কোষ" প্রবন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভীমদেব শর্ম্মা শাস্ত্রী এম্-এ এম-ও-এল্ আলোচ্য

বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত তথ্যগুলি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং আর্য্যসমাজের চেষ্টায় প্রকাশিত বৈদিক কোষ "বৈদিক-শব্দার্থ পারিজাত" গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভগবদ্দত্ত বী-এর "লুপ্ত বৈদিক নিঘণ্টু" মৌলিক আলোচনাত্মক ক্ষুদ্র একপৃষ্ঠময় নিবন্ধ। পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারাপদ চৌধুরী এম্-এ, পী-এচ্-ডি "কুছ সন্দিগ্ধ বৈদিক শব্দ" প্রবন্ধ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে দুই একটী বৈদিক শব্দের আলোচনা করিয়াছেন। পুনার শ্রীযুক্ত শ্রীধর বেঙ্কটেশ কেতকর এম্-এ, পী-এচ্-ডীর "বেদ গ্রন্থোক্ত নবীন অভ্যাস কী পদ্ধতি" প্রবন্ধে বেদালোচনার জন্য ভারতে ব্রাহ্মণজাতির বিস্তারের ইতিহাসের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়াছেন। হরিদ্বার ঋষিকুলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র ঝা বেদব্যাকরণাচার্য্য-কৃত "বৈদিক ঋষি, দেবতা, ছন্দ ঔর বিনিয়োগ" উল্লেখযোগ্য। বেদের নিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে—এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সংস্কৃতব্যবসায়ী পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত; এই সব প্রবন্ধের পার্শ্বে শ্রীযুক্ত কেশব লক্ষ্মণ দপ্তরী বী-এ, এল্-এল্-বী রচিত "বেদকী নিত্যতা" প্রবন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বেদের আলোচনা দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রমাণের চেষ্টা দেখিয়া কৌতুক ও আনন্দ হয়। নাগপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আনন্দরাও জোশীর "মরাঠী সাহিত্যমেঁ বেদচর্চ্চা" নানা সংবাদে পূর্ণ। বেদ ও আর্য্য সমাজ—এই বিষয়ে তিনটী প্রবন্ধ আছে। জয়পুররাজের সভাপণ্ডিত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন ওঝার বৈদিক ও অন্য সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ও পুস্তকাদির পরিচয় জনৈক লেখক দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্য বহু প্রবন্ধ আছে।

চতুর্ব্বেদের তাবৎ সংস্করণ ও অনুবাদ এবং বেদ বিষয়ক একটী নাতিদীর্ঘ পুস্তকসূচী সম্পাদকগণ দিয়াছেন। "সংসারকে বর্ত্তমান বেদজ্ঞ" শীর্ষক অংশে দেশীয় ৪৮ জন ও বিদেশীয় ২৩ জন অধ্যাপক ও অন্য ব্যক্তির নাম দেওয়া হইয়াছে—কিন্তু এই তালিকা প্রণয়নে তালিকাপ্রণেতার কোনও চিন্তা বা বৈদিক সাহিত্য এবং অধুনিক বেদালোচনা বিষয়ে তাঁহার কোনও জ্ঞানের পরিচয় নাই; বিচার বিবেচনা না করিয়া যে যে নাম তিনি পাইয়াছেন, তাহাই তিনি ছাপিয়া দিয়াছেন—এমন কি বর্ত্তমান সমালোচকের নামও তাঁহার এই তালিকায় "বেদজ্ঞ" বলিয়া স্থান পাইয়াছে!

যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এই "বেদাঙ্ক" সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অতি সাধু—দেশের মধ্যে আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্যের সহিত জনসাধারণের পরিচয় করানো; এই উদ্দেশ্যের সহিত প্রত্যেকেরই সহানুভূতি আছে। সম্পাদনে হিন্দী অংশের ছাপা ভালই হইয়াছে, কিন্তু ইউরোপীয় নাম ও রোমান অক্ষরে লিখিত শব্দাদির ছাপায় এত বেশী ভুল হইয়াছে যে, তাহা এইরূপ পুস্তকের পক্ষে বিশেষ লজ্জাকর।—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

কুমাও—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন, এল্-এ-এম্-এস্ (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৩৯)

খর্ব্বদৃষ্টি (short sight)—ডাঃ শ্রীচৈতন্যকিঙ্কর ঘোষ (পঞ্চপুষ্প, আষাঢ় ১৩৩৯)

গাছপালার জন্ম ও জীবনযাত্রা—শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যাদিত্য (কৃষিলক্ষ্মী, আষাঢ় ১৩৩৯)

ছোট চাঁদড়—কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ (স্বাস্থ্য, শ্রাবণ ১৩৩৯)

বানরের মানবত্বপ্রাপ্তি—শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৩৯)

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

৯ম বর্ষ শরৎ ও হেমন্ত ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

প্রসরণশীল বিশ্ব

(Expanding Universe)

শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনীষী আইনষ্টাইনের সাপেক্ষবাদ (Theory of Relativity) বিজ্ঞানজগতে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। পুরাতন মতে দেশ ও কাল বিভিন্নগুণবিশিষ্ট; দেশ আমাদের ঊর্দ্ধে, অধোভাগে ও চতুঃপার্শ্বে স্থিরভাবে পরিব্যাপ্ত আছে, কিন্তু কালের স্রোত আমাদের অতিক্রম করিয়া অবারিত বেগে অনন্তের পথে ধাবিত হইতেছে। আইনষ্টাইনের নূতন মতে দেশ ও কাল পরস্পর জড়িত। পূর্ব্বতন মতানুসারে কেবল ত্রিপরিমাণবিশিষ্ট (three dimensional) দেশেরই (space) প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুসারে দেশ ও কাল আর বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে না, দুই মিলিয়া দেশ-কাল (space-time) হইয়াছে, এবং উহার প্রসরণ (continuum) যে চতুঃপরিমাণবিশিষ্ট (four-dimensional) তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। সেই চতুর্থ পরিমাণই কাল। আইনষ্টাইনের বিধি অনুসারে পদার্থবিহীন শূন্যগর্ভ বিশ্বের দেশকালবিশিষ্ট আকার অবক্র অবস্থায় থাকিতে পারে এবং ইহার পরিসরও সীমাবদ্ধ থাকে না। কিন্তু যে বিশ্বের অভ্যন্তর রিক্ত ও বস্তুবিবর্জ্জিত নহে তাহা বক্রভাব ধারণ করে এবং উহার আকার ও আয়তন অন্তর্নিবিষ্ট পদার্থসমষ্টির দ্বারা নিরূপিত হয়।

আইনষ্টাইনের আকর্ষণ-বিধিতে (law of gravitation) দূরত্বানুপাতিক বিকর্ষণশক্তির

(repulsion) পরিচায়ক একটি পদ (term) সন্নিবিষ্ট আছে। সেই হেতু আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয় শক্তিরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দূরত্বহিসাবে বিকর্ষণশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই শক্তিকে "ভৌতিক বিকর্ষণশক্তি" (cosmic repulsion) বলা হয়। অল্পদূরে ইহার প্রভাব খুবই কম দৃষ্ট হয়। অতিবিশাল ও অতিবিস্তৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের এই সৌরজগৎ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। সৌরজগতের সীমার মধ্যে "ভৌতিক বিকর্ষণশক্তির" প্রভাব অত্যল্প ও উপেক্ষণীয়। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক অনুমান করেন যে, বিশ্বের প্রথম অবস্থায় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির প্রভাব সমান ছিল। এই ভূয়ের মাত্রা সমান থাকিলে বিশ্ব স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে। এই স্থিতিশীল বিশ্বকে "আইনষ্টাইন জগৎ" (Einstein universe) বলা হয়। বেলজিয়ামদেশীয় গণিতজ্ঞ জ্যোতিষী আবেল মেত্র্ গণনা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে ব্রহ্মাণ্ডের এই স্থিরভাব অস্থায়ী (unstable)। কোনও কারণবশতঃ অল্পতম বিক্ষোভের (disturbance) সূত্রপাত হইলেই বিকর্ষণ ও আকর্ষণ শক্তির মধ্যে একটি প্রবলতর হয় এবং স্থিতিশীল বিশ্ব প্রসারিত কিংবা সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হলাণ্ড অধিবাসী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডি সিটারও গণনা দ্বারা বিশ্বের প্রসারণ ও সঙ্কোচনপ্রবণতা প্রদর্শন করেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে আলোক দ্বৈতগুণবিশিষ্ট। মনোবিজ্ঞানে দ্বৈতবাদের (principle of duality) প্রচলন নূতন নহে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে এই নীতির প্রবর্ত্তন এক অভিনব ব্যাপার। অবস্থাবিশেষে আলোকরশ্মি অতিসূক্ষ্ম বেগবান কণিকাসমষ্টির আকার ধারণ করে এবং অপর অবস্থায় গতিশীল তরঙ্গমালায় পরিণত হয়। প্রথমোক্ত মতানুসারে জ্যোতিষ্মান পদার্থ হইতে একরূপ অতিসূক্ষ্ম কণিকা বেগে বহির্গত হয়, সেই কণিকাগুলি চক্ষুতে প্রবেশ করিয়া আঘাত করিলে আলোকের জ্ঞান জন্মে। কণিকাগুলি অবিভাজ্য এবং আলোকরশ্মির ক্ষুদ্রতম খণ্ড, ইহাদিগকে সূক্ষ্মতর অংশে আর বিভক্ত করা যায় না। আলোককণিকার বৈজ্ঞানিক নাম প্রকাশাণু (photon)। প্রকাশাণু প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬৩২৬ মাইল বেগে ধাবিত হইতেছে। দ্বিতীয় মত অনুসারে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের অণু বা পরমাণুগুলি কাঁপিতে থাকে, সেই কম্পনই আলোকতরঙ্গের সৃষ্টি করে। এই তরঙ্গগুলি ধাবিত হইয়া চক্ষুতে আঘাত করিলে আলোকের বোধ জন্মে। শব্দতরঙ্গ ও আলোকতরঙ্গ অনেক বিষয়ে সদৃশধর্ম্মবিশিষ্ট। শব্দবাহী বায়ুতরঙ্গগুলি কর্ণে প্রবেশ করিয়া আঘাত করিলে শব্দজ্ঞান জন্মে।

দূরগামী মোটরকারের শূন্যধ্বনি কিংবা বাষ্পীয়যানের বংশীধ্বনি স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক স্বর হইতে অপেক্ষাকৃত কোমলভাব ধারণ করে। গতিশীল মোটরকার কিংবা বাষ্পীয়যানের ব্যবধান যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে, তাহাদের শূন্য বা বংশী হইতে যে স্বর নির্গত হইয়া আমাদের নিকট পৌঁছে, তাহার স্পন্দনসংখ্যা (pitch) সেই পরিমাণে কমিয়া যায় এবং সেই জন্যই এই স্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু বোধ হয়। কোনও আগমনশীল বস্তু হইতে নির্গত

শব্দ যখন আমাদের নিকট পৌঁছে, তখন তাহার স্পন্দনসংখ্যা অধিকতর হয় এবং তাহার স্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ বোধ হয়। কোনও গতিশীল পদার্থ হইতে নির্গত স্পন্দনসংখ্যার কি পরিমাণে হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় তাহা গণনা করিতে পারিলে, ডপলার নীতি (Doppler's principle) অনুসারে সেই পদার্থের গমন কিংবা আগমনবেগ (velocity) অতি সহজে নির্ণয় করিতে পারা যায়। এই ডপলারনীতির বশবর্ত্তী হইয়াই দূরগামী জ্যোতিষ্মান পদার্থ হইতে যে আলোক নির্গত হইয়া আমাদের নিকট পৌঁছে, তাহার স্পন্দনসংখ্যা হ্রাস হইয়া যায় এবং নিকটে আগমনশীল স্বয়ংপ্রভ বস্তু হইতে যে আলোক আসে তাহার স্পন্দনসংখ্যা অধিকতর হয়।

সূর্য্যের আলোক শুভ্র। ত্রিশির কাচফলকের (triangular prism) ভিতর সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাহিরে আসিলে তাহা আর শুভ্র থাকে না, উহা নানাবর্ণের হয় এবং যথাস্থানে একটী পর্দ্দা ধরিলে তাহার উপর বর্ণচ্ছটার (spectrum) সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ণচ্ছটায় শতসহস্র বর্ণের আলোকরেখা সারি বাঁধিয়া গায়ে গায়ে স্পর্শ করিয়া অবস্থান করে এবং মধ্যে মধ্যে আলোকের পরিবর্ত্তে কতকগুলি আঁধার রেখাও দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিকেরা ফ্রানহোফারের রেখা (Fraunhofer lines) বলেন। সূর্য্যকিরণের বর্ণচ্ছটার সাতটি প্রধান বর্ণ উল্লেখযোগ্য যথা :—লোহিত, জরদ, (কমলা লেবুর বর্ণ), পীত, হরিত, নভোনীল, ঘননীল ও বার্ত্তাকুবর্ণ (বেগুণে)। জ্যোতিষ্মান সূর্য্যপিণ্ডের ধাতু ও মূল পদার্থগুলি (elements) বায়বীয় (gaseous) অবস্থায় আছে। যে কোন ধাতু বা মূলপদার্থ যখন প্রভূত তাপ দ্বারা অনিলাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা স্বয়ংপ্রভ হইয়া কিরণ বিতরণ করিয়া থাকে। এই কিরণকে কাচের কলস দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ উজ্জ্বল আলোকরেখা দৃষ্ট হয়। ধাতু বা মূলপদার্থবিশেষে এই রেখাগুলির বর্ণের তারতম্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিভিন্ন বর্ণের আলোকরেখার স্বতন্ত্র স্পন্দনসংখ্যা আছে। কোনও একটী মূল পদার্থের আলোকরেখাগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহারা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত, সূর্য্যকিরণের বর্ণচ্ছটার ন্যায় নিরন্তর (continuous) নয়। সূর্য্যপিণ্ডে বহুসংখ্যক মূলপদার্থ বর্ত্তমান আছে। এই সকল মূলপদার্থ হইতে উদ্ভূত নানা বর্ণের অসংখ্য আলোকরেখা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া অপূর্ব্ব অবিচ্ছিন্ন কিরণচিত্র (spectrum) রচনা করে। প্রত্যেক আলোকরেখার স্পন্দনসংখ্যানুযায়ী স্বতন্ত্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য (wave-length) আছে। কোনও তরঙ্গের পরস্পর সান্নিহিত দুই শিরোভাগের (crest) মধ্যে যে ব্যবধান তাহাকেই তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলা হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্য স্পন্দনসংখ্যার বিপরীত অনুপাতে পরিবর্ত্তিত হয়। যে উর্ম্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অধিক তাহার স্পন্দনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং যে উর্ম্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অল্প, তাহার স্পন্দনসংখ্যা সেই পরিমাণে অধিক। দৃশ্যমান বর্ণচ্ছটার (visible spectrum) লোহিতবর্ণ আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও স্পন্দনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প; বার্ত্তাকুবর্ণ আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অল্পতম এবং স্পন্দনসংখ্যা সেই অনুপাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

নীহারিকার ঘনত্ব (density) অতিশয় কম এবং ইহাতে অত্যল্প সংখ্যক স্থূল পদার্থ অনিলাবস্থায় বিদ্যমান আছে। নীহারিকার কিরণচিত্র বিভিন্ন আলোকরেখার সমষ্টি-মাত্র। জ্যোতির্বিগণ দূরবর্ত্তী নীহারিকাগুলির কিরণচিত্র বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে নীহারিকা হইতে নির্গত আলোকরেখাবলী নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া লোহিতবর্ণ রেখাগুলির দিকে সরিয়া গিয়াছে। অতএব দূরবর্ত্তী নীহারিকাসমূহ ক্রমশঃ আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে। মার্কিণদেশে মাউণ্ট্ উইলসন্ পর্ব্বতের উপর যে মানমন্দির আছে, তথায় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সহিত আলোকরশ্মিবিশ্লেষক যন্ত্র সংযুক্ত আছে। জ্যোতিষী ডাক্তার হাব্‌ল্ মহোদয় এই যন্ত্রের সাহায্যে বহুসংখ্যক নীহারিকার কিরণচিত্র পরীক্ষা করিয়াছেন। সৌরজগতের কিংবা নিকটবর্ত্তী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অন্তর্গত কোনও পদার্থের দূরত্ব মাপিতে হইলে মাইল (mile) কিংবা কিলোমিটর (kilometre) দৈর্ঘ্যের মানদণ্ডরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই বিশ্ব অতি বৃহৎ এবং বহুসংখ্যক নীহারিকা ও নক্ষত্রমণ্ডলী বহুদূরে অবস্থিত। মাইল কিংবা কিলোমিটর এই বিশাল দূরত্বের মানদণ্ড হইবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী। বিশ্বরচয়িতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই বিরাট বিশ্ব, ইহার বিশালত্ব ক্ষুদ্র মানব সমাকরূপে উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। অতিদূরে অবস্থিত জ্যোতিষ্ক-সমূহের দূরত্ব নিরূপণ করিবার জন্য উপযুক্ত মানদণ্ডের প্রয়োজন। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০২৬ মাইল বেগে ছুটিয়া যাইতেছে। এমন অনেক নীহারিকা আছে, যাহারা এতদূরে অবস্থিত যে সেই সকল জ্যোতিষ্ক হইতে আলোক আসিতে কোটি বর্ষের উপর সময় লাগে। এই সকল বহুদূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কবর্গের দূরত্ব মাপিবার জন্য যে মানদণ্ড জ্যোতির্ব্বিদেরা ব্যবহার করেন তাহাকে প্রকাশ-বর্ষ (light-year) বলা হয়। আলোক এক বৎসরে এক প্রকাশবর্ষ-পরিমাণ পরিসর অতিক্রম করিতে পারে; এক প্রকাশবর্ষে ৫৮৭৪৯৭৬০৩৬০০০ মাইল হয়, অর্থাৎ প্রায় ছয় লক্ষ কোটি মাইল। ডাক্তার হাব্‌ল্ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে নীহারিকার দ্রুতগতি যদি উহার কিরণচিত্রের আলোকরেখাগুলির স্থানপরিবর্ত্তনের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হয়, তাহা হইলে এক কোটি প্রকাশবর্ষ দূরে যে নীহারিকা অবস্থিত, তাহা প্রতি সেকেণ্ডে নয়শত মাইল বেগে আমাদের নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছে এবং যে নীহারিকা আট কোটি প্রকাশবর্ষ ব্যবধানে অবস্থিত, তাহা প্রবলতর বেগে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে সাত হাজার মাইল হিসাবে সরিয়া যাইতেছে। ডাঃ হাব্‌ল্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে দূরত্বের সমানুপাতে গতিশীল নীহারিকার বেগের পরিবর্ত্তন হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ডাঃ হুমাসন্ এমন একটী নীহারিকার সন্ধান পাইয়াছেন যাহা প্রতি সেকেণ্ডে বার হাজার মাইল বেগে সরিয়া যাইতেছে। এই নীহারিকার বেগ আলোকের বেগের পঞ্চদশাংশের এক অংশ। এই দূরতম নীহারিকা বর্ত্তমানে পরিজ্ঞাত বিরাট বিশ্বের প্রান্তসীমায় অবস্থিত। উপরোক্ত অনুমান সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া জ্যোতিষিশ্রেষ্ঠ এডিংটন্ মহোদয় গণনা করিয়া দেখিয়াছেন

যে, প্রতি ১৪০ কোটি বৎসরে বিশ্বের আয়তন দ্বিগুণ হইয়া যায়। প্রথম অবস্থায় প্রসারিত হইবার পূর্ব্বে "আইন্‌ষ্টাইন্ জগতের" ব্যাস ৬০ কোটি প্রকাশবর্ষ মাত্র ছিল। এই হিসাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়ঃক্রম মাত্র কয়েকশত কোটি বর্ষ হইবে। তাহা হইলে এই বিশ্ব কি সত্য সত্যই তরুণ? ভূতত্ত্ববিদেরা এবং জ্যোতিষীরা অন্যান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলেন—না, বিশ্ব এত তরুণ হইতে পারে না।

বৈজ্ঞানিকেরা অবগত আছেন যে রেডিয়াম্ (Radium) উরেনিয়াম্ (Uranium) প্রভৃতি রশ্মিশক্তিশালী (radio-active) পদার্থনিচয় ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট হইয়া অবশেষে সমগ্রভাবে অল্পতর পরমাণুভারবিশিষ্ট (lower atomic weight) বস্তুতে পরিণত হয়। পদার্থবিদ্‌গণ অবধারণ করিয়াছেন যে কোনও কোনও রশ্মিশক্তিশালী দ্রব্য অতিশীঘ্র সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং কোন কোনটী সমগ্রভাবে বিশ্লিষ্ট হইতে কোটি কোটি বৎসর অতিবাহিত হয়। বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে কতিপয় সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী (longest-lived) রশ্মিশক্তিশালী পদার্থ পৃথিবীর আদিম অবস্থায় পূর্ণশক্তিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু উহারা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা হইতে ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবী বা বিশ্বের বয়ঃক্রমের সন্ধান পাইলেন। তাঁহারা গণনা করিয়া দেখিলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়ঃক্রম অন্ততঃ কোটি কোটি বৎসর হইবে।

এক্ষণে দেখা যাক এই দুই বিভিন্ন গণনার মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য থাকা সম্ভবপর কিনা। কালিফোর্ণিয়া অধিবাসী পদার্থবিৎ ডাক্তার জুইকি (Dr. Zwicky) দূরবর্ত্তী নীহারিকা হইতে আগত আলোকরেখাগুলি আলোহিত হইবার আর একটী কারণ প্রদর্শন করেন। ডাক্তার জুইকি অনুমান করেন যে দূরবর্ত্তী নীহারিকা হইতে নির্গত আলোকরশ্মির প্রকাশাণুগুলি দ্রুতবেগে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে অবস্থিত অনিবিড় জ্যোতিষ্কবর্গের অণু ও পরমাণুগুলির উপর প্রবলবেগে পতিত হইয়া প্রতিহত হয় এবং ইহারই ফলস্বরূপ আলোকরশ্মি ঈষৎ বর্ণ পরিবর্ত্তন করে ও আলোহিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ পদার্থবিৎ আচার্য্য কম্পটন্ পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে রঞ্জনরশ্মির (X-Ray) প্রকাশাণু যখন ঋণাণুগুলির (electrons) সহিত সংঘর্ষের ফলে প্রতিহত হয় তখন রঞ্জনরশ্মি ঈষৎ লোহিত হয়। আচার্য্য কম্পটনের পরীক্ষার ফল অবগত হইয়াই ডাঃ জুইকি উপরোক্ত অনুমানে উপনীত হন। জ্যোতিষী টেন ব্রাগেনকেট্ জুইকির অনুমান সত্য কিনা পরীক্ষা করিতে প্রয়াসী হন। তিনি পৃথিবী হইতে সমদূরবর্ত্তী কতকগুলি বর্ত্তুলাকার জ্যোতিষ্কমালার (globular clusters) আলোক পরীক্ষা করেন। যদিও এই সকল জ্যোতিষ্মান পিণ্ডগুলি পৃথিবী হইতে সমান দূরে অবস্থিত, তথাপি পরীক্ষণীয় জ্যোতির্ম্মালাগুলি এমনভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল যাহাতে বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক হইতে নিঃসৃত আলোকরশ্মি বিভিন্ন পরিমাণ বায়বীয় পদার্থের ভিতর দিয়া আসে। যদি প্রকাশাণুগুলির মধ্যবর্ত্তী নীহারিকার অণুপরমাণু দ্বারা প্রতিহত হইয়া কিরণচিত্রে আলোকরেখাবলীর স্থান পরিবর্ত্তন করাইবার গুণ না থাকে এবং যদি নীহারিকার অপসরণশীল গতিই (receding

motion) আলোকরশ্মি আলোহিত হইবার একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে সমদূরবর্তী জ্যোতিষসমূহ হইতে নির্গত আলোকরশ্মিগুলি সমভাবেই আলোহিত হইবে। কিন্তু ডাঃ ব্রাগেনকেট্ দেখাইলেন যে যদি রশ্মি অধিক পরিমাণে বায়বীয় পদার্থের মধ্য দিয়া আসে, তাহা হইলে ইহা অধিকভাবে লোহিত হয়। কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক অনুমান করেন যে দূরবর্তী নীহারিকা হইতে আগত আলোকরশ্মি যে পরিমাণে লোহিত হয় তাহার অধিকাংশই সধ্যপথবর্তী অণুপরমাণুগুলির সহিত ঘাতপ্রতিঘাতের ফলস্বরূপ, কেবল অল্পাংশের জন্যই দূরগামী নীহারিকার গতি দায়ী। এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত মনে হয়;—বিশ্বকে তরুণ ভাবিবার আর কোন কারণ থাকে না। এই হিসাবে বিশ্বের প্রান্তভাগে যে সব নীহারিকা অবস্থিত, তাহারা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় একশত মাইল বেগে সরিয়া যাইতেছে। বিশ্বের বয়ঃক্রম তাহা হইলে অন্ততঃ কোটি কোটি বৎসর হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি যে পদার্থ-বিদেরা ও ভূতত্ত্ববিদেরা অন্যান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। দুই বিভিন্ন গণনার মধ্যে এরূপে আর অসামঞ্জস্য নাই।

সম্প্রতি কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক বিশ্ব যে প্রসরণশীল এই অনুমানের বিরুদ্ধে সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক প্রফেসর মিলন প্রশ্ন করেন যে বিশ্ব কি কারণে সঙ্কুচিত না হইয়া প্রসারিত হইতেছে? তিনি আইনষ্টাইনের সাপেক্ষবাদ হইতে অনুমেয় দেশ-কাল প্রসারের বক্রতা স্বীকার না করিয়া এবং দেশ যে কেবল ত্রিপরিমাণবিশিষ্ট ইহাই অনুমান করিয়া নীহারিকাগুলির গতিশীলতার কারণ প্রদর্শন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি আরও অনুমান করেন যে জ্যোতিষ পদার্থের অণুপরমাণুগুলি শূন্যবেগ হইতে আলোকরশ্মির বেগ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার বেগে ধাবিত হইতেছে। কিন্তু প্রফেসর মিলনের এই অনুমানটি কতখানি যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে।

অবশ্য সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে বিশ্ব সত্যসত্যই প্রসারিত হইতেছে কিনা। আমরা জানি না ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়ে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন কিনা। গত শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা কার্য্যকারণনীতির (law of causality) বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃতিক ঘটনানিচয়ের ব্যাখ্যা এবং হেতু নির্দ্দেশ করিতেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানসেবীরা কার্য্যকারণনীতি পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতবাদের (principle of uncertainty) ও সম্ভাবনাবাদের (law of probability) অনুগামী হইয়াছেন। উপসংহারে সম্ভাবনাবাদের অনুবর্ত্তী হইয়া এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বিশ্বের প্রসরণশীলতার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প নহে।

কয়লা

ডাঃ শ্রীসত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী

পৃথিবীর উপরে বহুসংখ্য যুগ ধরিয়া প্রচুর উদ্ভিদাদি জন্মিয়া আসিতেছে, এবং অবস্থা বিপর্য্যয়ে সময়ে সময়ে শত শত মাইল-ব্যাপি বৃক্ষলতাসমাকীর্ণ বনজঙ্গল ভূমিকম্পে হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক মাটীর মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বেশী দিন এই অবস্থায় থাকিলে গাছের কাঠ পচিয়া কয়লাতে পরিণত হয়। কয়লা সাধারণতঃ গৃহস্থালি কার্য্যে এবং রেল ও ষ্টীমার চালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শোষকরূপে ব্যবহার করিতে হইলে এই কয়লাকে গোড়াইয়া 'কোক' করিয়া লইতে হয়। 'কোকের' মধ্যে অনেক ছোট ছিদ্র আছে এবং এইজন্য ইহা দ্রব কিম্বা বায়বীয় পদার্থ হইতে দূষিত পদার্থ শোষণ করিয়া লইতে পারে।

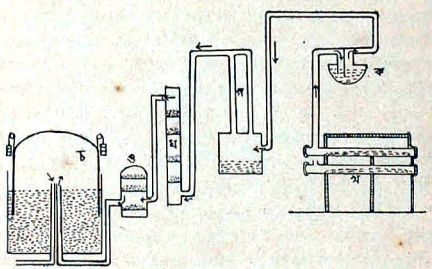

চিত্র—১

সাধারণ খনিজ কয়লা হইতে কোক কি প্রকারে তৈয়ারী করা হয় ১নং চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল। কয়লাকে বাতাসের অনুপস্থিতিতে উনানে উত্তপ্ত করিলে একটী উদ্বায়ী দ্রব পদার্থ বাহির হয়—উনানের উপরিভাগে 'ক' চিহ্নিত পাত্রে উহা সঞ্চিত হয়। উক্ত পদার্থকে 'কোলটার' বলে। ইহা ব্যতীত উপরোক্ত উত্তপ্ত কয়লা হইতে আর একটী উদ্বায়ী বায়বীয় পদার্থ নির্গত হইয়া ক্রমান্বয়ে 'গ' চিহ্নিত কন্‌ডেন্‌সার্ এবং 'ঘ' ও 'ঙ' চিহ্নিত ফিল্টারের মধ্য দিয়া যাইয়া 'চ' চিহ্নিত পাত্রের মধ্যে জমায়েত হয়। সাধারণ কথায় এই গ্যাসকে 'কোলগ্যাস' বলে এবং চ চিহ্নিত স্থান হইতে কোলগ্যাসকে বিভিন্ন নলের সাহায্যে

ইচ্ছামত বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া যায়। কোল্‌গ্যাস রাসায়নিক পরীক্ষাগারে, গৃহস্থালির কার্য্যে এবং রাত্রিকালে রাস্তা আলোকিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। 'ক' চিহ্নিত পাত্রে জমায়েত কোল্‌টার হইতে বেঞ্জিন, জাইলিন, ন্যাপ্‌থালিন, কার্বলিক এসিড্ প্রভৃতি পদার্থ পাওয়া যায়।

উক্ত উপায়ে কয়লা পোড়াইবার পরে 'খ' চিহ্নিত উনানের মধ্যে যে দ্রব্য পড়িয়া থাকে তাহাকে সাধারণতঃ কোক বলে। খুব সূক্ষ্ম গুঁড়া অবস্থায় কোকের দূষিত গ্যাস্ বা বীজাণু বা বিভিন্ন প্রকার রঙ শোষণ করিবার শক্তি খুব প্রবল। যুদ্ধকালে প্রাণান্তকর দূষিত বায়বীয় দ্রব্য হইতে সৈনিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কোক-কয়লা শোষকরূপে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে জার্ম্মাণরা বিষাক্ত বায়ু অস্ত্ররূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছিল। তখন হইতে এই বায়ু হইতে প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য রসায়নবিদ্‌গণ গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। আজকাল সৈনিকেরা দূষিত গ্যাস্ হইতে প্রাণরক্ষা করিবার জন্য পোষাকের অঙ্গস্বরূপ তাহাদের নাসিকার অগ্রে কোক কয়লা ব্যবহার করে।

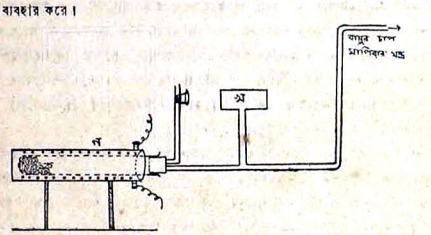

চিত্র—২

নানাপ্রকার রঙের শোষক হিসাবে কোক-কয়লা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। শাদা চিনি বা মিছ্‌রী তৈয়ারী করিবার সময় চিনির রসের মধ্যে যে নানারকম রঙ্ থাকে, পরিমিত ভাবে কোক-কয়লার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা দূর করা হয়। এইভাবে খুব পরিষ্কার শাদা চিনি পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামে পুষ্করিণীর দূষিত জলে অনেক প্রকার রোগের বীজাণু জন্মে, তাহাতে ঐ জল সম্পূর্ণরূপে পানের অযোগ্য হয়। এই দূষিত জল কয়লার মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইলে উহা পানের উপযোগী হয়। উহার কারণ এই যে জলের মধ্য হইতে কয়লা দূষিত দ্রব্যগুলি শোষণ করিয়া লয়।

উপরোক্ত কোক-কয়লাকে চূর্ণ করিয়া অন্যান্য প্রণালীদ্বারা উহার শোষণশক্তি বর্দ্ধিত করা যায়। কয়লার শোষণশক্তি কি প্রকারে সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত করা যায় সে সম্বন্ধে

অনেক মৌলিক গবেষণা হইয়াছে—এখনও হইতেছে। কয়লার শোষণশক্তি দুইটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(১) একটী তাহার নিজের বিশিষ্ট শোষণশক্তি এবং (২) অপরটী তাহার বিশিষ্ট পৃষ্ঠভাগ (surface)। শেষোক্তটীকে বর্দ্ধিত করিতে হইলে কোক-কয়লাকে বিশেষভাবে চূর্ণ করা আবশ্যক। পাথরের হামানদিস্তার সাহায্যে খুব ধীরে ধীরে অত্যন্ত সহিষ্ণুতার সহিত গুঁড়া করিলে সাধারণতঃ কোক-কয়লা খুব মিহি চূর্ণে পরিণত হয়, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে বৈদ্যুতিকশক্তি-পরিচালিত হামানদিস্তার সাহায্যে কোক-কয়লাকে চূর্ণ করা খুব সহজসাধ্য। এই প্রসঙ্গে একটী কথা স্মরণ রাখা দরকার। চূর্ণ করিলে কয়লার পৃষ্ঠভাগ সাধারণতঃ বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে অবস্থাবিশেষে কয়লার দুইটী কণার মধ্যস্থিত ছিদ্র পিশিয়া গিয়া বিশিষ্ট পৃষ্ঠভাগ কমিয়াও যাইতে পারে।

বিশিষ্ট শোষণশক্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা হয় (২ নং চিত্র)—

চূর্ণীকৃত কোক-কয়লাকে 'ক' চিহ্নিত মৃত্তিকানির্ম্মিত নলের মধ্যে ঢুকাইয়া চুল্লীর মধ্যে ৬০০° ডিগ্রী হইতে ১০০০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপে চারি বা পাঁচ ঘণ্টা কাল উত্তপ্ত করা হয়। পাম্পের ('খ') সাহায্যে এরূপ বন্দোবস্ত করা হয় যে উনানের মধ্যে বায়ু না প্রবেশ করিতে পারে। অঙ্গার কয়লা বায়ুমধ্যস্থিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিয়া কার্ব্বন্-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাসে পরিণত হয়। দেখা গিয়াছে যে এই উপায়ে কোক-কয়লার শোষণশক্তি অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। কয়লাকে এইরূপভাবে উত্তপ্ত করিবার পক্ষে বৈদ্যুতিক চুল্লী বিশেষ উপযোগী ('গ')।

উপরোক্ত প্রণালীতে কয়লার বিশিষ্ট শোষণশক্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য চুল্লীর মধ্যস্থিত তাপের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হওয়া দরকার। খুব কম তাপ হইলে বিশিষ্ট শোষণশক্তির বৃদ্ধি খুব কম হয়, পরন্তু তাপের পরিমাণ খুব বেশী হইলে কয়লার গুঁড়া দানাবদ্ধ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে বিশিষ্ট পৃষ্ঠভাগ ও বিশিষ্ট শোষণশক্তি দুইই হ্রাস পায়,—এই উভয় কারণে কয়লার সাধারণ শোষণশক্তিও খুব কমিয়া যায়। উত্তপ্ত করিবার সময়ের পরিমাণেরও বাঁধাবাঁধি হওয়া দরকার। খুব কম সময় হইলে শোষণশক্তির বৃদ্ধি খুব কম পরিমাণে হয়। খুব বেশী সময় উত্তপ্ত করিলে কয়লার কণাগুলি দানাবদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে সাধারণ শোষণশক্তি কমিয়া যায়। এই বিষয় লইয়া গবেষণা-নিযুক্ত মনীষিগণ দেখাইয়াছেন যে তাপের পরিমাণ যদি ৬০০° ডিগ্রী এবং উত্তপ্ত করিবার সময় যদি ৫ হইতে ৬ ঘণ্টাকাল হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়।

অনেক সময় নাইট্রোজেন্ অথবা হাইড্রোজেন্ গ্যাস্ ২ নং চিত্রের 'ক' চিহ্নিত মৃত্তিকা-নির্ম্মিত নলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কয়লাকে উত্তপ্ত করা হয়। তাহাতে অবস্থাবিশেষে কয়লার শোষণশক্তি বিশেষ বর্দ্ধিত হয়।

খনিজ কয়লাপ্রসূত কোক-কয়লা ছাড়াও শোষণকারী কয়লা অনেক উপায়ে পাওয়া

যায় ;—যেমন প্রাণী, প্রাণীর রক্ত, কাঠ, নারিকেল অথবা চিনি হইতে। উক্ত দ্রব্যগুলি উপযুক্ত প্রণালীতে পোড়াইলে কয়লা হয়। এই সকল শোষণকারী কয়লার মধ্যে কাঠের কয়লা সর্ব্বাপেক্ষা কম ব্যয়-সাপেক্ষ। এই জন্য সাধারণ কাজে এই কয়লা বেশী ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ কয়লা তৈয়ারী করিতে হইলে চিনি হইতেই করা আবশ্যক। চিনির কয়লা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে সাধারণ শোষণপ্রণালী পরীক্ষা করিবার পক্ষে খুব প্রশস্ত। এই সকল প্রক্রিয়া হইতে মাটীর ভিতরে শোষণপ্রক্রিয়ার রীতি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

চিনি হইতে কয়লা প্রস্তুত করিবার নিয়ম দুই প্রকার। প্রথম উপায়ে একটী মাটীর পাত্রের মধ্যে খুব সাবধানে খুব বিশুদ্ধ পরিষ্কার চিনি পোড়াইতে হয়। ইহাতে চিনি গলিয়া গুড়ে পরিণত হয়। বিশেষ সতর্কতার সহিত মাটীর পাত্রটী উত্তপ্ত করিলে গুড়ের মধ্যস্থিত চিটা পদার্থগুলি পুড়িয়া ছাই হয় এবং অবশেষে পাত্রের মধ্যে কয়লা পড়িয়া থাকে। এই কয়লাকে হামানদিস্তার মধ্যে গুঁড়া করিয়া লইতে হয়। ভাল করিয়া চূর্ণ করিলে এবং উক্ত প্রণালীতে দুই তিনবার পোড়াইলে যে কয়লা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে চিটা পদার্থগুলি সমস্তই দূরীভূত হয় এবং অবশেষে খুব বিশুদ্ধ কয়লা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রণালী অনুসারে চিনির মধ্যে বিশুদ্ধ সাল্‌ফিউরিক্ এসিড্ ঢালিয়া দিতে হয়। ঐ এসিড্ চিনির মধ্য হইতে জল টানিয়া লয়, খুব ছোট ছোট কণাবিশিষ্ট কয়লা মাত্র অবশেষে পড়িয়া থাকে। ঐ কয়লা পরে জলের সহিত ফুটাইয়া বিশুদ্ধ করা হয়।

পৃথিবীর দেহগঠন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

মধ্য মহাযুগ

মধ্যমহাযুগের সূত্রপাত হয় খুব বেশী করে ধরলেও ১৮ কোটী বৎসর, আর খুব কম করে ধরলে ১৪ কোটী বৎসর আগে। এর স্থিতিকাল ১২ কোটী বৎসর। মধ্যমহাযুগকে তিনটী যুগে ও চারটী কালচক্রে (cycle) ভাগ করা হয়। প্রথম যুগ হল চাখড়ি যুগ (cretaceous period)। এর মধ্যে দুটী কালচক্র; কাজেই যুগের মোট স্থিতিকাল ৬ কোটী বৎসর। দ্বিতীয় যুগ জুরাসিক যুগ; এই যুগটা সমস্তই একটী কালচক্র। এর স্থিতিকাল তিন কোটী বছর। চতুর্থ যুগ ত্রায়সিক যুগ, এর স্থিতিকাল ৩ কোটী বৎসর।

যে সব বিশেষ আকার প্রকারের প্রাণীকে এই মহাযুগের জীব ও উদ্ভিদ্ বলে ধরা হয় তাদের কঙ্কাল বা fossil যে সব প্রস্তরগাত্রে পাওয়া যায়, তাদের মোট গভীরতা ৯০।৯১ হাজার ফুট। তার মধ্যে চাখড়ি যুগের স্তরই ৪৬ হাজার ফুট; জুরাসিক যুগস্তর ২০ এবং ত্রায়সিক যুগস্তর ২৫ হাজার ফুট।

এই সব স্তর-পাথরের অল্পভাগই নরম বেলে ও মেটে পাথর। চুনেপাথর যা কিছু পাওয়া যায় তা নরম ধাতের। চাখড়ি যুগের স্তর বেশীভাগ বিশুদ্ধ খড়িমাটীতেই তৈরী। খড়িকে-চুনেমাটী বা নরম পাথরের মধ্যেই ধরা হয়। বাকী স্তরগদার্থ সমস্তই আলগা বালি বা মাটীর শক্ত চাপ মাত্র।

মধ্য মহাযুগের সমস্ত কালটাই একটা একটানা উৎপাতহীন বিরামের যুগ। বিগত কয়লা যুগের শেষদিকে যে ভূবিপ্লব ঘটে, যার ফলে ভূবল্কের উত্তর-দক্ষিণ দুইভাগে দুটী মহাদেশ জন্মে, নানাস্থানে বড় বড় পাহাড়পর্ব্বত মাথা তুলে ওঠে, তাদের দেহক্ষয় এই মধ্য মহাযুগে আরম্ভ হয়। সেই অবিরাম অপচয়ফলে যে রাশি রাশি পলিমাটী দেখা দেয় তাই নদীমুখে, হ্রদগর্ভে, সমুদ্রতলে স্তরে স্তরে জমতে থাকে। পরবর্ত্তী কালের নব নব মহাদেশের ভিত্তিপাথর গাঁথা হতে চলেছিল এই শান্তিময় mesozoic যুগে। পূর্ব্ব বিপ্লবের কালে ভূদেহ একচোট খুব ভাঙ্গাগড়ার ধাক্কা খায়,—স্থলভাগ জেগে ওঠে, পাহাড় মাথা তোলে, ভূগহ্বরে ভাঁজ ও খাঁজ দেখা দেয়, সমুদ্রগর্ভ নীচের দিকে ধ্বংস যায়; ফলে তার গভীরতা খুব বাড়ে, বিস্তৃতি কমে যায়। এই মধ্য মহাযুগে ঠিক তার উল্টা ব্যাপার আরম্ভ হয়। সমুদ্রের তলা একটু একটু করে উপরে ঠেলে ওঠে, জল ছাপিয়ে গিয়ে দেশমহাদেশের নিম্নভূমি-গুলা গ্রাস করতে থাকে; স্থলভাগের অবিরাম ক্ষয় চলতে থাকায় পাহাড়পর্ব্বত ছোট হয়ে আসতে আসতে শেষে উচ্চ-নীচ সমস্ত স্থলভাগই একাকার সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হয়। চাখড়ি যুগের শেষভাগ হতে আবার এক বিপ্লবের সূচনা হয়; সেটা পরবর্ত্তী যে নূতন জীবমহাযুগ আসে তারই প্রথমার্দ্ধকাল জুড়ে চলতে থাকে।

এ মহাযুগের সমস্তটা কালব্যাপীই ভূপৃষ্ঠের জলবাতাস অল্প গরম—রম্য। এই গরম একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে যুগের শেষদিকে চরমে ওঠে। শেষযুগের যে বিপ্লবপ্রভাবে স্থলের জাগরণ সুরু হয় তার ফলে continental extreme ধরণে জলবায়ুর শীতাতপ আরম্ভ হতে থাকে। অর্থাৎ পাহাড়পর্ব্বতের মাথা উঁচু হলে, দেশমহাদেশের বুক ফুলে উঠ্‌লে গ্রীষ্মে আতপ খুব বাড়ে, শীতে ঠাণ্ডা বাড়ে, বাতাস জলীয়বাষ্পহীন হয়ে শুষ্ক হয়; একেই continental climate বলে। মধ্য মহাযুগটা প্রাণিরাজ্যের ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে খুব বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য যুগ। এ মহাযুগের জীব ও উদ্ভিদবংশীয় যত প্রাণী সবই পুরাতনের আকারপ্রকার ছেড়ে নব্য মহাযুগের নূতন আকারপ্রকার ধরতে আরম্ভ করেছে। এদের চেহারা ও স্বভাবধর্ম্ম দেখলে বুঝা যায় এরা না সে-কেলে, না একেবারে এ-কেলে প্রাণী।

প্রাচীন মহাযুগে ছিল প্রথম দিকে অমেরুদণ্ডী জীবের ও জলঘাসের কাল; শেষদিকে অন্ত্যজ, হীন আদিম মেরুদণ্ডী জীবের ও পুষ্পহীন উদ্ভিদের কাল। মধ্য মহাযুগে দেখা দিল মেরুদণ্ডী জীবের তৃতীয় বংশ—অর্থাৎ সরীসৃপের বংশ। কচ্ছপ, কুমীর, গিরগিটি, টিকটিকি, গোহাড়গেল এরাই হল সরীসৃপবংশীয় জীব। আধুনিক যুগে এরা অধম জীববংশীয় বলেই গণ্য হয়; স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ, দ্বিপদদের প্রতিযোগিতায় একালের সরীসৃপ একেবারে তৃতীয় ধাপে নেমে গিয়েছে। কিন্তু মধ্য মহাযুগে সরীসৃপই ছিল যুগের 'অধিপতি' (dominant) জীব। 'কূর্ম্ম' এ মহাযুগের অবতার।

সরীসৃপ বিগত পারমীয় সন্ধ্যা-যুগেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু তখন হতে এ মহাযুগের প্রথম (ত্রয়সিক) যুগ পর্য্যন্ত এদের প্রভাব ও আধিপত্য তত বেশী বাড়েনি। তবে বিগত পারমীয় যুগে সরীসৃপের ভ্রূণাবস্থা; ত্রয়সিক যুগে এ জীবের শৈশব ও বাল্য। জুরসিক যুগেই সরীসৃপের ষোল আনা রাজত্ব ও প্রভুত্ব। আমাদের সমকালীন সরীসৃপরা এখন গোটা চার শাখাবংশভুক্ত হতে পারে; কিন্তু জুরসিক যুগে অন্ততঃ ২৫টা মূল শাখাবংশে অসংখ্য বিচিত্রদর্শন সরীসৃপ বিভক্ত ছিল। প্রাণিবংশ যে যুগে আধিপত্যলাভ ও প্রভাববিস্তার করে, সে যুগে তারা নানা আকারে ও নানারূপে বিকশিত হয়। মধ্য মহাযুগের সরীসৃপ এই নিয়মে জলস্থল ও বাতাস তিন রাজ্যই অধিকার করে বসেছিল। তখন যদি কোনো মনুসন্তান ধরাবক্ষে থাকতেন তিনি দেখতেন, নানা আকারের, নানা আয়তনের ও নানা প্রকৃতির সরীসৃপ ধরাবক্ষে একচ্ছত্র রাজা হয়েছে। তখন ভূচর, খেচর, জলচর হয়ে হিংস্র মাংসাশী, নিরীহ শাকভোজী, উভভোজী, সর্ব্বভুক ভীমায়তন হতে ক্ষুদ্রকায় শান্তপ্রকৃতির সব রকম সরীসৃপই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেছে। এই সব অদ্ভুদর্শন ও বিচিত্রপ্রকৃতির গোটাকত সরীসৃপের নাম ও পরিচয় দেওয়া যাক। এই সব সরীসৃপদের 'Saurians' বা গিরগিটি (lizard) বলা হত। ঐরূপ আকার তখন অনেকেরই ছিল। কুমীরের ও গোহাড়গেলের সেই আকৃতি এখনো দেখা যায়। তবে জাতিবিশেষে আকারের একটু তারতম্য ছিল। কেহ বা মৎস্যাকার, কেহ বা কাঙ্গারুবৎ, কেহ বা গণ্ডারবৎ ইত্যাদি।

১। Icthyosaurus: আকারে ছিল মাছের মত, আয়তনে ছিল তিমিমাছের সমান, লম্বা ছিল ৪০ ফুট।

২। Plesiosaurus: গিরগিটি আকার। বিশুদ্ধ গিরগিটি নয়। কুমীর, তিমি, কচ্ছপ, জিরাফ্—এই কয়টা জীবের অঙ্গ হতে কিছু কিছু নিয়ে মিশিয়ে ভগবান এই সরীসৃপকে গড়েছিলেন।

৩। Pareiasaurus: আকারে অজপ্রকার হলেও আয়তনে একটা ষাঁড়ের মত। নিরামিষাহারী তৃণপত্রভুক নিরীহ জীব ছিল।

আর এক বংশীয় সরীসৃপ ছিল অতীব ভীষণদর্শন, তাদের বলা হতো Dinosaurus। ডাইনসরাসের আকৃতি ছিল অর্দ্ধতিমি+অর্দ্ধ গিরগিটি। মাথাটাই ছিল একটা ঘোড়ার মত প্রকাণ্ড। ইহারা মাংসাশী ও নিরামিষাশী দুইই ছিল।

৪। Allosaurus—কাঙ্গারুর মত দেখ্‌তে, কিন্তু বাঘের মত ক্রূর ও হিংস্র।

৫। Brontosaurus (অতিকায় গিরগিটি) প্রায় ৮০ ফুট দীর্ঘ। ওজনে দেহখানি ছিল ৫০০ মণ। কিন্তু মস্তিষ্কের খোলটা ছিল একটা বড় বাদামের আয়তনের।

৬। Iguandon দীর্ঘ ছিল ৫০-৬০ ফুট। নিরামিষাহারী। দেখতে ঋজুদেহ নেউলের মত।

৭। Diplodocus—৮০ ফুট দীর্ঘ দেহ।

৮। Atlantosaurus—১০০ ফুটের দীর্ঘ দেহ, ৩০ ফুট উচ্চ।

৯। Brachiosaurus—একটা বিপুলদেহ জীব।

১০। Stegosaurus—অতীব ভীষণ ও কদাকার জীব। তার পেছনের একটা পা দু'মানুষ সমান উচ্চ ছিল।

সরীসৃপের এই বৃদ্ধি ও প্রভাববিস্তার ছাড়া জীবরাজ্যের ক্রমিক উন্নতি বিষয়ে আরো কয়েকটা প্রধান ঘটনা এই মধ্য মহাযুগে ঘটে। এই মহাযুগেই প্রাচীন যুগের কাঁটাহীন স-খোল মাছ আধুনিক কাঁটা ও আঁশওয়ালা মাছের রূপ ধরে। কীটপতঙ্গও আধুনিক যুগের আকৃতিপ্রকৃতি ধারণ করতে আরম্ভ করে। পক্ষধর পাখীর প্রথম সাক্ষাৎ এই মহাযুগেরই শেষভাগে ঘটে। তবে আধুনিক পাখী হতে প্রথম পক্ষীর তফাৎ এই যে তাদের দাঁত ছিল এবং ডানার পাঁচটা আঙ্গুল চামড়া ও পালকে ঢাকা হলেও একটার নখ (claw) বেরিয়ে থাকতো; বোধ হয় ঐটে দিয়ে ডালে ঝুলবার সুবিধা হতো। লেজটারও বিশেষত্ব ছিল,—মেরুদণ্ডটাই লম্বা ও সরু হয়ে খানিকটা বড় হয়ে ঝুলতো এবং তার দুধারে গাঁটে গাঁটে পালক সাজানো থাকতো, অনেকটা নারিকেল গাছের পাতার ধরণের ছিল।

এক শ্রেণীর উড্ডয়নশীল সরীসৃপ এযুগে দেখা দিয়েছিল, তাদের নাম ছিল Pterodacty। তারা ঠিক পাখী না হলেও পক্ষিধর্ম্মী বটে, অনেকটা বাদুড় ধরণের। এদেরই একটা শাখাজাতি অবস্থা ধর্ম্মে পড়ে পাখীতে রূপান্তরিত হয়। এই আদিম ধরণের পাখী আধুনিক রূপ ধরে নব্য জীবমহাযুগের আরম্ভের আগে অর্থাৎ lower tertiary যুগে। প্রাণিজগতের ক্রমবিকাশ ব্যাপারে দুটা খুব বড় ঘটনা হচ্ছে যথাক্রমে (১) জীবরাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তন্যপায়ী জীবের ও (২) উদ্ভিদরাজ্যে সপুষ্পক গাছপালার উচ্চবংশের আবির্ভাব। এই দুই ঘটনাই মধ্য মহাযুগের শেষভাগে চাখড়ি যুগে হয়।

কিন্তু তার আগে সমস্ত মহাযুগটা ধরে অর্থাৎ ত্রয়সিক হতে চাখড়ি যুগের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত অধম বংশীয় সপুষ্পক গাছপালার প্রভাব ও প্রসার।

সপুষ্পক উদ্ভিদের দুইটা বড় বিভাগ। প্রথম হল আবৃতবীজ উদ্ভিদ (angiosperms) অর্থাৎ যে সব ফুলে বীজ গর্ভকোষে ঢাকা থাকে, যেমন—আম, জাম, ধনে, যব, তাল, নারিকেল

ইত্যাদি। এরই উপরের উন্নত বংশ হচ্ছে মুক্তবীজ উদ্ভিদ (gymnosperms), এদের বীজডিম্ব (ovum) ও বীজ (seed) গর্ভকোষে ঢাকা থাকে না, উন্মুক্ত অনাবৃতাবস্থায় থাকে; পাইন, ফার, সাগুতাল (Sago palm—Cycads) এই জাতের উদ্ভিদ। এই সব গাছপালাই মধ্য মহাযুগের অরণ্যাপাদপ; গন্ধপূর্ণ, বাষ্পের পাপড়িওলা, রসালো ফলযুক্ত আধুনিক গাছপালার নামগন্ধ এ যুগের অধিকাংশ কালে ছিল না; চাখড়ি যুগেই তাদের প্রথম একটু সূচনা হয়।

ফার ও পাইন বংশীয় এসকল গাছ যে এই মহাযুগেই প্রথম দেখা দেয় তা নয়, বিগত পারমীয় যুগেও তাদের পূর্ব্বপুরুষস্থানীয় কয়েক জাতীয় ফলবান গাছপালার আভাস পাওয়া গিয়েছে। এইসব নগ্ন বা মুক্তবীজ সপুষ্পক উদ্ভিদ তখনকার কালে সর্ব্বত্র বহু সংখ্যায় জন্মিলেও এখনকার কালের উচ্চবংশীয় ফুলগাছরা তাদের একেবারে কোণঠ্যাসা করে দিয়েছে।

চাখড়ি যুগে স্তন্যপায়ী জীবের প্রথম আবির্ভাব হয় বটে, কিন্তু এসব স্তন্যপায়ী জীব খুব হীন ও অধম বংশীয়। স্তন্যপায়ী জীব উচ্চনীচভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে পড়ে একজাতের জীব যারা ডিম পাড়ে এবং ছানা হলে মাই দুধ খাওয়ায় (monotremes); এরা দ্বিধর স্তন্যপায়ী, এদের বলা হয় অধম স্তন্যপায়ী।

এদের উপরের শ্রেণী হল কাঙ্গারুবংশীয় জীব, এদের অপুষ্টাবস্থায় ছানা হয়; উদরের বহির্ভাগে একটা থলিতে এইসব ছানাকে রাখা হয় এবং স্তন্য খেয়ে পরিপুষ্টাঙ্গ হলে তবে ছানা মাটীতে নামে। এরা হল অর্দ্ধজরায়ুজ জীব। এই শ্রেণী হল মধ্যম স্তন্যপায়ী (marsupials)।

এদের উপরে এল পূর্ণজরায়ুজ জীব। তিমি, বাদুড়, ইঁদুর, বেড়াল, গরু, ভেড়া, নর, বানর ইত্যাদি সব জীব এই শ্রেণীভুক্ত। এরা উত্তম স্তন্যপায়ী (placentals)।

মধ্য মহাযুগের শেষদিকে যে সব স্তন্যপায়ী দেখা দেয় তারা এই নিম্ন দুই শ্রেণীর স্তন্যপায়ী।

Monotremes বা অধম স্তন্যপায়ী ত্রয়সিক যুগে দেখা দেয়। Marsupials বা মধ্যম স্তন্যপায়ী জুরসিক যুগে আবির্ভূত হয়। উত্তম স্তন্যপায়ী সবচেয়ে উচ্চবংশীয় মেরুদণ্ডী জীব, এদের আবির্ভাব হয় নব্য জীবমহাযুগে—যার নামান্তর আধুনিক মহাযুগ।

চাখড়ি যুগের শেষভাগ হতে এক প্রকাণ্ড ভূবিপ্লবের সূত্রপাত হয় এবং সে যুগ শেষ হয় এই বিপ্লবকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে।

আধুনিক বা নব জীবমহাযুগ

মধ্য জীবমহাযুগ শেষ হয় ৬ কোটী বৎসর পূর্ব্বে। এর পরই একটা অজ্ঞাত কাল যার কোনো ঠিকঠিকানা পাওয়া যায় না। এ সময়েই যা কিছু ভাঙ্গাচুরা উলটপালট ঘটে এবং নূতন প্রাণিবেশ বেশ একটু স্থির ও স্থায়ী হয়। এযে কতটা কাল তা জানবার উপায়ই নেই। প্রতি মহাযুগ শেষে ও পরবর্ত্তী মহাযুগ আরম্ভে বোধ হয় এমনি

একটা কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এ অনুমানের হেতু এই যে নূতন একটা বড় যুগ যখন আরম্ভ হয় তখন সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা নিয়ে দেখা দেয়, বিগত বড় যুগের সব চিহ্ন যেন ধুয়ে মুছে যায়।

আধুনিক যুগের আরম্ভ দেখা গেল প্রায় ৬ কোটী বৎসর আগে। মতান্তরে ৪ কোটী। অজ্ঞাত বিগত মহাযুগের তুলনায় এই কাল নগণ্য, প্রাচীন বা মধ্য মহাযুগের একটা যুগ বা গর্ভযুগের কাল এই পরিমাণের। অঙ্গার বা ডিভনীয় যুগ দুটার প্রত্যেকটাই ৯ কোটী বৎসরব্যাপী। তা ছাড়া আধুনিক মহাযুগের এই তো আরম্ভ বা উষাকাল। এগনো সম্মুখে সীমাহীন ভবিষ্যৎ বিস্তৃত আছে। কিন্তু যুগস্থিতিকাল অল্প হলেও প্রাণীর ক্রমবিকাশের ব্যাপারে ও দেহের নানা পরিবর্ত্তনের বিষয়ে এই নবযুগের ঘটনাবলী বিস্ময়কর।

এক হিসাবে ধরতে গেলে বহুন্ধরা ও তার সন্তানসন্ততির বয়সে ও দেহবিকাশে এ যুগটা যেন যৌবনকাল।

নবযুগকে তিনটী যুগে ও ছয়টী গর্ভযুগে ভাগ করা হয়।

এই যুগের স্তরগুলার উপাদান বালি, কাঁকর বা মাটী; স্থানে স্থানে চুণে-মাটীও বিস্তর আছে। উপর দিকের স্তরগুলা চাপ বেঁধেছে মাত্র—পাথরে পরিণত হয়নি, পাষাণ হওয়া তো দূরের কথা। নীচের দিকের থাকে অল্প বিস্তর বেলে-পাথর, সেটে-পাথর ও চুণে-পাথর পাওয়া যায় বটে তবে এসব পাথরের বাড়ীঘর তৈয়ারী করবার মত কাঠিন্য ঘটেনি।

সমস্ত স্তরগুলার মোট গভীরতা এ পর্য্যন্ত যা খুঁজে পাওয়া গিয়াছে তা হচ্ছে ৭৩০০০ ফুট। অবশ্য সব দেশেই যে এই পরিমাণ গভীর স্তর উপর উপর এক স্থানে সাজানো পাওয়া যায় তা নয়।

নবযুগ বিপ্লব নিয়ে আরম্ভ এবং এর বেশীভাগ কালই বিপ্লবের ও উৎপাতের মধ্যে কেটে যায়। চাখড়ি যুগের শেষদিকে এই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, এই বিপ্লব মাঝে মাঝে থেমে আবার সজোরে আরম্ভ হ'ত; এইভাবে চলতে চলতে মায়োসীন যুগে তার প্রকোপ চরম হয়; তার ফলে বিগর্য্যয় কাণ্ড ঘটে, ভূপৃষ্ঠে—ইয়োরোপ, এশিয়া ও আমেরিকায় বিপুলকায় উন্নতশির পর্ব্বতশ্রেণীর জন্ম হয়। ইয়োরোপে পিরীনিজ পাহাড়, আল্পস পর্ব্বত, কার্পেথিয়ান, এশিয়াতে ককেশস ও গিরিরাজ হিমালয়, চীনের পর্ব্বতমালা, আমেরিকা খণ্ডে থাণ্ডিজ ও রকি প্রভৃতি গিরিমালা ভূপৃষ্ঠকে বিচিত্রদর্শন করে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এই বিরাট বিপ্লব আরম্ভ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি হতে ৪।৫ কোটী বৎসর পর্য্যন্ত সময় নেয়। কাজেই সমগ্র যুগটাই এক রকম অশান্তিরও ভাঙ্গাগড়ার যুগ। পূর্ব্বগত মধ্যযুগটা সমস্তই একটা এক টানা বিরামের যুগ ছিল। এইরূপ পিছু হেঁটে অতীতের দিকে গেলে বেশ দেখা যায় একটা বিপ্লবের দীর্ঘ যুগ, আর তার আগে একটা বিরাম ও শান্তির যুগ, তার

নব্য জীবমহাযুগের বিবরণচিত্র

		স্থিতিকাল		
নব্য জীবমহাযুগ	আধুনিক ভাগ Quaternary	বর্ত্তমান যুগ (হিমাস্তকাল)	২০ হাজার বৎসর	(Homosapiens) আসল মানুষ
		হিম যুগ Pleistocene	৪৮০,০০০ বৎসর	(আবৃতবীজ) উচ্চবংশীয় (দ্বিবীজদল) (Submen) অর্দ্ধমানুষ, বানর-নর
	মধ্য ভাগ (Upper tertiary)	প্রায়-আধুনিক Pliocene	৯৫ লক্ষ বৎসর	বাহারে পাপড়ি ও রসাল ফলগাছের আবির্ভাব মানুষের প্রথম আবির্ভাব
		দূর-আধুনিক Miocene	৭৫ লক্ষ বৎসর	এই যুগে anthropoid ape বা নরবানর হতে নর (Hominoid) শাখা ভেদ হয়
	আদি ভাগ (Lower tertiary)	অল্পাধুনিক Coligocene	১ কোটী ২৫ লক্ষ বৎসর	গিবন জাতীয় নর-বানর হতে গরীলা জাতীয়দের শাখা ভেদ হয়। উচ্চবংশীয় স্তন্যপায়ীর সংখ্যাবৃদ্ধি (mammals)
		আদি-আধুনিক উর্দ্ধ ভাগ Upper Eocene	২ কোটী বৎসর	উচ্চজাতীয় primate জীবের আবির্ভাব
		অধোভাগ Lower Eocene		আদিম বংশীয় দ্বিবীজদল ও একবীজদল উদ্ভিদ Lemurs এবং Lemuroid জাতীয় lower primate-এর উৎপত্তি

আগে আবার একটা বিপ্লবের যুগ; এইরূপ ধারাক্রমে চলেছিল এবং চলে আসছে। প্রাচীনতম পলিপাথর হতে আধুনিকতম পলিস্তরে ক্রমান্বয়ে এই বিপ্লব ও বিরামের চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের লিপি স্পষ্টাক্ষরে খোদিত।

শুধু কি বিপ্লবের আর বিরামের লিপি? সারা ভূবক্ষব্যাপী শীতাতপের চরম মাত্রাও চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হয়ে এসেছে। একবার সুদীর্ঘ যুগব্যাপী উষ্ণতা এক মেরু হতে অপর মেরু পর্য্যন্ত চলে এল, তারপর উষ্ণতার মাত্রা ধীরে ধীরে কমে এসে শীত এল, শীত আরো বাড়তে বাড়তে শেষে প্রচণ্ড হিম যুগের (Ice age) আবির্ভাব। মেরু হতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত মেদিনীর বুক তুষারের বজ্রবাঁধনে বাঁধা পড়ে গেল। আবার ধীরে ধীরে সে বাঁধন আল্গা হতে হতে শেষে সমস্ত বরফ গলে সমুদ্র, নদী, নালা, হ্রদ জলে ভরে গেল। মেদিনীর হিমাবসন্ন পাঁজর উত্তাপের প্রাণদায়ক স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো।

নির্দ্ধারিত কালমাত্রান্তর পালাক্রমে শীতাতপের এই আবির্ভাব ও তিরোভাব। হিমযুগ একবার উত্তর গোলার্দ্ধে ও একবার দক্ষিণ গোলার্দ্ধে পালাক্রমে ঘটে এসেছে। এর কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত আছে। তবে ঘটনার কারণগুলা খুব জটিল, আর কারণও একটা নয়; নানা জাতীয় অনেক কারণ এর মূলে আছে। তবে এটা ঠিক যে জ্যোতিষিক কারণটা বড় কারণ। সে কারণ বুঝাবার এ স্থান নয়, দু'চার কথায় তা শেষ করা যায় না; তার জন্য একটা আলাদা প্রবন্ধ দরকার।

এই আধুনিক যুগের চতুর্থ গর্ভযুগশেষে (Pliocene) এইরূপ এক প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন হিমযুগ আসে। পৃথিবীর বয়সে দুবার ছুটা খুব তীব্র ও দীর্ঘকালস্থায়ী হিমযুগ এসেছে; প্রথমটা প্রাচীন মহাযুগের শেষযুগ পারমীয়ন যুগশেষে। সেটার প্রভাব কিন্তু দক্ষিণ গোলার্দ্ধেই নিবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় হিমযুগটা উত্তর গোলার্দ্ধে (আমাদের ভূখণ্ডে) ঘটেছিল। আরও গোটা দুই হিমযুগ দেখা দিয়েছিল সুদীর্ঘ আদিম মহাযুগে (Pre-cambrian বা archezoic era)। তার প্রথমটা হয়েছিল আদিম মহাযুগের আরম্ভকালে এবং দ্বিতীয়টা তার শেষদিকে। ভূতত্ত্বের বাবধানকাল কম পক্ষে ২০ কোটী বৎসর। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরা বলেন হিমযুগগুলা ঐরূপ ২০ কোটী বৎসর অন্তর অন্তর ঘটে এসেছে। যদি জ্যোতিষিক কারণেই হিমযুগ দেখা দেয় ও সে কারণ যদি সত্য হয়, তবে নির্দ্ধারিত কাল অন্তরে তা ঘটবে, এ কথা বিচিত্র নয়।

আধুনিক হিমযুগের সূত্রপাত হয় অন্যূন ৫ লক্ষ বৎসর আগে। এর অবসান হয়েছে ২০,০০০ বছর পূর্ব্বে। হিমযুগের স্থিতিকাল তা হলে দাঁড়াচ্ছে চার লক্ষ ৮০ হাজার বছর। হিমযুগের প্রভাব যে আরম্ভ হতে শেষ পর্য্যন্ত বিরামহীন একটানা ভাবে চলেছিল তা নয়।

সমগ্র হিমপ্রভাবটীকে চারটী ভিন্ন প্রকোপে বা আক্রমণে ভাগ করা যায়। প্রথম প্রকোপ কিছুকাল সজোরে চলে, তারপর একটু নরম পড়ে; কিছুকাল বিরাম-অন্তে দ্বিতীয় প্রকোপ আসে; তারপর খুব এক দীর্ঘ বিরামের পর তৃতীয় আক্রমণ; তারপর আবার

বিরাম ; তারপর চতুর্থ বা শেষ আক্রমণ। নিম্নলিখিত রেখাচিত্র হতে এই প্রকোপ ও বিরামের আরম্ভ এবং স্থিতিকালের একটা ধারণা হবে।

হিমযুগ Ice age (Pleistocene)

	মোট স্থিতিকাল		আরম্ভ ও অবসান কাল
		হিমান্ত কাল Post-Pleistocene	
Pleistocene (হিম যুগ) Ice age	চতুর্থ হিমপ্রকোপ স্থিতিকাল ২০ . হাজার বৎসর		২০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে শেষ ৪০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ
	খণ্ড বিরামকাল		
	তৃতীয় হিমপ্রকোপ স্থিতি ৩০০০০ বৎসর কাল		১০০হাজার বৎসর পূর্ব্বে শেষ ১৩০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ
	মহা বিরামকাল ২৫০ হাজার বৎসর		প্রধান বিরামকাল
	দ্বিতীয় হিমপ্রকোপ স্থিতিকাল প্রায় ৬০ হাজার বৎসর		৩৮০ হাজার পূর্ব্বে শেষ ৪৪০ হাজার পূর্ব্বে আরম্ভ
	খণ্ড বিরামকাল		
	প্রথম হিমপ্রকোপ স্থিতিকাল ৬০ হাজার বৎসর		৪৭০ হাজার বছর আগে শেষ ৫৩০ হাজার পূর্ব্বে আরম্ভ

এ যুগের এই সব ঘন ঘন উৎপাত, বিক্ষেপ ও বিপ্লব এবং এইরূপ চার চার বারের হিমপ্রকোপ প্রাণিজগতের রূপপরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশ ব্যাপারে খুব বেশী মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে। প্রাণী মাত্রেরই ভালমন্দ উন্নতিঅবনতি বাহ্য অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। বাহ্য প্রকৃতির এই সব পরিবর্ত্তন যে প্রাণীদের আকৃতিপ্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন আনবে, এতো সহজ কথা। বিগত মধ্যযুগটা ছিল আগাগোড়া উৎপাতহীন শান্তির যুগ ; জীব, জন্তু, উদ্ভিদ্ কোটী কোটী বছর ধরে বংশানুক্রমে অবস্থানুযায়ী এক রকম দেহ ও প্রকৃতি গঠন করে নির্ভাবনায় জীবলীলা চালাচ্ছিল ; কিন্তু নব যুগের প্রারম্ভে ও কিছু আগে হঠাৎ একটা ছোটখাটো প্রলয় ঘটলো, মুহুর্মুহু ভূকম্প, আগ্নেয়গিরি-নিঃস্রাব, পাহাড়-পর্ব্বতের উৎপত্তি, ভূপঞ্জরের আন্দোলন, উষ্ণ জলবাতাস একটু একটু করে নাতিশীতোষ্ণ, অতি শীতল এবং অবশেষে তুষারশীতল হয়ে পড়লো ; প্রাণিজগতে একটা সাড়া পড়ে গেল ; জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকবার জন্য—প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থাকে আয়ত্ত করবার জন্য প্রবল চেষ্টা আরম্ভ হ'ল ; ফলে যাদের দেহগঠন এরূপ ছিল না যে প্রচণ্ড শীত হতে আত্মরক্ষা করতে পারে তারা এবং যারা জলস্থলের হঠাৎ পরিবর্ত্তনে নিজ নিজ বাসভূমির উপায় করতে পারলে না তারা ধ্বংস হয়ে গেল। যে সব অনুন্নত প্রাণীর দেহ জটিল হয়ে পড়েনি এবং যারা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজ দেহকে অবস্থার উপযোগী করে গড়ে নিতে পারলো তারা বেঁচে গেল ; তাদেরই বংশধররা পরে প্রবল ও প্রভাবশালী হয়ে উঠলো।

একটা খুব বিস্ময়কর কথা এই যে ক্রমোন্নতিসূত্রে যে যুগে যে জীব অবস্থানুকূল্যে খুব জটিল যন্ত্রযুক্ত দেহ গড়ে তুলেছে, তারাই হঠাৎ অনুগামী ধ্বংসের যুগে লোপ পেয়ে গেছে। বেঁচে যায় তারা, যাদের দেহ খুব জটিল হয়ে পড়েনি। যারা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সরল অবস্থায় থাকে, তারা চট্ করে অল্প চেষ্টায় দেহকে নূতনাবস্থার উপযোগী করে নিতে পারে। তবে এ কাজটা তারাই ভাল পারে, যাদের দেহগঠনে ভাগ্যগুণে একটু আধটু ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ যাদের এমনি একটা দৈহিক লক্ষণ থাকে যেটা ভাগ্যবশে নূতন প্রতিকূল অবস্থায় কাজে লেগে যায়। একেই accidental variation গুণে natural selection বলে। এ হ'ল ডারুইনব্যাখ্যাত অভিব্যক্তি সূত্র বা বিধি।

মধ্য মহাযুগের প্রধান জীববংশ বা উদ্ভিদবংশ—সরীসৃপ ও নগ্নবীজ উদ্ভিদ্—তারা বর্ত্তমান নব যুগের এই সব প্রতিকূল পরিবর্ত্তনে খুব মুস্কিলে পড়ে গেল ; সরীসৃপরা ছিল cold-blooded জীব অর্থাৎ তারা দেহের রক্তের তাপমাত্রাকে বাইরের তাপমাত্রার সঙ্গে সমান রাখবার কৌশল বা উপায় আয়ত্ত করেনি, ফলে এই দুরন্ত হিমপ্রভাবে তারা আত্মরক্ষা করতে না পেরে অধিকাংশই লোপ পেল। পাখী ও স্তন্যপায়ী warm-blooded বা 'উষ্ণশোণিত' জীব, তারা ঐ কৌশলটা আয়ত্ত করেছিল ; কাজেই তারা লোম ও পালক উৎপাদন করতঃ জীবনযুদ্ধে জয়ী হল। উদ্ভিদ সম্বন্ধেও ঐ ব্যাপর

ঘটল। নগ্নবীজ গাছপালার (যেমন, পাইন গাছ) বীজডিম্ব বা বীজ গর্ভকোষে বদ্ধ থাকে না; কাজেই দুরন্ত শীতে, তুষারপাতে অথবা হিমশীতল ঝড়ঝাপটায় এই সব অনাবৃত বীজডিম্ব বা বীজ নষ্ট হয়ে গেল; যে সব গাছপালার বীজডিম্ব বীজকোষে আবৃত ছিল তারা বেঁচে গেল। তাদেরই বংশধররা বাহারে ফুলওলা বা আবৃতবীজ-উদ্ভিদে পরিণত হয়েছে।

বীজডিম্বকে যখন কোষে আবৃত করে রাখতে হল, তখন ডিম্বকোষকে পুংকোষ (pollen) দিয়ে সঞ্জীবিত (fertilised) করবার আয়োজন করতে হল। বাহারে পাপড়ি দ্বারা অথবা মধুকোষ তৈরী করে পোকামাকড়কে আকর্ষণ করার মতলবে corolla (দল চক্র) ও nectarine (মধু) তৈরী করতে হল।

এইভাবে নব জীবযুগে মেরুদণ্ডী জীবের শ্রেষ্ঠ শাখাবংশ স্তন্যপায়ীর আবির্ভাব হয় এবং সপুষ্পক উদ্ভিদের উচ্চতর বংশ 'আবৃতবীজ' ফুলগাছ বা রসাল ফলযুক্ত বৃক্ষলতার উৎপত্তি আরম্ভ হয়।

কিন্তু তা হলেও যুগারম্ভকালের স্তন্যপায়ী জীব ও রসাল ফলযুক্ত গাছপালা এখনকার ঐ শ্রেণীর জীব বা উদ্ভিদ হতে অনেক হীন জাতীয় ছিল।

এই সব অতি-আদিম ধরণের জীব ও উদ্ভিদকে একটু একটু করে উন্নত হয়ে যুগ যুগ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তবে আধুনিক আকৃতিপ্রকৃতি লাভ করতে হয়েছে। এইটিই যে ঘটেছে তার সাক্ষাৎ প্রমাণ এ যুগের স্তরথাক হ'তে প্রাপ্ত ফসিল বা 'জীবাশ্ম' হতে পাওয়া যায়।

ভূতত্ত্ববিদরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এ যুগের সমগ্র স্তরটার উপরিভাগ হ'তে যত নীচের দিকে যাওয়া যায়, ততই থাকে থাকে জীবাশ্মগুলা সেকেলে রূপ ধারণ করে। জীবিত যত জীব ও উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায় তাদের সঙ্গে অতীতের প্রাণীর জীবাশ্ম কতদূর মেলে তাই দেখে স্তরভেদ করা হয়।

এই নব্য যুগটার অন্তর্গত যে ছয়টা গর্ভযুগ, তাদের নাম ও স্থিতিকাল ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হয়েছে। প্রাণীর দেহাবশেষ দেখে তা হতে প্রাণীটা কোন্ জাতীয় ছিল তা বোঝা যায়। এই লক্ষণ ধরে ভূতত্ত্ববিৎ ও প্রাণিতত্ত্ববিদরা মিলে স্থির করেছেন যে, আধুনিক হিমাক্ত যুগের ও হিমযুগের স্তরে যে সব প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া যায় তারা সমস্তই জীবিতদের সঙ্গে এক জাতীয়। প্লিয়োসীন যুগে যে সব প্রাণী বিদ্যমান ছিল, তাদের শতকরা ৭৫টা একালের জীবন্ত প্রাণিজাতির সঙ্গে এক। মায়োসীন যুগে যে সব প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, তাদের শতকরা ৫০টা একালের জাতিদের সঙ্গে এক। অলিগোসীন যুগের প্রাণীদের মধ্যে শতকরা ২৫টা জীবিত জাতিদের সঙ্গে একজাতীয়। ইয়োসীন বা আদি-আধুনিক যুগের জীবাশ্মগুলা এরকমের যে আধুনিক জীবন্ত জাতিদের সঙ্গে তাদের কোনো মিল নেই।

সাধারণ জ্ঞানের দিক দিয়ে এর চেয়ে বেশী খুঁটীনাটী খবরের তত কোনো মূল্য নেই; তবে এ যুগের যেটা খুব দরকারী জ্ঞাতব্য বিষয় তাই বলে প্রবন্ধ শেষ করা হবে।

নব মহাযুগের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে জীবরাজ মানুষের আবির্ভাব। মানুষ সব দিক দিয়েই সর্ব্বজীবের অধিপতি সকলের সেরা জীব; কিন্তু তাকেও খুব দীর্ঘ-কালব্যাপী ক্রমবিকাশের ধারা বয়ে, বহু হীন মূর্ত্তি ও আকৃতিপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে এই আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ রূপগুণে এসে পৌঁছুতে হয়েছে। আমাদের শাস্ত্রেও বলে ভগবানের প্রথম সকল প্রাণীই বটে, কিন্তু মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রতীক, মানুষ প্রায় পূর্ণ অবতার সত্যতম জ্ঞান ও শক্তিমান। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ প্রভৃতি। ভিন্ন অধম ও মধ্যম রূপের ভিতর দিয়ে পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ মূর্ত্তিতে ভগবান পূর্ণপ্রকট হন।

ভগবান প্রাচীন ও মধ্য দুই মহাযুগে মৎস্য ও কূর্ম্মরূপের লীলা শেষ করে নব মহাযুগে বরাহ ও বামন হয়ে বুদ্ধরূপ ধারণ করেন।

চতুষ্পদ অবস্থা হতে দ্বিপদ অবস্থায় আসা আর বরাহ রূপ হতে বানরাবস্থা পার হয়ে বর্ব্বর নরাবস্থা বা বামনাবস্থায় আসা একই ধরণের পরিণতি।

স্তন্যপায়ী জীববংশের সর্ব্বোচ্চ শাখাবংশ হচ্ছে primate (প্রধান) জীবশ্রেণী। এই শ্রেণীতে পড়ে লেমুরবর্গীয় জীব, সলাঙ্গুল বানর, লাঙ্গুলহীন নরাকার বানর (anthropird ape), বানরাকার নর (pithecoid man) ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নর। (Homosapien's)

এর পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, সব মেরুদণ্ডী শাখাবংশই সগোত্র জীব; এক আদিম নরম মেরুদণ্ডী জীব হতে শক্ত হাড়ের মেরুদণ্ডী যত জীব উৎপন্ন হয়। মনুষ্যজাতি primate-এর অন্তর্গত; এই primate বা প্রধান বংশ স্তন্যপায়ী বংশেরই অন্তর্গত; এবং স্তন্যপায়ী (mammals) ও পক্ষী দুই বংশই তাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সরীসৃপ বংশের এক শাখাবংশ হতে ক্রমবিকাশ ধর্ম্মে উৎপন্ন হয়েছে।

মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব হলেও উৎপত্তি তার এক আদিম হীন জীব হতে। সরীসৃপ, মাছ, শুক্তি, শামুক সব জীবই মানুষের জ্ঞাতি ভাই—এক রক্তের ছিট সব জীবের নাড়িতেই বইছে।

প্রাইমেট বা প্রধান বংশীয় লেমুরবর্গীয় জীব দেখা দেয় আদি গর্ভযুগ ইয়োসীন কালে, সে আজ ৫।৬ কোটী বছর আগেকার কথা। এর চেয়ে উচ্চ বংশীয় হনুমান (tailed monkey) প্রথম দেখা দিল এই ইয়োসীন যুগের শেষদিকে। পরবর্ত্তী অলিগোসীন যুগে লাঙ্গুলহীন নরাকার বানর বংশের উৎপত্তি হয়। গিবন-বানর এই বংশের আদি জীব। তার পর যুগে মায়োসীন কালে মূলবংশ নরাকার বানর ও বানরাকার নর—দুই শাখাবংশে ভাগ হয়ে গেল।

অনেকের ধারণা ডারুইন নাকি বলেছেন যে বানরদম্পতির সন্তান হচ্ছে নর, কোনো এক সময়ে বানরীগর্ভে এক নর জন্ম গ্রহণ করেন। এটা একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা রটনা, ডারুইন তা বলেন নাই। তিনি বলেছেন যে, একটা অজানা মূল শাখাবংশ হতে দুইটী প্রশাখা বংশ নির্গত হয় সুদূর মায়োসীন যুগে প্রায় ১ কোটী বৎসর আগে। একটী

প্রশাখা হতে বহুকাল পরে দেখা দিয়েছে ওরাং, গরিলা ও শিম্পাঞ্জি; অন্য প্রশাখা হতে দেখা দিয়েছেন বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে বর্ত্তমানের খাঁটী মানুষ (Homosapiens)। নর-প্রশাখার গোড়ার দিকে প্রথম দুচারটে বানরাকার নর (ape man) দেখা দিয়ে লোপ পায়। তারপর দেখা দেয় উপনর, অর্দ্ধনর (submen—বামনরূপ); তারও বহু পরে খাঁটী নর! প্লায়োসীন ও প্লিসটোসীন (হিমযুগ) এই দুটা যুগ ধরে প্রায় দুকোটী বছর মানুষ বানরাবস্থায় (ape man) ও উপনর (sub men) অবস্থায় কাটিয়ে তবে হিমযুগে (৫ লক্ষ বছর পুর্ব্বে) পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠে।

সপুষ্পক গাছপালার ও এই ধরণের ক্রমোন্নতি। মধ্য মহাযুগের গাছপালা নামে সপুষ্পক। পাইন, ফার, সাগুতাল—এরা পুষ্পবান হলেও সে ফুলে না পাপড়ি, না মধু না গর্ভকোষে বীজের জন্ম। তাদের ফলে না রস, না স্বাদ, না গন্ধ একেবারে অখাদ্য।

নব মহাযুগেই আসল ফলপুষ্প ও পাতার উৎপত্তি। যাকে বলে এক-বীজদল বংশ (যেমন তাল, ধনে, লিলি) এবং যাকে বলে দ্বিবীজদল বংশ) তাদের উদ্ভব এই যুগে। এই আধুনিক যুগের অরণ্যেই প্রথম দেখা দিল বর্ণবাহারযুক্ত সুগন্ধ ফুল ও সমাল ফলবান তরুলতা। কিন্তু এই দুই বংশীয় ফুল গাছেরও উচ্চনীচ ভেদ আছে। যুগপরিচয় প্রবন্ধের গোড়ার দিকে জীব ও উদ্ভিদ পরিচয় উপলক্ষ্যে এই উচ্চ নীচ ভেদের উল্লেখ করা গেছে।

এখানে বক্তব্য এই যে সপুষ্পক উদ্ভিদরাজ্যে এই যে নিম্ন হতে উর্দ্ধদিকে গতি বা প্রসার, এও যুগ যুগ ধরে হয়েছে এবং যুগ যুগের স্তরপাথরে তার চিহ্ন রেখে গিয়েছে।

উদ্ভিদের সঙ্গে জীবের, প্রাণীর সঙ্গে জড়ের, জলের সঙ্গে স্থলের, জলস্থলের সঙ্গে প্রাণীর, আবহাওয়ার সঙ্গে জীবোদ্ভিদের, ভূদেহের আন্দোলন ও বিক্ষেপ, বিরাম ও বিপ্লবের সঙ্গে ক্রমাভিব্যক্তির সূত্র অচ্ছেদ্য বন্ধনে এবং অতীব জটিল সূত্রে বাঁধা। আবার জড় বা প্রাণময়ী ধরণীর সঙ্গে সূর্য্যের সম্বন্ধ আরো নিগূঢ়।

ততোধিক নিগূঢ় ও রহস্যময় সম্বন্ধ সূর্য্যের সঙ্গে সমগ্র তারাজগতের এবং দূরতম প্রান্তবিহারী ধূমময়ী নীহারিকাদের। প্রথমে বিশ্বের ও সূর্য্যের জন্মকথা বলে পৃথিবীর জন্ম, দেহগঠন ও যুগপরিচয় কাহিনী শেষ করা হল।

এর পর আমরা মানুষের আবির্ভাব কাহিনীর বিশেষ বিবরণ দেবার চেষ্টা করবো। তারপর প্রাণের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বিস্তৃতির কথা আলোচনা করে ক্রমাভিব্যক্তির ধারা, ধরণ ও ইতিহাস বর্ণনায় রত হব।

সম্বলপুরে নরবলি

অধ্যাপক শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র

ধনলিপ্সু এবং কৃপণ ব্যক্তিরা তাঁহাদের জীবদ্দশায় বহু ধন সঞ্চয় করেন, অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর পর্য্যন্তও তাঁহাদের ধনতৃষ্ণা যায় না। এই বিশ্বাসটী পৃথিবীর সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্ব জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। ঐরূপ ব্যক্তিরা তাহাদের সঞ্চিত ধনসমূহ ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখে এবং ভীষণাকৃতি সর্পের আকার ধারণ করিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। যখন প্রোথিত ধনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার এই সকল সর্পরূপী রক্ষকগণের অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহারা কোন অর্থলিপ্সু ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলে, "ওহে! যদ্যপি তুমি এই প্রোথিত ধন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আইস। তোমার কোন প্রিয়তম আত্মীয়কে আমার তৃপ্ত্যর্থে বলি দিয়া ধনসমূহ দখল করিয়া লও।"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নিজাম রাজ্যের কোন স্থানে এই প্রকার একটী নরবলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে উপরোক্ত বিশ্বাসটী ভারতবর্ষেও প্রচলিত আছে। নিজাম রাজ্যের নরবলির ব্যাপারটী এইরূপ:—প্রোথিত ধনপ্রাপ্তির অভিলাষে রাধাম্মা নাম্নী জনৈক ধনী স্ত্রীলোক একটী শিশুকে অপহরণ করিয়া লইয়া আসে এবং তৎপরে ভৌতিক ধনরক্ষকের তৃপ্ত্যর্থে তাহাকে বলি দেয়। The Journal of the Bihar and Orissa Research Society নামক পত্রিকার ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ৪৩৫ হইতে ৪৩৭ পৃষ্ঠায় উক্ত নরবলিটীর বিষয় আমি বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছি।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার অন্তর্গত সম্বলপুর জেলায় একটী নরবলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নিম্নে উহার বিবরণ প্রদত্ত হইল:—

সম্বলপুর জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী বারপলি গ্রামে এই নরবলিটী অনুষ্ঠিত হয়। একদিন একটী সপ্তমবর্ষ বয়স্ক বালকের ছিন্নমস্তক দেহ যদু সোনারী নামক জনৈক গ্রামবাসীর গৃহ প্রাঙ্গণস্থ কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া গেল। জনরব এইরূপ যে যদু সোনারী কোন গ্রাম্য যাদুকরের শিষ্য। এই যদু সোনারীর বাটীতে একখানি তালপত্রের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথিখানিতে পশুবলি দিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ লিখিত আছে।*

উপরোক্ত ঘটনাটী পাঠ করিলে নিম্নলিখিত প্রশ্নটী স্বতঃই মনে উত্থিত হয়—"সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত বারপলি গ্রামে যে নরবলিটী অনুষ্ঠিত হইয়াছে উহার উদ্দেশ্য কি প্রোথিত ধনপ্রাপ্তি, না অপর কোন উদ্দেশ্য?"

* ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখের (বাঁকিপুর হইতে প্রকাশিত) বেহার হেরাল্ড নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা দেখুন।

উপরোক্ত প্রশ্নটির প্রথম ভাগের উত্তরে আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে সম্বলপুরে যে নরবলিটী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল গুপ্তধনপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য ছিল।

ঐ প্রশ্নের দ্বিতীয় ভাগের উত্তরে আমি বলিতে চাই যে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি হইতে ১৫ই এপ্রেল পর্য্যন্ত প্রায় তিন মাস আমি রাঁচিতে ছিলাম। এথায় অবস্থানকালে সদর-মহকুমার কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর রায়সাহেব অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেন যে উড়িষ্যার সন্নিকটস্থ রাঁচি জেলায় অপর একটী উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নরবলি দিবার প্রথা ছিল এবং এখনও আছে। জঙ্গল কাটিয়া কোন ভূমিখণ্ডকে চাষবাসের উপযুক্ত করিবার সময় ধরিত্রী মাতাকে প্রীত ও তৃপ্ত করিয়া সেই ভূমির উর্ব্বরতাসম্পাদন করাই এই প্রকার নরবলির প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি আমাকে আরো বলিয়াছিলেন যে রাঁচি জেলার অন্তর্গত গুম্‌লা মহকুমায় এই প্রকারের দুই একটী নরবলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করিয়া উপরোক্ত তত্ত্বটী জানিতে পারিয়াছিলেন।

সম্বলপুরে যে নরবলিটী অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার তদন্তকাহিনী পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে নিহত বালকটীর দেহ একটা কূপমধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমার মনে হয় কোন ভূমিখণ্ড হইতে জঙ্গল কাটিয়া উহা শস্যোৎপাদনযোগ্য এবং উর্ব্বর করিবার উদ্দেশ্যেই এই নরবলিটী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত নিহত বালকটীর দেহপ্রাপ্তি হইতেই আমার উপরোক্ত মন্তব্যটী সমর্থিত হইতেছে।

আমার মন্তব্যটী যে যুক্তিসঙ্গত তাহা দেখাইবার জন্য আরো গুটীকতক কথা আমি নিম্নে বলিব :—

(১) কোন দেবতা বা দেবীর প্রীত্যর্থে যে প্রাণী নিহত হয় বা যে খাদ্যদ্রব্য অর্থাৎ স্বরূপ অর্পিত হয় এবং যে অর্পিত খাদ্যদ্রব্য বা নিহত প্রাণীর মাংস ঐ সকল দেবদেবীর উপাসকরা তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ভক্ষণ করিয়া থাকে সেই প্রাণী অথবা খাদ্যদ্রব্যকে নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা "বলি" বলিয়া থাকেন। যদ্যপি কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার মানসে কোন প্রাণীকে নিধন করা হয় অথবা কোন খাদ্যদ্রব্য অর্থাৎস্বরূপ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ প্রাণী অথবা দ্রব্যকেও উপরোক্ত পণ্ডিতরা "বলি" বলিয়া থাকেন।

(২) অজ্ঞানীয় দেবতা বা দেবীর বাসস্থান অথবা তাঁহাদের গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে উপাসকরা নানারূপ কল্পনা করিয়া থাকে। সেই কল্পনানুযায়ী "বলি" প্রদান করিবার প্রণালী বিভিন্ন হয়।

(৩) ধরিত্রীদেবীর প্রীত্যর্থে যে সকল "বলি" প্রদান করা হয়, তাহা ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া অথবা উপত্যকার উপর হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ঐ বলিগুলিকে পর্ব্বতগাত্রস্থ ফাটলসমূহের মধ্যেও রাখিয়া দেওয়া হয়।

(৪) যে সকল দেবতা এবং দেবীর বাসস্থান স্বর্গে বা আকাশে, উহাদের প্রীত্যর্থে যে

"বলি" দেওয়া হয়, তাহা দগ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে তাহাদের সারাংশ ধূমে পরিণত হইয়া আকাশে উত্থিত হইতে পারে।

(৫) কখন কখন অর্চ্চনীয় দেবতা বা দেবীর প্রতিমূর্ত্তিপানিকে নিহত প্রাণীর চর্ম্ম দ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। কখন কখন দেবতা বা দেবীর প্রাপ্য অংশটুকু কোন নিভৃত স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে তাঁহারা গুপ্তভাবে আসিয়া উহা ভক্ষণ করিতে বা লেহন করিয়া আনন্দলাভ করিতে পারেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সম্বলপুরে অনুষ্ঠিত নরবলি ব্যাপারে নিহত বালকটীর দেহ কূপ মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পৃথিবী ধরিত্রীদেবীর বা ধরিত্রীমাতার বাসস্থান, এবং কূপসকল পৃথিবীর বা ধরিত্রীর অভ্যন্তরে খোদিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি যে সম্বলপুরে যে বালকটীকে "বলি" স্বরূপ প্রদান করা হইয়াছিল উহা ধরিত্রীমাতার প্রীত্যর্থেই নিহত হইয়াছিল।

বাংলার মৎস্যগুলির বৈজ্ঞানিক নাম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ

চাঁদি—(১) (পুরী) Priopis gymno cephalus. (২) রাঙ্গাচাঁদা।

কালচাঁদি—(পুরী) Stromateus cinereus Bloch.

লালচাঁদি—(পুরী) রাঙ্গাচাঁদা।

টঙ্কাচাঁদি (পুরী)—টাকাচাঁদা।

সাদাচাঁদি (পুরী)—Caranx malabaricus (Bl. and Schn).

চাঁড়ারমারা—Leiocassis rama (chandramara H. B).

চাঁদামতি—চাঁদা।

চাঁপলি—(লক্ষ্মীপুর) থয়রা।

চাঁপা—Cybium commersonii Lacepede.

চাঁপাগড়ি—Ophiocephalus gachua aurantiacus H. B.

চাঁপিলা—চাপ্পিলা।

চাকন্দ—চাকুন্দা।

চাকা—Chaca chaca H. B.

চাকাবাগিয়া—Platycephalus insidiator.

চাকুন্দা—Chatoessus chacunda (H.B.)

চাকুলা—রং শাদা ; চেপ্টা ; লম্বায় ১২ ইঞ্চি ; কুকুরজিহ্বা জাতীয় মাছ।

চাগুনি—(বিহার) Barbus chagunio (H. B.)।

চাঙ্গি—(১) (পুর্ণিয়া) সোনাপুঁঠী; (২) (পুর্ণিয়া) তিতপুঁঠী।

চাপট—(১) চাপট ভোলা; (২) (ভাগলপুর) এট্‌পের।

চাপরা—খয়রা (১)।

চাপিলা—(পূর্ব্ববঙ্গ, শ্রীহট্ট) Clupea chapra (H. B.)

চাম্পিল—Chataessus chanpole (H.B.)

চাম্পিলা—চাম্পিল।

চালওয়া—বকুলচেলা।

চিং—চেঙ (?)

চিংপ্‌লি (লক্ষ্মীপুর)—গাং খয়রা।

চিড়িং (চাটিগাঁ)—পিটুলি বেলে।

চিড়ুং (চাটিগাঁ)—পিটুলি বেলে।

চিতল, চিতুল—Notopterus chital (H.B.)

চিত্রফল, চিত্রফলক—চিতল।

চিত্রফলা, চিত্রফলী—ফলুই।

চিত্রবদাল—বোয়াল।

চিত্রবল্লিক—বোয়াল।

চিত্রা—ছাতারিয়া।

চিত্রাতু (পাঞ্জাব)—Barbus chilinoides McClell.

চিপুয়া—(১) (বিহার) বুকরাঙ্গী; (২) (পাটনা) এটপের।

চিরুং—চিড়ুং।

চিল (চাটিগাঁ)—Aetobatis flagellum (Schneider)

চিলয়া—Chela phula (H. B.)

চিলি (লী) বি (বী) য—(১) বকুলচেলা; (২) বেলে গুড়গুড়ী।

চিলীয, চিলিমীনক—বকুলচেলা।

চিলুয়া (পাটনা, দ্বারভাঙ্গা)—চেলা [Chela bacaila (H. B.)]

চুঁচড়া—মেটে রং; চেপ্টা; ১ ইঞ্চি লম্বা; নাদেয়।

চুড়চি—আড়।

চুড়িমাছ—Trichiurus savala Cuv. and Val.

চুণা—Gobius chuno H. B.

চাচিচুণা—অতি ক্ষুদ্র চুণামাছ।

সাদাচুণা—চুণামাছ।

চুলা—(আসাম) মোরুল্লা [Aspidoparia morar (H. B.)]

চেউস—(নোয়াখালী) চেঙ্।

চেওয়া— (পূর্ব্ববঙ্গ) Gobioides buchanani (Day).

চেঁড়—চেদরা।

চেঁদলা—(বিহার) ঘিলাচাঁদা।

চেঁপুয়া—(চম্পারণ) মোরার

চেঙ্—Ophiocephalus gachua H. B.

বড়চেঙ্—গড়ই।

চেঙ্গ—(উড়িষ্যা) চেঙ্।

চেঙ্গা—(আসাম, বিহার) চেঙ্।

চেঙ্গুয়া—(১) Gobioides rubicundus H. B. (২) Boleophthalmus boddaerti (Pall.)

কাদা চেঙ্গুয়া—(১) Gobioides cirratus (Blyth)। (২) Gobioides buchanani (Day).

লাল চেঙ্গুয়া—Trypauchen vagina Bl. and Schn.

ভেতো চেঙ্গুয়া—Apocryptes bato (H. B.)

গুলে চেঙ্গুয়া—পিটুলি বেলে (Apocryptes lanceolatus Bl.)

চেঙ্গো—(উড়িষ্যা) চেঙ্।

চেচুয়া পোড়া (উড়িষ্যা)—রেবা।

চেচ্‌রা (পুর্ণিয়া)—পাবদা।

ছোট্‌কা চেচ্‌রা (পুর্ণিয়া)—কানিপাবদা।

লালমুখা চেচ্‌রা (পুর্ণিয়া)—তাম্বুলিয়া পাবদা।

চেটুয়া—চোটাবেলে।

চেদরা (রঙ্গপুর)—Barilius bendelisis chedra (H. B.)।

চেদরী—(১) (তিস্তানদী) বরিলা। (২) (পূর্ব্ববঙ্গ) স্বাদোয।

চেনা—(১) শকুল; (২) চেঙ্গুয়া।

চেনার—(আসাম) বড়্‌কা।

চেন্নুয়া—(বিহার) সিগর।

চেন্দলা—ঘিলাচাঁদা।

চেপ্‌টাভোলা—চাপ্‌ট ভোলা।

চেমুআ—চেঙ্গুয়া।

চেল্‌পি (পূর্ব্ববঙ্গ)—বকুল চেলা।

চেল্‌পুল (বিহার)—ঘোড়া চেলা।

চেলা—(১) (কলিকাতা, ঢাকা, দিনাজপুর) ফুলচেলা। (২) (ঢাকা, আসাম) বকুল চেলা।

গাংচেলা (ঢাকা)—ঘোড়াচেলা।

ঘোড়চেলা (ভাগলপুর)—ঘোড়াচেলা।

ঘোড়াচেলা (ভাগলপুর)—Chela gora (H. B.)

চমকচেলা (ভাগলপুর)—বকুলচেলা।

ধরচেলা (মহানন্দা নদী)—ঘোড়াচেলা।

নারিয়েল চেলা (গোয়ালপাড়া)—বকুল চেলা।

নোনা চেলা—বকুল চেলা।

ফুল চেলা (গোয়ালপাড়া)—Chela phula (H.B.)।

বকুল চেলা (উত্তর বঙ্গ)—Chela bacaila (H.B.)।

রাম চেলা (ঢাকা)—ঘোড়া চেলা।

চেলায়া (চম্পারণ)—বকুল চেলা।

চেলিয়া (১) (পূর্ব্ববঙ্গ)—ফুল চেলা; (২) (বিহার)—বকুল চেলা।

চেলীম—বালিয়া।

চেলুয়া (বিহার)—মোরার।

চেলো (দিনাজপুর)—বকুল চেলা।

চেল্‌পি (পূর্ব্ববঙ্গ)—বকুল চেলা।

চেবলা—ধুসরবর্ণ; আধ হইতে এক ইঞ্চি লম্বা; আঁশ আছে; চেপ্টা; খাল ও পুকুরে থাকে। চেলা হইতে পারে।

চেষ্ট, চেষ্টক—তপ্‌সি মাছ।

চোকপূনি—তেচোকো।

চোক্‌সি (বঙ্গদেশ)—সাম্‌টা।

চোর—শাদা; আঁশ থাকে; ১-২ হাত লম্বা; চেপ্টা; চোক বড়। পাবনাতে এবং যমুনা নদীতে পাওয়া যায়।

চোলা (আসাম)—জায়া।

চৌথুলি—সবুজ রংএর মাছ।

চ্যাঙ্, চ্যাঙানি—চেঙ্।

ছহি (ভাগলপুর)—পঙ্গুশিয়া।

ছাইতান (পুর্ব্ববঙ্গ)—গড়াই।

ছাগলক—আড়ি (১)।

ছাতারিয়া—Toxotes chatareus (H.B.)।

ছিঙ্গুড়ি (বর্দ্ধমান)—লাটা।

ছিনা—সিলন্দ।

ছিলন, ছিলেন (জলপাইগুড়ি)—সিলন্দ

ছিলিন্দে—সিলন্দ।

ছিলেচ (আসাম)—ঘোড়া চেলা।

ছুয়া—শাদা রং ; চেপ্টা ; আঁশ আছে ; ১০ ইঞ্চি লম্বা, আড়াই ইঞ্চি চওড়া ; •গঙ্গায় পাওয়া যায়।

ছুরিমাছ (চাটিগাঁ)—Trichiurus savala Cuv. and Val.

ছেপ্‌কা (রঙ্গপুর)—দেবরি।

ছেলে—সেলে।

ছেলোট—ছেলে।

জাউরি—বাটা।

জংলা--ছোট গাগরা টেংরা।

জকি (নোয়াখালী)—গড়ই।

জট্‌ক্যা (পুর্ব্ববঙ্গ)—খয়রা।

জলকর্পূর—ইলিশ।

জলকিরাট—হাঙ্গর।

জলতাপিক—কাকোটা।

জলতাপী—ইলিশ।

জলতাল—ইলিশ।

জলদ (বালেশ্বর)—সিলন্দ।

জলব্যধ, জলসূচি—কাঁকিলা।

জলাটক—হাঙ্গর।

জসির (দ্বারভাঙ্গা)—Oreinus sinuatus. Heckel.

জাউরিয়া (আসাম)—বাটা।

জাওয়ালি (উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ)—গুড়জাওয়ালি Barbus joalius (H.B.).

জাগিরি—Gerus punctatus (Cuv. aud Val.)

জাগুর—(১) মাগুর। (২) Clarius jagur (H.B.).

জাট্‌কিয়া, জাট্‌ক্যা (পূর্ব্ববঙ্গ)—খয়রা।

জায়া (পুর্ণিয়া)—Aspidoparia jaya (H.B.).

জাবালি—জাওয়ালি।

জারুয়া (পূর্ব্ববঙ্গ)—চাগুনি।

জাল্‌রা (চম্পারণ)—জসির।

জিওল (ঢাকা)—শিঙ্গী।

জিলুং (পুরী)—সিলন্দ।

জিলো (পুরী)—ডানকোনা।

জিহ্বা—Cynoglossus lingua H.B.

জীরপাই (চাটিগাঁ)—বুর্‌গুনি।

জুজ্যা (আসাম)—পুতিতোড়।

জুপকোড়ি (উড়িষ্যা)—গুঁতে।

জুবিকোড়ি (উড়িষ্যা)—(১) Lepidocephalichthys guntea (balgara H.B.) (২) Lepidocephalichthys thermalis (Cuv. and Val.).

জুলিয়াসাগর (উড়িষ্যা)—Zygaena blochii Cuvier.

জেরুয়া—চাগুনি।

জেলারি—বকুল চেলা।

জেলুস (উড়িষ্যা)—পাঙ্গাশ।

জোঞ্জা (পুর্ণিয়া)—Nuria danrica (jogia H.B.).

সিড়ি জোঞ্জা—(পুর্ণিয়া)—Danio rerio (H.B.).

জোলা (গোরক্ষপুর)—লাল খলিশা।

জোসা (শাহাবাদ)—জোঞ্জা।

জৌরি (গোয়ালপাড়া)—বাটা।

ঝট্‌ল (জলপাইগুড়ি)।

ঝলকপুর—ইলিশ।

ঝাঁকি—দেখিতে গুলে মাছের মত।

ঝাঁয়া—জায়া।

ঝাগুর (নোয়াখালী ; পূর্ব্ববঙ্গ)—মাগুর। গাং ঝাগুর (পূর্ব্ববঙ্গ)—কাণ-মাগুর।

ঝিঙ্গা (পালামৌ, চম্পারণ)—তেচোকো (?)।

ঝিলুং—সিলন্ধ।

ঝুরঙ্গ (পুরী)—চুণা খলিশা।

ঝেলুং—পাঙ্গাশ।

ঝাংরা, লাল (উড়িষ্যা)—তেচোকো।

টাউ—কি মাছ তাহা জানা নাই।

টাকা মাছ (পূর্ব্ববঙ্গ)—টাকাচাঁদা।

টাকি (ঢাকা)—গড়ই।

টাকিয়া (পূর্ব্ববঙ্গ)—টাকাচাঁদা।

টাগি (চাটিগাঁ পাহাড়)—গড়ই।

টাঙ্গর (বগুড়া)—বজরি টেংরা।

টাট্টকিনা (ঢাকা, জলপাইগুড়ি)—বাটা।

টিংরা (গয়া)—বজরি টেংরা।

টিঙ্গরা (আসাম)—বজরি টেংরা।

টিপুই (গোরক্ষপুর)—কসবাটি।

টুটি—রাম টেংরা।

টুনি—Thynnus thunnina Cuv. and Val.

টেংরা—(১) (দিনাজপুর, পুর্ণিয়া) করকি টেংরা ; (২) (উত্তর বঙ্গ) কাবাসি টেংরা ; (৩) (গোয়ালপাড়া) টেঙ্গনা ; (৪) (পূর্ব্ব-বঙ্গ) পুকুরিয়া টেংরা।

আকাশ টেংরা—Mocrones tengara (H.B.).

আড় টেংরা—Macrones aor (H.B.).

কউয়া টেংরা—(ধরলা নদী) কানি টেংরা।

কর্‌কি টেংরা (দিনাজপুর)—বজরি টেংরা।

কাটুয়া টেংরা—Nangra visidescens (H.B.).

কানি টেংরা, কানিয়া টেংরা—Glyptothorax cavia (H.B.).

কাপাসি টেংরা, কাবাসি টেংরা—Macrones cavasius (H.B.).

কেউয়া টেংরা (তিস্তা নদী)—কানি টেংরা।

কেলেটি টেংরা—Macrones kelatius (Bleeker).

কোসিয়া টেংরা (পুর্ণিয়া)—কাবাসি টেংরা।

গলসা টেংরা (পূর্ব্ববঙ্গ)—Macrones corsula (H.B.).

গাং টেংরা (ঢাকা)—গুলে টেংরা।

গাগরা টেংরা—(১) (ভাগলপুর) Arius arius (H.B.) ; (২) Gagata gagata (H.B.) বা Gagata cenia (H.B.).

ছোট গাগরা টেংরা—গাগরা টেংরার বাচ্ছা।

গেগি টেংরা—ছোট গাগরা টেংরা।

গুলে টেংরা—Macrones gulio (H.B.).

ঘুরে টেংরা—গুলে টেংরা (?)

ছোট টেংরা (পাটনা)—করকি টেংরা।

নাংরা টেংরা—Nangra nangra (H.B.).

নেঙ্গা টেংরা—Arius nenga (H.B.).

নোনা টেংরা (বাংলা)—গুলে টেংরা।

পলয়া টেংরা (ভাগলপুর)—কাবাসি টেংরা।

পাট টেংরা—বাতাসি টেংরা।

পাতাসি টেংরা, পাতাসিয়া টেংরা—বাতাসি টেংরা।

পাথরি টেংরা (গোয়ালপাড়া)—কাবাসি টেংরা।

পুকুরিয়া টেংরা—Macrones vittatus (Bloch.)

বজরি টেংরা (পূর্ব্ববঙ্গ)—Macrones tengara (H.B.).

বাজি টেংরা (পূর্ব্ববঙ্গ)—পুকুরিয়া টেংরা।

বাতাসি টেংরা (তিস্তা নদী)—Gagata batasio (H.B.).

বাতাসিয়া টেংরা—বাতাসি টেংরা।

বিষ টেংরা (গোয়ালপাড়া)—বাতাসি টেংরা।

মোচা টেংরা (গোয়ালপাড়া)—পুকুরিয়া টেংরা।

রাম টেংরা—(১) (দিনাজপুর) Leiocassis rama (H.B.). (২) (ভাগলপুর) বিলতুরী।

লারা টেংরা (পূর্ণিয়া)—বাতাসি টেংরা।

হারা টেংরা (কলিকাতা, পূর্ণিয়া)—পুকুরিয়া টেংরা।

টেঁকি, ঈল (উড়িষ্যা)—Aetobatis guttata (Bl. and Schn.).

পুলি টেঁকি (উড়িষ্যা)—Trygon varnak (Forsk.)

মুকুরা টেঁকি (উড়িষ্যা)—Myliobatis nienhofii (Schn.)

টেঁপা—টেপা।

টেঙ্গন (গোয়ালপাড়া)—Gagata tengana (H. B.).

টেঙ্গরা—টেংরা।

টেঙ্গাবগুরি (চাটিগাঁ পাহাড়)—পুকুরিয়া টেংরা।

টেপা—(১) Tetrodon lunaris Bl. and Schn. (২) (পূর্ব্ববঙ্গ) পটোকা।

টেপাবেঙটি (উড়িষ্যা)—কটুকটিয়া।

টেপ্‌টেপা (পূর্ব্ববঙ্গ)—পটোক।

ট্যাংরা—টেংরা।

ঠুঁটি (নোয়াখালি)—Hemirhamphus canturii Bleeker.

ডংরিকো (দিনাজপুর)—দাঁড়িকা।

ডংকুয়া—দাঁড়িকা।

ডঙ্গিলা (ভাগলপুর, দার্জ্জিলিং)—Danio dangila (H. B.).

ডণ্ডমৎস্য—দাঁড়িকা।

ডরই (বিহার)—শরণ পুঁঠি।

ডরি, ডারি (দিনাজপুর, রঙ্গপুর)—Botia dario (H. B.).

ডর্কিনা (ত্রিপুরা, গোয়ালপাড়া)—ডানিকোনা।

ডাইড়্‌কা (বগুড়া)—দাঁড়িকা।

ডাংরি, ডাংলিয়া—Mugil gymnocephalus Swain.

ডাঁড়িকা—দাঁড়িকা।

রামদাঁড়িকা (চাটিগাঁ পাহাড়)—বড় আকারের দাঁড়িকা।

ডাটি (পূর্ণিয়া)—ভেদা।

ডানিকোনা (কলিকাতা, আসাম)—Rasbora daniconius (H. B.).

বড় ডানিকোনা (কলিকাতা)—ডানিকোনা।

ডার্কিনা (নোয়াখালি, ত্রিপুরা)—ডানিকোনা।

রাম ডার্কিনা (ত্রিপুরা)—বড় আকারের ডানিকোনা।

দেব ডার্কিনা (আসাম)—ডানিকোনা।

ডেংরা (পাটনা, চম্পারণ)—জোল্লা।

ডেকাই, ডুকাই (দাৰ্জ্জিলিং)—Silurus afghana Guenther.

ডেঙ্গু—পিঙ্গলবর্ণ; এক হইতে দেড় ফুট; নদী ও পুকুরে থাকে।

ডেবরি—Danio devario (H. B.).

ডেমরে—শাদা; সরু; আধ হাত লম্বা; নদী ও খালে থাকে।

ডোগ—Periophthalmus schlosseri (Pallas).

ডোরি (গয়া)—পাঁকাল।

ডোরিকানা—Amblypharyngodon mola (H. B.)

ড্যাংরা—(১) ডানিকোনা; (২) লতিয়া।

কোসিয়া ড্যাংরা (পূর্ণিয়া)—ডানিকোনা।

ঢাই—বড় আকারের সিলন্দ।

ঢাই, ঢাইচুণা (কলিকাতা)—Aplocherlus melastigma Mc. Clell.

ঢালকুনি—ধানকেনা।

ঢালি (পূর্ণিয়া)—নাদোষ।

ঢেকরা (আসাম)—কাতলা।

ঢেমনি (মুঙ্গের)—ঘুগিনী।

ঢোক, ঢেরি (বিহার)—গাছুয়া।

ফুলঢোক (বিহার)—গড়ুই।

ঢোলবাড়ি (আসাম)—কাঁকিলা।

ঢ্যালা (ত্রিপুরা)—Chaetessus modestus Day (?)

তইসি (বালেশ্বর)—তপস্বী।

তপঃকর, তপস্বী—Polynemus paradiseus Linn.

তপ্‌সি—তপস্বী।

তয়ারি (বালেশ্বর)—পারিশা।

তরুই (উত্তর বাংলা)—পারিশা।

তরসে—ছোট; পাঁশুটে রং; নাদেয়।

তল্লা (রাজসাহি)—তুলমাছ।

তাঁপার (উড়িষ্যা)—তিলর।

তাঁপারা (উড়িষ্যা)—Engraulis purava (H. B.).

তাম্‌রে—এক ইঞ্চি; কালো; নোনা জলে থাকে।

তারুই—তেচোকো মাছ।

তারিয়া—শাদা; ১০ ইঞ্চি লম্বা; নাদেয়।

তার্তুর (উড়িষ্যা)—Opisthopterus tartoor (Cuv.)। পুরীতে খয়রা বলে।

তিক্তমৎস্য—তিতপুঁঠী।

তিক্তশফরী—তিতপুঁঠী।

তিতুয়া—(১) (পূর্ণিয়া) বালিতোড়া; (২) (পূর্ণিয়া) শুকুটি।

তিনকাঁটা (রাজসাহী)—গাগরা টেংরা।

তিনকাঁটোয়া (ভাগলপুর)—Erethistes hara (H. B.).

তিলর (দিনাজপুর)—Engraulis telara (H. B.).

তিলা (দিনাজপুর)—Barilius bendelisis tila (H. B.).

তিলিয়া লতা—Gobioides rubicundus (H. B.)

তিলুয়া (পূর্ণিয়া)—খোক্‌সা (Barilius bendelisis cocsa H. B.).

তিলেই (পূর্ণিয়া)—Barilius tileo (H.B.).

তুক্‌রো—কালো; আঁইশ নাই; দুই তিন হাত লম্বা; পুকুরে থাকে।

তুড়ি (পুরী)—পাঁকাল।

খরা তুড়ি (পুরী)—পাঁকাল।

বড়া তুড়ি (পুরী)—তারা বাম।

বাইস তুড়ি (পুরী)—বাম।

তুরা (আসাম)—তারা বাম।

তুরিয়া (পূর্ণিয়া, কুশি নদী)—তোড়।

তুলদাঁড়ি (ঢাকা)—Sillago panijus (H. B.).

তুলমাছ—তুলদাঁড়ি।

তুলের দাঁড়ি (নোয়াখালী)—তুলদাঁড়ি।

তেচোক, তেচোকো—Panchax panchax (H. B.)

তেনাড়—গাং ফেঁসা।

তেলকিন্দলা (উড়িষ্যা)—Badis badis (H. B.).

তেলকুপনি—কুলিবেলে।

তেলগাগরা—(১) তিলর, (২) গাগরা দেখুন।

তেল চাপড়া—শাদা; এক হইতে দেড় ইঞ্চি লম্বা।

তেলচিটা—Glyptothorax telchitta (H. B.).

তেলটুঙ্গি—কালো; আধহাত; আঁইস আছে।

তেলটুপি—কালো; দুই ইঞ্চি; মুখ একটু সরু; পুকুরে থাকে।

তেলতাঁপরি (উড়িষ্যা)—Engraulis telara (H. B.)

তেলার—তিলর।

তেলিয়া (১) (উড়িষ্যা)—শঙ্কর।
(২) (বিহার)—তেলচিটা।

তেলে—তেলচিটা।

তোড়—Barbus for (H. B.)

তোড়া, তোরা (আসাম)—পাঁকাল।

তোড়াগচি (আসাম)—পাঁকাল।

তোলিয়া (চাটিগাঁ)—তুলমাছ।

ত্রাহি (উড়িষ্যা)—Stolephorus tri Bleeker.

ত্রিকণ্ট—টেংরা [Macrones tengara (H. B.)]

ত্রিকণ্টক—গাগরা টেংরা।

ত্রিকণ্টকা—শিঙ্গী।

ত্রিনয়ন—তেচোক।

ত্রিশৃঙ্গী—রুই।

থইছনিসু (লুসাই পাহাড়)—বোয়াল।

থরক (মণিপুর)—Rohtee belangeri Hora (Records of the Indian Museum, ২২শ বর্ষ)।

থরি (পাটনা)—খসখসিয়া।

দণ্ডপাল—দাঁড়িকা।

দণ্ডপালক—শকুল।

দণ্ডমৎস্য—দাঁড়িকা।

দণ্ডারি (গয়া)—রেবা।

দণ্ডিক—ডানিকোনা।

দধই—(মুঙ্গের, ভাগলপুর) শরণপুঁঠী।

দনারা (বিহার)—লাউবুকো।

দয়া (রঙ্গপুর, আসাম)—অঙ্গি।

দরই (চম্পারণ)—চাগুনি।

দরঙ্গি (তিস্তা নদী)—চাগুনি।

দরারি (গয়া)—ডানিকোনা।

দরকি—চাগুনি।

দলু, দলো (দ্বারভাঙ্গা)—ধালো।
নোনা দলো—নাদোয।

দাঁই (নোয়াখালী)—ধাই।

দাঁড়িকা (কলিকাতা, দিনাজপুর)—Nuria danrica (H. B.).

দাঁতিনা (চাটিগাঁ)—কুজো ভেকুটি।

দাঁতনে, দাঁতন—কুজো ভেকুটি।

দাগি—Barbus chilinoide Mc.Clell.

দাড়ি, দাড়ি খুগি—Badis dario (H.B.).

দাঢ়ি—(১) (পূর্ণিয়া, চম্পারণ) ভেদা;
(২) (কুশী নদী) শরণপুঁঠী।

দাতত্থা—Chrysophys datnia (H.B.).

দানকোনা—ডানিকোনা।

দারাঙ্গী—দরঙ্গি।

দারি—দাড়ি

দাহাঙ্গিরি (পুরী)—Lutianus Jahangara Day.

দিগ্‌রি পোয়া (পূর্ব্ববঙ্গ)—Sciaena coitor

দীর্ঘ অঙ্গল—ডাঙ্গন Cirrhinus reba (H.B.)

দুঁগুড়া পোড়া (উড়িষ্যা)—বাটা।

দুধরথল (চাটিগাঁ)—Holacanthus imperator (Bloch), Holacanthus annularis (Bloch).

দুধিয়া (বিহার)—হিজল।

দুরুয়া (পুরী)—ভেকটি।

দেকাই—ডেকাই।

দেওকাটা, দেবথাটা (রঙ্গপুর)—Doryichthys deocáta (H.B.)

দেবরী—ডেবরি; Danio devario (H B.).

দেবা, দেওয়া (দ্বারভাঙ্গা)—দেবথাটা (?)

দেসরি (পূর্ণিয়া)—Cirrhinus latia sada (H.B.)

দোয়ারিয়া (জলপাইগুড়ি)—দাঁড়িকা।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালীর নামকরণে উদ্ভিদ

অধ্যাপক শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

ছেলেমেয়ের 'নামকরণ' হিন্দুদের একটা সংস্কার। সাধারণতঃ পুত্রকন্যার বয়স যখন ছয় মাস সেই সময় 'অন্নপ্রাশন' ও 'নামকরণ' এক সঙ্গেই হয়। এই সময় ছেলে বা মেয়ের কি নাম দেওয়া হইবে সেটা ঠিক করা একটা সমস্যা হইয়া পড়ে। কত নামই যে বাছাই হয় আর বর্জ্জিত হয় তাহার হিসাব থাকে না। এই নাম বাছাই করিতে পুরাণ, ইতিহাস, কাব্যগ্রন্থ, সাহিত্য কোনটাই বাদ যায় না। আবার আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, প্রতিবেশী কেহই খোকা কি খুকুর একটা পছন্দমত নাম দিতে বাবামায়ের অনুমোদনের অপেক্ষা রাখেন না। অথচ শেষকালে গিয়া দাঁড়ায় ঐ একটা নামে, যেটা ছেলের বাকী জীবনের পরিচয়পত্ররূপে গণ্য হইবে।

এই যে নামকরণ, একটু বিচার করিলে দেখা যায় এটার একটা ধারা আছে, একটা বিশেষ প্রথা আছে। ইহাতে—অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বেও—যথেচ্ছাচার হইবার উপায় ছিল না। এই নামকরণের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই দুই পুরুষ পূর্ব্ব পর্য্যন্তও প্রত্যেক বংশের একজন করিয়া গ্রহাচার্য্য ছিলেন এবং নামকরণের সময় তিনি উপস্থিত হইয়া ছেলের রাশি, নক্ষত্র, কোষ্ঠি, বংশমর্য্যাদা ও কুলধর্ম্ম বিচার করিয়া ও পিতার নামের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখিয়া ছেলের এমন একটা নাম ঠিক করিতেন যে, নাম শুনিলেই বোঝা যাইত সে

কোন্ বংশের ছেলে ও তার ধর্ম্মমত কি? এইটাই ছিল সেকালের নামকরণের সাধারণ নিয়ম। এ প্রথার ব্যতিক্রমও যে না হইত তাহা নহে।

বাঙ্গালার হিন্দুরা সাধারণতঃ হয় 'শক্তির' উপাসক, আর না হয় বৈষ্ণব। যাঁহারা শাক্ত তাঁহাদের কুলদেবতা সর্ব্বশক্তির আধার 'দুর্গা', আর না হয় তাঁহারই কোন অঙ্গ রূপ, যথা—দেবী, উমা, শ্যামা, কালী, ভবানী, গৌরী প্রভৃতি। আর যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁদের উপাস্য দেবতা 'বিষ্ণু' আর না হয় তাঁহার কোন অবতার, যেমন—নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, প্রভৃতি। শাক্তরা তাঁহাদের ইষ্টদেবতার নামের সঙ্গে 'চরণ', 'পদ', 'প্রসাদ', 'দাস' 'কুমার' প্রভৃতি যৌতভাবের পদগুলি সংযোগ করিয়া ছেলের নামকরণ করিতেন, যেমন—কালীচরণ, শ্যামাপদ, শ্যামাপ্রসাদ, দেবীদাস, দুর্গাদাস, বিমলাচরণ, কালীকুমার প্রভৃতি। এ ছাড়াও 'মোহন', 'কান্ত', 'প্রসন্ন' প্রভৃতি পুরুষবাচক পদগুলি যোগ করিয়াও নাম দেওয়া হইত, যথা—শ্যামাকান্ত, দুর্গামোহন, গৌরীপ্রসন্ন প্রভৃতি। এই রকমভাবে নাম দেওয়ায় তাঁহারা বোধ হয় ভাবিতেন কুলদেবতা খুসী হইয়া সন্তানের মঙ্গল করিবেন ও তাঁহাদের কৃপায় তাহার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইবে, এবং সারাজীবন, বিশেষ করিয়া অন্তিমকালে, পুত্রের নাম উপলক্ষ্য করিয়া ইষ্টদেবতার নাম আপনিই স্মরণ হইবে। পুত্রের নাম যে পিতার নামের সাদৃশ্যে রাখা হইত, সেটা আমরা হরপ্রসাদের ছেলের নাম শ্যামাপ্রসাদ, গৌরীপ্রসাদ কি দেবীপ্রসাদ শুনিয়া বুঝিতে পারি এবং আরও জানিতে পারি সে কোন্ বংশের ছেলে ও তার ধর্ম্মমত কি?

বৈষ্ণবদিগেরও এই নিয়মেই নামকরণ হইত। তাঁহাদের নামও হরিচরণ, কৃষ্ণপদ, হরিপদ, কৃষ্ণদাস, রামচরণ, গৌরপদ প্রভৃতি দেওয়া হইত। আবার লক্ষ্মীকান্ত, রমানাথ, রমাপ্রসাদ, গোপীমোহন, গোপীকারমণ প্রভৃতি নামেরও অভাব ছিল না। সুতরাং সেই যুগের নামে যেমন বংশের নির্দ্দেশ থাকিত তেমনই আবার শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকতার ছাপও থাকিত।

তা'র পরবর্ত্তী যুগে দেখিতে পাই নামকরণের ধারা বদলাইয়া গিয়াছে। বহুকালের পরাধীনতার পর আমাদের মধ্যে একটা দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। আমরাও যে মানুষ—আমাদেরও যে একটা জাতি আছে, সত্তা আছে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশের জাতির মতই—এই আত্মবোধ আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় নানাপ্রকারে পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির সঙ্গে এক পঙক্তিতে স্থান পাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বক্তৃতার ভিতর দিয়া, সাহিত্যের ভিতর দিয়া, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দিয়া কত কত মহাত্মা নানাভাবে আমাদের মধ্যে দেশপ্রেমের একটা আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছেন। এই পরিবর্ত্তন বাঙ্গালা শিক্ষিত সমাজের উপর দেবদেবীর প্রভাবকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে। তাই দেখি এই যুগের নামের মধ্যে বঙ্কিম, সুরেন্দ্র, রবীন্দ্র, অরবিন্দই বেশী। সে যুগের বাবা মা হয় ত ভাবিতেন এই নামের প্রভাবে ছেলে এমন আদর্শে গড়িয়া উঠিবে যে ভবিষ্যতে সে দেশের, বংশের তথা তার

নিজের মুখ উজ্জ্বল করিবে, ধন্য হইবে। নিজের ছেলে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে কোন্ বাবা মায়ের না আনন্দ হয়?

তারপর বর্ত্তমান যুগে দেখিতে পাই নামকরণের পদ্ধতি একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বের মত মহেশচন্দ্রের ছেলে রমেশচন্দ্র দেখিতে পাই না, হরেন্দ্রনারায়ণের ছেলে দেবেন্দ্রনারায়ণ দেখিতে পাই না; তাহার পরিবর্ত্তে দেখি বেণীমাধবের ছেলে বিমল, নির্ম্মল কি অমল; সুরেন্দ্রের ছেলে অমিয়, নিখিল কি প্রশান্ত; জ্ঞানেন্দ্রের ছেলে সুনীল, অনিল কি কুশল, আর বৈদ্যনাথের ছেলে শিশির, মিহির কি তিমির। নাম শুনিয়া বুঝা যায় না নামের মালিক ছেলে কি মেয়ে, সে কোন্ সম্প্রদায়ের লোক বা কোন্ বংশে তার জন্ম? আজকালকার নামকরণে ভক্তির নিদর্শনও নাই, আদর্শের পূজাও নাই, আছে একটা নিরাকার নির্ব্বিকার ভাব, কোন একটা গুণের কি ভাবের সমাবেশ।

মেয়েদের নামকরণেও এই রকম একটা পরিবর্ত্তনের ধারা লক্ষিত হয়। প্রথম যুগে নাম ছিল শিবসুন্দরী, কাত্যায়নী, দাক্ষায়ণী, লক্ষ্মীমণি, গোবিন্দমোহিনী প্রভৃতি। তার পরবর্ত্তী যুগে দেখি বেশীর ভাগ নামই পদ্মজুল অবলম্বনে, যেমন—পঙ্কজিনী, পদ্মিনী, কমলা, কমলিনী, পদ্মা, পদ্মপ্রিয়া, পদ্মালয়া, কুমুদিনী, সরোজিনী প্রভৃতি। এর কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয় মেয়েকে আমরা রূপগুণের আদর্শ 'লক্ষ্মী'র মত হওয়ার কামনা করি। পদ্মের সঙ্গে মা লক্ষ্মীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই জন্যই আদর্শ স্ত্রীজাতিকে হিন্দুরা পদ্মিনী সংজ্ঞা দিয়াছেন। এই যুগের নামকরণে অজান্তে ফুলের প্রভাবও বড় কম ছিল না; তাই কুন্দনন্দিনী, মালতীসুন্দরী, চম্পকলতা, বনকুসুম, বননতা, পারুলবালার অভাব দেখি না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মেয়েদের বড় নাম আর আমরা পছন্দ করি না। দেবদেবীর নামে তো নাসিকা কুঞ্চিত করি। তাই আজকালকার মেয়েদের নামে ভাবের প্রাচুর্য্যই বেশী দেখা যায়; যেমন—আভা, বিভা, শোভা, রেণু, বীণা, বাণী, অমলা, নির্ম্মলা, অমিয়া, সুধা, রমা, রেখা, রেবা, ইরা, ইলা প্রভৃতি।

উপরে অতি সাধারণভাবে শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে নামকরণের ধারার একটা মোটামুটি ইতিহাস দেওয়া গেল। এই নিয়মই যে সকলে মানিয়া লইতেন বা এখনও মানেন, সে কথা যেন কেহ মনে না করেন। উদ্ভিদ্‌রাজ্য হইতেও আমরা যে নাম ধার করি আমি এইবার তাহা দেখাইব। কিন্তু এই রকম নামের একটা সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া বর্ত্তমানে আমার পক্ষে অসম্ভব।

গাছপালা আমাদের বাস্তব জীবনে বন্ধু, স্বজন। গাছের মত সর্ব্ববিষয়ে উপকার করিতে আমাদের আর কেহ নাই। আমাদের আহারে, বিহারে, শয়নে, ভূষণে, এমন কি আমাদের সর্ব্বতোভাবে মনোরঞ্জনে, ব্যবসায়, বাণিজ্যে গাছ আমাদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করে। আমাদের ভাষায়, কাব্যে, চিত্রে, শিল্পে গাছের প্রভাব কিছু কম নয়। সুতরাং আমাদের নামকরণে গাছ যে প্রভূত উপকরণ যোগাইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

(১) গাছ হইতে ছেলের নাম—

অর্জুন (Terminalia arjuna)—অর্জুন
অরবিন্দ (Lotus)—অরবিন্দ
অশোক (Saraca Indica)—অশোক
উদ্দালক (Cassia fistula)—উদ্দালক
উৎপল (Blue lotus)—উৎপল, উৎপলকুমার
কমল (Lotus)—কমল, কমলকুমার, কমলচন্দ্র
কুমুদ (Water lily)—কুমুদ, কুমুদচন্দ্র, কুমুদনাথ
কুসুম (Flower)—কুসুমকুমার
ডালিম (Pomegranate)—ডালিমকুমার
তুলসী (Sweet basil)—তুলসীদাস
পদ্ম (Lotus)—পদ্মলোচন, পদ্মপাণি, পদ্মগুপ্ত, পদ্মিনীকান্ত, মহাপদ্ম
পুণ্ডরিক (White lotus)—পুণ্ডরিকাক্ষ
মুকুল (Inflorescence, flower bud)—মুকুলদেব
মূল (Root)—মূলদেব, মূলশ্রী
মৃণাল (Lotus stalk)—মৃণালকান্তি
বেণু (Reed)—বেণু (ছোট ছোট ছেলেদের ডাক নাম)।
বিল্ব (Wood apple)—বিল্বমঙ্গল
শতদল (Lotus)—শতদলকুমার
সহস্রদল (Lotus)—সহস্রদলকুমার
সোম (Soma, Vedic plant)—সোমনাথ, সোমদেব, সোমদত্ত

(২) গাছ হইতে মেয়েদের নাম—

অপরাজিতা (Clitorea ternata)—অপরাজিতা
অশোক (Saraca Indica)—অশোকা
ইন্দীবর (Lotus)—ইন্দীবরপ্রভা
উৎপল (Blue lotus)—উৎপলা
কমল (Lotus)—কমলা, কমলিনী, কমলকামিনী
কামিনী (Murraya exotica)—কামিনী
কুমুদ (Water lily)—কুমুদিনী, কুমুদকামিনী,
কুন্দ (Jasmine) কুন্দনন্দিনী, কুন্দকুসুম
কুসুম (Flower)—কুসুম, কুসুমকুমারী, বনকুসুম
কেতকী (Pandanus odoritissimus)—কেতকী

কর্পূর (Camphor plant product)—কর্পূরমঞ্জরী
গোলাপ (Rose) গোলাপ, গোলাপমোহিনী, গোলাপ সুন্দরী
চম্পক (Michelia champaca)—চাঁপা, চম্পকলতা, চম্পকবরণি
ডালিম (Pomegranate)—ডালিমমণি, ডালিমকুমারী
তরু (Plant)—তরু, তরুবালা, তরুলতা
তিল (Sesame)—তিলোত্তমা, তিলমঞ্জরী
তুলসী (Sacred basil)—তুলসীমঞ্জরী, তুলসী
নলিনী (Water lily)—নলিনী, প্রফুল্লনলিনী, নলিনীপ্রভা
পদ্ম (Lotus)—পদ্ম, পদ্মা, পদ্মপ্রিয়া, পদ্মাবতী, পদ্মমুখী, পদ্মগন্ধা, পদ্মিনী
পুষ্প (Flower)—পুষ্পলতা, পুষ্পবতী, পুষ্পিতা, পুষ্পরাণি
পারুল (Bigonia suaveolnes)—পারুল, পারুলবালা
পর্ণ (Leaf)—অপর্ণা
ফুল (Flower)—ফুলকুমারী
বকুল (Mimusops elengi)—বকুল, বকুলমালা, বকুলবালা
বেদানা (Pomegranate)—বেদানা, বেদানাদাসী
মদয়ন্তি (Jasmine)—মদয়ন্তি, মদয়ন্তিকা
মঞ্জরী (Flower bunch)—মঞ্জরীকা
মাধবী (Hiptage madablata)—মাধবী, মাধবীকা
মল্লিকা (Jasmine)—মল্লিকা
মালতী (Jasmine)—মালতী, মালতীসুন্দরী
মৃণাল (Lotus stalk)—মৃণালিনী
যূথিকা (Jasmine)—যূথিকা, যুঁই
রম্ভা (Banana)—রম্ভা, রম্ভাবতী
রেণু (Pollen dust)—রেণু, রেণুকা
লবঙ্গ (Cloves)—লবঙ্গলতা, লবঙ্গমঞ্জরী, লবঙ্গলতিকা
শতদল (Lotus)—শতদলবাসিনী
শেফালিকা (Nyctanthes arboratissimus)—শেফালি, শিউলি
সহস্রদল (Lotus)—সহস্রদলবাসিনী
সূর্যামুখী (Sunflower)—সূর্যামুখী
সোম (Vedic plant)—সোমবতী
হেনা (Night green)—হেনা

(ক) কোন একটী পদের সঙ্গে "মঞ্জরী" (flower bunch) যোগ করিয়া যথা—অনঙ্গমঞ্জরী,

অশোকমঞ্জরী, কণকমঞ্জরী, কর্পূরমঞ্জরী, কামমঞ্জরী, তিলকমঞ্জরী, তুলসীমঞ্জরী, মদনমঞ্জরী, মেঘমঞ্জরী, রত্নমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী, লাবণ্যমঞ্জরী প্রভৃতি।

(খ) পদের সঙ্গে "মালা" (flower wreath) শব্দ যোগ করিয়া যথা—অতিমুক্তকমালা, অশোকমালা, কনকমালা, কাননমালা, কাঞ্চনমালা, চম্পকমালা, পুষ্পমালা, বকুলমালা, মদনমালা, বনমালা প্রভৃতি।

(গ) পদের সঙ্গে "লতা" (creeper) শব্দ যোগ করিয়া যথা—কণকলতা, কুন্দলতা, তিলকলতা, পদ্মলতা, মুক্তালতা, বসন্তলতা, বসন্তলতিকা, বনলতা, হেমলতা, স্বর্ণলতা প্রভৃতি।

(ঘ) গাছের নামের সঙ্গে "বতী" শব্দ যোগ করিয়া যথা—পদ্মাবতী, কমলাবতী প্রভৃতি।*

ভারতের গাছ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিজনবিহারী দত্ত

খ

ভারতীয় নাম — বৈজ্ঞানিক নাম

খগবক্ত্র—Artocarpus lacucha.
খগশত্রু—Hemionites cordifolia.
খগগড়—Saccharum spontaneum
খঞ্জনা (সরিষা)—Brassica campestus.
খট (ঘাস)—
খটিকা—Andropogon muricatus.
খট্টা—Andropogon serratus.
খড়্গাকোষ, খড়্গাপত্র, খড়্গালতা } —Scirpus maximus.
খণ্ডকর্ণ (লাল আলু)—Ipomœa satatas.
খণ্ডশাখা (মহিষবল্লী)—
খণ্ডী (বন মুগ)—Phaseolus sp.
খণ্ডীর—Phaseolus sp.
খদির (খয়ের)—Mimosa catechu.
খদির-পত্রিকা—
খদির সার—Mimosa catechu.
খদিরী (লজ্জাবতী)—Mimosa pudica.
খদিরোপম (বাবলা)—Acacia arabica.
খপুর—Cyperus pertennis.
খমূলি (পানা)—Pistia stratiotes.
খর—Solanum dulcamara.
খরকাষ্ঠিকা—Sida cordifolia.
খরগন্ধনিভা, খরগন্ধা—Hedysarum sp.
খরঘাতন (নাগকেশর)—Mesua ferrea.
খরচ্ছদ—Saccharum cylindricum.

* প্রাচীন ভারতে নামকরণ ও নাম সম্বন্ধে কেহ জানিতে চাহিলে Dr. Alfons Hilkar Indische Forsungen: Die Altindischen Personennamen বইখানি পড়িবেন।

খরত্বক—
খরদণ্ড (পদ্ম)—Nelumbium speciosum
খরদলা—Ficus glomerata.
খরদূষণ (ধুতুরা)—Datura stramonium.
খরপত্র (তুলসী)—Ocinum sanctum
খরপত্র—Vangueria spino a.
খরপত্রক—
খরপত্রা—Elephantopus scaber.
খরপাদাচা (কতবেল)—Feronia Elephantum.
খরপুষ্প—Vangueria spinosa.
খরপুষ্পা (তুলসী)—Ocinum sanctum.
খরমঞ্জরী—Achyranthes aspera.
খরমুজা (খরবুজা)—Cucumis melo.
খরবল্লীকা—Same as খরগন্ধা
খরশাক (বামনহাটী)—Siponanthus indica.
খরস্কন্ধ—Buchanania latifolia.
খরস্কন্ধা—
খরা, খরাশরী—Andropogon serratus.
খরাশ্বা—Colocia cristata.
খর্জ্জুঘ্ন—Cassia tora, Datura stramonium.
খর্জ্জুর—Phœnix sylvestris.
খলসা—
খলিনী—Anthericum tuberosum
খবল্লী—
খসকা-ডুমুর—Ficus sp.
খস্খস্—Andropogon squarrosus.
খাদির, খাদিরসার—Same as খদির
খাম আলু—Dioscorea alata.
খাশ্মরী—Gmelina arborea.
খিরহিট্টী—Sida cordifolia.
খিরা (শশা)—Cucumis sativus.
খুজ্জাক—Andropogon serratus.
খেঁতুয়া—ঐ
খেঁসারি—Lathyrus sativus.
খেদিনী (শুসনী)—Marsilea quadrifolia.
খেরমুগ—Phaseolus mungo.
খেসারি—Same as খেঁসারি
খেতপাবরি—
খুদিপানা—Lemna minor.

গ

গজকন্দ—
গজকর্ণিকার (হাতিশুঁড়)—Heliotropium indicum.
গজচিভিট—Cucumis madraspatanus.
গজপিপ্পলী—Pothos officinalis.
গজপ্রিয়া—
গজভক্ষ (অশ্বত্থ)—Ficus religiosa.
গজভুক্ত-কপিত্থ (কতবেল)—Same as কএতবেল
গজেষ্টা—Convolvulus paniculatus.
গণরূপ—
গণিকা, গণিকারিকা, গণিকারী } —Premna spinosa.
গণ্ডকারী { Lycopodium imbricatum, Mimosa pudica.
গণ্ডকালী—Mimosa pudica.
গণ্ডপাত্র—
গণ্ডমালিকা—
গণ্ডালী—Cynodon dactylon.

গণ্ডীর—Cucumis sativus.

গণ্ডীরী—Euphorbia sp.

গদাখ্য—Costus speciosus.

গন্ধক (শজিনা)—Moringa pterigosperma.

গন্ধকান্দক—Scirpus kysoor.

গন্ধখেড়—Andropogon schœnanthus.

গন্ধগুরালী— „ glabrum.

গন্ধতৃণ schœnanthus.

গন্ধনাকুলী—

গন্ধপত্র—Artemisia vulgaris.

গন্ধপত্রী (অশ্বগন্ধা)—Withania somnifera.

গন্ধপলাশী—Curcuma zerumbet.

গন্ধপুষ্প— { Alengium hexapetalum / Cordia myxa.

গন্ধপুষ্পা—Premna spinosa.

গন্ধফল (কতবেল)—Feronia Elephantum.

গন্ধফলা—Hedysarum gangeticum.

গন্ধফলী (চম্পক)—Michelia champaka

গন্ধবন্ধু (আম)—Mangifera indica

গন্ধভদ্রা (গাঁধাল)—Pæderia fœtida

গন্ধভাদাল— „ „

গন্ধমালতী—Echites caryophyllata

গন্ধমূল—Alpinia golanga

গন্ধমূলা—Curcurna zerumbet

গন্ধরাজ { Gardenia florida / „ latifolia

গন্ধবধু—

গন্ধবল্লী—Sida sp.

গন্ধবৃক্ষ (শাল)—Shorea robusta

গন্ধশটী—

গন্ধশাক—

গন্ধসার— { Sida sp. / Santalum album

গন্ধা— { Hedysarum gangeticum / Michelia champaka

গন্ধাঢ্য—Pædenia fetida

গন্ধালা—Celtis orientalis

গন্ধালী—Same as গন্ধাঢ্য

গন্ধিকর্ণ (ছাতিম)—Alstonia scholaris

গন্ধোৎকট—

গম্ভারী—Gmelina aroborea

গয়া—Ficus cordifolia

গয়াশ্বত্থ—Same as গয়া

গরাগরী, গরী—Andropogon serratus

গরাণ—

গর্জন—Dipterocarpus incanus

গর্জাফল—Hedysarum alhagi

গর্দ্দভশাক—Siphonanthus indica

গর্দ্দভাণ্ড—Hibiscus populneoides

গর্দ্দভী— { Cletoria ternatea / Solanum jacquini

গর্দ্ধ—Same as গর্দ্দভাণ্ড

গর্ভকর—Nagelia putranjiva

গর্ভঘাতিনী—Gloriosa superba

গর্ভদ (গর্ভকার)—

গর্ভদা, গর্ভদাত্রী—

গর্ভসুৎ—

গর্ভিনী—Asclepias rosea

গন্যা—

গবাক্ষী—Clitoria ternatea

গবাদনী

গবেড়—Coix brabata

গবেড়ুকা— „ „

গবেধুক—Hedysarum sp.

গাঙ্গেয়—Cyperus rotundus ; Scirpus kysoor

গাঙ্গেরুকী—Same as গবেধুক

গাঙ্গেষ্টী—Cæsalpinia bonducella

গাছ মরিচ (লঙ্কা)—Capsicum sp.

গাঁদা—Tagetes patula F. P.

গাব—Diospyros embryoptens

গাম্ভারী—Same as গম্ভারী

গায়ত্রী—Same as খদির

গায়কলায়—Dolichos soja

গিমাশাক—Chironia centanroides

গিরিকর্ণিকা—Same as অপরাজিতা

গিরিকর্ণী—Hedysarum alhagi

গিরিপিলু—Xylocarpus granatum

গিরিভিৎ—Plectranthus arometicus

গিরিমল্লিকা—Same as কুটজ

গিরিশালিনী—Same as অপরাজিতা

গুইয়া—Vitis latifolia

গুগ্গুল—Balsamodendron Mukul ; B. pubscens

গুচ্ছদন্তিকা (কদলী)—Musa sp.

গুচ্ছ পত্র—

গুচ্ছপুষ্প—Echites scholaris

গুচ্ছপুষ্পী—Grislea tomentosa

গুচ্ছফল—Mimusops kanki

গুচ্ছফলা—Solanum indicum ;

গুচ্ছবধ্বা—Phaseolus radiatus

গুচ্ছমূলিকা—

গুচ্ছাল—Andropogon schœnanthus

গুঞ্জা—Abrus precatorius

গুড়ত্বক, গুড়ত্বচ—

গুড়দারু (আখ)—Saccharum officinarum

গুড়পুষ্প—Bassia latifolia

গুড়ফল—Careya arborea

গুড়মূল—Amaranthus polygamus

গুড়া—Euphorbia triculla

গুড়াশয়—Juglans regia

গুড়ূচী, গুড়ূচী—Menispermum glabrum

গুণা (ঘাস)—

গুণ্ডকন্দ—Scirpus kysoor

গুণ্ডরোচনিকা—

গুণ্ডালা—

গুণ্ডাসিনী—

গুৎস—

গুৎসকপুষ্প—Echites scholaris

গুন্দ্র—Saccharum sp.

গুন্দ্রা—Cyperus rotundus ; Coix barbata

গুপ্তস্নেহ—Alangium hexapetalum

গুয়ে বাবলা—Acacia Farnesiana

গুয়েলা—Vitis latifolia

গুরমি—Cucumis sp.

গুরী—Leucocephala graminifolia

গুলআনার—Pomegranata sp.

গুলমাখমল—Gomphrena globosa

গুলবাঁশ—

গুলাব (গোলাপ)—

গুলাব-জাম—Eugenia Jambos
গুলাল-তুলসী—Ocinum sanctum
গুলিবেগুণ—Solanum longum
গুল্মকেতু—Rumex vesicarius
গুল্মিনী—
গুহা—Hemionites cordifolia ; Hedysarum gangeticum
গুহাবীজ (ঘাস)—
গূঢ়পত্র—Capparis aphylla; Alangium hexapetalum
গূঢ়পুষ্পক (বকুল)—Mimusops elengi
গূঢ়বল্লিকা—Alangium hexapetalum
গৃধ্রনখী—Zizyphus nepeca
গৃষ্টি—Licopodium imbricatum ; Gmelina arborea
গৃহকন্যা (ঘৃতকুমারী)—Aloe perfoliata
গৃহদ্রুম—
গোকন্টক—
গোখুরী—
গোজাগারিক—Solanum jacquini
গোজিহ্বা—Hieracicum sp.
গোডুম্ব, গোডুম্বা (তরমুজ)—Citrulus vulgaris
গোপুর—Cyperus rotundus
গোয়ালিয়া লতা—Cissus vitiginea
গোরক্ষী—Solanum rubrum
গোল লতা—Vitis setosa
গোলিহ (ঘন্টপাটালি)—
গোস্তানা (আঙ্গুর)—Vitis vinifera
গোহরিতকী—Vilva sp.
গ্রন্থিদূর্বা—Cynodon dactylon
গ্রন্থিমণি—Heliotropium indicum
গ্রন্থিল—Flacourtia sapida
গ্রন্থিসংহার—Same as গ্রন্থিমণি
গ্রামকন্দ (কচু)—Colocasia sp.
গ্রাম্যকর্কটী—
গ্রাম্যকুঙ্কুম—
গ্রাম্যবল্লভা—
গ্রীষ্মভবা—
গ্রীষ্ম সুন্দরা—

ঘ

ঘণ্টা—
ঘণ্টাক—
ঘনপত্র—
ঘনপল্লব—Moringa pterigosperma
ঘনবাস—
ঘনাঘনা—Solanum indicum
ঘনাময়—
ঘনামল—
ঘূর্ণ (গিমা)—Chironia centauroides
ঘৃতকুমারী—Aloe perfoliata
ঘৃষ্টি—
ঘেঁটকচু, ঘেঁটকুল—Alocasia orinense
ঘেকুলিকা— " "
ঘোড়ানিম—Melia azadirachta
ঘোড়ামুগ—Phaseolus lobatus
ঘোন্টা—

চ

চই—
চক্রকুল্যা—Hemionites cordifolia
চক্রপশ্মাট—Cassia tora
চক্রপর্ণী—Same as চক্রকুল্যা

চক্রমর্দ্দ—Cassia tora
চক্রাঙ্গী (হিলঞ্চা)—Enhydra fluctuans
[illegible]ণ্ডা—
চক্রলা (লঙ্কা)—Capsicum sp.
চঞ্চু—
চটকা—Baubinia variegata
চণক (ছোলা)—Cicer arietinum
চণ্ডাত (করবী)—Narium odorum
চণ্ডিল—
চনা—Same as চণক
চন্দন—Santalum album
চন্দ্রক (গোলমরিচ)—Piper nigrum
চন্দ্রপ্রভা—
চন্দ্রমল্লিকা—Chrysanthemum sp.
চন্দ্রবল্লরী—
চম্পক—Michelia champaka
চম্পকদলী—
চম্পক তরু—Same as চম্পক
চম্পকালু (কাঁঠাল)—Artocarpus integrifolia
চর্ম্মী (ভূর্জ্জপত্র)—চর্ম্মিকা (ভূর্জ্জপত্র)—
চা—Camellia thea
চাউলমুগরা—Taraktogenos kurzii
চাঁপাকলা—
চাঁপানটিয়া—Amaranthus polygamous
চাকন্দা, চাকুন্দা—Cassia tora
চাণা—Same as চণক
চামরপুষ্প— { Mangifera indica ; Piper betel }
চামর পুষ্পক—
চামর আলু—
চাম্পেয়— { Michelia champaka ; Mesua ferrea }
চারটী—Hibiscus mutabilis
চালথাগড়া—Saccharum bengalensis
চালতা—Dillenia indica
চালতা জাম—Eugenia macrocarpa
চালবাঁশ—
চালমুগরা—Same as চাউলমুগরা
চালিতা—Same as চালতা
চিত্রক—Plumbago zeylanica
চিত্রকর্ম্মা—Dalbergia ougieniensis
চিত্রকৃত— " "
চিত্রত্বক (ভূর্জ্জপত্র)—Betula edulis
চিত্রপত্রিকা—
চিত্রপদা—Cigsus pedata
চিত্রপর্ণিকা, চিত্রপর্ণী }—Hemionites cordifolia
চিত্রপুষ্পী—Cissampelos hexandra
চিত্রফল, চিত্রফলা }—Cucumis utilatissimus
চিত্রফলী— { Solanum melangena ; S. jacquini }
চিত্রা, চিত্রাঙ্গ }—Plumbego zeylanica
চিনিকাঁটালি—
চিন্ন—Panicum miliaceum
চিরজীবক—
চিরতা, চিরতিক্ত—
চিরবিল্ব—Galedupta arborea
চিরিমিরি—Brassica eruca
চির্ভটী—Cucumis utilatissimus

চিলিচিম—Clupea cultrata
চিলীম— " "
চিহ্নধারিণী—Echites frutesceus
চীনক, চীনা—Panicum miliaceum
চীনা-নারাঙ্গি—Triphasia aurantiola
চুঁচা—Cyperus compressus
চুক-পালঙ্গ—Rumex vesicarious
চুক্র, চুক্রা, চুক্রিকা—" "
চুপড়ী আলু—Dioscorea alata
চুয়া—Celosia argentea
চূত (আম)—Mangifera indica
চেঁচকা—Scripus plantagineus
চেলান (শশা)—
চৈ—Piper chaba
চোঁচড়া—
চোরকণ্টক (চোরকাঁটা)—Andropogon aciculatus
চোরকাঁচকি—
চোরকাঁটা—Same as চোরকণ্টক
চোরপুষ্পিকা—Same as চোরকাঁটা

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

ইঙ্গুদী

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

প্রকৃতিতে (৯ম বর্ষ, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৩৯) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় লিখিত ইঙ্গুদী সম্বন্ধে আলোচনাটী বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। কলিকাতা বোটানিক গার্ডেনে বৃক্ষলতা সম্বন্ধে বহু পুস্তকাদি এবং ভারতীয় বহু বৃক্ষের কর্ত্তিত পালা (specimens) থাকায় আমি ইঙ্গুদী সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি ; নিম্নে উহার মোটামুটী বিবরণ প্রদান করিলাম।

ইঙ্গুদী Simarubeae জাতীয় উদ্ভিদ, ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Balanites Roxburghii, Planch. বাঙ্গালা নাম—ইঙ্গুদ, হিঙ্গন ও তাপসতরু।

সংস্কৃত নাম—অঙ্গারবৃক্ষঃ, তিক্তকঃ, তাপসদ্রুমঃ ও মণিপদ্মঃ।

ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসদ্রুমঃ।
ইঙ্গুদঃকুষ্ঠভূতাদি গ্রহব্রণবিষক্রমীন্ ॥
হন্ত্যুষ্ণঃশ্বিত্রশূলঘ্নস্তিক্তকঃ কটুপাকবান্ ॥
ভাবপ্রকাশঃ।

এই বৃক্ষ ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মৃত্তিকাময় অনুর্ব্বর ভূমিতে এবং সিকিম, বেহার, কানপুর, গুজরাট, ডেরাডুন ও ব্রহ্মদেশে বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার Roxburgh প্রণীত Flora Indica নামক পুস্তকে (vol. ii, page 253) এই গাছের পুরাতন নাম Ximeria Aegyptica, Roxb. বলিয়া লিখিত আছে (Voigt, Hortus Suburbanus Calcuttensis, page 32)। এই গাছ বড়-গুল্ম পর্য্যায়ভুক্ত। উচ্চে বেশী বড় হয় না। গাছের গুঁড়ি বেশ সরল, ত্বক্ ধূসর বর্ণ, পাতাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও এক ইঞ্চি হইতে দেড় ইঞ্চি লম্বা, প্রস্থে ½ ইঞ্চি। গাছগুলি মে মাসে পুষ্পিত হয়। ফুলগুলি ক্ষুদ্র ও গুচ্ছবদ্ধ এবং ঈষৎ সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। একটী ফলে একটী মাত্র বীজ (আঁটী) আছে। বীজ অতিশয় কঠিন ও শাঁস তিক্ত।

আফ্রিকার মিশর দেশে ইহার ফলকে মরুভূমির খেজুর বলে। সেনিগাম্বিয়া দেশে ইহার ফল জোলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকা দেশই ইঙ্গুদীর আদি জন্মস্থান।

লোকে গুরু-উপাসনার সময় ইহার বীজ হইতে নিষ্কাসিত তৈল প্রদীপে জ্বালাইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে তাপস তরু বলে। ইঙ্গুদীর ফল গৌরীদেবীর (দুর্গা) উপাসনার সময় আবশ্যক হয় বলিয়া উহাকে গৌরীবৃক্ষও বলিয়া থাকে। গণপতি উৎসবের সময় এই গাছের পাতা ও ফুল গৌরী পূজায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আধুনিক সংস্কৃত লেখকেরা Balanites:কে হিঙ্গুপত্রী বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত হিঙ্গুপত্রী বলিতে Asafoetida পাতা বুঝায়। কঙ্কন ও ভারতের অপরাপর স্থানে যথায় এই গাছ পাওয়া যায় না, তথাকার লোকেরা বাদাম (Terminalia catappa, Linn) গাছের তৈল গুরু-উপাসনায় ব্যবহার করিয়া থাকে। আমার অনুমান হয় এই কারণে কেহ কেহ বাদাম গাছকে ইঙ্গুদী গাছ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন (O'shaughnessy, Beng. Dispens. and Pharm. page 341)।

বাদাম গাছ কিছুতেই ইঙ্গুদী গাছ হইতে পারে না, কারণ বাদাম গাছ বড় গাছ ; আয়ুর্ব্বেদোক্ত ইঙ্গুদীর সহিত বাদামের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। বাদামের ফল ইঙ্গুদীর ফল অপেক্ষা আকৃতিতে ছোট।

ইঙ্গুদীর ফল অনেক ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়। ইহা ভেদক ও ক্রিমিনিবারক। জোলাপ লইতে হইলে একটী ফলের অর্দ্ধেক প্রতিবারে ব্যবহার্য্য। কমপক্ষে ধরিতে গেলে ২ - ২০ গ্রেণ প্রতিবারে গ্রহণ করিতে হয়। এই গাছের পাতা, ছাল ও অপক্ক ফল পশুদিগের ক্রিমিনিবারক। ইহার ছালের ও ফলের কয়েক ফোঁটা রস Tincture of senegar তুল্য। ইহার বীজ হইতে নিষ্কাসিত তৈল অগ্নিদগ্ধ ও ক্ষতরোগ নাশক (Dymock Pharm. Indica, vol. i, p. 284)।

Balanites গাছ দিল্লীতে, এলাহাবাদে ও যমুনা নদীর উভয় তীরে দেখিতে পাওয়া যায় (Royle, p. 154)। ডাক্তার Rorburgh বলেন যে ইহার ফলের শাঁস অতিশয় তিক্ত ও

উগ্রগন্ধ। ইঙ্গুদীর আঁটী হইতে শাঁস বাহির করিয়া উহার মধ্যে বারুদ পুরিয়া অগ্নি প্রদান করিলে উহা ফুটিয়া বমের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া থাকে (O' Shaughnessy, Beng. Dispen. Phar., 260)।

ইঙ্গুদীর বীজ সর্দ্দিতে ব্যবহার হয়। বক্ষে সর্দ্দি জমিলে ইহার বীজ ২ হইতে ৩০ গ্রেণ সেবন করিলে সত্বর সর্দ্দি উঠিয়া যায়। ইহার ফল ১ গ্রেণ হইতে ২০ গ্রেণ ভক্ষণ করিলে কোষবদ্ধতা দূর হয় (Surgeon W. Barren, Bhuj and Cutch)। ইহার পাকা ফল ডিম্বাকৃতি, গায়ে খাঁজকাটা ও ঈষৎ পীতবর্ণ। পশ্চিম ভারতে এবং মিশর দেশে ইহার পাকা ফল খাইয়া থাকে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর লোকেরা ইহার ফলের শাঁস দিয়া রেশমী বস্ত্র পরিষ্কার করিয়া থাকে (Brandis)। পাঁচমহল নামক স্থানে (বোম্বাই) ইহার ছালের রস দিয়া মৎস্যাদি মারা হয় (Bomb. Gaz. iii, 200)।

এক্ষণে Putranjiva Roxburghii, Wall. যে ইঙ্গুদী নহে সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

Putranjiva Roxburghii, Wall. Euphorbiaceae জাতীয় উদ্ভিদ। এই গাছ ভারতের করমণ্ডল উপকূল, পাটনা, মুঙ্গের ও আসামের জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সংস্কৃত নাম পুত্রঃ (a son) and জীবঃ (life) এবং হিন্দী নাম জীয়পুত্র বা জীয়পুত। উভয় নামই এক অর্থবোধক। পুত্র সুস্থ ও বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া বালকের পিতামাতা ইহার ফলের আঁটীতে ছিদ্র করিয়া সূতায় গাঁথিয়া বালকের গলায় ঝুলাইয়া দেয়। গাছগুলি দেখিতে খুব উচ্চ, গাছের গুঁড়ি সরল। চারিদিকে অনেক ডালপালা জন্মিয়া বৃক্ষতলে বেশ ছায়ার সৃষ্টি করে। মার্চ্চ ও এপ্রেল মাসে ইহার ফুল হয়। ফুলগুলি ছোট ছোট, ফলে একটী মাত্র বীজ হয় (Roxb. Flora Indica vol. iii, 766)।

পুত্রঞ্জীবোগর্ভকরোযষ্টীপুষ্পোঽর্থসাধকঃ।
পুত্রজীবো গুরুর্বৃষ্যোগর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতহৃৎ॥
সৃষ্টমূত্রমলোরুক্ষোহিমঃ স্বাদুঃ পটুঃ কটুঃ॥
ভাবপ্রকাশঃ।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ইঙ্গুদী কোন্ গাছকে বলা যাইতে পারে? ভাবপ্রকাশে ইঙ্গুদী গাছের যে গুণ লিখিত আছে তাহা Balanites Roxburghii, Planch, গাছের সহিত প্রায়ই মিলিয়া যায়। কলিকাতা বোটানিক গার্ডেনে দুই রকমের গাছই আছে এবং Herbariun-এ উভয় গাছের কর্ত্তিত পালা আছে। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের সহিত মিলাইয়া দেখা যাইতেছে যে Putranjiva Roxburghii Wall. কিছুতেই ইঙ্গুদী হইতে পারে না। উভয় গাছের ফুল ছোট বটে এবং উভয় গাছের ফলে একটী আঁটী আছে সত্য, কিন্তু Balanites-এর ফল বড় এবং ফলের শাঁস আছে, Putranjiva গাছের ফল ছোট এবং আঁটী ছোট, দেখিতে Cherry ফলের ন্যায়। পুত্রঞ্জীব গাছের ফলকে লোকে 'ঘুরনী' ফল বলে এবং ছেলেরা ইহার ছোট ছোট আঁটীগুলি লইয়া খেলা করে।

ডাক্তার Sir George King সাহেবের Glossary of the Indian Plants গ্রন্থে ইঙ্গুদীকে Balanites Roxburghii, Planch বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

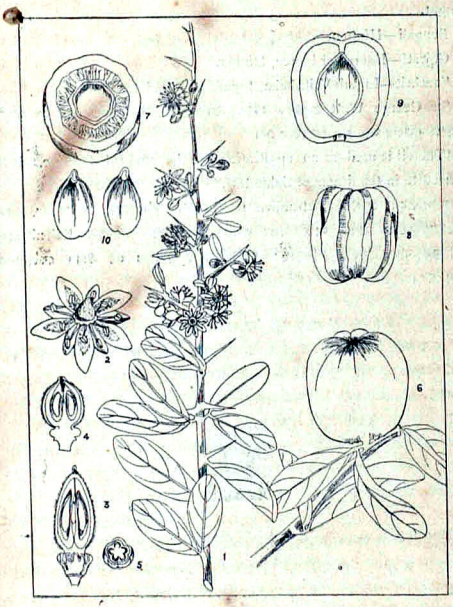

Balanites Roxburghii, Planch (ইঙ্গুদী)

Sir George Watt তাঁহার Dictionary of Economic Products of India নামক পুস্তকেও Balanites Roxburghii, Planch বৃক্ষকেই কবি কালিদাসের

ইঙ্গুদী বৃক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে লিখিত এই বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

Hindi—Hingan, Hingu or Hingen, Ingua, Hingol, Hingata or Hingot.

Bengali—Hingon.

Gujrati—Egorea or igorea, Hinger.

Sanskrit—Ingudi-Vrikshaka, Ingudi or Ingudom.

Sir George Watt-এর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বোধ হয় গাছটি কি তাহা বুঝিবার আর অসুবিধা হইবে না।

"The oil is used as an application for the cure of O chine. It is referred to in the drama of Sakuntala."

নৃপাল বাবু যে ইঙ্গুদীকে Putranjiva Roxburghii বলিয়াছেন উহা কোন পুস্তকের সহিত মিলিতেছে না। আমি উভয় বৃক্ষের specimens মিলাইয়া Balanitesকে ইঙ্গুদী বৃক্ষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। বৃক্ষটী চিনিবার সুবিধার জন্য উহার একটী ছবি দেওয়া গেল।

বিবিধ

জাতীয় জীবনে ভূতত্ত্বের স্থান

জনসাধারণ ও রাজনীতিবিদ্‌গণ জাতীয় উন্নতির পক্ষে ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের প্রয়োজন সম্যক্ উপলব্ধি করেন না। তাঁহারা মনে করেন, সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিভাগগুলি অনর্থক মোটা মাহিনা দিয়া কতকগুলি কুপোষ্য পুষিতেছে; ইঁহারা জাতীয় উন্নতির ও অর্থবৃদ্ধির কোন প্রকার সহায়তা করে না। যখনই গবর্ণমেণ্টের ব্যয়সঙ্কোচের আবশ্যক হয়, তখনই সর্ব্বাগ্রে এই সকল বৈজ্ঞানিক বিভাগগুলির উপর সকলের দৃষ্টি পড়ে। ভারতবর্ষের মত একটি বিশাল দেশের বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য যত লোক আবশ্যক, তাহার তুলনায় ব্যয়সঙ্কোচ-কুঠার প্রয়ুক্ত হইবার পূর্ব্বেও ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত কর্ম্মচারিসংখ্যা অকিঞ্চিৎকর ছিল; কুঠার প্রয়ুক্ত হইবার পরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। একমাত্র ভূতত্ত্বের দিক্ হইতেই দেখা যায় যে, যদিও ভারতবর্ষ আয়তনে রুশিয়া বাদে সমস্ত ইয়োরোপের সমান, তথাপি যে স্থলে ইয়োরোপে ৩০০ বৈজ্ঞানিক ভূতত্ত্ব অনুসন্ধানে নিযুক্ত রহিয়াছে, সে স্থলে মাত্র ২৪ জন কর্ম্মচারীর সাহায্যে সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যের ভূতত্ত্ব বিষয়ক সমুদয় বিবরণ সংগ্রহের আশা করা হইতেছে। ফলে এদেশের ভূতত্ত্ব সামান্য মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; খনিজ সম্পত্তি এযাবৎ যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, অনাবিষ্কৃত সম্পত্তির পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক, ভূতত্ত্ববিভাগ হইতে যে কোন আয় হয় না তাহা ঠিক নহে; কিন্তু এ বিভাগের আয় পরোক্ষভাবে ইন্‌কাম্ ট্যাক্স, রয়ালটি প্রভৃতি আকারে রাজকোষে প্রবেশ করে বলিয়া আপাততঃ মনে হয় যে এই বিভাগে কেবলমাত্র ব্যয় হয়, আয় হয় না। সভ্যদেশ মাত্রেই যে এক একটি ভূতত্ত্ববিভাগ আছে, তাহার এক উদ্দেশ্য এই পরোক্ষ আয় এবং আর এক উদ্দেশ্য স্বদেশ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ।

জিওলজিকেল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার অধ্যক্ষ ডাঃ ফার্ম্মোর বলেন—"মানবসমাজের ইতিহাসের উপর দেশের ভৌগোলিক গঠনের প্রভাব সুবিদিত। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে পাহাড়পর্ব্বত, জলবায়ু ও নদনদীর প্রকৃতির ফলে এক দেশের লোক নিজ দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু দেশের ভৌগোলিক গঠন ভৌতাত্ত্বিক ইতিহাসের ফল। মানবজাতির ইতিহাসের উপর ভৌতাত্ত্বিক ইতিহাসের প্রভাব অতি স্পষ্ট।

"ইয়োরোপের ভৌতাত্ত্বিক মানচিত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে পিরিনিজ পর্ব্বত ফ্রান্স হইতে স্পেন ও পর্টুগালকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। এইরূপে ইটালী আর একটি

স্বতন্ত্র দেশ, এবং নরওয়ে ও সুইডেন মিলিয়া একটি পৃথক্ দেশ। কিন্তু ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে এইরূপ কোন স্বাভাবিক ভৌতাত্ত্বিক বিভাগ নাই। উভয়ের কোন স্বাভাবিক সীমা-নির্দ্দেশ করা যায় না, এবং এই প্রাকৃতিক সীমার অভাবই গত মহাযুদ্ধের কারণ। উভয় দেশের সীমান্তপ্রদেশস্থিত কয়লার খনি ও লৌহের খনির অধিকার লইয়াই ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়াছিল। মধ্য ইয়োরোপে কোন স্বাভাবিক সীমানা নাই; কেবলমাত্র জাতি ও অর্থনীতি আলোচনা করিয়া ঐ স্থানে দেশ বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ বিভাগ স্থায়ী হইতে পারে না। যে স্থলে দেশের সীমানা স্বাভাবিক ভৌতাত্ত্বিক সীমানার উপর নির্ভর করে না, সে স্থলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী।

"ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, জাতি, বর্ণ ও ভাষাগত বহু বিভাগ সত্ত্বেও ভৌতাত্ত্বিক ঐক্যের ফলে বহু শতাব্দীর যুদ্ধবিগ্রহের পর ভারতবর্ষ রাজনৈতিক হিসাবে এক দেশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পুরাকালে দক্ষিণ-ভারত, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আমেরিকার সহিত সংযুক্ত ছিল। এই মহাদেশের নাম দেওয়া হইয়াছে "গণ্ডোয়ানা"। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থান ছিল এই গণ্ডোয়ানা মহাদেশের এক চূড়া। বর্ত্তমান আসাম প্রদেশও এই মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। পক্ষান্তরে, বেলুচিস্থান ও উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ, হিমালয়পর্ব্বত, আরাকান ও আন্দামান, নিকোবর দ্বীপের পাহাড়গুলি মিলিয়া ছিল এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণভাগ। যে কারণেই হউক, গণ্ডোয়ানা প্রদেশ বিশ্লিষ্ট হইয়া, ভারতবর্ষ আসিয়া এশিয়ার দক্ষিণদিকে যুক্ত হইয়াছে, অথবা এশিয়া আসিয়া ভারতের উত্তরে মিলিত হইয়াছে। গঙ্গা ও সিন্ধুনদবিধৌত প্রদেশ পরে সৃষ্ট হইয়াছে।

"দিল্লীতে যে এতকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের রাজধানী রহিয়াছে তাহার একটি স্বাভাবিক কারণ আছে। ভৌতাত্ত্বিক মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে হিমালয় হইতে প্রাচীন গণ্ডোয়ানা মহাদেশের দূরত্ব এই স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। পশ্চিম সীমান্ত ভেদ করিয়া সমস্ত বৈদেশিক আক্রমণকারী ভারতে প্রবেশ করিয়াছে; এই স্থান হইতেই তাহা-দিগকে বাধা দিয়া গঙ্গাযমুনাবিধৌত উর্ব্বরা ভূমি রক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। পক্ষান্তরে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রবিধৌত উর্ব্বরা ভূমি, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কয়লার খনি এবং সমুদ্রের সান্নিধ্যবশত রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও কলিকাতা এখনও ভারতের বাণিজ্যের রাজধানী রহিয়াছে। প্রায় সাড়ে সাত কোটি বৎসর পূর্ব্বে আগ্নেয়গিরির গলিত পদার্থে বোম্বাই অঞ্চলের মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইয়াছে; এই মৃত্তিকার গুণে তুলা জন্মে বলিয়াই বোম্বাইর প্রাধান্য। জামসেদ্‌পুরের লৌহ কারখানার ভিত্তি ভৌতাত্ত্বিক হিসাবে ৭৫ কোটি হইতে ২০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে; কারণ এই সময়ের মধ্যে ঐ অঞ্চলে লৌহ ও কয়লার খনি সঞ্চিত হইয়াছিল।

"যে দেশে আমরা বাস করি, তাহার পূর্ব্বকথা জানিবার জন্য আমাদের আগ্রহ

স্বাভাবিক। সুতরাং ভূতত্ত্বের আলোচনা কোন দেশেরই অবহেলার বিষয় নহে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেশের খনিজ সম্পত্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা অর্থাগমের পথ বৃদ্ধির জন্য,—সহস্র সহস্র লোকের অন্নসংস্থানের পথ সুগম করিবার জন্য ভূতত্ত্বের সম্যক্ গবেষণা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

মনুষ্যদেহে "জীবনরশ্মি"

সম্প্রতি রয়াল সোসাইটির সভাপতির অভিভাষণে সভাপতি একটি প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে কয়েকটি আধুনিক পরীক্ষায় একরূপ প্রমাণিত হইয়াছে একপ্রকার "জীবনরশ্মি" মনুষ্যদেহগঠনের সহায়তা করে। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস, "জীবন" কোন অজ্ঞাত কৌশলে আণবিক শক্তি অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার করে। জীবন্ত প্রাণীর শরীরে যে সকল রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তেজ বিকিরণও হয়; স্নায়ু হইতে এই তেজবিকিরণ বা রশ্মিনির্গম হইয়া থাকে। একটি কোষ হইতে যে রশ্মি নির্গত হয়, তাহাতে অন্যান্য কোষের বৃদ্ধিকার্য্যে সহায়তা করে। বৈজ্ঞানিকগণ এই জীবনরশ্মির অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করিতেছেন। এই জীবনরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণীত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিকগণ কোন কোন রোগের গবেষণায় এই রশ্মির ব্যবহার করিতেছেন।

জড়ের সঙ্গে জীবনের কোন সম্বন্ধ এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। রাসায়নিক তেজ, বৈদ্যুতিক তেজ প্রভৃতির ন্যায় জীবন বলিয়া একপ্রকার ভিন্ন তেজ আছে—ইহাই এতদিন স্বীকার করা আবশ্যক ছিল। যদি এই নূতন আবিষ্কারের ফলে জীবনের সহিত বৈদ্যুতিক তেজের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক নূতন ও অদ্ভুত অধ্যায় আরম্ভ হইবে। বৈদ্যুতিক তেজের মত জীবনও যদি ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহা হইলেই এই গবেষণার চরম সার্থকতা।

এভারেস্ট অভিযান

ইংরাজি ১৯৩৩ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখে হাউষ্টন এভারেষ্ট অভিযানের কর্ত্তৃত্বাধীনে ৮টা ১৫ মিনিটের সময় পূর্ণিয়া হইতে লর্ড ক্লাইসডেল এবং তাঁহার এক মিনিট পরে লেফ্‌টানেণ্ট ম্যাকিনটায়ার দুইখানি বিভিন্ন বিমানপোতে এভারেষ্ট অভিমুখে যাত্রা করেন। লর্ড ক্লাইসডেল যে পোতখানি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার নাম হাউষ্টন-ওয়েষ্টল্যাণ্ড এবং তাহাতে কর্ণেল ব্লাকার পর্য্যবেক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। ম্যাকিন্‌টায়ারের পোতখানির নাম ওয়েষ্টল্যাণ্ড-ওয়ালেস এবং তাহাতে পর্য্যবেক্ষণের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন গাউমণ্ট ব্রিটীশ ফিল্ম কর্পোরেশনের মিঃ বনেট্। বিমানপোতদ্বয় এভারেষ্ট শৃঙ্গের সন্নিকটে প্রায় ১৫ মিনিট কাল উড়িয়া বেড়াইয়া-

ছিল। এভারেষ্ট অভিযানে সফলকাম হাউষ্টন দলের এই কৃতিত্ব চিরদিন বিমানবিদ্যার ইতিহাসের গৌরবময় পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই সফলতা সাধারণের নিকট ইংরাজের নব নব আবিষ্কারের অদম্য স্পৃহা, দুর্নিবার উৎসাহ এবং সাহসিকতার দৃষ্টান্তস্বরূপে পিয়ারী ও স্কটের সুবিখ্যাত প্রচেষ্টা অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়কর মনে হইবে। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টা যতই অভিনব মনে হউক না কেন, ইটালীয় এবং ইংরাজ নাবিকগণের খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী দেশসমূহের আবিষ্কারের সহিত ইহাদের তুলনা হয় না; কেন না সেই সকল আবিষ্কারের ফলেই প্রাচ্যের বিশাল দেশসমূহের বিপুল অর্থসম্পদের কথা পাশ্চাত্য জাতিগণের নিকট ব্যক্ত হইয়াছে এবং সেই আবিষ্কারই দুরতিক্রম্য সমুদ্রপথকে ব্যবসায়বাণিজ্যের পক্ষে সুগম করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও সভ্যতাপ্রসারের সহজ পথ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। অধিকন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগে নানাদেশের জীবজন্তু, উদ্ভিদ্ ও মানবজাতি এবং পৃথিবীর অপরিজ্ঞাত নানা অংশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু তথ্য আমাদের গোচরীভূত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে দুস্তর তুষারপথ লঙ্ঘন করিয়া এভারেষ্টের শীর্ষতম স্থানে পৌঁছিবার বহু প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই; তাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ আরোহণের বৃত্তান্ত সাধারণের নিকট চিরদিন একটা দুর্দ্দমনীয় কৌতূহলের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান আরোহিদল স্থলপথ অবলম্বন করেন নাই, আকাশপথে এভারেষ্টশীর্ষ পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যবহৃত "ওয়েষ্টল্যাণ্ড" নামক বিমানপোত দুইটিকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এবং মানুষের সাধ্যানুসারে যাহা কিছু করা সম্ভব তদ্রূপ সকল প্রকার উপাদানে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। অতি উচ্চ স্থানে আরোহণের পক্ষে যে সকল প্রতিকূল সমস্যা প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হইতে পারে—বাতাসের অবস্থার অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনের ফলে যে বিপদ আসন্ন হইয়া উঠিতে পারে তৎপ্রতি আরোহিগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। ঊর্দ্ধে প্রবল ঝড়ে ধূলিকণার দ্বারা তাঁহারা আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপভাবে যেকোন সময় যে হঠাৎ দুর্ব্বার ঝড় উঠিয়া তাঁহাদের দৃষ্টিরোধ করিয়া দিতে পারে, একথা তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নেই চিন্তা করিয়াছিলেন এবং যাহাতে এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা সম্পূর্ণ বিপন্ন না হইয়া পড়েন সে ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই। তাই ঝটিকা-তাড়িত ধূলিকণা কিছুকালের জন্ত তাঁহাদের দৃষ্টিরোধ করিয়া থাকিলেও তাঁহাদিগের গতি ব্যাহত করিতে পারে নাই। শৃঙ্গের নিকটে আসিয়া তাঁহারা এভারেষ্টের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। সম্মুখে, দক্ষিণে ও বামে বহু দুগ্ধশুভ্র গিরিশিখর তাঁহাদের নয়নগোচর হইয়াছিল। এভারেষ্টের শীর্ষদেশ কোমল পালকসদৃশ তুষারপুঞ্জে আচ্ছাদিত দেখিয়া কর্ণেল ব্লাকার অনুমান করিলেন যে বাতাস প্রচণ্ডবেগে ঐ শিখরদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া জমাট তুষারকে রেণু রেণু করিয়া আকাশপথে পূর্ব্বাভিমুখে ছড়াইয়া দিয়াছে। সমগ্র ক্ষেত্র সম্পূর্ণ নগ্ন—তৃণলতা উদ্ভিদের শেষ চিহ্ন বহু দূরে পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

আরোহিগণ যাহাতে বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে সতত সমর্থ হন এবং যাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য অটুট থাকিতে পারে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া পুষ্টিকর আহার্য্য দ্রব্যের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যদি রাট্লেজের অধিনায়কত্বে এই ব্যোমচারী বৈজ্ঞানিক দল ভবিষ্যতে পদব্রজে এভারেষ্টশৃঙ্গে গমনাগমনের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানের দিক্ হইতে এইরূপ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করার মূল্য অপরিমিত হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে এই প্রচেষ্টার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া সময়োচিত ও শোভন হইবে না। তথাপি আকাশপথে চলাফেরার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি ও উপচিকীর্ষা স্থাপনের পক্ষে আশু সাহায্য করিতে পারে, একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এ সম্পর্কে হাউষ্টন দল যে ইঙ্গিত করিয়াছেন আমরা তাহার প্রতি আমাদের উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছি। হয় তো বা সত্যই ইহা দ্বারা সহজে, অল্প খরচে এবং নিরাপদে বিভিন্ন দেশের জাতিসমূহের মধ্যে নানা ভাবের আদানপ্রদান চলিতে পারিবে এবং মানবের ভ্রাতৃত্ববোধ চরম ও পরম পরিণতি লাভ করিবার সুযোগ পাইবে।

জার্ম্মাণীতে ইহুদীপীড়ন

জার্ম্মাণীতে হিট্লারের নেতৃত্বে নাজি বিপ্লবীদের কীর্ত্তির আলোচনা অথবা তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু শিক্ষিত জগতের সমক্ষে জ্ঞানী ও গুণী ইহুদীদিগের প্রতি নাজিগণের রূঢ় ব্যবহার নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই। নাজিগণের দুর্ব্যবহারের ফলস্বরূপ অধ্যাপক জেমস্ ফ্রাঙ্ক গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যক্ষের আসন পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্ক ১৯২৫ সালে পদার্থবিদ্যার অভিনব গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ফ্র্যাঙ্ককে হয় তো নাজিগণ এখনই পদচ্যুত করিত না; কিন্তু তাঁহার সমধর্ম্মী ইহুদী উচ্চরাজকর্ম্মচারী ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপকগণকে তাহারা যেরূপভাবে বলপ্রয়োগ দ্বারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেছে—তাহাদের নিজ বাসভূমিতে তাহাদিগের প্রতি যেরূপ পরবাসী শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক আগে হইতেই অবসর লইয়াছেন। বিগত মহাসমরের সময় পিতৃভূমির মঙ্গলকল্পে ফ্র্যাঙ্ক কঠোর পরিশ্রম করিয়া বহু কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং প্রথম শ্রেণীর লৌহ ক্রুশ (Iron Cross) পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইঁহার অনতিকাল পূর্ব্বেই বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত আলবার্ট আইনষ্টাইনও জার্ম্মাণী পরিত্যাগ করিয়া যান। ব্যবসায়বাণিজ্য ক্ষেত্রের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার ইহুদীগণের প্রতি যেরূপভাবে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উক্ত মনীষিদ্বয়ের আচরণ অন্যায় ও অশোভন হয় নাই স্বীকার করিতেই হইবে। নাজিগণ যে সমগ্র জার্ম্মাণজাতিকে টিউটনিক ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গঠন করিবার কল্পনা করিতেছে, তাহা বস্তুতঃপক্ষে মানববিজ্ঞানসম্মত নহে;—এরূপ কল্পনার মূলে কোনও বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে বলিয়া মনে হয় না।

ইহুদীগণের পক্ষসমর্থন জন্য কাহারও ওকালতির প্রয়োজন হয় না। পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতার ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে তাঁহাদের কৃতিত্বের কথা কাহারও অবিদিত নাই। ইউরোপের মধ্যযুগে ইহুদীগণই তথায় আধুনিক ব্যবসায়বাণিজ্যপদ্ধতির গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। ইটালীতে টাকাপয়সা-লেনদেন কারবারে তাহারা লম্বার্ডির টিউটনিক বংশের বণিকগণের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। ইহুদীগণের কল্যাণেই আজিও ইউরোপের প্রগতিশীল কলাশিল্পে প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনের অবশেষ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী মধ্যযুগে জ্ঞানবিজ্ঞান এবং কৃষ্টির কেন্দ্ররূপে স্পেন্ পৃথিবীতে যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, সেই খ্যাতির জন্য সে ইহুদীদিগের নিকটই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণী। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহুদী-শিক্ষার পুনরুত্থান জ্ঞান ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এমন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে, তখনকার দিনের জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিখ্যাত অধ্যাপকই ছিলেন ইহুদীবংশ-সম্ভূত। সাহিত্য এবং কলাশিল্পে, বিশেষতঃ সঙ্গীত এবং নাট্যে ইহুদীগণ সর্ব্বত্রই অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। জার্ম্মাণ সভ্যতার ক্ষেত্রে ইহুদীগণের দান স্বীকার না করিলেও জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর যাহা কিছু প্রতিষ্ঠা তাহার জন্য অপার্টের মত সুপণ্ডিত, বেন্‌ফির মত প্রাচ্যভাষাবিৎ এবং হার্টজের মত বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহার গভীর ঋণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পুস্তক সমালোচনা

জীবজগৎ—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম-এ প্রণীত। আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত; মূল্য ২৲ টাকা।

আলোচনার খাতিরে নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে বাধ্য হইয়া বলিতেই হয়, অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জীবজগতের অনেক স্থলেই অসঙ্গতি আছে। বৈজ্ঞানিকের চোখে এগুলি মারাত্মক। ভুলগুলি বিভিন্ন পর্য্যায়ে নিম্নোল্লিখিত মতে বিভক্ত হইল।

১। ছাপা :—

১২ পৃঃ—*Donald* Ross, হওয়া উচিত *Ronald* Ross.

১৫ পৃঃ—ইহাদের কাজ দেখিলে এরূপেই মনে হয়। এরূপই হইবে।

৩৩ পৃঃ—দেহের একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট প্রান্থই;—প্রান্তস্থলে এইরূপ প্রান্থের ব্যবহার বইটীতে বহুবার দৃষ্ট হয়।

৪৫ পৃঃ—বহুপদী (*Myripoda*), লূতাদিবর্গ (*Arachnid*), *Myriapoda* ও *Arachnida* হইবে।

৫৪ পৃঃ—*Aftera* (পাখাহীন পোকা); *Aptera* হইবে।

৩২ পৃঃ—Belostoma *Indica*। Binomial nomenclaturing-এর নিয়মানুযায়ী species-এর নামকরণে দ্বিতীয়াংশ small letter দ্বারা আরম্ভ করা হয়, কাজেই হওয়া উচিত *indica*।

৩৮ পৃঃ—পিশু (*Flees*); *Fleas* হইবে।

৯১ পৃঃ—*Pulmunary* chamber। *Pulmonary* হইবে।

৯২ পৃঃ—জীব (জিহ্বার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে); জিব হইবে।

১০৫ পৃঃ—*Fisces* (মৎস্য); *Pisces* হইবে।

১০৬ পৃঃ—*Ampioxus*; হওয়া উচিত *Amphioxus*।

১১৯ পৃঃ—*Salamenders* (একপ্রকার গিরগিটি); *Salamanders* হইবে।

১২২ পৃঃ—ফুসকো দুইটী ঠিক নীচে ইত্যাদি; দুইটীর হইবে।

১৩৯ পৃঃ—ইহাদের পালক এবং পাখায় বিশেষত্বই ইত্যাদি; পাখার হইবে।

১৪১ পৃঃ—বায়ু হইতে খুব কম বাঁধাই প্রাপ্ত হয়; বাধা হইবে।

১৫৯ পৃঃ—নিম্নস্তর (Monotremes), মধ্যস্তর (Marsupials) এবং সর্ব্বোচ্চস্তর *Placental* বলিয়াছেন। হওয়া উচিত *Placentals*।

১৬১ পৃঃ—ইচিণ্ডা (*Echinda*); একিড্‌না (*Echidna*) হইবে।

১৭২ পৃঃ—*Cheiroptera* (বাদুড় ইত্যাদি); *Chiroptera* হইবে।

২। চিত্র :—

২০ পৃঃ—এমিবার বংশবৃদ্ধি ছবিটী বড়ই delusive। বড় গোলাকৃতি nucleus-এর পাশে contractile vacuole ছবিতে প্রায় solid-এর মতই দেখান হইয়াছে। vacuole গুলির ভিতর ফাঁকা রাখিলেই ভাল হইত।

৬৫ পৃঃ—মশার ছবি inaccurate। মশার ডানায় চিত্রানুরূপ শিরা, উপশিরা কখনই দেখা যায় না। অন্যান্য ভুলের কথা না হয় নাই উল্লেখ করিলাম।

৮৯ পৃঃ—"কাঁচপোকার মাকড়সা শিকার" চিত্রটী দেখিলে মনে হয় না যে ছোট্ট কাঁচপোকা একটি বেশ বড় মাকড়সাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

১৭৯ পৃঃ—জিরাফকে জেব্রা নামে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

১৮৬ পৃঃ—দেশী হাতী (বর্ত্তমান আকার)। বর্ত্তমান আকার বলিতে সাধারণতঃ present size বুঝায়। অধ্যাপক নিশ্চয়ই এই অর্থ এখানে প্রয়োগ করেন নাই। আধুনিক হাতী অর্থেই বোধ হয় ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩। ভাষা :—ভাষার ত্রুটী খুবই দৃষ্ট হয়, বইখানি আগাগোড়া পড়িলে মনে হয় লেখক কোন ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ করিতে গিয়া ভাষাকে খুবই আড়ষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

৪৯ পৃঃ—(কাঁকড়ার কথায়) আর যে কাল পদার্থ ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহা ইহাদের উদর হইতে নিঃসৃত অনাবশ্যক অপরিষ্কার মল ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৫২ পৃঃ—(ষট্‌পদী কীটের প্রসঙ্গে) একটি তাহাদের সরু কটীদেশ বা মাজা, শুধু তাহাদের গ্রন্থিযুক্ত ছয়টী পা।

ঐ—ইহাদের পিছনদিকের মগজের সহিত একটি কঠিন জালাকারের স্নায়ু সংলগ্ন থাকে।

ঐ—পূর্ণাঙ্গ হইলে এই শ্রেণীর অধিকাংশ প্রাণীর বক্ষের দুই ধারে পাখার উৎপত্তি হয়।

১১৫ পৃঃ—(ভেটকী মাছের) পিঠের রং সবুজ মিশ্রিত ধূসর।

১২১ পৃঃ—কটকটে ব্যাঙ্‌ বড় কদাকার। ইহাদের শরীরের ছোট বড় গোটাগোটা মাসকলায়ের মত গণ্ডমালা থাকাতে বড়ই বিশ্রী দেখায়।

১২৬ পৃঃ—(সরীসৃপ) একেত বৈজ্ঞানিকদিগের মতে তাহারা মানুষের চাইতে পৃথিবীর প্রাচীনতর অধিবাসী, তা ছাড়া কচ্ছপ কাছিম প্রভৃতি কোন কোন জাতির প্রিয় খাদ্য, সুতরাং তাহাদিগকে কখনই এরূপ করা উচিত নহে।

১৩৫ পৃঃ—স্ফেনোডন (Sphenodon) দেখিতে সাধারণ টিকটিকির মত হইলে পরেও তাহাদের গঠনে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে।

১৩৬ পৃঃ—গভীর জ্ঞানী পণ্ডিতেরা ইত্যাদি।

১৭৮ পৃঃ—প্রকৃতি তাহার সন্তান, উদ্ভিদ, জীবজন্তু এমন কি জড় পদার্থ অর্থাৎ যাহা কিছু পৃথিবীতে তোমরা দেখিতে পাও তাহারা সকলকেই অবিরত ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

৪। অসাবধান বা অস্পষ্ট উক্তি :—

১৯ পৃঃ—আমিবার প্রসঙ্গে লিখিতেছেন "বহুরূপীর মত ইহারা আপনাদের আকার অনবরত পরিবর্ত্তন করিতে থাকে।" ইহা কি ঠিক? বহুরূপীর রঙ্‌ পরিবর্ত্তিত হয় ইহাই তো জানি।

২৯ পৃঃ—জেলিমাছের উদরে গর্ত্ত ছাড়া আর বিশেষ কোন অস্ত্র নাই। এখানে অন্ত্র কোন্‌টাকে বলিতেছেন—গর্ত্তকে?

৪০ পৃঃ—কেঁচোর দেহ দুইটী নলদ্বারা গঠিত। ইহার অর্থ তরলমতি শিশুগণ আবিষ্কার করিতে কতটুকু সমর্থ হইবে?

৪১ পৃঃ—কেঁচো "নীচের মাটি উপরে তুলিয়া একপ্রকার চাষের কাজও করিয়া থাকে; চাষের সহায়তা করিয়া থাকে বলাই সঙ্গত।

৪২ পৃঃ—(জোঁকের কথায়) ইহাদের দেহের অন্ত প্রান্ত দ্বারা ইহারা শুধু প্রাণীদিগের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়াই থাকিতে পারে, এছাড়া মুখের অন্য কোন কাজই করিতে পারে

না; সুতরাং তাহাকেও মুখ বলা নিতান্ত ভুল। এটী যখন মুখ নয়, তখন এই অপ্রাসঙ্গিক উক্তির প্রয়োজন কি?

৪৮ পৃঃ—(কাঁকড়ার দেহ) ভিজা বলিয়া মাংসল অংশ অপেক্ষাকৃত সরু হইয়া, এমন কি পায়ের গ্রন্থির ভিতর দিয়াও বাহির হইয়া আসে। এই সঙ্কোচনের ক্ষমতা কি শুধু দেহ ভিজা থাকে বলিয়াই?

৫০ পৃঃ—(পেরিপিটাসের) বাচ্চা ডিম্ব হইতে উৎপন্ন না হইয়া এমনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাচ্চা সর্ব্বত্রই ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয়,—ইহাই বিজ্ঞানসম্মত নয় কি?

৫১ পৃঃ—কেনোর কথা বলিতে বলিতে চেলার কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন।

৬৩ পৃঃ—রেনেত্রা (Ranatra) প্রসঙ্গে বলিয়াছেন চলিবার পক্ষে বায়ুও কখন কখন ইহাদের সাহায্য করে।

৫। আপত্তিজনক উক্তি :—

৪ পৃঃ—(সূচনা) তাহা (অর্থাৎ শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ) হইতেই যথাক্রমে মাছ, ব্যাঙ্‌, সরীসৃপ, পাখী, পশুর সৃষ্টি ;...অবশেষে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। জীবজগতের বিভিন্ন সমষ্টির আবির্ভাব ক্রমান্বয়ে একের পর এক কখনই হয় নাই, ইহা বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিনই মানিয়া লইয়াছেন।

৫৩ পৃঃ—মৌমাছি, বোলতা ইত্যাদির প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—ইহাদের দেহের পশ্চাদ্ভাগস্থিত হুলের দংশনই কিন্তু বিষাক্ত এবং যন্ত্রণাদায়ক। হুল দ্বারা দংশন করে না, হুল বিদ্ধ করে বলাই ঠিক।

৯৭ পৃঃ—অষ্টপাশ (Octopus) ও কাটল মাছ (Cuttle fish) "এই উভয়েরই মস্তকে আটটি করিয়া হাতীর শুঁড়ের মত লম্বা পা আছে। মস্তকে আটটি লম্বা পা আছে তরলমতি শিশুগণের ইহা কতটুকু বোধগম্য হইবে?

৯৮ পৃঃ—'শিপিয়া নামক কাল রং'; শিপিয়া নামক রং বলিলেই চলিত।

১৩০ পৃঃ—"নদীতে যে সকল মৃতদেহ ভাসিয়া যায় তাহা যদি কুম্ভীরে খাইয়া না ফেলিত তবে মানুষের যে কত ভীষণ অনিষ্ট হইত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।" অনেক নদীতেই তো কুম্ভীর থাকে না। সেই সমস্ত নদীতীরবর্ত্তী মানুষের শুধু কুম্ভীরের অভাবেই যে ভীষণ অনিষ্ট হইয়াছে তাহা শুনি নাই। ইহারা মৃতদেহ খাইয়া মানুষের কিছু উপকার সাধন করে সন্দেহ নাই, তাই বলিয়া এই কার্য্য ইহারা সাধন না করিলে মানুষের ভীষণ অনিষ্ট হইত একথা বলা ঠিক নহে।

১৪৫ পৃঃ—'কবুতর' সম্বন্ধে বলিতেছেন, "তাহাদের পালকের রং সাদা, কটা, ব্লু, প্রভৃতি নানা রকমই দেখিতে পাওয়া যায়।" 'ব্লু'র কি বাংলা প্রতিশব্দ নাই?

১৪৬ পৃঃ—মাদী মোরগকে মুরগী বলিয়া থাকে। এইরূপ জটিল ভাষার তাৎপর্য্য কি?

১৫৪ পৃঃ—(স্তন্যপায়ী প্রাণী) জন্মের পরমুহূর্ত্ত হইতে মায়ের বুকের দুধ খাইতে আরম্ভ করে। দুধ পান করে বলিলেই ভাল হইত।

১৬৭ পৃঃ—তিমির খাদ্য—চিংড়ি, কাঁকড়া, ছোট মৎস্য বিশেষভাবে জেলিমাছ প্রভৃতি প্রাণী ইহাদের প্রধান খাদ্য। 'ছোটমৎস্য বিশেষভাবে জেলিমাছ' বলিলে স্বতঃই মনে হয় জেলিমাছ বুঝি ছোট মৎস্যের উদাহরণস্বরূপ; জেলিমাছ অনেক নিম্নস্তরের মেরুদণ্ডহীন প্রাণী, মাছ নামে অভিহিত হইলেও মেরুদণ্ডী মৎস্যের সহিত ইহার সম্পর্ক খুবই অল্প।

৬। পুনঃপৌনিকতা :—

১০০ পৃঃ—তারামাছ। এই পাগুলির সাহায্যে সমুদ্রের তলাতে এই পাঁচদিকের যে কোন দিকে ইহারা সহজেই গমনাগমন করিতে পারে। সকল দিকেই……ইহারা যখন যেদিকে ইচ্ছা চলিতে পারে, তাহাতে কোন অসুবিধা হয় না। এইরূপ একই কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিবার দোষ বহু স্থলে দৃষ্ট হয়।

৭। গ্রাম্য দোষ :—

ঠুকাঠুকি (১৩৪ পৃঃ), পাতল (১২৯ পৃঃ), পিঠের দিকের চাগের নিচে (৪০ পৃঃ), চারি কুঠরী বিশিষ্ট (১৩৯ পৃঃ) কচি অবস্থায় (১৭০ পৃঃ), পিঁজরার ভিতরে বন্ধ (১৪৪ পৃঃ) ভাষাকে সরল করিতে গিয়া এইরূপ বহু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৮। পরিভাষা :—

১৯ পৃঃ—Oxygenকে ওজন বলিয়াছেন। অম্লজান বলাই ঠিক।

৫৩ পৃঃ—Maxillae—চাপার চুয়াল, mandible—দংশনাস্ত্র।

৩৫ পৃঃ—কীটডিম্বকে larva বলা হইয়াছে; ৫৬ পৃষ্ঠায় চিত্রে দেখা যায় আরশুলার nymphকে কীটডিম্ব বলা হইয়াছে। Larva ও nymphএর প্রভেদ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ মাত্রেই অবগত আছেন। একই প্রতিশব্দ দুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা সঙ্গত হয় নাই। তা'ছাড়া কীটডিম্ব বলিতে সাধারণতঃ embryoকেই বুঝায়।

৮৩ পৃঃ—'মানিবেগ' ইংরাজী Moneybagএর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। সোজাসুজি থলে বলিলেই চলিত।

৮। বড় রকমের ভুল :—

৬২ পৃঃ—(ছারপোকার কথায়) "প্রাণান্তকর কালাজ্বরের বীজাণু ইহারাই বহন করে।" কালাজ্বরের বীজাণুর বাহক ছারপোকা আধুনিক জীববিজ্ঞানে এ কথার স্থান নাই। এই বীজাণুর প্রকৃত বাহক এখনও সম্পূর্ণ স্থিরীকৃত হয় নাই,—সম্ভবতঃ Phlebotomus নামক দ্বিপক্ষ পোকাই ইহার বাহক।

৬৪ পৃঃ—দ্বিপাখ পোকার (Diptera) বিবরণ দিতে গিয়া মশা, পিশু (Fleas) প্রভৃতিকে একই পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। কোন্ সূত্রে এইরূপ করিলেন বুঝিলাম না। feas বা পিশু Aphaniptera নামক একটা স্বতন্ত্র বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

৭৫ পৃঃ—মাছিকে মৌমাছি, বোলতা, পিপীলিকা ইত্যাদি পোকার সহিত 'সূক্ষ্ম স্বচ্ছ পাখাধারীর' (Hymenoptera) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই ভুলই বা কেন হইল?—মাছি ও মৌমাছিতে অনেক পার্থক্য, প্রথমটী দ্বিপাখ পোকা (Diptera) ও শেষোক্তটী চা[illegible]া বিশিষ্ট (Hymenoptera)।

৬ পৃঃ—জীবজগতের শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানসম্মত হয় নাই। মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর সর্ব্বনিম্ন স্তরে 'কণ্টকচর্ম্মীর' (Echinoderma) স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহার স্থান 'কীট' ও 'কণ্টকচর্ম্মী'র মাঝামাঝি। কীটের প্রধান বিভাগগুলির উল্লেখ এইখানে করিলে ভাল হইত।

বালককালিকাদের জন্য সহজ ও সরল ভাষায় বিজ্ঞানের কথা আলোচনা করা যে কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। কঠিন সত্যের চুলচেরা বিচারই হইল বিজ্ঞানের কাজ, তাহার ব্যতিক্রম স্থানে স্থানে ঘটিয়াছে বলিয়াই এত কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম। এ সকল ত্রুটি সহজেই বিদূরিত হইতে পারে। আমার মনে হয় সম্যক সংশোধিত হইলে হেমেন্দ্রবাবুর 'জীবজগৎ' মাতৃভাষায় প্রাণিতত্ত্বের অভাব অনেকখানি পূর্ণ করিবে।—শ্রীপূর্ণেন্দু সেন।

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

আগরতলায় মৌমাছির চাষ—শ্রীপ্যারীমোহন ভট্টাচার্য্য (কৃষিলক্ষ্মী, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৩৯)
উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণ—ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী (কৃষিলক্ষ্মী, ভাদ্র ১৩৩৯)
কৃষিপ্রাণ যবক্ষারজান—শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা (কৃষিসম্পদ, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৩৯)
চিকিৎসাশাস্ত্রে জীবজন্তুর স্থান—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (স্বাস্থ্যসমাচার, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৯)
নক্ষত্রের জন্মকথা—শ্রীসতীরঞ্জন খাস্তগীর, ডি-এস-সি (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৯)
বাতাস—ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল-এম-এস (স্বাস্থ্যসমাচার, আশ্বিন ১৩৩৯)
বৌদ্ধযুগের ভূগোল—ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, পি-এইচ-ডি (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৯)
ভারতবর্ষের খনিজ জল— ... (স্বাস্থ্যসমাচার, কার্ত্তিক ১৩৩৯)
মৌমাছি পালন—শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, বি-এ (কৃষিসম্পদ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৯)
স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও ব্যায়াম—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু (ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৩৯)

Printed and published by Sj. Ragunath Seal, at the Calcutta Oriental Press, 9, Panchanan Ghose Lane, Calcutta.

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকৃতি

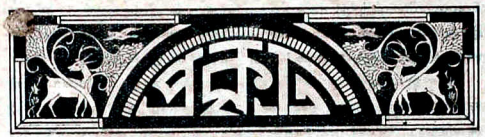

৯ম বর্ষ | শীত ও বসন্ত | ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

জড়ের উপাদান

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

জড় বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে আমাদের ধারণার বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাহ্য জগতের যে ছবি আমরা মানসপটে আঁকিয়াছিলাম, তাহা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইয়াছে; তাহার স্থানে জড়বিদ্‌গণের গত ৩৫ বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনায় সম্পূর্ণ নূতন মনোমুগ্ধকর আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীর্ণ কুটীর ধূলিসাৎ করিয়া বিচিত্র কারুকার্য্য সমন্বিত সুরম্য হর্ম্ম্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

জানা-রশ্মি, অজানা রশ্মি, ক্যাথোড রশ্মি—সব এক জাতীয়, কেবল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন।

গত শতাব্দীর শেষভাগে যে দুটি বাদ (theory) প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহারাই এই বিচিত্র পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তক। উহাদের মধ্যে একটি ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের সাধনাজাত ফল; আলোকের স্বভাব-নিরূপণ আলোচনায় ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে নিউটনের আলোক সম্বন্ধীয় ধারণা ভুল; অর্থাৎ উজ্জ্বল বস্তু হইতে জড় কণা ছুটিয়া আসিয়া আলোকের অনুভূতি জন্মায় না—পক্ষান্তরে কাল্পনিক ইথার সমুদ্রে তরঙ্গ শ্রেণীই আলোক অনুভূতির কারণ। তাপের স্বভাব আলোচনায় দ্বিতীয় বাদটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে জড় পরমাণুগুলির অবিরত অস্থিরতাই তাপোৎপত্তির কারণ।

আদিকালে মানবের চক্ষে আলোকের যে সব ধর্ম্ম উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল, "আলোকের সরল রেখায় গমন" তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। মান্ধাতার আমল হইতে প্রতিফলন ও দিক্‌-বিবর্ত্তন (reflection and refraction) মানবের পরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কৃষ্টাল বা স্বচ্ছ

দানার মধ্যে দ্বি-দিক্‌বিবর্তন (double refraction), পাতলা পাতের মধ্যে আলোকের বর্ণবৈচিত্র (colours of thin plates), বক্রণ (diffraction), আলোক বেগের সসীমতা (finite velocity of propagation of light) প্রভৃতি আলোকের অন্যান্য ধর্ম্মের আবিষ্কার হইয়াছিল। নিউটন ও হিউগেনের মধ্যে (Newton and Huygens) মতের অনেক পার্থক্য থাকিলেও আলোক যে দেশ ও কাল ঘটিত ব্যাপার—ইহা যে periodical—সে বিষয়ে তাঁহাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

তরঙ্গ তত্ত্বের আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে তরঙ্গবাহী মধ্যস্থের (medium) নির্দ্দিষ্ট জড় কণা, হয় তরঙ্গগতির সমান্তরে এদিক ওদিক যাতায়াত করিতেছে, অথবা উহার লম্বভাবে উঠা নামা করিতেছে। শব্দ তরঙ্গ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত এবং স্থির জলে লোষ্ট ক্ষেপণোদ্ভূত তরঙ্গ শেষোক্ত শ্রেণী-ভুক্ত। আলোকশ্রেণী যে দ্বিতীয় শ্রেণী-ভুক্ত—অনেক কারণে জড়বিৎ (physicist) ইহা অনুমান করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

তারপর ম্যাক্‌স্‌ওয়েল (Maxwell) তাঁহার ধ্যানলব্ধ ধারণা লইয়া সুধীজনের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ না দিয়াও নিম্ন-প্রদত্ত বর্ণনা দ্বারা তাঁহার ধারণা মোটামুটি ভাবে বুঝা যাইতে পারে। পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে ইথার কণাগুলির গতির লম্বভাবে কম্পনের দরুণ আলোক-তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। ম্যাক্‌স্‌ওয়েল ইহা মানিলেন না। তিনি অনুমান করিলেন যে ইথারের মধ্যে তাড়িত ও চৌম্বক ক্ষেত্রে কোন সাময়িক ঘটনা—নির্দ্দিষ্ট কালে সম্পাদিত কোন অনুষ্ঠানই (periodic phenomenon)—আলোকের জন্মদাতা। ইউনিট সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন উক্ত অনুষ্ঠান-সংখ্যা দ্বারাই বিভিন্ন বর্ণ পরিচিত হয়। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও ইউনিট সময়ে নিষ্পন্ন তরঙ্গের সংখ্যার গুণফল সর্ব্বদাই তরঙ্গের বেগ সূচনা করে। (Wave-velocity is always equal to the product of any wave-length and the number of waves in unit of time); অর্থাৎ সরল ভাষায় লিখিতে গেলে বলিতে হয়—বিভিন্ন বর্ণের বেগ বিভিন্ন নহে, অভিন্ন; এবং তরঙ্গের ছোট বড় আকৃতি দেখিয়া পীত লোহিতাদি বর্ণ চিনিতে পারা যায়।

সকলেই জানেন যে, যাবতীয় বর্ণের একত্র সমাবেশেই শ্বেত আলোকের উৎপত্তি। একখানি ত্রিশির (prism) সাহায্যে শ্বেত আলোক বিশ্লিষ্ট করিয়া বিভিন্ন বর্ণ অতি সহজেই দেখিতে পারা যায়। বেগুণ বর্ণ ক্ষুদ্রতম তরঙ্গজাত; সুতরাং ইউনিট সময়ের মধ্যে বেগুণ বর্ণের তরঙ্গ-সংখ্যা সর্ব্বোচ্চ; আর লাল বর্ণের তরঙ্গগুলি বৃহত্তম; কাজেই ইউনিট সময়ের মধ্যে তাহার তরঙ্গ-সংখ্যা ক্ষুদ্রতম। আলোকের কম্পনগুলি বড় তীব্র বেগে সাধিত হয়। নিম্নলিখিত অনুপাত দৃষ্টে একবার মাত্র কম্পন-কালের ক্ষুদ্রতার আভাস পাওয়া যাইতে পারে :—

১ কম্পন-কাল : ১ সেকেণ্ড :: ১ সেকেণ্ড : ১ কোটী বৎসর।

ইয়ং ও হারসেলের (Young and Herschel) কার্য্যাবলি হইতে জানা যায় যে রবিকরে যে কেবলমাত্র সপ্তবর্ণ (বেণীআসহকলা) আছে, তাহা নহে; বেগুণ বর্ণের আন্দোলন-সংখ্যা অপেক্ষা

* বর্ণ সপ্তক :—বেগুণ-নীল-আসমানি-সবুজ-হরিদ্রা-কমলা-লাল ; Vibgyor-এর বঙ্গলে "বেণী আ সহকল" বলা যাইতে পারে।

(frequency) * বৃহত্তর দোলন-সংখ্যা-বিশিষ্ট বেগুণাতীত রশ্মি (ultra-violet rays) ও লোহিত বর্ণের দোলন-সংখ্যা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দোলন-সংখ্যাবিশিষ্ট লোহিতাতীত রশ্মি (infra-red rays) সূর্য্যের আলোকে বর্ত্তমান আছে; অর্থাৎ লোহিতাতীত রশ্মি, "বেণীআসহকলা" নামক রশ্মি ও বেগুণাতীত রশ্মি রবি-কিরণে বর্ত্তমান। রবি-আলোকের দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অংশটুকু রবি-দত্ত শক্তির (energy) ক্ষুদ্রতর অংশমাত্র।

আলোক-তরঙ্গ ব্যতীত অন্য প্রকার তরঙ্গ-গতির সংবাদ সম্প্রতি পাওয়া যাইতেছে। এই সকল নূতন তরঙ্গের বেগ (velocity) কিন্তু আমাদের পরিচিত আলোক-তরঙ্গের বেগের সহিত সমান। তাহাদের পার্থক্য কেবল দোলন-সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধিতে। ধাবমান বিয়োগাত্মক তড়িৎ-কণা (ক্যাথোড রশ্মি) বায়ুশূন্য প্রদেশে (vacuum) জড়-সংঘাতে অজানা-রশ্মি (x-rays) উৎপন্ন করে। সম্প্রতি ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে এই অজানা-রশ্মির দোলন-সংখ্যা খুব বেশী; ইহা অতি উচ্চ দোলন-সংখ্যাবিশিষ্ট আলোক ব্যতীত আর কিছুই নয় সুতরাং অজানা-রশ্মির তরঙ্গগুলি অত্যধিক ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। বে-তার টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আর এক প্রকার তাড়িত তরঙ্গের পরিচয় দিতেছে; এই তরঙ্গগুলি খুব বড় বড়; ইহাদের মাপিবার জন্য মিটার বা কিলোমিটারকে ইউনিট বা মাত্রা ধরিতে হয়। কাজেই তাহাদের দোলন-সংখ্যা কম। অতএব আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তরঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহত্তম তরঙ্গ পর্য্যন্ত একটা শ্রেণী (series) পাইলাম। ইহাতে তাড়িত-চৌম্বক তরঙ্গের শ্রেণীবিভাগ পূর্ণ হইল (complete series of electromagnetic waves); বেগুণাতীত দেশে অজানা-রশ্মি, তার পাশে পরিদৃশ্যমান সপ্তবর্ণ, তার পাশে লোহিতাতীত দেশে তড়িৎ-রশ্মি—সকল তরঙ্গের বেগ সমান, কেবল আকারে ছোট বড়। অতএব এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে অজানা-রশ্মি, জানা বা পরিদৃশ্যমান রশ্মি, তড়িৎ-রশ্মি—সব এক জাতীয়,—কেবল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন।

আলোক-প্রকৃতি এইরূপে জ্ঞাত হইয়া জড়-গঠনের বর্ত্তমান ধারণা কিরূপে বিকশিত হইয়াছে, তাহার একটা বিবরণ এখন দেওয়া যাইতে পারে।

জড় গঠনের ঐতিহাসিক বিকাশ। ইলেকট্রন্ জড়ের একটী উপাদান।

উপনিষদের "অণোরণীয়ান্" ইত্যাদি বাক্যে ও কণাদের বৈশেষিক দর্শনে প্রমাণ হয় যে, সেই পুরাকালে বৈদিক যুগেও জড়ের অণু-পরমাণুর ধারণা মানবের অপরিচিত ছিল না। হিন্দু ঋষিদিগকে—উপনিষদ্‌কারদিগকে অণু-পরমাণু ধারণার জন্মদাতা বলিয়া স্বীকার করিতে জগৎ এখন কুণ্ঠাবোধ করে না, করিবার উপায় নাই। জড় (matter) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাসমষ্টি—এই ধারণা ডেমোক্রট (Democrit) পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করেন। গতি-শক্তি-স্বরূপতা-হইতেই জড় উৎপন্ন হইয়াছে—ইহাই তাঁহার আদি ধারণা।

* প্রতি সেকেণ্ডে কণাগুলি যতবার দোলে, তাহাকে উহার দোলন-সংখ্যা বলে (frequency)।

জগতের যাবতীয় সংঘটন চঞ্চলতা বা গতিশক্তি হইতে উৎপন্ন—ইহা যদিও নব্য জড়বিজ্ঞান বা রসায়ন-বিজ্ঞান (Physics or Chemistry) সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিতে পারে নাই, তথাপি ইহা জড়-গঠনের জটিল পথ অনেকটা সুগম করিয়াছে। রাসায়নিক মিলনের বিধিগুলি ব্যাখ্যা করিবার জন্য—ডাল্টন জড়-গঠনের পরমাণুবাদ পাশ্চাত্যদেশে প্রথম প্রস্তাব করেন।

তিনি অনুমান করেন যে জড় মাত্রেই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। এই সকল কণাকে পরমাণু (atom) বলে। পরমাণুগিকে অবিভাজ্য বলিয়া মনে করা হইত। তখনকার দিনে কতকগুলি জড়কে মূলবস্তু (element) বলা হইত। দুই বা ততোধিক মূলবস্তু বিভিন্ন পরিমাণে রাসায়নিক যোগে মিলিয়া বিভিন্ন জড়ের সৃষ্টি করিত। কোন নির্দ্দিষ্ট মূলবস্তুর পরমাণুগুলির আকার প্রকার ধর্ম্ম সবই এক প্রকার, অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বতোভাবে পরস্পরের সহিত সমান। বিভিন্ন মূলবস্তুর পরমাণুগুলির ওজনে পার্থক্য দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ এক মূলবস্তুর একটি পরমাণুর ওজন অপর মূলবস্তুর একটি পরমাণুর ওজনের সমান নহে, বিভিন্ন। কেবল ওজনে যে তাহাদের পার্থক্য দৃষ্ট হয় তা নয়, তাহাদের ধর্ম্মাবলিও পরস্পর হইতে বিভিন্ন। সরল বা মূলবস্তু একজাতীয় পরমাণু দ্বারা গঠিত, আর জটিল বা যৌগিক বস্তু বিভিন্ন জাতীয় পরমাণু দ্বারা গঠিত।

একটী মূলবস্তুকে ক্রমাগত ভাগ করিয়া গেলে আমরা একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কণার সন্ধান পাই। এইরূপ কণাকে অণু বলে (molecules)। এক, দুই, বা ততোধিক পরমাণু যোগে এক একটি অণু গঠিত হয়। পরমাণুর অস্তিত্ব মানসক্ষেত্রে, ব্যবহারিক জগতে নাই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অণুর অস্তিত্বই পাওয়া যায়।

যৌগিক বস্তু গঠনের জন্য পরমাণুগুলি পরস্পরের সহিত ১ : ১, ১ : ২, ১ : ৩, ১ : ৪ এইরূপ সরল অনুপাতে রাসায়নিক যোগে মিলিত হয়; দুই বা ততোধিক মূলবস্তু যখন পরস্পর রাসায়নিক যোগে মিলিত হইয়া নূতন জড়ের সৃষ্টি করে, তখন তাহাদের ওজনের অনুপাত একই থাকে, বদলায় না। যখন দুই মূলবস্তু যোগে একের অধিক যৌগিক বস্তু উৎপন্ন হয়, তখন কোন নির্দ্দিষ্ট ওজনের এক বস্তু অপর বস্তুর একগুণ, দ্বিগুণ, তিনগুণ বা চারিগুণ ওজনের সহিত মিলিত হয়; (combining weights are simple multiples of each other) মিলনশীল বস্তুর ওজন পরস্পরের জটিল ভগ্নাংশ না হইয়া সরল গুণিতক হইয়া থাকে। এক একটি পরমাণুর ওজন অতীব ক্ষুদ্র। বিভিন্ন মূলবস্তুর আপেক্ষিক মিলন-ওজন তাহাদের পরমাণুর বাস্তব ওজনের অনুপাতের সহিত সমান। নিম্ন প্রদত্ত উদাহরণ দৃষ্টে পরমাণুর ওজনের সূক্ষ্মতার একটা আভাস পাঠক পাইবেন :—$১০^{-২৪}$ টি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন মাত্র তিন গ্রাম। **নানা কারণে অক্সিজেনের একটি পরমাণুর ওজনকে ১৬ ধরা হইয়াছে।** অক্সিজেনের একটি পরমাণুর সহিত যে পরিমাণ অপর বস্তু রাসায়নিক যোগে মিলিত হয়, সেই পরিমাণকে উক্ত বস্তুর পরমাণু-ওজন বলে (atomic weight)।

জড়-গঠন প্রশ্নটি আর এক দিক হইতে বিচার করা যাইতে পারে। সামান্য এসিড মিশ্রিত

জলকে তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত করা যাইতে পারে। লবণ জাতীয় বস্তু মাত্রকেই তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা এইরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। ফ্যারাডে সাহেব দেখিলেন যে যখন যৌগিক বস্তু তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়, তখন উৎপন্ন মূলবস্তুর ওজন যে পরিমাণ দ্রবণ মধ্যে (solution) চালিত তড়িতের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, তাহা নহে; তাহাদের পরমাণু-ওজনের অনুপাতে মূলবস্তুগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতেই মনে হয় যে, প্রত্যেক পরমাণুর সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ সংশ্লিষ্ট থাকে; এবং মূলবস্তুগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; যথা (১) যে সকল মূলবস্তুর পরমাণু ধনাত্মক বা যোগাত্মক তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট তাহাদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা যায়, (২) আর যে সকল মূলবস্তুর পরমাণু ঋণাত্মক বা বিয়োগাত্মক তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট, তাহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এরূপে ভাগ করিলে তড়িৎ-বিশ্লেষণ ব্যাপার অনেকটা সরল ও সহজ হইয়া আসে। যৌগিক বস্তু (compounds) জলে গুলিলে, উহার কতকগুলি পরমাণু বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, এবং বিশ্লিষ্ট পরমাণুর সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট থাকে। যখন তড়িৎ-প্রবাহনাহী তারের যুক্ত সীমা (ধনাত্মক সীমা positive pole) ও বিযুক্ত সীমা (ঋণাত্মক সীমা negative pole) দ্রবণের মধ্যে নিমজ্জিত হয়, তখন ভিন্ন জাতীয় তড়িৎময় মধ্যে আকর্ষণ হেতু যোগাত্মক বিশ্লিষ্ট পরমাণুগুলি বিয়োগ দ্বারে (negative electrode) ও বিয়োগাত্মক পরমাণুগুলি যোগ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং স্ব স্ব তড়িৎ-দ্বারস্থ বিপরীত তড়িতের সহিত মিশিয়া সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে যে বলা হইল জলের গোলা বা দ্রবণের মধ্যে যৌগিক বস্তুর কতকগুলি অণু ভাঙিয়া তড়িতাত্মক পরমাণুতে পরিণত হয়, সেই সকল তড়িতাত্মক পরমাণুকে কণা বা আয়ণ (ion) বলা হয়। তাড়িত বিশ্লেষণ ব্যাপারের (Electrolysis) এই হইল প্রকৃত ব্যাখ্যা। একটি পরমাণুর সহিত যে পরিমাণ তড়িৎ সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহাকে **তড়িৎ-মাত্রা** বা তড়িৎ কোয়ান্টম্ (quantum) বলে। তড়িৎ যখন দুই জাতীয়, তড়িৎ-মাত্রাও তখন দুই জাতীয় হইবে, যথা যোগাত্মক মাত্রা বা কোয়ান্টম্ ও বিয়োগাত্মক মাত্রা বা কোয়ান্টম্ (positive and negative quantum)। তার পর আরও দেখা যায় যে, প্রত্যেক বিয়োগাত্মক মাত্রা বা কোয়ান্টম্ কোন নির্দ্দিষ্ট ওজনের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জড় কণার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে ১৮০০ ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগের যে ওজন হয়, সেই ওজনবিশিষ্ট জড়কণার সহিত বিয়োগাত্মক তড়িৎ-মাত্রা বা কোয়ান্টম্ সংশ্লিষ্ট থাকে। এই বিয়োগাত্মক তড়িৎ-মাত্রা-সংশ্লিষ্ট উক্ত ওজনের জড়কণার নাম ইলেক্‌ট্রন্। বায়ু নিষ্কাসিত কাচ-গোলকের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুরণের সময়ে পূর্ব্বোক্ত ইলেক্‌ট্রন্‌কে আবার দেখিতে পাওয়া যায়, এক তড়িৎ-দ্বার হইতে অপর তড়িৎ-দ্বার পর্য্যন্ত এই সকল কণার আলোকময় স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। এই আলোকময় তড়িৎ-কণার স্রোতকে ক্যাথোড রশ্মি বলে। এই সকল ক্যাথোড রশ্মিকে চুম্বক দ্বারা অপসারিত করিতে পারা যায়। জানা-পরিমাণ চুম্বকের দ্বারা যতটুকু অপসরণ (deflection) হয়, উহা মাপিয়া আজকালের বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ ইলেক্‌ট্রনের ওজন, বেগ ও

তৎ-সংশ্লিষ্ট তড়িৎ-পরিমাণ নিরূপণ করিয়াছেন। ইলেক্‌ট্রনের ওজন (= ১/১৮০০ হাইড্রোজেন পরমাণু-ওজন) ও তৎ-সংশ্লিষ্ট তড়িৎ-পরিমাণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; উহার বেগ আলোক-বেগের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ কিলোমিটার।

এই সকল তথ্য অবলম্বন করিয়া বেশ অনুমান করা যায় যে, ইলেক্‌ট্রন্ জড়-পরমাণুর উপাদান; এবং তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা জড়-পরমাণু হইতে বিচ্যুত ইলেক্‌ট্রনের স্রোত ব্যতীত ক্যাথোড্-রশ্মি আর কিছুই নয়। নিষ্কাসিত-বায়ু কাচ-গোলকের মধ্যে (vacuum tubes) ইলেক্‌ট্রন্ স্রোত ছাড়া আরও একটি আলোক-স্রোত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গতি ইলেক্‌ট্রনের গতির বিপরীত দিকে। কতকগুলি তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট জড়কণার দ্রুতগতি হেতুই এই আলোক প্রবাহের সৃষ্টি, এই আলোকস্রোতে যে জড়কণা থাকে, তাহার ওজন পরমাণু ওজনের সহিত তুলনীয়; এক একটি জড়কণার সহিত এক ইউনিট যোগাত্মক তড়িৎ সংশ্লিষ্ট থাকে (unit quantity of positive electricity)। এই যোগাত্মক তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট জড়কণার স্রোতকে **যোগাত্মক রশ্মি** (positive rays) বলে। এই যোগাত্মক তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট জড়কণার বেগ খুব কম, আলোক বেগের হাজার ভাগের এক ভাগ।

সক্রিয়তা
Radio-activity.

গত ৪৫ বৎসর মধ্যে কতকগুলি নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে। এই সকল নূতন তথ্য বা ঘটনা বৈজ্ঞানিক জগতে একটা অভাবনীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল নূতন তথ্যকে "স-ক্রিয়তা" শীর্ষক (Radio-activity) প্রবন্ধ মধ্যে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। জড়ের উপাদান নিরূপণার্থে সক্রিয়তা নিবদ্ধ তথ্য সমূহের আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রন্‌জেন্ (Rontgen) দেখিলেন যে, যখন ক্যাথোড্-রশ্মি জড়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়ে, তখন ক্যাথোড্-রশ্মি এক নূতন রশ্মির কলেবর ধারণ করিয়া প্রতিফলিত হয়। তিনি এই নূতন রশ্মিকে "এক্‌স্ রে" নাম দিয়াছিলেন। আমরা ইহার নাম রাখিব **"অ-জানা রশ্মি"**। পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, অজানা রশ্মি অতি উচ্চ দোলন-সংখ্যা-বিশিষ্ট আলোক মাত্র। কাগজ, কাষ্ঠফলকাদি ভেদ করিয়া যাইবার ক্ষমতা ইহার আছে; এবং ইহা ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর ক্রিয়াশীল।

ইহার কয়েক মাস পরে বেকারেল (Becquerel) এক অদ্ভুত আবিষ্কার করেন। ইউরেনিয়াম ঘটিত পদার্থ হইতে এক প্রকার বিকিরণ (radiation) বাহির হয়। কালো কাগজে আবৃত ফটোগ্রাফের প্লেট এই বিকিরণ দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়; এই বিকিরণ দ্বারা পার্শ্বস্থ বায়ু তড়িৎপরিচালক (conductor) হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণতঃ বায়ু অ-চালক (non-conductor) মধ্যে গণ্য; কিন্তু ইউরেনিয়াম নিঃসৃত বিকিরণ যখন বায়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তখন বায়ুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আয়ন সৃষ্ট হয়; আয়ন সকলের অস্তিত্ব হেতুই অ-চালক বায়ু পরিচালক হইয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ তড়িৎ বহনে সক্ষম হয়। যে সকল বস্তু হইতে বিকিরণ নির্গত হইয়া পার্শ্বস্থ বায়ুকে পরিচালক করে, কাল কাগজে আবৃত ফটোগ্রাফি প্লেটের উপর রাসায়নিক

ক্রিয়া সংসাধন করে, তাহাদিগকে **সক্রিয়**-বস্তু বলে (Radio-active)। ইউরেনিয়াম্ ব্যতীত থোরিয়াম্ ঘটিত বস্তু হইতেও পূর্ব্বোক্ত বিকিরণ নির্গত হইতে দেখা যায়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কুরী দম্পতি এক নূতন ধাতুর আবিষ্কার করেন। তাঁহারা ইহাকে রেডিয়াম্ নামে অভিহিত করেন। ইউরেনিয়াম্ বা থোরিয়াম্ অপেক্ষা রেডিয়মের সক্রিয়তা খুব বেশী। ইউরেনিয়াম্ ঘটিত খনিজ পদার্থের মধ্যে (Uranium ore) রেডিয়াম্ কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাওয়া যায়। রেডিয়মের সক্রিয়তা শক্তি ইউরেনিয়মের সক্রিয়তা শক্তি অপেক্ষা প্রায় দশ লক্ষ গুণ অধিক। রেডিয়াম্ নিঃসৃত বিকিরণের মধ্যে তিন প্রকার বিকিরণ বা রশ্মি পাওয়া যায়; যথা (১) আল্‌ফা রশ্মি, (২) বিটা রশ্মি (৩) গামা রশ্মি। আল্‌ফা রশ্মি কতকগুলি জড়কণার প্রবাহ মাত্র, ইহার এক একটি জড়কণার পরমাণু ওজন ৪, এবং প্রত্যেক কণাটি দুই ইউনিট যোগাত্মক তড়িতে সমাচ্ছন্ন। পূর্ব্ববর্ণিত ইলেক্‌ট্রনের প্রবাহ ব্যতীত বিটা রশ্মি আর কিছুই নয়; অর্থাৎ ইহার প্রত্যেক জড়কণা অতি ক্ষুদ্র, অতি সূক্ষ্ম ও এক ইউনিট বিয়োগাত্মক তড়িতে সংশ্লিষ্ট। গামা-রশ্মি পূর্ব্ববর্ণিত অ-জানা রশ্মির নামান্তর মাত্র; ইলেক্‌ট্রন্ জড়-সংঘাতে গামা বা অজানা রশ্মি উৎপন্ন করে। আল্‌ফা রশ্মির কণাগুলি যদি কোন কারণে তাহাদের নিজ নিজ তড়িৎ হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে তখন তাহারা হিলিয়াম্ গ্যাসের পরমাণু রূপে দেখা দেয়। বায়ুমণ্ডলে হিলিয়াম্ পাওয়া যায়। ইহার পরমাণু-ওজন = ৪।

এই সকল বিকিরণ নিঃসরণ ব্যতীত রেডিয়ামকে সদাই তাপ উৎপন্ন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়; উৎপন্ন তাপ সম-ওজনের জলকে ৪৫ মিনিটে ০° হইতে ১০০° সেঃ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তপ্ত করিতে সমর্থ হয়। রেডিয়ামের এই সকল অত্যদ্ভুত ধর্ম্ম বাহ্য অবস্থার উপর নির্ভর করে না; যথা, উহার গরম বাড়াইলে বা কমাইলে উক্ত ধর্ম্মাবলির হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না। এটাও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সক্রিয়তা ধর্ম্ম কেবল মাত্র সর্ব্বাপেক্ষা ভারী মূল বস্তুতেই প্রকাশ পায়।

রাদারফোর্ড ও সডী সক্রিয়তা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, রেডিয়াম হইতে **রেডিয়াম-ইমানেসন্** নামক এক প্রকার গ্যাস নির্গত হয়, ইহা হইতে পর পর পুত্র পৌত্রাদিক্রমে অনেকগুলি মূলবস্তু উৎপন্ন হয়। তাহারা সকলেই সক্রিয়গুণে গুণান্বিত অর্থাৎ রেডিয়াম্ বংশে যে-ই জন্ম লাভ করিয়াছে, সে-ই সক্রিয়তারূপ বংশ-ধর্ম্ম পাইয়াছে। ইহার সদ্ ব্যাখ্যা করিবার জন্য তাঁহারা **"স্বতঃ-বিশ্লেষ-বাদ"** (Spontaneous decomposition theory) প্রচার করিয়াছেন। এই বিশ্লেষ-বাদ অনুসারে পরমাণুর কি অবস্থা দাঁড়ায়, এখন তাই দেখা যাক্। রেডিয়াম্ হইতে নূতন গ্যাসের উৎপত্তি, এই গ্যাস হইতে অপর মূলবস্তুর উৎপত্তি ইত্যাদি পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান। সুতরাং অণু বা পরমাণুকে আর অবিভাজ্য জড়কণা বলা চলে না। যোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট জড়কণা সমষ্টিকে পরমাণু বলে। বস্তুর জড়ীয় ও রসীয় ধর্ম্ম (Physical and Chemical properties) যোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট জড়কণার সংখ্যা ও অবস্থানের উপর নির্ভর করে; উহাদের মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তির পরিমাণ পরমাণুর স্থায়িত্বভাব (stability) জ্ঞাপন করে।

মনে কর, এমন করিয়া কতকগুলি জড়কণা একটি পরমাণুর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল যে উহা অস্থায়ী (unstable) বলিয়া গণ্য হইল ; তখন প্রত্যেক পরমাণু হইতে কয়েকটি তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট জড়কণা বিতাড়িত হইয়া চলিয়া আসিতে থাকে ; যতক্ষণ না বস্তুটি স্থায়ী ওণান্বিত হয়, ততক্ষণ এইরূপে তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট জড়কণা পরমাণু হইতে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। এইরূপে কয়েকটি তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট জড়কণা ত্যাগে অবশিষ্ট তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট জড়কণার নূতন অবস্থানে নূতন মূলবস্তুর সৃষ্টি হয়। এই নবজাত মূলবস্তু আবার পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট জড়কণা ত্যাগ করিয়া আর এক নব মূলবস্তুর সৃষ্টি করে ; এই প্রথা অবিরত চলিতে থাকে, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ স্থায়ী মূলবস্তু (absolutely stable element) জন্ম লাভ করে। তবেই দেখ, পরমাণুর মধ্যে একটা বিরাট শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে ; সেই জন্য পরমাণু হইতে তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট-জড়কণা-বিচ্ছুরণ ভীষণ বেগে সাধিত হইতেছে ; ভীষণ বেগে জড়কণা বিচ্ছুরণই আল্‌ফা ও বিটা রশ্মি উদ্ভবের কারণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিটা রশ্মির অন্তর্গত জড়কণাগুলি অতীব ক্ষুদ্র। এই বিটা রশ্মির অন্তর্গত জড়কণাগুলিকে "বিটা-কণা" বলা যাক্। যে পরমাণু হইতে একটি মাত্র বিটা কণা বিচ্ছুরিত হয়, সেই পরমাণুর ওজন তাহাতে কার্য্যতঃ কিছু কমে না, বিটা কণা বিচ্ছুরণের পূর্ব্বে পরমাণুর যে ওজন ছিল, পরেও তাহাই থাকিবে। কিন্তু যে পরমাণু হইতে একটি আল্‌ফা কণা বিচ্ছুরিত হইবে সে পরমাণুর ওজন পূর্ব্বের ন্যায় থাকিতে পারে না, ৪ কমিয়া যাইবে ; কেননা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে একটি আল্‌ফা কণার ওজন ৪ ; সুতরাং পরমাণুর ওজন ৪ কমিয়া গেলে, সেটি আর পূর্ব্ব পরমাণু বলিয়া পরিচিত হইবে না, নূতন পরমাণু রূপে দেখা দিবে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে বক্তব্য বিষয়টি পরিস্ফুট হইতে পারে। রেডিয়ামের পরমাণু-ওজন=২২৬। রেডিয়াম পরমাণু হইতে একটি আল্‌ফা কণা বিচ্ছুরণ হইলে, রেডিয়াম্ ইমানেসন্ (গ্যাস) জন্মলাভ করে ; ইহা পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং রেডিয়াম্ ইমানেসনের পরমাণু ওজন=(২২৬—৪)=২২২। কেবলমাত্র ইহাই নহে ; আরও মজা আছে ; যে সকল আল্‌ফা কণা রেডিয়াম্ পরমাণু হইতে বিচ্ছুরিত হইল তাহারা সেখানে জমা হইতে রহিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি একটি আল্‌ফা কণার ওজন=৪ ; আর উহাতে দুই ইউনিট বা দুই মাত্রা যোগাত্মক তড়িৎ সংশ্লিষ্ট আছে ; যখন সমবেত আল্‌ফা কণাগুলি স্ব স্ব সংশ্লিষ্ট তড়িৎ হারাইয়া ফেলিল, তখন তাহাদের আর আল্‌ফা কণার রূপ রহিল না, তখন তাহারা হিলিয়াম্ পরমাণুর রূপ ধারণ করিল। তখন তাহাদের ধর্ম্ম বায়ুমণ্ডল হইতে সংগৃহীত হিলিয়ামের ধর্ম্মের সহিত একেবারে মিলিয়া যায়।

সক্রিয় পরমাণুর অবিরত বিশ্লেষণ—অনবরত ভাঙাগড়া এখন আমরা বুঝিলাম। এবং ইহা হইতে সহজে অনুমান করা যায় যে, যে পরমাণুতে অধিক সংখ্যক আল্‌ফা কণা আছে, সেই পরমাণুই অস্থায়ী হইবার অধিক সম্ভাবনা ; আর অস্থায়ী পরমাণু হইলেই সেখানে সক্রিয়তা শক্তি প্রকাশ পায় ; কাজেই সর্ব্বাপেক্ষা ভারী পরমাণুবিশিষ্ট বস্তুসমূহ (রেডিয়াম্, ইউরেনিয়াম্ ইত্যাদি) সক্রিয় শক্তির বিকাশ।

কোয়ান্টম্ বাদ
Quantum Theory

পূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইল, উহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, জড়জগতে যেমন পরমাণুর অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তড়িৎ জগতে তেমনি তড়িত-পরমাণুর ধারণা বিকাশ পাইয়াছে। এই জগৎটা বৈদ্যুতিক ভাষায় প্রকৃতি ও পুরুষের খেলা বলা হইয়া থাকে ; জড়বিজ্ঞানের ভাষায় জড় ও শক্তির খেলা বলা যাইতে পারে। জড়ের যদি পরমাণু থাকে, শক্তির তেমনি পরমাণু থাকা সম্ভব কিনা—ইহাই এখন বিচার্য্য। যদি থাকে, তবে শক্তির পরমাণুকে (atom of energy) কোয়ান্টম্ বলিব। তাপ-বিকিরণ ব্যাপারটা (heat -radiation) একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। জগৎটা তাড়িত-চৌম্বক তরঙ্গে সদাই পূর্ণ। বস্তুর অন্তরস্থ অণুগুলির চঞ্চলতা হইতে তাপের উৎপত্তি। তাড়িত-চৌম্বক-তরঙ্গ ও অণুগুলির চঞ্চলতার পারস্পরিক ক্রিয়াই তাপ-বিকিরণ নামে অভিহিত। জড়বিজ্ঞানবিৎ প্লাঙ্ক (plank) অনুমান করেন যে তাপ-বিকিরণ দ্বারা উদ্ভপ্ত বস্তু হইতে যে শক্তি ক্ষয় হয়, এই ক্ষয় **অবিরত** নহে (not continual) অর্থাৎ ক্ষয় অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে দফায় দফায় ধাপে ধাপে ঘটিয়া থাকে। এই এক এক দফায় যে ক্ষুদ্র পরিমাণ শক্তি তপ্ত বস্তু হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে, ইহাকে শক্তির এক এক ইউনিট বা মাত্রা বলা যাইতে পারে। শক্তির এই ইউনিটের নাম **কোয়ান্টম্**। এক খণ্ড জড়ের সহিত পরমাণুর যে সম্বন্ধ, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির সহিত শক্তি-পরমাণু বা কোয়ান্টমের সেই সম্বন্ধ। ইহাকেই বলে **কোয়ান্টম্‌বাদ**। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলের অণু দ্বারাই মহাসমুদ্র গঠিত, সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি-পরমাণু বা কোয়ান্টম্ দ্বারাই মহান্ শক্তি গঠিত।

জড়বিজ্ঞানে কোয়ান্টম্-বাদের বহুল প্রয়োগস্থল পাওয়া যায় এবং আজকাল প্রতিদিন নূতন নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইতেছে, যেখানে কোয়ান্টম্-বাদ স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বর্ণ-বিশ্লেষণ-ক্ষেত্র (spectra) উহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কির্চফ্ ও বুন্‌সেন্ একটি বড় জ্ঞানপ্রদ ব্যাপার আবিষ্কার করেন। কোন মূলবস্তু ঘটিত যৌগিক পদার্থ বর্ণহীন অগ্নিশিখায় তপ্ত করিলে বা ডিউবের মধ্যে রাখিয়া তাহার মধ্যে তড়িত স্ফুরণ দিলে, সেই মূলবস্তু কোন নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট আলোক দিতে থাকিবে। এই হেতু সোডিয়াম্ হরিদ্রাবর্ণের আলোক দেয়, তামা সবুজ বর্ণের আলোক দেয়, পোটাসিয়াম্ বেগুন বর্ণের আলোক দেয়। এই সকল পরিদৃশ্যমান কিরণজাল ব্যতীত মূলবস্তু অদৃশ্য-রশ্মিও বিতরণ করে ; যথা, বেগুনাতীত ও লোহিতাতীত রশ্মি। বেগুনাতীত রশ্মি, পরিদৃশ্যমান্ রশ্মি ও লোহিতাতীত রশ্মি—উত্তপ্ত মূলবস্তু নিঃসৃত এই তিন রশ্মির একত্র সমাবেশকে ঐ মূলবস্তুর **বিশ্লিষ্ট বর্ণাসন** বা স্পেক্‌ট্রাম্ বলে। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট আলোক-রেখা দ্বারাই বিশ্লিষ্ট বর্ণাসন (spectrum) গঠিত এবং কোন দুইটি মূলবস্তুর এক রকমের বিশ্লিষ্ট বর্ণাসন হইতে পারে না। এই তথ্য বিজ্ঞান জগতে এক অমূল্য বস্তু ; ইহা দ্বারা বিজ্ঞান জগতের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। অনেক মূলবস্তুর আবিকার এই তথ্যাবলম্বনে ঘটিয়াছে। যে মূলবস্তুর পরিমাণ এত ক্ষুদ্র যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রথায় উহার অস্তিত্ব ধরিতেই পারা যায় না, সেই মূলবস্তুর চরিত্রগত বিশ্লিষ্ট বর্ণাসন দৃষ্টে তাহার অস্তিত্ব সুপ্রমাণিত হয়।

প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল যে কোন মূলবস্তুর বর্ণাসনভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন রেখার দোলন-সংখ্যার মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। বামার (Balmer) কিন্তু দেখাইলেন যে হাইড্রোজেন-বর্ণাসনের বিভিন্ন রেখার দোলন-সংখ্যাগুলি নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা বেশ সহজে প্রকাশ করা যাইতে পারে :— $\frac{R}{n^2}-\frac{R}{m^2}$, এখানে R (একটি ধ্রুবাঙ্ক বিশেষ) = ৩২৯১ × $১০^{১২}$. এই Rকে Rydberg constant বলে, n ও m ছুটি অখণ্ড পূর্ণরাশি মাত্র। এই সূত্রস্থ ধ্রুবাঙ্ক, R, যে কেবলমাত্র হাইড্রোজেনের বেলায় প্রযোজ্য, তাহা নহে ; সকল মূলবস্তুর বর্ণাসন পক্ষেই ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; সুতরাং ইহাকে সার্ব্বভৌমিক ধ্রুবাঙ্ক (universal constant) বলা যাইতে পারে।

রাদারফোর্ড (Rutherford) প্রস্তাবিত পরমাণুর মডেল ব্যবহার করিয়া বর সাহেব হাইড্রোজেন-বর্ণাসনের (Hydrogen spectrum) গঠন অতি সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। রাদারফোর্ড প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে হাইড্রোজেন-পরমাণুর কেন্দ্রস্থানে একটি যোগাত্মক তড়িৎকণা বসিয়া আছে, ঐ কেন্দ্রস্থ কণাতে এক ইউনিট যোগাত্মক তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট, এবং এই যোগাত্মক কেন্দ্রস্থ কণার চারিদিকে একটি বিয়োগাত্মক ইলেক্‌ট্রন্ ঘুরিতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, পরমাণুর প্রায় সমস্ত পদার্থটাই (mass) উহার কেন্দ্রে অবস্থিত ; কেবল ১৮৪০ অংশমাত্র ইলেক্‌ট্রনে অবস্থিত।

বর সাহেব পূর্ব্ব প্রস্তাবিত হাইড্রোজেন পরমাণুর মডেল কোয়ান্‌টম্-বাদ প্রয়োগে বুঝিবার চেষ্টা করেন। দুই প্রকারে কোয়ান্‌টম্-বাদ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি বলিলেন যে ঘুর্ণায়মান ইলেক্‌ট্রনের কক্ষ-ব্যাস 'যা তা' ধরিলে চলিবে না ; উহার ব্যাস এমন হওয়া উচিত যে আবর্ত্তনসম্ভূত শক্তি (energy of rotation) কোয়ান্‌টম্ বা শক্তি-পরমাণুর অখণ্ড গুণিতক হয় (whole number of multiples)। যদি এইরূপে ঘুর্ণ্যমান ইলেক্‌ট্রনের কক্ষ স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে যে একটি মাত্র কক্ষ পাওয়া যাইবে, তাহা নহে ; অনেকগুলি কক্ষ উক্ত চাহিদা পূরণ করিতে পারে ; অর্থাৎ একাধিক কক্ষের অস্তিত্বসম্ভাবনা আছে। যখন আবর্ত্তনসম্ভূত শক্তি এক কোয়ান্‌টমের সমান, তখন ইলেক্‌ট্রনের বেগ আলোক-বেগের ১৪০ ভাগের এক ভাগ ; এবং তাহা হইলে প্রতি সেকেণ্ডে ইলেক্‌ট্রন ৬০০০ লক্ষ কোটী বার ঘুরিবে। যখন আবর্ত্তন-শক্তি দুই, তিন, বা চারি…কোয়ান্‌টমের সহিত সমান হইবে, তখন পূর্ব্বোক্ত প্রথম কক্ষের ব্যাসার্দ্ধ অপেক্ষা নূতন কক্ষের ব্যাসার্দ্ধ ৪, ৯, ১৬…গুণ বড় হইবে।

আলোক প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আইনষ্টীনের (Einstein) গভীর গবেষণার সহিত বর সাহেবের দ্বিতীয় অনুমানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। আইনষ্টীন আলোক-কোয়ান্‌টমের স্রষ্টা। বর সাহেব অনুমান করিলেন যে, যখন পরমাণু এক সাম্য অবস্থা হইতে অন্য সাম্য অবস্থায় (normal state) রূপান্তরিত হয়, তখন সেই পরমাণু কেবলমাত্র আলোক রূপে শক্তি বিকিরণ করিতে পারে, অর্থাৎ একটি ইলেক্‌ট্রন যখন এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গমন করে, তখনই বর্ণাসনে নূতন রেখা ফুটিয়া উঠে। সাদা কথায়, ইলেক্‌ট্রনের কক্ষান্তরে গমনই বিশ্লিষ্ট বর্ণাসনে নব রেখার উৎপত্তির কারণ। ইলেক্‌ট্রনের কক্ষান্তর গমনে হয় শক্তি মুক্ত হইয়া

পরমাণুর বাহিরে আসিবে, নয় শক্তি পরমাণুর মধ্যে শুষিয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক কক্ষ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কোয়ান্‌টম্ (শক্তির পরিমাণ মাত্রা) নির্দ্দেশ করে, কক্ষান্তরে গমনে যে শক্তি মুক্ত বা বিলীন হইবে, সে শক্তি, পরমাণু নিঃসৃত আলোক-দোলন সংখ্যাকে (light frequency) কক্ষদ্বয়ের কোয়ান্‌টম্ সংখ্যার বিয়োগফল দ্বারা গুণ করিলে যে গুণফল পাওয়া যাইবে, তাহার সহিত সমান। ইলেক্‌ট্রন যখন ১-কোয়ান্‌টম্ কক্ষ হইতে ২-কোয়ান্‌টম্ কক্ষে যাইবে, তখন বর্ণাসনে একটি রেখা দেখা দিবে ; আবার যখন ইলেক্‌ট্রন্ ২-কোয়ান্‌টম্ কক্ষ হইতে ৩-কোয়ান্‌টম্ কক্ষে যাইবে, তখন বর্ণাসনে অপর একটি রেখা পাওয়া যাইবে ; এইরূপে ৩ কোয়ান্‌টম্ কক্ষ হইতে ৪ কোয়ান্‌টম্ কক্ষ, ৪ কোয়ান্‌টম্ কক্ষ হইতে ৫ কোয়ান্‌টম্ ইত্যাদি কক্ষে গমন হেতু বর্ণাসনে এক একটি নূতন নূতন পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং ইলেক্‌ট্রনের কক্ষান্তর গমন হেতু এক প্রস্ত রেখা বর্ণাসনে দেখিতে পাইব। বর সাহেবের কোয়ান্‌টম্-বাদ প্রয়োগ করিয়া হিলিয়ামের বিশ্লিষ্ট বর্ণাসনের প্রকৃত মর্ম্ম বেশ উপলব্ধি করা যায়। হিলিয়ামের বিশ্লিষ্ট বর্ণাসনে কয়েকটি রেখা দেখা যায়। ঐগুলিকে ভ্রমবশতঃ হাইড্রোজেন অস্তিত্বজ্ঞাপক রেখা বলিয়া অনুমান করা হইত। বামার ও রীড্‌গার প্রদর্শিত সূত্র প্রয়োগে (formula) এই রেখাগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, এবং যুক্তির মধ্যে কোথায় যেন গলদ রহিয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। বর সাহেব অকাট্য যুক্তিবলে দেখাইলেন যে এই রেখাগুলি হিলিয়াম্-বর্ণাসনের চরিত্রগত লক্ষণ ; পরে যখন বিশুদ্ধ হিলিয়াম সংগ্রহ হইল, এবং তৎসাহায্যে উহার বিশ্লিষ্ট বর্ণাসন উৎপন্ন হইল, তখন উহাতে পূর্ব্বোক্ত রেখাগুলি দেখা গেল। সুতরাং ঐ রেখাগুলি যে হিলিয়াম বর্ণাসনের চরিত্রগত লক্ষণ ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

১৯১৫ সালে বর সাহেবের থিয়োরি সমারফেল্ড (sommerfeld) দ্বারা বেশ পরিপুষ্ট হইয়াছিল। কোপার্‌নিকাস্ (copernicus) প্রথম জগতে প্রচার করেন যে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বৃত্ত-কক্ষে ঘুরিতেছে। কয়েক বৎসর পরে কেপ্‌লার্ দেখাইলেন যে দূরবীক্ষণ-দৃষ্ট ঘটনাবলী গণনার সহিত বেশ মিলিয়া যায়, যদি গ্রহগণের কক্ষ-বৃত্ত না মনে করিয়া বৃত্তাভাষ (ellipse) মনে করা হয়। বর ও সমারফেল্ডের ধারণা কতকটা সেইরূপ। সমারফেল্ড দেখাইলেন যে বর-থিয়োরি অনুযায়ী গণনার মধ্যে যে সকল গলদ্ বা গোলমাল লক্ষিত হয়, সেগুলি একেবারে দূরীভূত হইবে যদি ভ্রাম্যমান্ ইলেক্‌ট্রনের কক্ষগুলি বৃত্ত (circle) না মনে করিয়া বৃত্তাভাষ (ellipse) মনে করা হয়।

মূল বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ। Relation of Elements among themselves.

ড্যাল্‌টনের মতে এক মূলবস্তুর পরমাণু-প্রকৃতি অপর মূলবস্তুর পরমাণু-প্রকৃতি অপেক্ষা বিভিন্ন ; অর্থাৎ যতগুলি মূলবস্তু আছে ততগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির পরমাণু আছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে জানা মূলবস্তুর সংখ্যা ছিল মাত্র ত্রিশটি। উক্ত শতাব্দীর শেষে যখন বায়ুমণ্ডলস্থ দুষ্প্রাপ্য গ্যাসগুলির ও সিরিয়াম্ (cerium) শ্রেণীর ধাতুগুলির আবিষ্কার হইল—তখন মূলবস্তুর সংখ্যা হইল ৮০ ; আর আজ কাল মূলবস্তুর সংখ্যা হইল ৮৭ ; (সম্প্রতি

আর ছুটি মূলবস্তুর আবিষ্কারের কথা শুনা যাইতেছে; উহাদের আবিষ্কারক অধ্যাপক নোডাক্ (Noddack) ও হেরোভস্কী (Heyrovsky)। মূলবস্তুর প্রধান চরিত্রগত ধর্ম্ম হইল তাহার পরমাণু-ওজন। রসবিৎগণ (chemists) ক্রমোচ্চ পরমাণু-ওজন অনুসারে মূল বস্তুগুলিকে সাজাইতেন। গোড়ায় হাইড্রোজেনকে রাখিতেন (পরমাণু-ওজন সংক্ষেপে পঃ ওঃ=১·০০৮) ও শেষে ইউরেনিয়ামকে রাখিতেন (পঃ ওঃ=২৩৮·২)। রুশীয় রাসায়নিক মেণ্ডেলিফ Mendelejeff) মূল বস্তুগুলিকে পূর্ব্বোক্ত প্রথায় সর্ব্বপ্রথম সাজান। এইরূপে মূলবস্তু সাজাইবার প্রণালীকে "**সাময়িক বা পিরিয়ডিক্ প্রথা**" বলা হয়। এইরূপে সাজাইয়া দেখা গেল যে, প্রথম, নবম ও সপ্তদশ ইত্যাদি স্থানগত মূল বস্তুগুলির ধর্ম্ম অনেকটা এক রকমের। এই শ্রেণীর (series) কিছু দূর অগ্রসর করিয়া আবার মূলবস্তুর ধর্ম্ম ফিরিয়া আসে বলিয়া এইরূপে সাজান প্রথাকে সাময়িক বা পিরিয়ডিক্ (periodic) বলে। যেমন ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আইয়োডিন—ইহাদের রাসায়নিক ধর্ম্ম এক। লিথিয়াম্, সোডিয়াম্, পোটাসিয়াম্, রুবিডিয়াম্ প্রভৃতি ধাতুগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি এক। মেণ্ডেলিফ্ প্রস্তাবিত সাজান প্রথা আলোচনায় দেখা যায় যে, কোন নির্দ্দিষ্ট মূলবস্তুর ধর্ম্মাবলি ছুই পার্শ্বস্থ মূলবস্তুদ্বয়ের ধর্ম্মাবলীর মাঝামাঝি। এইরূপে বিচার করিয়া মেণ্ডেলিফ্ যে মূলবস্তু তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই তাহার গুণ ও ধর্ম্ম পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া দিয়াছিলেন; এবং পরে যখন সেই মূলবস্তু আবিষ্কৃত হইল, তখন উহার গুণাগুণ মেণ্ডেলিফ্ বর্ণিত গুণাগুণের সহিত সম্পূর্ণ মিল হওয়ায় জগৎ বিস্মিত হইয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন মূলবস্তুর পরমাণু-ওজন কোন নিয়ম অবলম্বন করিয়া বাড়ে না; কাজেই তাহাদের গুণাগুণ পরমাণু-ওজনের বৃদ্ধির অনুপাতে পরিবর্ত্তন হয় না। সাময়িক বা পিরিয়ডিক্ প্রথায় আরও কয়েকটি দোষ আছে।

১৯০৫ সালে বার্কলা দেখিলেন যে, যখন কোন মূলবস্তুর উপর ক্যাথোড্ বা অজানা রশ্মি আসিয়া পড়ে, তখন সেই মূলবস্তু হইতে নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট অজানা রশ্মি (X-rays) বিচ্ছুরিত হয়; অর্থাৎ অজানা রশ্মি মাত্রেরই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক নহে, বিভিন্ন। প্রত্যেক মূলবস্তু ক্যাথোড্ রশ্মি দ্বারা উত্তেজিত হইলে অজানা রশ্মি বিচ্ছুরিত করে বটে, কিন্তু প্রত্যেক মূলবস্তু নিঃসৃত অজানা রশ্মি অপর মূলবস্তু নিঃসৃত অজানা রশ্মি হইতে বিভিন্ন; তাহাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সমান নহে; কোনটি অপেক্ষাকৃত ছোট, কোনটি অপরের তুলনায় বড়। কিন্তু একই মূলবস্তু সদাই একই রকম অজানা রশ্মি নিঃসরণ করিতে থাকে। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, অজানা রশ্মির প্রকৃতি মূলবস্তুর প্রকৃতি ও তাহার রাসায়নিক গুণের উপর নির্ভর করে। নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট অজানা রশ্মি বিচ্ছুরণ ধর্ম্মটি মূলবস্তুর পরমাণুর প্রকৃতিগত ধর্ম্ম; অপর মূলবস্তুর অবস্থিতিতে ইহার কোন ব্যত্যয় দেখিতে পাওয়া যায় না।

ক্যাথোড্ রশ্মি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মূলবস্তুগুলি যে সকল অজানা রশ্মি বিচ্ছুরণ করে, সেগুলির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যন্ত্রপরীক্ষা দ্বারা স্থির করিবার প্রথম প্রয়াস পান মস্‌লি সাহেব। তিনি বিভিন্ন মূলবস্তু নিঃসৃত অজানা রশ্মি বা বিকিরণের ফটোগ্রাফ তুলিয়া লন; তারপর

সেই সকল ফটোগ্রাফ তুলনা করিতে বসেন। ফলে তিনি এক অদ্ভুত আবিষ্কার করিয়া বসেন। তিনি দেখিলেন যে, এই সকল অজানা রশ্মির ফটোগ্রাফগুলি ১, ২, ৩, ৪...... প্রভৃতি স্বাভাবিক সংখ্যানুযায়ী সাজাইতে পারা যায়। যে মূলবস্তু অপেক্ষাকৃত ভারী সে মূলবস্তু নিঃসৃত অজানা রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও বড়। মূলবস্তু নিঃসৃত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এমন সুন্দর নিয়মে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হয় যে, প্রত্যেক অবচ্ছেদ (gap) দ্বারা এক একটি মূলবস্তুর অভাব বা অনুপস্থিতি ধরিতে পারা যায়। প্রত্যেক মূলবস্তুর পরমাণু মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন্ থাকে। এই ইলেক্‌ট্রন্ সংখ্যাও সেই মূলবস্তু নিঃসৃত অজানা রশ্মির আন্দোলন-সংখ্যার বর্গমূল লইয়া যদি ঘর কাটা কাগজে রেখাপাত করা যায় (plotting a graph) তবে দেখা যায় যে অঙ্কিত রেখাটি একটি সরল রেখা মাত্র। এই রেখাস্থ প্রত্যেক ব্যবচ্ছেদ একটি মূলবস্তুর অভাব সূচনা করে, এবং আমরা আরও দেখিতে পাই যে মেণ্ডেলিফ্ প্রস্তাবিত মূলবস্তু সাজান প্রথা যে সকল দোষে দুষ্ট ছিল, পূর্ব্বোক্ত সাজান প্রথায় সে দোষগুলি আপনা হইতেই সংশোধিত হইয়া যায়। মস্‌লি প্রস্তাবিত সাজান প্রথাকে মূলবস্তুগুলির **স্বাভাবিক সন্নিবেশ** বলা হয়। এই স্বাভাবিক সন্নিবেশে ৯২টি আসন আছে; ১ নং আসন হাইড্রোজেন ও ৯২ নং আসন ইউরেনিয়াম অধিকার করে; ইহার ৪৩ নং, ৬১ নং, ৭৫ নং, ৮৫ নং ও ৮৭ নং আসন শূন্য আছে, তাহাতে কে কে বসিয়া আছেন এখনও জানা যায় নাই; সুতরাং এই পাঁচটি মূলবস্তুর এখনও আবিষ্কার হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে।

এই স্বাভাবিক সন্নিবেশস্থ এক আসন দর্শিত মূলবস্তু হইতে পরস্থ আসন দর্শিত মূলবস্তুতে যাইতে হইলে দেখিতে পাই যে কেন্দ্রস্থ যোগাত্মক-তড়িৎ একমাত্রা বা এক ইউনিট বাড়ে এবং কেন্দ্রস্থ যোগতড়িতের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যাও এক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। সহজ বোধের জন্য মূলবস্তুর স্বাভাবিক সন্নিবেশ চক্র পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

মূলবস্তুর স্বাভাবিক সন্নিবেশ চক্রে একটি বেশ মজার জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে; উহাতে ছয়টি মূলবস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের ব্যবহার "ভারত ছাড়া" অর্থাৎ অন্য কোন মূলবস্তুর সহিত উহাদের ব্যবহার মেলে না। উহাদিগকে নিশ্চেষ্ট গ্যাস (inert gas) বলে। এই ছয়টির মধ্যে পাঁচটিকে বায়ুমণ্ডল হইতে পাওয়া গিয়াছে; উহাদের নাম হিলিয়াম্, নীয়ন্, আর্‌গন্, ক্রুপ্টন ও জীনন্। ষষ্ঠ বস্তুর নাম ইমানেসন। রেডিয়াম্ হইতে এক প্রকার গ্যাস নিঃসৃত হয়, তাহাকে ইমানেসন্ বলে। এই ছয়টি মূলবস্তু কোন মূলবস্তুর সহিত রাসায়নিক যোগে মেশে না; ইহাদের পরমাণু-সংখ্যা যথাক্রমে ২, ১০, ১৮, ৩৬, ৫৪; ও ৮৬ (পরপৃষ্ঠার চক্রে দেখ)।

নব্য পরমাণুবাদ অনুসারে রাসায়নিক-ক্রিয়া-সংঘটন ক্ষমতা (chemical activity) পরমাণুচয়ের যোগ ও বিয়োগ তড়িতের আকর্ষণ হইতেই জন্ম লাভ করে। একটি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে যত ইউনিট যোগ তড়িৎ থাকে (nucleus), তাহার চারিদিকে ঘূর্ণায়মান ততগুলি ইলেক্‌ট্রন্ থাকে। ইলেক্‌ট্রন্‌গুলি বিয়োগাত্মক তড়িৎ-খণ্ড মাত্র। সুতরাং প্রত্যেক পরমাণু সাম্য অবস্থায় থাকে। অতএব সাম্য অবস্থাতে পরমাণুচয়ের মধ্যে কখনও রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইতে পারে

মূলবস্তুগুলির স্বাভাবিক সন্নিবেশ চক্র। (Natural arragement of elements.)

সমষ্টি (Period)	১ ক	১ খ	২ ক	২ খ	৩ ক	৩ খ	৪ ক	৪ খ	৫ ক	৫ খ	৬ ক	৬ খ	৭ ক	৭ খ	৮ ক	৮ খ
শ্রেণী																
I	১H															২He
II	৩Li		৪Be		৫B		৬C			৭N		৮O		৯F		১০Ne
III	১১Na		১২Mg		১৩Al		১৪Si			১৫P		১৬S		১৭Cl		১৮A
	১৯K		২০Ca		২১Se		২২Ti		২৩V		২৪Cr		২৫Mn		২৬Fe, ২৭Co, ২৮Ni	
IV		২৯Cu		৩০Zn		৩১Ga		৩২Ge		৩৩As		৩৪Se		৩৫Br		৩৬Kr
	৩৭Rb		৩৮Sr		৩৯Y		৪০Zr		৪১Nb		৪২M॰		৪৩—		৪৪Rn, ৪৫Rh, ৪৬Pd	
V		৪৭Ag		৪৮Cd	৫৭—৭১ Rare Earths	৪৯In		৫০Sn		৫১Sb		৫২Te		৫৩I		৫৪Xe
	৫৫Cs		৫৬Ba				৭২Hf		৭৩Ta		৭৪W		৭৫—		৭৬Ox, ৭৭Ir, ৭৮Pt	
VI		৭৯Au		৮০Hg		৮১Tb		৮২Pb		৮৩Bi		৮৪Po		৮৫—		৮৬Em
VII	৮৭—		৮৮Ra		৮৯Ac		৯০Th		৯১Pa		৯২U					

না। যে পরমাণুতে কেন্দ্রস্থ যোগ-তড়িৎ অপেক্ষা ইলেকট্রন্ সংখ্যা বেশী বা কম থাকে সেই পরমাণু অপরের সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হইতে পারে। ইহা হইতে বেশ অনুমান করা যাইতে পারে যে, নিশ্চেষ্ট গ্যাসের পরমাণুগুলি দৃঢ় সাম্য অবস্থাগত হওয়ায় (অর্থাৎ যোগ ও বিয়োগ তড়িৎ-পরিমাণ সমান থাকায়) উহারা অন্য কোন পরমাণুর সহিত রাসায়নিক যোগে যুক্ত হয় না। উহারা এরূপ প্রবল সাম্য অবস্থাগত যে ঐ সকল পরমাণু হইতে ইলেকট্রন্ বিচ্যুতি বা সংস্থতি ঘটিতে পারে না।

নানা প্রকার সুযুক্তিপূর্ণ জল্পনা কল্পনার পর বর সাহেব উক্ত ছয়টি মূলবস্তুর পরমাণু মধ্যে ইলেকট্রন্ সমাবেশ নিম্নদত্ত চক্রে প্রকাশ করেন :—

মূলবস্তু	কক্ষসূচক কোয়ান্টম্ সংখ্যা ১	২	৩	৪	৫	৬	ইলেক্ট্রনের মোট সংখ্যা।
হিলিয়াম্	২						২
নীয়ন্	২	৮					১০
আরগন্	২	৮	৮				১৮
ক্রুপটন্	২	৮	১৮	৮			৩৬
জীনন্	২	৮	১৮	১৮	৮		৫৪
ইমানেসন্	২	৮	১৮	৩২	১৮	৮	৮৬

বেশ অনুধাবন করিয়া দেখিলে মনে হয় এই নিশ্চেষ্ট গ্যাসগুলিকে আশ্রয় করিয়াই যেন মূলবস্তুগুলি সপ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে দুইটি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যেকটিতে আটটি, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর প্রত্যেকটিতে আঠারটি, ষষ্ঠ শ্রেণীতে বত্রিশটি মূলবস্তু বিন্যস্ত; সপ্তম শ্রেণীটি অসম্পূর্ণ (স্বাভাবিক সন্নিবেশ চক্র দেখ)।

মূলবস্তুর স্বাভাবিক সন্নিবেশ চক্রে হাইড্রোজেন প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রস্থানে এক মাত্রা বা ইউনিট যোগ-তড়িৎ বসিয়া আছে, আর উহার চারিদিকে একটি ইলেকট্রন্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; আর এই ঘূর্ণায়মান্ ইলেকট্রনের কক্ষব্যাস এইরূপ যে, আবর্তনসম্ভূত শক্তি এক কোয়ান্টম্। এরূপ কক্ষকে সাধারণতঃ ১ কোয়ান্টম্ কক্ষ বলা হয়। হিলিয়াম্ পরমাণুর মধ্যে দুটি ইলেকট্রন্ আছে; উভয়ই একই কক্ষে ঘুরিতেছে; এবং হাইড্রোজেনের ন্যায় এই কক্ষ=১ কোয়ান্টম্ কক্ষ। অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই কক্ষে দুটি অপেক্ষা অধিক ইলেকট্রন্ থাকিতে পারে না। তৃতীয় মূলবস্তু

লিথিয়ামের বেলায় ইলেক্‌ট্রন্ সমাবেশ ও তাহাদের কক্ষ কয়টিও কিরূপ—এখন দেখা যাক্। লিথিয়ামের পরমাণু মধ্যে ৩টি ইলেক্‌ট্রন্ আছে; দুইটি ১ কোয়ান্‌টম্ কক্ষে ঘুরিতেছে, অপরটি ২ কোয়ান্‌টম্ কক্ষে ঘুরিতেছে; অর্থাৎ তৃতীয় ইলেক্‌ট্রন্‌টি এমন ব্যাস বিশিষ্ট কক্ষে ঘুরিতেছে যে তাঁহার আবর্ত্তনসম্ভূত শক্তি = ২ কোয়ান্‌টম। বেরিলিয়াম্ পরমাণুর মধ্যে ৪টি ইলেক্‌ট্রন্ আছে, দুটী ১-কোয়ান্‌টম কক্ষে ঘুরিতেছে, অপর দুটি ২-কোয়ান্‌টম কক্ষে ঘুরিতেছে। ২-কোয়ান্‌টম কক্ষে ৮টি ইলেক্‌ট্রনের বেশী থাকিতে পারে না। সুতরাং বেরিলিয়ামের পর একটি একটি ইলেক্‌ট্রন্ বাড়িয়া নীয়নে যখন আসিল, তখন নীয়ন পরমাণুতে মোট ১০টি ইলেক্‌ট্রন্ আছে, দেখা যায়; তার মধ্যে ২টি ১-কোয়ান্‌টম কক্ষে ঘোরে, অপর আটটি ২-কোয়ান্‌টম কক্ষে ঘোরে; এখানে ২-কোয়ান্‌টম্ কক্ষ ইলেক্‌ট্রন পরিপূর্ণ—সে কক্ষে আর একটিও বেশী ইলেক্‌ট্রন্ ধরিতে পারে না (saturated with electrons)। নীয়নের পর যখন সোডিয়ামে পৌঁছাই, তখন দেখিতে পাই যে, ইহার পরমাণুমধ্যে ১১টি ইলেক্‌ট্রন আছে, দুইটি ১-কোয়ান্‌টম কক্ষে, আটটি ২-কোয়ান্‌টম কক্ষে ও একটি ৩ কোয়ান্‌টম কক্ষে ঘোরে; এখানে ৩-কোয়ান্‌টম কক্ষটি অসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ নয়, উহাতে যত ইলেক্‌ট্রন ধরিতে পারে, তাহা নাই, খালি স্থান পড়িয়া আছে, ইহাতে আরও ইলেক্‌ট্রন ধরিতে পারে। আরও মজার কথা এই যে, সোডিয়ামের ধর্ম্ম ও লিথিয়ামের ধর্ম্মের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ৩-কোয়ান্‌টম কক্ষে যেমন একটি একটি ইলেক্‌ট্রন বাড়িবে, তেমনি ম্যাগ্‌নেসিয়াম্, এলুমিনিয়াম্ প্রভৃতি নব নব মূলবস্তু দেখা দিবে। এইরূপে আর্‌গন (Argon) আসিয়া এই শ্রেণী পূর্ণ করিবে। সুতরাং আর্‌গন্ পরমাণুতে ১৮টি ইলেক্‌ট্রন থাকিবে—দুটি ১-কোয়ান্‌টম কক্ষে, আটটি ২-কোয়ান্‌টম কক্ষে, আটটি ৩-কোয়ান্‌টম কক্ষে। আর্‌গনে আসিয়া তৃতীয় শ্রেণী শেষ হইল। তার পর পোটাসিয়াম হইতে চতুর্থ শ্রেণী আরম্ভ হইবে। এই শ্রেণীর ইলেক্‌ট্রন সমাবেশ বড় চমকপ্রদ। কেবল মাত্র যে ৪ কোয়ান্‌টম কক্ষে এক একটি ইলেক্‌ট্রন বাড়িতে থাকিবে তা নয়, ৩ কোয়ান্‌টম কক্ষেও এক একটি ইলেক্‌ট্রন বাড়িবে। এই রূপে এই শ্রেণীতে ১৮টী মূলবস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর পঞ্চম শ্রেণী। ক্রুপ্‌টনের পর হইতে জীনন্ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর অন্তর্গত। রুবিডিয়াম্ হইতে ৫-কোয়ান্‌টম কক্ষে ইলেক্‌ট্রন ঘুরিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীস্থ মূলবস্তুর পরমাণুগত ইলেক্‌ট্রন সংখ্যার ব্যাখ্যা করা হয়। মোট কথা ৭ টার বেশী আর কক্ষ নাই।

পরমাণুর কেন্দ্রে কেবলমাত্র যোগ-তড়িতের অধিষ্ঠান ইহাই প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু সক্রিয় মূলবস্তু (Radio active elements) ভাঙিয়া যাওয়া সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সকল গবেষণাপূর্ণ তথ্য বাহির হইয়াছে, সেই সকল পাঠে জানা যায় যে পরমাণুর কেন্দ্রস্থানে যোগাত্মক ও বিয়োগাত্মক উভয়বিধ তড়িৎ অবস্থান করে। যোগাত্মক তড়িতের ভাগ বিয়োগাত্মক তড়িতের ভাগ অপেক্ষা অধিক থাকায় কেন্দ্রে কেবলমাত্র যোগ-তড়িৎ ছিল বলিয়া মনে হইত। বিয়োগ-তড়িৎ সম সংখ্যক যোগ-তড়িতের সহিত মিশিয়া সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায়, বাড়্‌তি যোগ-তড়িৎ (surplus positive charge) কেন্দ্রে আছে বলিয়া ভ্রম হইত। কেন্দ্রস্থ যোগ ও বিয়োগ তড়িৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ারই অপর নাম আল্‌ফা ও বিটা রশ্মির নিঃসরণ (α and β-rays)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দুই ইউনিট্ যোগ-তড়িৎযুক্ত হিলিয়াম্ পরমাণুর নাম আল্‌ফা কণা। সু... কোন পরমাণু হইতে এক একটি আল্‌ফা কণা বিচ্ছুরণ হইলে উহার কেন্দ্রস্থ তড়িৎসমষ্টি হইতে দুই ইউনিট্ যোগ-তড়িৎ কমিয়া যাইবে; কাজেই দুটি ইলেক্‌ট্রন্ কক্ষচ্যুত হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। হিলিয়ামের পরমাণু-ওজন ৪। একটি আল্‌ফা কণা বিচ্ছুরণের ফলে দাঁড়াইল এই যে পরমাণু-সংখ্যা হইতে ২ কমিয়া গেল (কারণ, পরমাণু-সংখ্যা মানে উহার মধ্যস্থ ইলেক্‌ট্রন্-সংখ্যা, দুটি ইলেক্‌ট্রন্ চলিয়া গিয়াছে, কাজেই পরমাণু-সংখ্যা হইতে ২ কমিয়া গেল), আর পরমাণু-ওজন হইতে ৪-হিলিয়াম্ পরমাণুর ওজন কমিয়া গেল। এখন একটি বিটা কণা কেন্দ্র হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিদায় হইলে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ায় দেখা যাক্। আল্‌ফা কণার তুলনায় বিটা কণার ওজন কিছু নাই বলিলেও হয়। বিটা কণায় এক ইউনিট বিয়োগ-তড়িৎ সংশ্লিষ্ট থাকে। সুতরাং কোন পরমাণুর কেন্দ্র হইতে একটি বিটা কণা বিশ্লিষ্ট হইয়া বিচ্ছুরিত হইলে কেন্দ্রে এক ইউনিট্ যোগ-তড়িৎ মুক্ত হইয়া পড়িবে (কেননা, বিটা কণাস্থ এক ইউনিট্ বিয়োগ-তড়িৎ এক ইউনিট্ যোগ-তড়িতের সহিত মিশিয়া সাম্যভাবে ছিল, বিটা কণার সহিত বিয়োগ-তড়িৎ চলিয়া গেলে যোগ-তড়িৎ মুক্ত হইল); কাজেই এই কেন্দ্রস্থ মুক্ত যোগ-তড়িৎ বাহির হইতে আর একটি ইলেক্‌ট্রন্‌কে টানিয়া আনিয়া কোন একটি কক্ষে আটকাইয়া রাখিবে; সুতরাং ইহার পরমাণু-সংখ্যা ১ বাড়িয়া যাইবে।

উপস্থিত জানা গিয়াছে যে সক্রিয় পদার্থের মধ্যে দুই রকম রূপান্তর স্বাধীনভাবে সংঘটিত হইতেছে। একটির আরম্ভ ইউরেনিয়াম্ হইতে, অপরটির আরম্ভ থোরিয়াম হইতে। ইউরেনিয়াম্ হইতে আরম্ভ করিয়া কিরূপে রূপান্তর সাধিত হইতেছে নিম্নলিখিত চক্রে তাহাই দেখান হইল; বন্ধনীগত আল্‌ফা বা বিটা কণা পরমাণুর কেন্দ্র হইতে আল্‌ফা বা বিটা কণা চলিয়া গিয়াছে :—

নাম		পরমাণু-সংখ্যা		পরমাণু-ওজন
ইউরেনিয়াম ১	...	৯২	...	২৩৮
| (আল্‌ফা)				
ইউরেনিয়াম X_1	...	৯০	...	২৩৪
| (বিটা)				
ইউরেনিয়াম X_2	...	৯১	...	২৩৪
(বিটা)				
ইউরেনিয়াম ২	...	৯২	...	২৩৪
| (আল্‌ফা)				
আইয়োনিয়াম্	...	৯০	...	২৩০
| (আল্‌ফা)				
রেডিয়াম্	...	৮৮	...	২২৬
| (আল্‌ফা				
ইমানেসন্	...	৮৬	...	২২২

ইমানেসন্				
(আল্‌ফা)				
রেডিয়াম্ A	...	৮৪	...	২১৮
(আল্‌ফা)				
রেডিয়াম্ B	...	৮২	...	২১৪
(বিটা)				
রেডিয়াম্ C	...	৮৩	...	২১৪
(বিটা)				
রেডিয়াম্ C_1	...	৮৪	...	২১৪
(আল্‌ফা)				
রেডিয়াম্ D	...	৮২	...	২১০
(বিটা)				
রেডিয়াম্ E	...	৮৩	...	২১০
(বিটা)				
পোলোনিয়াম্	...	৮৪	...	২১০
(আল্‌ফা)				
সীসা (Lead)	...	৮২	...	২০৬

উপরি-দত্ত চক্র আলোচনায় দেখা যায় যে অনেক মূলবস্তুর পরমাণু-ওজন এক, কিন্তু পরমাণু-সংখ্যা আলাদা। বস্তুর রাসায়নিক ধর্ম্ম সর্ব্বথাহিঃস্থ কক্ষস্থিত ইলেক্‌ট্রন্ সংখ্যার উপর নির্ভর করে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মূলবস্তুর পরমাণু-ওজন এক হইলেও পরমাণু সংখ্যা (ইলেক্‌ট্রন্ সংখ্যা) বিভিন্ন বলিয়া তাহাদের রাসায়নিক ধর্ম্মও বিভিন্ন। মেণ্ডেলিফ্ প্রস্তাবিত মূলবস্তু-সন্নিবেশ প্রণালীর গলদ্ এখানে আমরা বুঝিতে পারি। পরমাণু-ওজন এক, অথচ তাহাদের ধর্ম্ম বিভিন্ন, মেণ্ডেলিফ্ ইহার কারণ দর্শাইতে পারেন নাই। কিন্তু পরমাণু-সংখ্যা-বাদ (Theory of atomic number) উহার কারণ চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছে, বস্তুর ধর্ম্ম পরমাণু-ওজনের উপর নির্ভর করে না, পক্ষান্তরে ইহা পরমাণুর কেন্দ্রস্থ যোগ-তড়িতের উপর নির্ভর করে; অপর কথায়, কেন্দ্রের চতুঃপার্শ্বস্থ বিয়োগাত্মক তড়িৎ-সংশ্লিষ্ট ইলেক্‌ট্রন্ সংখ্যার উপর নির্ভর করে। পরমাণু-ওজন কেন্দ্রস্থ আল্‌ফা কণার সংখ্যার উপর নির্ভর করে, আর ইহার পরমাণু-সংখ্যা কেন্দ্রস্থ বিটা কণা অপেক্ষা আল্‌ফা কণা যত বেশী তাহার উপর নির্ভর করে।

যে সকল বস্তুর পরমাণু-ওজন বিভিন্ন, কিন্তু পরমাণু-সংখ্যা এক, তাহাদের রাসায়নিক ধর্ম্ম সমান। এই সকল মূলবস্তু "স্বাভাবিক সন্নিবেশ চক্রে" একই স্থান অধিকার করিবে। এই সকল মূলবস্তুকে "আইসোটোপ্" বলে (Isotopes—Isos=same, topos=place)। সাধারণ বিশ্লেষণী প্রথা দ্বারা তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না। কারণ, সাধারণ বিশ্লেষণী প্রথাগুলি রাসায়নিক ধর্ম্মের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। এখন মূলবস্তুর সংজ্ঞা (definition) নিম্নলিখিত বাক্যে প্রকাশ করা যাইতে পারে :—যে সকল বস্তুর পরমাণু-মধ্যে কেন্দ্রের চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান সম সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন্ আছে, কিন্তু পরমাণু-ওজন বিভিন্ন, এইরূপ পরমাণু-মিশ্রণকে মূলবস্তু বলা হয়।

এ্যাষ্টন্ (Aston) প্রমুখ বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণু গঠন সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা করিয়াছেন, ঐ সকল হইতে বেশ বোঝা যায় যে, যাহাদের আমরা সাধারণতঃ মূলবস্তু বলি, তাহারা অধিকাংশই বিভিন্ন ওজনের পরমাণু মিশ্রণে গঠিত। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঐ সকল পরমাণু-ওজন পূর্ণ অঙ্কও রাশি, জটীল ভগ্নাংশ নহে। ইহার কারণ এখনও জানিতে পারা যায় নাই। তবে এ সম্বন্ধে যত গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান হইতেছে, ততই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতেছে যে, আল্‌ফা ও বিটা কণার সংযোগে যাবতীয় জড় গঠিত।

সোডা প্রস্তুতের ইতিহাস

অধ্যাপক শ্রীআনন্দকিশোর দাশগুপ্ত

দেশের ধন সম্পদ বাড়াইতে হইলে ব্যবসায় বাণিজ্য চাই; আবার ব্যবসায় কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ করিতে হইলে বিজ্ঞান চর্চ্চা আবশ্যক। ব্যবসায়গুলি কতটা পরস্পরের মুখাপেক্ষী এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলি কতটা তাহাদের সহায়তা করে এই সব বিষয় একটু আভাস দিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। ব্যবসায় ও ব্যবসাদী দেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা ও সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতির উপর কতটা নির্ভর করে, তাহাও গৌণ ভাবে প্রবন্ধের বিষয়ীভূত বটে। স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা জিনিষ পত্রের মূল্যের হার কমাইতে কতটা সাহায্য করে এবং আইন প্রণয়ন বা অন্যান্য উপায়ে যাহারা ইহাতে বাধা দেন তাহারা কতটা জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতির কারণ হন, তাহাও হয়ত কিছু সুস্পষ্ট হইবে। শিল্পব্যবসায়ের উন্নতির জন্য প্রত্যেক অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া চাই। আবর্জ্জনার সদ্ব্যবহার করিয়া কিরূপে ব্যবসা নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা পাইল, ইহার ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক বটে।

সাবান আবিষ্কারের পূর্ব্বে বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্য ক্ষার ব্যবহৃত হইত। কোন কোন দেশে অদ্যাপি ঐ প্রথা প্রচলিত আছে। এই ক্ষার উদ্ভিদ্ হইতে প্রস্তুত হয়। কোথাও কোথাও ক্ষারের খনিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই ক্ষারকে ইংরাজিতে Potash কহে। উদ্ভিদ্ কোন পাত্রে রাখিয়া পুড়াইলে ঐ পাত্রের নিম্নে যে ছাই (ash) জমে তাহারই নাম Potash বা ক্ষার। Potash হইতেই Soda-ash নামেরও উৎপত্তি। Potassium Carbonate (K_2CO_3) কে Potash এবং Sodium Carbonate কে Soda-ash কহে। পূর্ব্বে Potash কথাটাই অনেকস্থলে উভয়ের বদলে প্রযোজ্য ছিল।

যখন সাবান ও কাচ নির্ম্মাণ-কৌশল রাসায়নিকগণ আয়ত্ত করিলেন, তখন দেখা গেল যে উভয়ের জন্যই প্রভূত পরিমাণ Soda বা Potash দরকার। এত ক্ষার জোগাইতে গিয়া ফ্রান্স ইংলণ্ড

প্রভৃতি সভ্য দেশের উদ্ভিদ্‌-রাজ্য ক্রমেই ক্ষয় পাইতে লাগিল। তখন তাহারা কানাডা ইজিপ্ট প্রভৃতি উপনিবেশ হইতে ক্ষার সংগ্রহ করিত। সেই সেই দেশে উদ্ভিদ্ বা খনি হইতে বহু ক্ষার উৎপন্ন হইত বটে।

কিন্তু ১৭৫৬—১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী (seven years' war) যুদ্ধের ফলে যখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স হইতে একে একে কানাডা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি উপনিবেশ সকল জয় করিয়া নিল, এবং ক্রমে ফ্রান্সের সামুদ্রিক ক্ষমতাও খর্ব্ব করিল, তখন ফরাসী বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় বুঝিতে পারিল, দেশের অত্যাবশ্যক দ্রব্যসম্ভারের জন্য উপনিবেশের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; স্বাবলম্বী হইতে হইবে, নিজের দেশে যথাসম্ভব ঐ সকল দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবিত করিতে হইবে। সেই সময় ফ্রান্সের বিজ্ঞান সভার (French Academy) অগ্রগণ্য ছিলেন ল্যাভসিয়র, প্রাউষ্ট, লাপ্লাস, বার্টলো প্রমুখ জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ। ইঁহাদের প্ররোচনায় ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সোডা তৈয়ারের নূতন পন্থা আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার দেওয়া স্থির করিল এবং ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই লবণ হইতে সোডা তৈয়ারের সুলভ পন্থা আবিষ্কারককে ১২০০০ পাউণ্ড (১,৮০,০০০, টাকা) পুরস্কার দিবে বলিয়া ঘোষণা করিল। ইহার ফলে ১৭৯১ খ্রীঃ লাব্লাঙ্ক নামক জনৈক ফরাসী বহু যত্ন ও চেষ্টার ফলে একটী উপায় উদ্ভাবিত করিলেন। যে প্রাণান্ত পরিশ্রম ও বিপুল অধ্যবসায়ের ফলে তিনি উপায়টী আবিষ্কার করিলেন, পুরস্কারের অর্থ পাইলে তাহা কার্য্যকরী করিবেন মনে মনে এইরূপ আশা পোষণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সেই সময় ফরাসীদেশের আভ্যন্তরীন অবস্থা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিপ্লবের সূচনা হইল—সেই ভীষণ বিপ্লবের প্লাবনে স্বয়ং সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীকেও ভাসাইয়া নিল। তখন কোথায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, আর কোথায় বা পুরস্কার! ফরাসীগণতন্ত্রে বৈজ্ঞানিকের স্থান নাই" এইরূপ দম্ভ করিয়া "মানব সমাজের তথাকথিত বন্ধুগণ" যখন আধুনিক রসায়নের জন্মদাতা স্বয়ং ল্যাভসিয়রকেই হত্যা করিল, তখন লাব্লাঙ্কের পুরস্কার লাভ সুদূরপরাহত। এমন কি Duke of Orleans হইতে ধার করা অর্থে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার কারখানাটী পর্য্যন্ত মৈত্র ও স্বাধীনতার বন্ধুগণ বাজেয়াপ্ত করিল। তখন ক্ষোভে দুঃখে তিনি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন—তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল—এবং অবশেষে ১৮০৬ খ্রীঃ পাগলা গারদে আত্মহত্যা করিয়া জীবনের অবসান করিলেন।

এদিকে ফ্রান্সের যখন এই অবস্থা, তখন ইংলণ্ড উত্তরোত্তর উন্নতির স্তরে আরোহণ করিতে লাগিল। বিবিধ প্রকার দেশহিতকর আইন প্রণয়ন হইতে লাগিল। ১৮২৩ খ্রীঃ লবণের শুল্ক উঠিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ১৮২৪ খ্রীঃ ইংলণ্ডের অন্তর্গত Muspratt অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম লাব্লাঙ্কের প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে সোডার কারখানা স্থাপিত হইল। ক্রমে এই ব্যবসা বিপুলাকার ধারণ করিল। যে সকল স্থানে কয়লা ও লবণ সহজলভ্য, সেই সকল প্রদেশে উহা ছড়াইয়া পড়িল। কারণ কয়লা ও লবণ সোডা প্রস্তুত প্রণালীর অন্যতম প্রধান উপকরণ বটে। আবিষ্কর্ত্তা নিজে

অনাহারে ও মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার প্রণালীর সহায়ে ইংরাজ ব্যবসায়িগণ কোটি কোটি মুদ্রা লাভ করিতে লাগিলেন। অদৃষ্টের এমনি পরিহাস! লাব্লাঙ্ক-উদ্ভাবিত সোডা প্রস্তুত প্রণালী ছিল এইরূপ। লবণকে সালফিউরিক এসিডে সিদ্ধ করিলে তাহা হইতে এক প্রকার গ্যাস নির্গত হইয়া যায়; আর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে কয়লা ও মার্ব্বল পাথর জাতীয় পদার্থ সহযোগে খুব উত্তপ্ত করিলে সোডা প্রস্তুত হয়।

কিন্তু সোডার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী আবর্জ্জনাও উৎপন্ন হয়; তাহার একটী অম্লরসাত্মক বায়বীয় পদার্থ; নাম Muriatic বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড আর একটী কৃষ্ণবর্ণ কঠিন পদার্থ নাম Calcium Sulphite or Black Ash. এই প্রকার আবর্জ্জনাকে তৎ তৎ ব্যবসায়ের Byproduct কহে।

Muriatic acid তীক্ষ্ণ অম্লপদার্থ; উহা যখন বাতাসের সঙ্গে কারখানার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িত, তখন চতুর্দ্দিক কুয়াসাচ্ছন্ন মনে হইত এবং তাহার তেজে চতুষ্পার্শ্বস্থ শস্যরাজি নষ্ট হইয়া যাইত এবং লৌহ নির্ম্মিত পদার্থ সমূহ যথা লোহার তালা, লোহার গরাদ ইত্যাদি সব মরিচা পড়িয়া অব্যবহার্য্য হইয়া যাইত। এই অনিষ্ট রোধ করিবার জন্য ব্যবসায়িগণ ৪৫০।৫০০ ফুট লম্বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিমনি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা আশা করিল যে এই চিমনির সাহায্যে অম্লপদার্থটী বহু উচ্চে দূর আকাশে ছড়াইয়া যাইবে—পৃথিবীর উদ্ভিদের বড় একটা অনিষ্ট করিবে না। কিন্তু তাহাতেও রক্ষা নাই। এই গ্যাস বায়ুরাশি হইতে ভারী; তাই উহা আবার নামিয়া আসিত এবং পূর্ব্বাপেক্ষাও বহুদূরব্যাপী ভূখণ্ডের শস্যরাশি বিনষ্ট করিত। ফলে কারখানার চতুষ্পার্শ্বস্থ লোক নালিশের পর নালিশ করিতে লাগিল। ব্যাপার এতদূর গড়াইল, যে জনৈক ব্যবসায়ী "ভাসমান যন্ত্র" নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্রবক্ষে সোডা প্রস্তুত জন্য প্যাটেণ্ট পর্য্যন্ত চাহিয়াছিল!

এই HCl গ্যাসটী বায়বীয় পদার্থ হইলেও উহার একটী ধর্ম্ম এই যে উহা জলে অতি সহজে শুষিয়া যায়। তাই অতঃপর ব্যবসায়িবৃন্দ উহাকে আকাশে ছড়াইতে না দিয়া জলে শুষিয়া লইতে আরম্ভ করিল। তাহাতে শস্যরাজি রক্ষা পাইল সত্য; কিন্তু বিপদ হইল মৎস্য সমূহের। কারণ এই জলীয় পদার্থ ফেলিবার ও ত স্থান চাই। ব্যবসায়ীগণ নিকটবর্ত্তী খাল বিল প্রভৃতির জলে উহা ফেলিতে আরম্ভ করিল। এই তীক্ষ্ণ অম্লরসাত্মক পদার্থের তেজে মৎস্য সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল এবং জল ও একেবারে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িল। চতুষ্পার্শ্বস্থ জনসমূহ ক্রমে ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিল—সময় সময় মারামারি পর্য্যন্ত হইতে আরম্ভ করিল। তখন গবর্ণমেণ্ট অনন্যোপায় হইয়া এক আইন বিধিবদ্ধ করিলেন যে, ব্যবসায়িবৃন্দ শতকরা ৯৫% অংশ গ্যাস শুষিয়া ফেলিবে এবং তাহা যেখানে সেখানে ফেলিতে পারিবে না।

সোডা চাই অথচ তাহার আনুষঙ্গিক আপদ বালাই চাই না। মাছ ধরিতে হইবে কিন্তু জল ছুঁইতে পাইবে না। আবদার বটে। অথচ উপায় নাই। একটা কিছু ব্যবস্থা করিতেই হইবে। ঘটনাচক্রে এক অপ্রত্যাশিত ভাবে এই আপদ দূরীকরণের এক ব্যবস্থা হইল।

জনসাধারণের আন্দোলনের ফলে ১৮৬১ খ্রীঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কাগজের শুল্ক (Paper tax)

তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। শুষ্ক উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই কাগজের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। পূর্ব্বে ছেঁড়া নেকড়া, ছেঁড়া কাগজ প্রভৃতি হইতেই কাগজ প্রস্তুত হইত কিন্তু তাহাতে সম্বুলান অসম্ভব হইল। কাগজ নির্ম্মাণের নব নব উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। খড়, কাঠের তন্তু, Esparto ঘাস ইত্যাদি কাগজ তৈয়ারের সরঞ্জাম জোগাইতে লাগিল। কিন্তু কাগজ তৈয়ারের পূর্ব্বে উহাদের (fibre) তন্তুগুলি শুভ্র করিয়া নিতে হইবে এবং তাহার জন্য ব্লিচিং পাউডার চাই। ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুত করণের জন্য chlorine বায়ু আবশ্যক; আর chlorine বায়ুর প্রধান উপকরণ HCl (হাইড্রোক্লোরিক এসিড)। কাজেই বহু HCl এর ডাক পড়িল। এত এসিড কোথায় পাওয়া যাইবে? কেন—এই যে সোডা প্রস্তুত প্রণালীর উদ্বৃত্ত HCl, যাহা নিয়া ব্যবসায়িগণ মহা বিভ্রাটে পড়িয়াছে—যাহার জন্য এত মারামারি কাটাকাটি, যাহার জন্য সরকার বাহাদুর আইন পর্য্যন্ত প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে—তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলেই হইল। উহাতে উভয় পক্ষেরই লাভ।

অতঃপর ব্লিচিং পাউডার এর জন্য HCl এসিড গ্যাস সম্পূর্ণরূপে শোষণ করা ব্যবসায়িবৃন্দের প্রধান চিন্তার কারণ হইল—কারণ উহার সাহায্যে ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুত করিয়া তাহারা যথেষ্ট পরিমাণ লাভবান ও হইতে পারিবে। আইনের ভয়ে তাহারা শতকরা ৯৫ অংশ শোষণ করিতে বাধ্য ছিল, কিন্তু অধুনা নিজের গরজে শতকরা ৯৯·২৭ অংশ পর্য্যন্ত শোষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই গ্যাসের উৎপাত হইতে জনসমূহ ও উদ্ধার পাইল।

কোথায় বা Alkali nuisance, আর কোথায় বা Repeal of Paper duty! অথচ একে অপরকে কতটা সহায়তা করিল। ব্যবসায়গুলি পরস্পরের সহিত এই ভাবেই সংবদ্ধ থাকে বটে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সোডা তৈয়ার করিতে দুইটী আবর্জ্জনা উৎপন্ন হয়। উহাদের একটী গ্যাস ও অপরটী কৃষ্ণবর্ণ কঠিন পদার্থ। এতক্ষণ আমরা গ্যাসটী নিয়াই ব্যস্ত ছিলাম; black ash বা কৃষ্ণবর্ণ ছাইকে উপেক্ষাই করিয়াছি। কাল জিনিষকে কে না উপেক্ষা করে! অথচ অবার বিপদের সময় ইহারও দরকার হয়।

কাগজের শুষ্ক উঠার সঙ্গে সঙ্গে HCl গ্যাসের একটী ব্যবস্থা হইল সত্য, কিন্তু black ashএর এখনও কোন সদ্গতি হয় নাই। কাজেই দিনের পর দিন উহারা কারখানার চতুষ্পার্শ্বে পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। কোন একটী কারখানার নিকটে ৪৫০ একর ভূমি এই আবর্জ্জনাতে আবৃত হইয়া পড়িল—তাহার উপরও রোজ যখন অনুমান ১০০০ টন আন্দাজ এই আবর্জ্জনা উৎপন্ন হইতে লাগিল, তখন ইহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যবসায়ীগণ চিন্তিত হইয়া পড়িল।

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। জল ও বায়ুর সংস্পর্শে উহা ক্রমে বিগলিত হইতে লাগিল এবং উহা হইতে H_2S নামক একপ্রকার বিষাক্ত দুর্গন্ধ বায়ু বিনির্গত হইতে লাগিল। "একৈকমেবানর্থায়, কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্।" এই নোংড়া আবর্জ্জনাস্তূপ এত দৃষ্টিকুৎসিত, যে উহা লোকচক্ষুর অন্তরালে নেওয়া দরকার। তাহাতে উহা বহু মূল্যবান জমি—যাহা সুশ্যামল শস্য ক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারিত,

তাহা আবৃত করিয়া রাখিল; তদুপরি আবার যখন বিষাক্ত বায়ুর বীভৎস সৌরভ (!) চারিদিকে ছড়াইতে লাগিল, তখন চতুষ্পার্শ্বস্থ জনসমূহ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অথচ উপায় কি? এই আবর্জ্জনাস্তূপ কোথায় ফেলিবে? ব্যবসায়ীগণ উহা বিনামূল্যে বিতরণ করিতে প্রস্তুত—তবু কেহ নিতে চাহিল না।

বিপদের উপর বিপদ। এতকাল সোডা তৈয়ারের লাব্লাঙ্ক প্রণালীই একমাত্র প্রণালী ছিল। কিন্তু ১৮৬৩ খ্রীঃ সল্ভ্যা নামক জনৈক ইংরেজ সোডা প্রস্তুতের এক নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত করিল। উহা একে আবর্জ্জনাশূন্য, তাহাতে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তাহার উপর আবার দরেও সস্তা। লাব্লাঙ্ক সোডার দাম ছিল টন প্রতি ১৩ পাউণ্ড। সল্ভ্যা সোডার দাম হইল মাত্র ৫ পাউণ্ড।

এবার লাব্লাঙ্কের দল প্রমাদ গণিল। কে তাহাদের সোডা কিনিবে? তারপর যতদিন লাব্লাঙ্ক প্রণালী ছাড়া সোডা তৈয়ারের আর উপায়ান্তর ছিল না, ততদিন সকলেই উহার সহিত সংশ্লিষ্ট দুঃখকষ্ট এক রকম করিয়া সহ্য করিয়াছে। কিন্তু এখন আর কেন করিবে! জনমত নানা কারণেই ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইতে লাগিল।

অথচ ব্যবসায়িবৃন্দ কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রার মূলধন এই কারবারে খাটাইতেছে—এখন যে সব যাওয়ার পথে—উহারা যে পথের ভিখারী হইবে।

অনন্যোপায় হইয়া ব্যবসায়িগণ রসায়নবিদের শরণাপন্ন হইল—যদি তাহারা ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারে। পরীক্ষার ফলে রাসায়নিকগণ ইহা হইতে গন্ধক বাহির করার কয়েকটী সহজ উপায় আবিষ্কার করিলেন।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছি, লবণ হইতে সোডা তৈয়ারের পক্ষে সালফিউরিক এসিড অন্যতম প্রধান উপকরণ। গন্ধক সাহায্যে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে পয়সা দিয়া গন্ধক ক্রয় করিতে হইত। এখন black ash নামক আবর্জ্জনা হইতে উহা উদ্ধার হইতে লাগিল। মাছের তেল দিয়াই মাছ ভাজিবার ব্যবস্থা হইল। কাজেই ব্যবসায়ীদের মস্ত এক খরচ আংশিক ভাবে বাঁচিয়া গেল। অতঃপর Byproduct Muriatic acid হইতে ব্লিচিং পাউডার এবং black ash হইতে গন্ধক আহরণ করিয়া লাব্লাঙ্ক প্রথার অনুবর্ত্তী ব্যবসায়িগণ সল্ভ্যা প্রণালীর ন্যায় অল্পমূল্যে সোডা বিক্রীর ক্ষতিপূরণ করিতে লাগিল। যে HCl ও black ash তাহাদের এত দুঃখের কারণ হইয়াছিল, তাহারাই আবার লাব্লাঙ্ক প্রণালীর ত্রাণকর্ত্তা হইল। আবর্জ্জনারাশির জয় জয়কার।

এখন HCl শোষণজন্য আইনের দরকার নাই এবং black ash এর দুর্গন্ধ ও বায়ুসমুদ্রে ভাসমান হইতে পারে না। যাহাতে বিন্দুমাত্রও আবর্জ্জনা নষ্ট না হইতে পারে, ব্যবসায়িবৃন্দ তদ্বিষয়ে যত্নবান হইলেন। আসলের চাইতে সুদের মায়া বাড়িয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বে সল্ভ্যা সাহেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি সোডা প্রস্তুতের এক নূতন প্রণালীর আবিষ্কারক। এস্থলে তদুদ্ভাবিত প্রণালীর একটু আলোচনা আবশ্যক।

Smelling salt, Baking Powder ইত্যাদির নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। উহাদিগের রাসায়নিক নাম Ammonium Carbonate। যদি লবণাক্ত জল উহার সংস্পর্শে আসে তবে এতদুভয়ের সংমিশ্রণে সোডা প্রস্তুত হয়। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াটী সাধারণের জানা থাকিলেও উহাকে ব্যবসায় হিসাবে কার্য্যকরী করিয়াছিলেন সল্‌ভ্যা সাহেব। তাই প্রণালীটী তাঁহার নামে পরিচিত। তাঁহার প্রণালীটী এই :—

কিছুক্ষণ লবণাক্ত জলে Ammonium গ্যাস চালান হয়। গ্যাস জলে শুষিয়া Ammonical lime প্রস্তুত হয়। তারপর ইহাতে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস (under pressure) চালাইলে প্রথম পূর্ব্বোল্লিখিত Ammonium Carbonate হয় এবং লবণাক্ত জলে আছে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহা সোডা-bi-carb এ পরিণত হয়। তৎপর তাহাকে উত্তপ্ত করিলে বিশুদ্ধ সোডা প্রস্তুত হয়।

লাব্লাঙ্ক সোডার অনুপান ছিল (১) H_2SO_4 (২) লবণ (৩) মার্ব্বল পাথর ও (৪) কয়লা। এবং ঐ কারবারের আবর্জ্জনা ছিল Muriatic acid এবং Black Ash.

সল্‌ভ্যা সোডার অনুপান সমষ্টি হইল —(১) লবণাক্ত জল (২) Ammonia gas (৩) মার্ব্বল পাথর (CO_2 এর জন্য) ও (৪) কয়লা। ইহার আবর্জ্জনা হইল নিশাদল (NH_4Cl) ও CO_2। নিশাদল হইতে (NH_3) উদ্ধার করা সহজ; আবার CO_2, Ammoniaকে Carbonate করিতে দরকার—তাই বিশেষ কিছু অপচয় হয় না। সেজন্য সোডার মূল্য অনেক কম। তাহার উপর এই প্রণালীতে প্রস্তুত সোডা খুব বিশুদ্ধ। এ অবস্থায় লাব্লাঙ্ক সোডা তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে কেন? তাই যদিও লাব্লাঙ্ক কারবার মুখ্যতঃ সোডা প্রস্তুতের জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল, তবু অধুনা উহা প্রধানতঃ কষ্টিক সোডাই প্রস্তুত করে। সাবান তৈয়ারে উহাই বেশী উপযোগী। পূর্ব্বে বলিয়াছি সাবান ও কাচ তৈয়ারীতেই সোডার খুব ব্যবহার হয়। অধুনা দেখা গিয়াছে কাচ নির্ম্মাণে সোডার পরিবর্ত্তে Salt Cake (Na_2SO_4) ব্যবহার সুবিধা। আর এই Salt Cake, লাব্লাঙ্ক প্রণালীতে প্রথমেই প্রস্তুত হয় এবং উহাই ক্রমে মার্ব্বল পাথর ও কয়লা সহ উত্তপ্ত হইলে সোডাতে পরিণত হয়। তাই আজকালকার লাব্লাঙ্ক দল আর সোডার জন্য অপেক্ষা না করিয়া Salt Cake প্রস্তুত করিয়াই ছাড়িয়া দেয়—তাহাতে তাহাদের লাভ এই যে Salt Cake ও HCl উভয় পদার্থই কাজে লাগিয়া যায়।

(১) লাব্লাঙ্ক ও সল্‌ভ্যা প্রণালী দ্বারা প্রস্তুত সোডার আপেক্ষিক পরিমাণ :—

বৎসর	লাব্লাঙ্ক	সল্‌ভ্যা
১৮৮৪	৫,৪৫,৫০০ টন	১,৬৩,০০০ টন
১৯০৩	১,৫০,০০০ „	১৮,০০,০০০ „
১৯০৮	১,০০,০০০ „	১,৯০,০০০ „

(2) Electrolytic Chlorine হওয়া অবধি অধিকাংশ ব্লিচিং পাউডার উহা হইতেই প্রস্তুত হয়—লাব্লাঙ্কের HCl এর দরকার তাহাতে অনেক কমিয়াছে এবং কাজেই বিপদ বাড়িয়াছে।

(3) ক্যালিফোর্ণিয়াতে এক সোডার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাতে ২০,০০০,০০০—৫০,০০০, ০০০ টন সোডা সঞ্চিত আছে বলিয়া অনুমান। তদুপরি আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে (Lake Magadi in East Africa) এক প্রকাণ্ড সোডার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৯১১ সনে অনেক টাকা মূলধনে এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। তাহাতে ২০০×(১০)* টন পরিমাণ সোডা আছে বলিয়া বিশ্বাস। বলা বাহুল্য ইহাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লাব্লাঙ্ক এমন কি সল্‌ভ্যা প্রণালীর প্রভূত ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

জলপাইগুড়িনিবাসী নেপালীদিগের একটী ধর্ম্মমূলক বিশ্বাস

অধ্যাপক শ্রীশরৎ চন্দ্র মিত্র

২৬শে নবেম্বর ১৯০০ হইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯০১ পর্য্যন্ত প্রায় তিন মাস কাল আমি জলপাইগুড়ি সহরে অবস্থান করিয়াছিলাম। তথায় অবস্থান কালে নিম্নে বিবৃত ঘটনাটী আমার নয়নগোচর হয়। এই ঘটনা হইতে আমি অবগত হইয়াছিলাম যে নেপালীদিগের বিশ্বাস তাহাদের কোন কোন দেবতা কোন কোন ব্যক্তিতে স্থায়িভাবে বাস করেন। ঘটনাটীর বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

ডুয়ার্স রোড্‌স্ ডিভিসনের এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার টি মিত্রের একজন হিন্দু নেপালী ভৃত্য ছিল। তাহার নাম কাঙ্কা।

১৯২৩ সনের ২৩শে জানুয়ারী শুক্রবার মিষ্টার টি মিত্রের ৩ বৎসর বয়স্ক পুত্র শৈশব-সুলভ ক্রোধে অভিভূত হইয়া কাঙ্কার মুখে নিজীবন ত্যাগ করায় কাঙ্কা বিষণ্ণবদনে ক্রন্দন করিতে করিতে আমাদিগের নিকট আসিয়া এই মর্ম্মে অভিযোগ করিল :—"মহাশয়! আমি ও আমার পিতা অসাধারণ লোক; জনৈক দেবতা আমাদিগের দেহে স্থায়িভাবে বাস করেন। আমরা কখনও কোন অনাচার করি না বা কাহারও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করি না; এমন কি আমার মাতা ও ভগ্নী যদ্যপি কোন খাদ্য উচ্ছিষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে সেই খাদ্যও কোন মতে খাই না। খোকা বাবু আমার মুখে নিজীবন ত্যাগ করিয়া আমাকে যে কলুষিত করিয়াছেন, সেই কলুষ দূর করিবার জন্য আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" এই বলিয়াই সে স্বীয় দেহ কম্পিত ও স্পন্দিত করিতে লাগিল; দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন কোন দেবতা তাহার উপর ভর করিয়াছেন।

তখন আমরা কাঙ্কাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলাম, কেন আমাদের সম্মুখে স্বীয় দেহ কম্পিত ও স্পন্দিত করিয়া নৃত্য করিতেছিস্। সে ইহার উত্তরে বলিল "মহাশয়! আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য আমি নিজে দায়ী নহি। আমার দেহের ভিতর যে দেবতা বাস করেন তিনিই আমাকে এইরূপ করিতে বাধ্য করিয়াছেন।"

তাহার পর আমরা তাহাকে নিদ্রা যাইবার জন্য তাহার শয়ন-কক্ষে পাঠাইয়া দিলাম, সমস্ত রাত্রি উপবাস করিয়া সে নিদ্রা গেল। প্রাতঃকালে যখন সে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইল তখন তাহার আর পূর্ব্ববৎ ভাব রহিল না এবং প্রায়শ্চিত্ত করিবার আর কোনও কথা বলিল না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও কাঞ্চা বলিয়া বেড়াইত যে তাহার দেহের অভ্যন্তরে জনৈক দেবতা স্থায়িভাবে বাস করেন, তথাপি সে কখনও নিজকে অলৌকিক ঐশী শক্তিবিশিষ্ট সাধু পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিত না। সে সাধারণ নেপালীদের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিত; সাদা পায়জামা ও কোর্ত্তা ব্যবহার করিত, মৎস্য, মাংস ও ডিম প্রভৃতি সকল প্রকার খাদ্যই খাইত। সে নিম্ন শ্রেণীর ভৃত্যের কর্ম্ম করিত; বস্ত্রাদি ধৌত করা হইতে যে সকল বাসনে পরিবারস্থ লোকেরা ভোজন করিত সেই সকল বাসন পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত সমস্তই করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দেবতা তাহার দেহের অভ্যন্তরে বাস করিত, সে কাঞ্চার এই সমস্ত নিকৃষ্ট কার্য্য করার জন্য কোনরূপে কুপিত বা বিরক্ত হইত না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটী নেপালীদিগের একটী অদ্ভুত ধর্ম্মমূলক বিশ্বাসের দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি, যদি কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নেপালীদিগের ধর্ম্ম এবং আচারব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকে, তিনি যেন এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া তাঁহার গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত করেন।

এই স্থলে বলা উচিত যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অন্যান্য কয়েকটী জাতির মধ্যেও উপরোক্ত বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এই সকল জাতির বিশ্বাস যে, যখন তাহাদের পুরোহিত অথবা অপর কোন বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কোন ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান করেন, সেই সময়ে কোন না কোন দেবতা বা প্রেতাত্মা তাহাদের উপর আসিয়া ভর করে। এই প্রকার বিশ্বাসের কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

মধ্য ভারতবর্ষে নাইকুডে গোঁড় নামক একটী অসভ্য জাতি বাস করে। ইহারা ভিমুয়া নামক এক দেবতার পূজা করিয়া থাকে। মহাভারতে কথিত পাণ্ডববীর ভীমসেন এবং নাইকুডে গোঁড়দের ভিমুয়া একই ব্যক্তি। এই সকল গোঁড়েরা একটী বৃহদায়তন প্রস্তরখণ্ডকে সিন্দুরে চর্চ্চিত করিয়া তাহাকে ভিমুয়া দেবের প্রতিকৃতি বলিয়া পূজা করে। প্রথমতঃ তাহারা এই প্রস্তরখানির সম্মুখে শর্করামিশ্রিত একটু অন্ন অর্ঘ্য স্বরূপ প্রদান করতঃ উহাকে সিন্দুর চর্চ্চিত করে এবং ধূপ জ্বালিয়া দেয়। তৎপরে ভিমুয়া দেবের সম্মুখে কয়েকটী মেষ, শূকর এবং কুক্কুট বলি দেওয়া হয় এবং তৎসঙ্গে খাদ্যও অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করা হয়। নাইকুডে গোঁড়দের এইরূপ বিশ্বাস যে এই সময়ে ভিমুয়া দেব আসিয়া পুরোহিতের উপর ভর করেন। উক্ত দেবতার দ্বারা প্রভাবান্বিত পুরোহিত তাহার মস্তক স্পন্দিত করে, উন্মাদের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া লম্ফঝম্ফ প্রদান করে এবং মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়; এবং এই অবস্থাতেই উপাসকবৃন্দকে ভিমুয়া দেব তাহাদের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন কি না বলিয়া দেয়।*

* ডব্লু কুক্ সাহেব প্রণীত An Introduction to the Popular Religion and Folk-lore of Northern India (Sudhabad Edition of 1894) নামক ইংরাজী গ্রন্থের ৫৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

অনেক অসভ্য জাতির বিশ্বাস যে কোন না কোন অনিষ্টকারী দেবতা বা প্রেতাত্মার প্রভাবেই রোগ উৎপন্ন হয়। এই সকল রোগ দূর করিতে হইলে কোন অলৌকিক গুণসম্পন্ন দৈবানুগৃহীত ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। যখন রোগোৎপাদনকারী দেবতা বা প্রেতাত্মা আসিয়া উক্ত ব্যক্তির উপর ভর করে, তখন সেই ব্যক্তি তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে এবং এই অবস্থাতেই কি কি করিলে দেবতা বা প্রেতাত্মা সন্তুষ্ট হইয়া পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করিবেন সে সকল কথা বলিয়া দেয়। পৃথিবীর নানাস্থানে অনেক জাতির মধ্যে এই প্রকার নৃত্য প্রচলিত আছে।*

জঙ্গল মধ্যে কোন বিখ্যাত শিকারী নিহত হওয়াতে উহার প্রেতাত্মা আইরী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রেতাত্মার মন্দিরগুলি পরিত্যক্ত স্থানে অবস্থিত। একটী ত্রিশূল ইহার প্রতিনিধি স্বরূপ পরিগণিত হয়। ত্রিশূলটীর চতুর্দ্দিকে কয়েকটী প্রস্তর স্থাপিত করিয়া সেই গুলিকে আইরী দেবের অনুচরবর্গ বলা হয়। প্রত্যেক বৎসর একবার করিয়া একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া এই প্রেতাত্মার পূজা করা হয়। অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে সমবেত উপাসকগণ উপবেশন করে। তৎপরে একটী ঢোলক বাজান হয়। এই সময়ে আইরী দেব আসিয়া প্রত্যেক উপাসকের উপর ভর করেন। দেবতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া উপাসকবৃন্দ অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে লম্ফঝম্ফ এবং চিৎকার করিতে থাকে। কেহ কেহ লৌহনির্ম্মিত চামচা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় দেহের বিশেষ বিশেষ স্থান দগ্ধ করিয়া দেয় ও তৎপরে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করে। উপাসকবৃন্দের দৃঢ় বিশ্বাস যে যাঁহারা অগ্নিদ্বারা কোনরূপে দগ্ধ হন না তাঁহাদের উপরে আইরী দেব যথার্থই ভর করিয়াছেন এবং যাঁহারা অগ্নিশিখার দ্বারা কোন না কোন রূপে দগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের উপরে উপরোক্ত প্রেতাত্মা কোনরূপ অনুগ্রহ করেন নাই।†

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে হরিবাবা নামক জনৈক নিরক্ষর সাঁওতাল রাঁচি জেলার গ্রামবাসীদিগের ধর্ম্ম ও সামাজিক অবস্থার সংস্কার করিবার মানসে একটী আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। এই সাঁওতালটী রাঁচি জেলার অন্তর্গত খুঁটী মহকুমার কোন গ্রামে বাস করিত। রাঁচি জেলার গ্রামবাসিগণকে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে শিক্ষা ও দীক্ষা প্রদান করাই উক্ত আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল :—

(ক) যাহাতে তাহারা মাংস ও মৎস্য প্রভৃতি কোনরূপ আমিষ খাদ্য আহার না করে

(খ) যাহাতে তাহারা সুরা প্রভৃতি কোনরূপ মাদক দ্রব্য স্পর্শ না করে

(গ) যাহাতে তাহারা বৃহস্পতিবারে হলদ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ না করে

এবং (ঘ) যাহাতে তাহারা সংকীর্ত্তন ও অপরাপর অনুষ্ঠানের দ্বারা সমুদয় গ্রাম হইতে ভূত প্রেতাদি দূরীভূত করিতে পারে।

শেষোক্ত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে নিম্নে বিবৃত প্রক্রিয়াটী অনুষ্ঠিত হইত :—

* উপরোক্ত ইংরাজী গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠা দেখুন।

† উপরোক্ত ইংরাজী গ্রন্থের ১৫৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

হরিবাবা আন্দোলনকারীদের মধ্যে কোন বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বলিত—"আমার উপরে অনেক দেবতা ভর করিয়াছেন।" এই কথা বলিতে বলিতে এবং স্বীয় দেহটী কম্পিত ও স্পন্দিত করিতে করিতে কোন স্থানে যাইয়া সে বলিত—"এই স্থানে একটী ভূত লুক্কায়িত আছে। তোমরা খনন করিয়া ভূতটীকে বাহির কর এবং এই গ্রাম হইতে দূরীভূত করিয়া দাও।" তাহার উপদেশ অনুযায়ী ... নির্দিষ্ট স্থানটী খনন করিলে পর যদ্যপি কোন প্রস্তরখণ্ড বা অপর কোন দ্রব্য পাওয়া যাইত, তাহা হইলে সেই দেবতার দ্বারা প্রভাবান্বিত ব্যক্তি বলিয়া উঠিত—"এইটাই ভূত; ইহাকে এখনই দূর করিয়া দাও।" ইহা শুনিয়া ভূগর্ভোত্থিত সেই প্রস্তর বা অন্য পদার্থ দূরে ফেলিয়া দেওয়া হইত।*

(২). চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় কথিত কয়েকটী পশুর পরিচয়

ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ

আমরা চরক সংহিতা (সূত্রস্থান, ২৭শ অধ্যায়) এবং সুশ্রুত সংহিতায় (সূত্রস্থান ৪৬ অধ্যায়) অনেকগুলি পশুর নাম দেখিতে পাই। তন্মধ্যে কয়েকটী প্রাণী আজকাল তেমন জানা নাই বলিয়া তাহাদের পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

অবকুশ।—সুশ্রুতে পর্ণমৃগগণের মধ্যস্থ একটা প্রাণী, অর্থাৎ ইহা গাছে বাস করে। চক্রদত্ত ইহাকে অবর্গকুশ বলেন। নিবন্ধকার ইহাকে গোলাঙ্গুল বানর বলিয়া অভিহিত করেন, অর্থাৎ ইহার লেজের অগ্রে এক গোছা লম্বা লোম থাকে। ইহাকে আমরা Macacus silenus schr. বলিয়া মনে করি (Fauna of British India, Mammalia, পৃঃ ১৬)।

উদ্রা।—চরকে ইহা উদ্র নামে অভিহিত। ইহা Otter (Lutra lutra Linn.)। টীকাকার ইহাকে পানীয় বিড়াল বলেন।

উরণ।—ইহার নাম চরকে আছে। ইহা জাঙ্গল পশু। অমরকোষে ইহাকে মেষ বলা হইয়াছে। ইহা Ovis vignei Blyth (F. B. I. পৃঃ ৪৯৭) আষ্টরে ইহাকে উরিণ এবং পাঞ্জাবে উরিয়াল বলা হয়।

ঋষ্য। টীকাকারগণ ইহাকে নীলহরিণ, নবয়মৃগ বলেন (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু দেখুন— Boselaphus [Antilope] tragocamelus (Pallus) F. B. l. পৃঃ ৫১৭)।

* রাঁচি জেলার খুটী মহকুমার ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টর মিষ্টার পি, কে, মিত্রের নিকট হইতে আমি উপরোক্ত ঘটনাটীর বিষয় অবগত হইয়াছি।

এণ। বৃদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণসার হরিণকে এণ বলা হয়। নাম Antilope cervicapra Linn. (F. B. I. পৃঃ ২১, ২২)।

কদলী।—নিবন্ধকার ইহাকে বড় বিড়ালের আয়তনবিশিষ্ট এবং দেখিতে বাঘের মত বলিয়াছেন। মেদিনীতে ইহাকে এক প্রকার হরিণ বলা হইয়াছে। ইহাকে বিলেশয় (ভূমিশয়—অর্থাৎ যাহারা গর্ত্তে বাস করে) প্রাণীর ভিতর ফেলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা Felis ornata Gray (F. B. I. পৃঃ ৮৪)।

করাল।—কস্তুরীমৃগ—Moschus moschiferus Linn.

কালপুচ্ছক।—সুশ্রুতে ইহাকে কুলচর বলা হইয়াছে। চরকে ইহাকে জাঙ্গল প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। টীকাকার মতে ইহা একপ্রকার হরিণ। হিন্দিতে Gazella bennetti Sykes কে কালপুঞ্ছ বলা হয়। ইহার লেজ কাল (F. B. I. পৃঃ ৫২৬) সুতরাং ইহাই কালপুচ্ছক।

কুরঙ্গ।—ইহা একপ্রকার হরিণ। টীকাকারগণের মতে ইহার বর্ণ কৃষ্ণও নহে, তাম্রবর্ণও নহে। শব্দকল্পদ্রুমে এণ শব্দের পর্য্যায়ে কুরঙ্গম (কুরঙ্গ) শব্দ পাওয়া যায়। বৈদ্যকশব্দসিন্ধুতে ইহাকে স্বল্প হরিণ বলা হইয়াছে। এণ অর্থাৎ কৃষ্ণসার মৃগ বৃদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণাভ পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে (F. B. I. পৃঃ ৫২২)। সুতরাং কুরঙ্গকে বৃদ্ধ কালসার হরিণ মনে করা যায়।

কৃতমাল।—এই শব্দের অর্থ যাহারা দলে দলে বাস করে। বৈদ্যকশব্দসিন্ধুতে ইহাকে একপ্রকার সঙ্ঘাতচারী পক্ষী বা মৃগ (পশু) বলিয়া মনে করা হইয়াছে। সুশ্রুতে ইহাকে দীর্ঘজঙ্ঘ পশুগণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। চরকে ইহার নাম নাই। সম্ভবতঃ, ইহাতে কোন বিশেষ পশুকে লক্ষ্য করা হয় নাই। ভরল বা ভরত নামে একপ্রকার মেষ (Ovis nahura Hodgson) দলে দলে বাস করে। এক দলে ১০০টী পর্য্যন্ত পশু দেখা যায়। অন্যান্য কোন পশুর দলে এত অধিক সংখ্যক প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায় না।

গবয়।—ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Bos gavaeus Colebrooke (F. B. I. পৃঃ ৪৮৭)।

গোকর্ণ।—সুশ্রুতে ইহাকে কুলচর পশুগণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। চরকে ইহাকে জাঙ্গল বা বন্য পশু বলা হইয়াছে। ইহাদের কর্ণ গোসদৃশ। চক্রদত্ত ইহাকে গোচ্ছ হরিণ বলেন। মৃগপক্ষিশাস্ত্র হইতে ইহাকে নীলগাই বলিয়া মনে হয়। বৈজ্ঞানিক নাম—Boselaphus tragocamelus Pallas (F. B. I. পৃঃ ৫১৭)।

চমর, চমরী।—Bos grunniens Linn (F. B. I. পৃঃ ৪৯১)।

চারুষ্ক, চারুষ্কর।—সুশ্রুতে ইহাকে জঙ্ঘাল পশুগণের ভিতর রাখা হইয়াছে। চরকে ইহাকে বন্যপশু বলা হইয়াছে। টীকাকারগণ ইহাকে এক প্রকার ছোট, সুন্দর দেহ বিশিষ্ট হরিণ বলেন। আমরা ইহাকে Tragulus meminna Erxl. বলিয়া মনে করি (F. B. I. পৃঃ ৫৫৫)।

চুলুকী।—ইহা চরকে উল্লিখিত হইয়াছে। টীকাকারগণ ইহাকে শুশুক বলেন—Platanista gangetica (Lebeck) (F. B. I. পৃঃ ৫৯০)। এস্থলে আমরা শিশুমার বা শিংশুমার সম্বন্ধে কিছু বলিব। বৈদিক সাহিত্যে শিশুমারের উল্লেখ আছে এবং বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি

গ্রন্থেও শিংশুমারের কথা আছে। ইহাদের বিবরণে শিংশুমারের হস্ত, পদ এবং দীর্ঘ পুচ্ছের উল্লেখ পাওয়া যায়; তাহাতে মনে হয় যে শিংশুমার শুশুক হইতে পারে না। চরকের টীকাকার ইহাকে গোরুর মত মুখবিশিষ্ট কুম্ভীর বলে। সুতরাং আমরা পুরাণ ও টীকাকারের মতের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। সম্ভবতঃ ইহা Crocodilus palustris Lesson (F. B. IV, পৃঃ ৫)।

জম্বুক।—এই শব্দ কেবল চরকে পাওয়া যায়। ইহাকে ভোঁড়শিয়াল বলা হয়। ইহা সাধারণ শিয়াল—Canis aureus Linn (F. B. I. পৃঃ ১৪০)।

তরক্ষু।—নেকড়ে বাঘ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Hyaena striata Zimm (F. B. I. পৃঃ ১০২) হরপ্রসাদ-সম্বর্দ্ধনা-লেখমালায় "বৈদিকসাহিত্যে প্রাণীর কথায়" তরক্ষুকে চিতি (Cynacturus jubatus) বলা হইয়াছে। তাহা ঠিক নয়।

তরপোত।—চরকের জাঙ্গল পশুগণের মধ্যে ইহার নাম আছে। ইহা হরিণ জাতীয়। সম্ভবতঃ ইহা তাহর বা তেহর—Hemitragus jemlaicus (Ham. etc.) (F. B. I. পৃঃ ৫০৯)

দ্বীপী।—ইহা চিতাবাঘ বা গুলবাঘ—Felis pardus Linn (F. B. I. পৃঃ ৬৭)।

নকুল।—Herpestes auropunctatus Hodgson (F. B. I. পৃঃ ১২১)।

ন্যঙ্কু।—টীকাকারগণ ইহাকে নন্দন হরিণ বলেন। মৃগপক্ষিশাস্ত্রের বিবরণ আমরা ন্যঙ্কুকে Cervus unicolor Bechstein বলিয়া মনে করি (F. B. I. পৃঃ ৫৪৩)। ইহাকে হিন্দিতে সাম্বর, সামর বলে। হরপ্রসাদ-সম্বর্দ্ধনা-লেখমালায় "বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথায়" ন্যঙ্কুকে Gazella bennetti মনে করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে।

পূতিঘাস।—ইহাকে কাঠবিড়ালী বলা হয়। Sciurus indicus Erxl. (F. B. I. পৃঃ ৩৭১)

পৃষত।—ইহা বিন্দু চিহ্নিত হরিণ—Cervas axis Erxl (F. B. I. পৃঃ ৫৪৬)।

বনবিড়াল।—Felis chaus Guildenstaedt (F. B. I. পৃঃ ৮৬)।

বানর।—Macacus sinicus Linn. (F. B. I. পৃঃ ২৩)।

বাম।—ইহা চরকে বন্যপশুর মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। টীকাকার ইহাকে হিমালয়ের একপ্রকার মহামৃগ (বড় আকারের পশু) বলিয়া মনে করেন। সম্ভবতঃ ইহা ভাম বা ভোঁদর—Paradoxurus niger Blanf. (F. B. I. পৃঃ ১০৬)।

বৃক।—Canis pallipes Sykes (F.B.I. পৃঃ ১৩৭)। ইহাকে বাংলায় ঘোঁষ এবং হিন্দিতে হুণ্ডার বলে। বেদে সালাবৃকের উল্লেখ আছে—ইহা সম্ভবতঃ চিতা—Cynaelurus jubatus Schreber. সালাবৃক পোষ মানে এবং কুকুরের মত শীকারে ব্যবহৃত হয়। একথা বেদেও পাওয়া যায় (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণ)। চিতা ও এইরূপে ব্যবহৃত হয় (F. B. I. পৃঃ ৯৩)।

বৃক্ষশায়িকা।—চক্রদত্ত ইহাকে কবটব বলেন। নিবন্ধকার ইহাকে বৃক্ষমর্কটিকা—গিলী বলিয়াছেন। ইহা Macacus rhesus (Aud.) (F. B. I. পৃঃ ১৩)।

বৃষদংশ।—ইহা বিড়াল।

মদ্গু। সুশ্রুতে পর্ণমৃগদের (অর্থাৎ যাহারা গাছে বাস করে) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। টীকাকারগণ ইহাকে মলুয়া সাপ বলে। কিন্তু এই বর্গে পশু ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীর উল্লেখ না থাকায় আমরা মদ্গুকেও কোন পশু বলিয়া মনে করি। মদ্গু অর্থে যে জলে ডুবিতে পারে। এই অর্থে পাণিকৌড়িকেও মদ্গু বলে। চরকে উদ্রাকে আমরা উদ্‌বিড়াল মনে করিয়াছি। এই কথা সুশ্রুতে নাই, আর চরকেও মদ্গু কথাটী পাওয়া যায় না। সুতরাং মদ্গুকে উদ্‌বিড়াল মনে করা যাইতে পারে (Lutra vulgaris Erxl.)

মহাবভ্রু।—টীকাকারের মতে একপ্রকার নকুল। সম্ভবতঃ Herpestes mungo Gml. (F. B. I. পৃঃ ১২২)।

মূষিক।—দুই স্থলে মূষিকের নাম পাওয়া যায়—প্রথমতঃ, পর্ণমৃগগণের মধ্যে। টীকাকারগণ ইহাকে বৃক্ষমূষিক বলেন। ইহা সম্ভবতঃ Mus rattus Linn (F. B. I. পৃঃ ৪০৬)। দ্বিতীয়তঃ, বিলেশয় প্রাণীদের (যাহারা মাটীতে গর্ত্ত করিয়া বাস করে) সহিত। Mus decumanus Pallas (F. B. I. পৃঃ ৪০৮)।

মৃগপ্রিয়ক।—বিলেশয় প্রাণীর অন্তর্গত। মৃগপ্রিয়ক অর্থে পর্ব্বততৃণ (রাজনিঘণ্টুঃ)। সুতরাং ইহা পার্ব্বতীয় প্রদেশে তৃণময় স্থানে গর্ত্তে বাস করে। সম্ভবতঃ ইহা Lagomys roylei Ogilby (F. B. I. পৃঃ ৪৫৬)।

মৃগমাতৃকা।—টীকাকার ইহাকে এক প্রকার ছোট, পেটমোটা হরিণ বলেন। ইহাকে আমরা Cervus porcinus Zimm, (F. B. I. পৃঃ ৫৪৯) বলিয়া মনে করিতে পারি।

মৃগের্ব্বারু।—টীকাকার ইহাকে কোঁচবাঘ বলেন। বৈদ্যকশব্দসিন্ধুতে ইহাকে এক প্রকার শাদা হরিণ বলা হইয়াছে। আমরা মৃগের্ব্বারু অর্থে "যে পশুর পশ্চাতে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ বা গর্জ্জন করে" তাহা ধরিলাম। সেই অর্থে ইহাকে আমরা শীকারে নিযুক্ত চিতা বলিয়া মনে করি—Cynaelurus jubatus Schreber (F. B. I. পৃঃ ৯৩)।

মেদপুচ্ছক।—ইহা দুম্বা ভেড়া। (মেষের একটী ভেদ মাত্র)।

রুরু।—ইহা কূলচর প্রাণীর অন্তর্গত। টীকাকারগণ বলেন ইহা বৃহৎ ও বহুশৃঙ্গ। শরৎকালে শৃঙ্গ ত্যাগ করে। পুনশ্চ, আমরা ঋগ্বেদে (১ম মণ্ডল ৬৪ম সূক্ত ৮ম শ্লোকে) পিশ (পেশ) নামে হরিণের উল্লেখ পাই। সায়নভাষ্যে ইহাকে রুরু বলা হইয়াছে; ইহা শ্বেতবিন্দু দ্বারা অলঙ্কৃত। ইহাকে আমরা Cervus duvanceli Cuv. বলিয়া মনে করি (F. B. I. পৃঃ ৫৩৩, ৫৩৮)।

লোপাক।—খেঁকশিয়াল—Vulpes bengalensis (Shaw). (F. B. I. পৃঃ ১৪৮)।

লোমশকর্ণ।—ইহা বিলেশয় প্রাণী। চক্রদত্ত ইহাকে নলিককব এবং নিবন্ধকার ইহাকে নলৎকব বলেন। লোমকর্ণ অর্থ শশক (হেমচন্দ্র)। লোমশ অর্থে অতিলোম করা যায়, সুশ্রুতে ও চরকে শশের উল্লেখ থাকায় আমরা ইহাকে শশের এক গণগত পশু বলিয়া মনে করি।

Lepus oistolus Hodgson এর গাত্রে ও কর্ণের বাহিরে ও ভিতরে ঘন লোম আছে। কোনও শশজাতীয় পশুর এরূপ লোম নাই। সুতরাং ইহাকে লোমশকর্ণ মনে করা যায়।

রোহিত, রোহিষ।—লোহিত বর্ণের হরিণ। ইহা কুলচর। ইহা Cervulus muntjac Zimm. হইতে পারে (F. B. I. পৃঃ ৫৩২)।

শম্বর।—চমরে জাঙ্গল পশুর মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। টীকাকারগণ ইহাকে গবয় বলেন। সুতরাং ইহা Bos gavaeus Colebrooke (F. B. I. পৃঃ ৪৮৭)।

শরভ।—এই প্রাণি সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ আছে। বেদের টীকাকারগণ ইহাকে অষ্টপদবিশিষ্ট সিংহঘাতী অরণ্যমৃগবিশেষ বলেন। পশুর পরিবর্ত্তে প্রাণী ধরিলে ইহাকে আমরা একপ্রকার বৃহদাকার অরণ্য মাকড়সা বলিয়া ধরিতে পারি; কারণ এই জাতীয় প্রাণিগুলির ৮টী পদ (Arachnida)। অনেক বৃহদাকার মাকড়সার বিষ এত তীব্র যে তাহাতে বড় বড় পশুও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। সুশ্রুতের শরভ দীর্ঘজঙ্ঘাবিশিষ্ট পশু। চমরকে ইহাকে জাঙ্গল পশুগণের সহিত রাখা হইয়াছে। টীকাকারগণ ইহাকে উষ্ট্রের ন্যায় উচ্চ, বৃহদাকার শৃঙ্গবিশিষ্ট হরিণ বলেন; ইহা কাশ্মীরে বাস করে। হিমালয়ে একপ্রকার ছাগল পাওয়া যায় (Nemorhaedus butalinus Hodgson, F. B. I. পৃঃ ৫১৩) ইহাকে সরাও বলে। ইহার কিন্তু দেহের এবং শৃঙ্গের আয়তন এই বিবরণের সহিত মিলে না। আমাদের মনে হয় যে শরভ Cervus cashmirianus Falconer নামক বৃহদাকার হরিণ হইতে পারে। ইহার শিং খুব বড় (F. B. I. পৃঃ ৫৩৬)।

শল্যক।—ইহা গর্ত্তে বাস করে। নিরুক্তকার ইহাকে বৃক্ষনকুল মনে করেন। গাত্রে কাঁটাবিশিষ্ট প্রাণী দুই জাতীয় দেখা যায়—সজারু (খাবিৎ) এবং কাঁটাচুয়া। আমরা শল্যককে কাঁটাচুয়া মনে করি—Erinaceus collaris Gray & Hardwicke (F. B. I. পৃঃ ২১৫)।

শশ।—ইহা সাধারণ শশক—Lepus ruficandatus Geoff. (F. B. I. পৃঃ ৪৫০)।

শ্বদংষ্ট্রা।—ইহা দীর্ঘজঙ্ঘাবিশিষ্ট পশুর অন্তর্গত। চারিটী বড় বড় শ্বদন্ত (canine teeth) আছে। ইহা বন্য শূকর হইতে পারে।

শ্বাবিৎ।—সজারু—Hystix leucura Sykes (F. B. I. পৃঃ ৪৪২)।

শ্বসর।—কুলচর প্রাণী। টীকাকারগণ ইহাকে মহাশূকর বলেন; কাহারও মতে প্রকাণ্ড অশ্বের মত। বৈদ্যক নিঘণ্টুমতে মৎস্যাকার মহাশূকর। বৈদ্যকশব্দসিন্ধুতে ইহাকে একপ্রকার হরিণ বলা হইয়াছে; ইহা শরৎকালে শৃঙ্গ ত্যাগ করে। মৃগপক্ষিশাস্ত্রে শ্বসরকে এক প্রকার কস্তুরীমৃগ বলা হইয়াছে। এই সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে বিভিন্ন প্রাণীকে এক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা জলহস্তী হইতে পারে, কারণ ইহা দেখিতে বড় শূকরের মত। অশ্বাকৃতি সীল (Seal) জাতীয় কোন সমুদ্রপশু হইতে পারে।

হরিণ।—তাম্রবর্ণ। ইহা কৃষ্ণসারের শিশুশাবক (Antilope cervicapra Linn) (F. B. I. পৃঃ ৫২১—২)।

একপাদ

শ্রীশিবনাথ

তার সঙ্গেও ঠিক করে দেখা হয়েছিল তা আমার মনে নেই। বোধ হয় চার বৎসর আগে, বর্ষাকালে। সেদিন আকাশে ঘোর ঘনঘটা, কালমেঘের ধুসর ছায়া নারিকেল গাছের মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলেছিল। তারপর এল মুষলধারে এক পশলা বৃষ্টি। গাছের, ঘাসের, সবুজ রং নীল হয়ে গেল এবং রাস্তাটা একটা চওড়া বেগুনী ফিতের মত বিছিয়ে রইল।

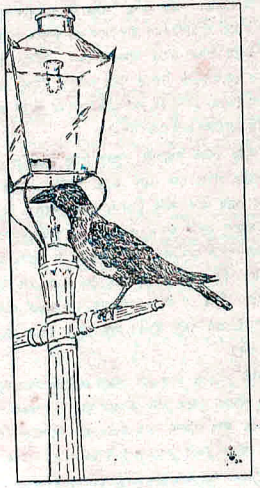

চিত্র—১

আমার জানালার বাহিরে গ্যাসপোষ্টের হাতায় বসে সে হঠাৎ ডেকে বলে, "কঃ কঃ ক্রঃ—দেখতে পাচ্ছনা, আমি অনাহারে বৃষ্টিতে ভিজে মারা যাচ্ছি?" বাস্তবিকই আমি দেখতে

পাইনি। আমি তাকে ছাড়িয়ে, তার মাথার উপর দিয়া উড়ন্ত মেঘের অনন্ত নৃত্য দেখতে ব্যস্ত ছিলাম। তার কথা শুনে মনে হল যেন সে আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু—তাই আমার উপর অতটা দাবি। সেত আমাকে অনবধানতার জন্য অনুযোগ দিতেই পারে।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে বলত? চেনা বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক—"

আমার কথা ফুরোবার আগেই সে বলে, "ক্ ক্ ক্রঃ—কি মুস্কিল! আমি দেখছি মানুষ জাতটা নিতান্তই বোকা! সোজা কথা বুঝতে পারনা কেন? আজ সারাদিন যে আমার খাওয়া হয়নি, তা চেহারা দেখেইত মালুম হয়। আগে চটপট্ কিছু খাবার নিয়ে এস—পরিচয় পরে হবে।"

বেচারি কথাটা ঠিকই বলেছে। আমি বল্লাম, "আচ্ছা বোসো, দেখি কি পাওয়া যায়।"

ভিতর থেকে এক টুকরো পাঁউরুটি এনে তার দিকে হাত বাড়িয়ে বল্লাম, "নিয়ে যাও।"

"ক্র ক্র ক্রঃ ক্রঃ—আরে দাওনা ছুঁড়ে আমার দিকে। চিনিনে শুনিনে তোমাকে, আমি খপ্ করে তোমার হাত থেকে রুটির টুকরো নিয়ে আসব? কিম্বা তোমার আঙুলে আমার ঠোঁটস্পর্শ হলে যদি শোণিতধারা নির্গত হয়, তবে তুমি বিচার না করেই বলবে আমি নিমকহারাম। জেনে রাখ আমাদের বুদ্ধি তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি।"

দ্বিরুক্তি না করে আমি রুটির টুকরোটা রাস্তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সে ব্যক্তি মুহূর্তের জন্য গ্যাসপোষ্টের হাতায় যেন চেপে বস্‌ল, আবার তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে একটা ডিম্বাকার রেখায় রাস্তায় নেমে এসে রুটির টুকরোর পাশে বস্‌ল। কিন্তু দুই একবার তাকে অল্প লাফিয়ে নিজেকে সাম্‌লে বস্‌তে হল। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এবার দেখলাম এই দুর্ভাগ্য কাকের একটা পা নেই—সেটা ডান পা। তাকে কেবল বাঁ পায়ের সাহায্যেই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করে চলতে হচ্ছে। কি কারণে, কোন্ সময়ে, কত বয়সে, সে তার ডান পা হারিয়েছিল, তা জান্‌বার উপায় নেই। কিন্তু সে যে যে অনেকদিনের কথা, তাতে আর সন্দেহ নেই; কারণ এখন সে একপায়ের দ্বারাই তার সকল করণীয় কর্ম্ম সাধন করতে পারে। এইরূপে অভ্যস্ত হতে তার অল্প সময় লাগেনি।

রুটির টুকরোটা ঠোঁটে করে সে উড়ে এসে আমার প্রাচীরের উপরে বস্‌ল। প্রাচীরটা গ্যাস-পোষ্টের নীচেই, আমার জানালা থেকে প্রায় চারহাত দূরে। টুকরোটা প্রাচীরের উপরে রেখে, এদিক ওদিক দেখে নিয়ে, ঈষৎ কাঁপিয়ে, তার একটা কোণ সে পায়ের দ্বিতীয় নখটা দিয়ে চেপে ধরল। তারপর আস্তে আস্তে ঠুকরে ঠুকরে সবটা উদরস্থ করল। তখন আমার দিকে ফিরে বলল, "ক্র র র র ক্ ক্ ক্রঃ—ওহে বাপু, তুমি একটু বোকা হলেও লোকটা নেহাৎ মন্দ নও, এখন আর এক টুকরো নিয়ে এসত! দেখ্‌তেই পাচ্ছ আমার সমস্ত দিন—"

আমি অবশ্যই আর এক টুকরো এনে তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম, কিন্তু টুকরোটা এবার রাস্তায় গিয়ে না পড়ে প্রাচীর এবং জানালার মাঝে আমার বাগানে পড়ল। সে বলে, "ক্রঃ ক্রঃ ক্রঃ—

এই যাঃ, মাটি করলে! হাতে কি জোর নেই নাকি? এখন ওখান থেকে আমি কি করে টুকরোটা উদ্ধার করি বলত? ক্র রর ক্রঃ—তুমি একটু সরে যাওত দেখি।"

আমি বল্লাম, "কেন হে, এতক্ষণেও কি বুঝতে পারনি যে আমি বন্ধু বটে, শত্রু নই?"

"কুঃ কুঃ কু রর কাঃ—আচ্ছা না হয় বন্ধুই হলে, কিন্তু একটু সরে যেতে দোষ কি? তা ছাড়া এতক্ষণ আহারই চলেছে, পরিচয়ত হয়নি। সাদা কথা বুঝতে পার না কেন? তোমরা না ন্যায়শাস্ত্র পড়?"

তাওত বটে! আমি একটু সরে গিয়ে খড়খড়ির পাশে দাঁড়ালাম। দেখলাম কোরি আবার সেই রকম কষ্ট করে উড়ল; এবারে একটু দূর দিয়ে ঘুরে এসে ছোঁ মেরে রুটির টুকরোটা নিয়ে প্রাচীরের উপর পূর্ব্বের মত বস্‌ল। এবারে সবটা খাওয়া হ'লনা। অর্দ্ধেক শেষ করে সে ডাক্‌লে, "কঃ কঃ ক—অ ক—অ—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, চলে আয়, আমি খাবার যোগাড় করেছি।"

তখন কোথা থেকে নিমেষমধ্যে দশ বারটা কাক উড়ে এসে, কেউ প্রাচীরের উপরে, কেউ গ্যাস্‌পোষ্টের হাতায়, কেউ রাস্তায় বস্‌ল। তারা সকলেই দ্বিপদ। একপাদ (আমার বন্ধুকে আমরা সপরিজনে এবং সবান্ধবে ওই নামেই ডাকি) তখন সেই অর্দ্ধভুক্ত টুকরোটা ছেড়ে দিয়ে একটু সরে বসে বলল "কঃ কঃ—নে, তোরা খেয়ে নে।"

আমি বল্লাম, "আর এনে দেব?"

"সে কথা কি আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়? এতগুলো অভুক্ত অতিথি দেখতে পাচ্ছনা?"

আমি আরও রুটি এনে ছড়িয়ে দিলাম। অন্য কাকেরা ছুটোছুটি করে খেতে লাগল। একপাদ বসেই রইল, এবং মাঝে মাঝে তাদের শাসন করে বলল, "কঃ কঃ—আরে নেহাৎ রথাহূতের মত খাস্‌নে, ভদ্রলোকের মত খা, মানুষটা মনে করবে কি?"

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "আর চাই?"

"র র কঃ—আচ্ছা দেখ, যদি মুখশুদ্ধির মত কিছু থাকে তবে দিতে পার।"

খানকয়েক কচুরি ছিল, সেগুলি আমাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ প্রাচীন হলেও, একপাদ এবং তার আত্মীয়দের ঠোঁটে রুচিপ্রদ। একখানা কচুরি আমি তাক্ করে একপাদের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। সে সেখানা শূন্যের উপরেই ঠোঁটে করে ধরে ফেলে, পূর্ব্বের মত নখে করে চেপে ঠুকরে খেতে লাগল। অপরগুলি আমি তার সঙ্গীদের দিলাম।

আহারান্তে একপাদ তার সঙ্গীদের প্রস্থান করতে ইঙ্গিত করলে। তাঁরা প্রায় সকলেই চলে গেল, কিন্তু দুই তিন জন তখনও বসে ছিল। একপাদ গম্ভীর স্বরে বল্লে, "কঃ কঃ ক্রঃ ক্রঃ—তোরা ত বড় লোভী দেখছি, যাঃ সরে পড় বলছি!" তারা চলে গেলে আমার দিকে ফিরে বল্‌লে, "ক্র ক্ ক্ ক্ র র রু রু ওর ওর—দ্যাখো, তোমরা হলে বড় জোর ধন্যবাদ দিয়ে সব কৃতজ্ঞতাটা থেকে নিষ্কৃতি পেতে। আমরা ধন্যবাদ দিতে শিখিনি। তোমরা মনস্তত্ত্ব আলোচনা কর, কিন্তু মনের খবর জাননা। আমি আবার কাল আসব। যদি আমার মনে তোমার প্রতি একটা স্নেহ না জন্মাত, তবে

ফিরে আস্‌তাম ও না বা তোমাকে সে কথা বল্‌তাম ও না।" সে তখন তারি মত করে উড়ে চলে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। কবিরা যাকে বলেন শ্যামায়মান বনান্তরাল, সে তারি মধ্যে লুকিয়ে গেল।

একপাদের নেতৃত্বের পরিচয় তার সঙ্গীদের প্রতি ব্যবহারেই বোঝা গেছে। সে যে বীর তা অনুমানযোগ্য। সে যুদ্ধে পরাস্ত হয়নি। ভাল পা হারাণো সত্ত্বেও সে ফিরে এসে পুনরায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করছে। যদি তার পদচ্ছেদ যুদ্ধে না হয়ে থাকে, তবে হয়ত সে বন্দী হয়েছিল, এবং লোহার জাল, কাঁটার তার প্রভৃতি লঙ্ঘনকালে সে পা হারিয়েছিল। হয়ত বা তার কোন মানবাকৃতি শত্রু নিজের পৈশাচিক প্রবৃত্তি নিবৃত্তির জন্যে তার পা কেটে দিয়েছিল। কিন্তু একপাদ বিপদকে বিপদ জ্ঞান করেনি, কারণ সেত জানেই যে সে যখন পশুজীবন ধারণ করেছে, তখন তাকে এক দিন না এক দিন আকস্মিক বিপৎপাতেই মরতে হবে। ভবভার নামিয়ে দেবার জন্যে তাকে ডাক্তার বদ্যি ডেকে একটা মহোৎসব ব্যাপার করতে হবে না। বাস্তবিকই অন্য জন্তু জানোয়ার (পাখীরাও অবশ্য সেই দলভুক্ত), মানুষের মত, যাকে বলে স্বাভাবিক মৃত্যু, সেটা সম্ভোগ করবার খুবই কম অবসর পায়। কোন্ এক অজানা দিনে যে শত্রুর হাতে, অথবা প্রকৃতির ঝঞ্ঝাপাতে, ওদের জীবনলীলা সাঙ্গ হয় তার ঠিকানা নেই।

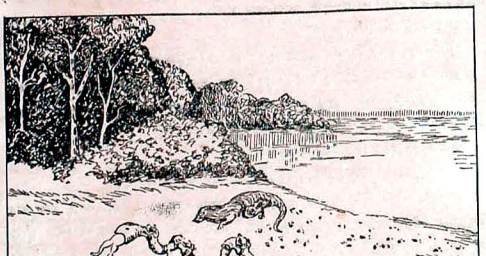

চিত্র—২

একবার একটা গ্রামের শেষে, নদীর ধারে, জঙ্গলের পাশে, সকাল বেলায়, আমি একটা বিষহীন ঢোঁড়া সাপের মুখে অর্দ্ধাস্তহিত ব্যাং দেখ্‌তে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সাপের দেহ দংশনক্ষত। উভয়েই মৃত। তাকিয়ে দেখি অদূরে একটা নকুলের মৃতদেহ, তার পেটের এক অংশ এবং পিছনের

একটা পা নেই। মাটিতে মাংসাশী চতুষ্পদের পদচিহ্ন ছিল; শেয়ালের বলেই মনে হল। চিহ্নগুলি ঘুরে গিয়ে একেবারে নদীর চড়ার উপর গিয়ে চল্‌ল। তার আশে-পাশে ওই রকমই একটা বড় জানোয়ারের পায়ের দাগ ছিল। পদচিহ্ন দেখে বোঝা গেল যে শ্বাপদকুলের দুইজনে একই দিকে গিয়েছিল—এবং দৌড়ে—কারণ চিহ্নগুলি দূরে দূরে ছিল। আমার সঙ্গী বল্লেন, "চল এখান থেকে, যায়গাটা ভাল নয়।"

কয়েকদিন পরে শুনলাম গ্রামান্তরে শিকারীর হাতে একটা নেকড়ে মারা পড়েছে। সব ইতিহাসটার মর্ম্মগ্রহণ করতে দেরি হল না। সাপটা ব্যাং খেতে এসেছিল, হঠাৎ নেউল এসে সাপকে আক্রমণ করলে। এমন সময় একটা শেয়াল নেউলভোজনে প্রবৃত্ত হল, কিন্তু সমাধা করবার আগেই বেচারাকে নেকড়ের তাড়ায় প্রাণভয়ে নদীর চড়া দিয়ে ছুটে পালাতে হয়েছিল। সঙ্গীর অনুরোধে ইতিহাসের শেষাংশ উদ্ধার না করেই আমাকে সে স্থান ত্যাগ করতে হল। ঘটনাগুলো প্রত্যূষেই ঘটেছিল, কারণ মৃতদেহগুলো তখনও টাট্‌কা ছিল, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটেছিল, কারণ কোন দেবতারই ভোজন সমাধা হয়নি। তার পর থেকে অনেক পশু পক্ষীর মৃত্যাবশেষ দেখেছি, প্রায় সকলেই অপঘাতে মারা পড়েছে। অবশ্য গৃহপালিত পশুদের কথা আলাদা। পশুদের জীবনলীলার সমাপন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা আমার পক্ষে ভূয়োদর্শন এবং বহু চিন্তাসাপেক্ষ হলেও, একপাদের কাছে যে সেটা নিতান্ত জানা কথা, তার কোন সন্দেহ নেই। রাতে বৃষ্টির অস্ত ছিল না, বাতাসও বেশ জোরে বয়েছিল। আকাশের অবস্থা দেখে একপাদ যে প্রাকৃতিক বিপদের আশঙ্কা করেনি, একথা বলা যায় না। কিন্তু তার পক্ষে

"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য,
চিত্ত ভাবনাহীন।"

পরদিন সকালে হঠাৎ সূর্য্যদেব দেখা দিতেই নারিকেল গাছের মাথাগুলো লাল হয়ে উঠ্‌ল; বাঁশের ঝোপের কচি পাতাগুলো হলদে হল; জানালার বাহিরে ল্যাগাষ্ট্রীমিয়া (Lagerstroemia indica) (পরিচয়টা আমার এক বটানিক্যাল বন্ধু দিয়েছিলেন) গাছের সাদা ফুলগুলো কুচো বরফের তোড়ার মত ঝক্ ঝক্ করে হাসতে লাগল। আমি তখন চা চর্চ্চায় নিমগ্ন। একপাদ গ্যাসপোষ্টের হাতায় বসে বল্লে, "কঃ ক ক ক ক্র র র র ক্র ক্র ক্র—গুড্‌মর্ণিং, একাই খাচ্ছ? মানুষগুলো কি স্বার্থপর! না, না, তুমি লোক ভাল, এখন কিছু খাবার আনত দেখি।"

আমি তাকে পাঁউরুটি টোষ্টের অবশিষ্ট টুক্‌রো কয়েকটা প্লেটের যেদিকে মাখন ছিল, সেইদিকে ঘসে, চুঁড়ে ফেলে দিলাম। সে ডিম্বাকারে ঘুরে গিয়ে সেগুলি তৃপ্তি-সহকারে ভোজন করলে। গা ঝাড়া দিয়ে (তখনও তাহার সর্ব্বশরীর ভিজে ছিল) সে এসে প্রাচীরের উপর বসে বল্লে,—কু রু রু রু—তুমি বোধ হয় মনে মনে ভাবছিলে যে একপাদ কাল রাতের ঝড় বৃষ্টিতে ভবলীলা সাঙ্গ করেছে। তা হয়ত হতে পারত, কিন্তু

'তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।'

আর এটা জেনো যে প্রকৃতির সঙ্গে কি করে যুঝতে হয়, তা তোমাদের চেয়ে আমরা ঢের বেশী জানি। ক্র—র র র—ওরে তোরা কোথায় গেলি ? এদিকে আয় লোকটা খাবার দেবে।

আরও কিছু রুটি এনে, আমি তার সঙ্গীদের খেতে দিলাম। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে তাদের-মধ্যে দু'একটা, আমাদের মানুষের হিসেবে, নিতান্তই অসভ্য। তারা আমার হাত থেকেই কেড়ে খাবার মতলবে দু'চারটে ছোঁ মারতে সুরু করেছিল। একপাদ একটু হেসে বল্লে, "ক্রম্ ক্রম্ ক্রঃ—তুমি রাগ করোনা। ওরা অসভ্যতা করেনি, প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে ওরা স্বাবলম্বন ব্যাপারটা যেমন শিখেছে, তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পণ্ডিতরা তার কাণাকড়িও শিখতে পারেন নি।" কথাটা ঠিক শ্রুতিমধুর না হলেও, মনে মনে একপাদের ফিলসফির প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না।

তার পর থেকে প্রতিদিন সকালে বিকেলে ঠিক নিয়মিত সময়ে একপাদ গ্যাসপোষ্টে বসে আমাকে ডাকত, আহার এবং গল্প করত। বিশ্বাস করলেন না ? আপনি ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষা হয়ত জানেন, কিন্তু সেগুলি আপনাকে যত্ন করে শিখতে হয়েছে। যদি চেষ্টা করেন, তবে কাঁকের ভাষাও শিখতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সময়, ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় আবশ্যক। একপাদের কণ্ঠস্বর গম্ভীর বটে, কিন্তু কঠোর নয়। মহাভারতে জরাসন্ধ রাজার মৃত্যুকালীন চীৎকারের কথা পড়েছিলাম—আজও মনে আছে। বেচারা জলার্দ্র ভেরীরবের ন্যায় বিকট আওয়াজ করে মারা পড়েছিল। প্রায় সকল কাকের ডাকই ঐ রকম রবের একটা পকেট এডিসনের মত ; অধিকন্তু উক্ত জলার্দ্র ভেরীর মধ্যে কয়েকটা পাথর কি ইটের টুক্‌রো থাকা চাই। একপাদ মিষ্টভাষী। কিন্তু তার কথাই তার ভাষার সবটা নয়। তার চোখ, ঠোঁট, ডানা, পা, লেজ, এমন কি সব দেহটা দিয়েই সে কথা বলে। সে যখন খাবার চায়, তখন তার আওয়াজের সঙ্গে মাথাটা একটু নুইয়ে পড়ে, লেজটা কেঁপে ওঠে, ডানা দুটো ঈষৎ চঞ্চল হয়ে দেহ থেকে আধ ইঞ্চিখানেক ফুলে ওঠে, একটা চোখ প্রায় মুদে যায়, আর একটা কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হয়। আমি যদি খাবার দিতে দেরি করি, তবে সে ঐ রকম ইঙ্গিত করে একবার পিছনে ফেরে, আবার তখনি পূর্ব্বের মত আমার দিকে ঘুরে বসে ; এবার তার দুই চোখই পুরো খোলা। আরও যদি দেরি করি, তবে সে আমাদের ছেলেবেলার খেলার মত একপায়ে নাচ করতে থাকে। তার কথার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গীর যোগাযোগের অনেক ব্যাপার আছে, কিন্তু তার শব্দোচ্চারণের বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে লক্ষ্য করবার যোগ্য। কাকের ভাষার ধ্বনি আমাদের ভাষায় লিখে জানান অসম্ভব। ধরুন না কেন একটা শব্দ, যথা কঃ। এই কঃ হ্রস্ব থেকে দীর্ঘ পর্য্যন্ত নানা পরিমাণে, অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট পর্য্যন্ত নানা প্রকার উচ্চ নীচ ভেদে, উচ্চারিত হতে পারে। এখন মনে করুন যদি এই দুই প্রকার—অর্থাৎ হ্রস্বদীর্ঘ এবং উচ্চনীচ—উচ্চারণের প্রত্যেকটি দশ প্রকারের হয়, তবে এক কঃ, এই শব্দটির উচ্চারণের একশত রকমভেদ আছে। এই রকম নানা শব্দ আছে, তার প্রত্যেকটির উচ্চারণভেদে যদি অর্থ বৈষম্য থাকে, তবে কাকেদের ভাষাটা বড় সহজ দাঁড়ায় না। তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি যোগ করলে, ব্যাপার বিলক্ষণ জটিল হয়ে ওঠে। শুনেছি চীনাদের ভাষায় এক এক শব্দের জন্য এক এক অক্ষর আছে। অক্ষর পরিচয়ে এবং হস্তলিপি অভ্যাস করতেই জীবনের বার আনা কেটে যায়। কাকেদের ভাষা চীনা ভাষার চেয়ে কোন অংশে

কম নয়, সেটা আমি শপথ করে বলতে পারি। কিন্তু কাকের ভাষায় এমন একটা প্রাণ আছে, যার আঘাতে আপনার মনের কপাটখানা সহজেই খুলে যাবে। অবশ্য আপনার মন থাকা চাই।

একপাদ সকালে বিকেলে নিয়মিতরূপে আমার জানালার বাইরে বসে, আমাকে তার ভাষা শেখাত এবং গল্পগুজব করত। কিন্তু প্রায় মাসখানেক বাদে সে হঠাৎ একদিন অন্তর্হিত হল। আমি দুঃখিত হলাম, এমন কি তার ভদ্রতার প্রতি দোষারোপও করলাম। তার উচিত ছিল অন্ততঃ আমাকে একটু জানিয়ে যাওয়া। পরে ভাবলাম যে সংবাদ দেবার হয়ত তার সময় ছিল না, অকস্মাৎ শত্রুর হাতে হয়ত তাহার জীবন শেষ হয়েছে। অথবা প্রকৃতির কোপ··ইত্যাদি···ইত্যাদি।

প্রায় দিন পনের পরে সকালে ঠিক সেই কথা, "কঃ ক্ ক্ ক্রঃ।"

আমি তাকে দেখে যদিও খুব আনন্দ অনুভব করলাম, তবুও একটু চেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কি খবর, কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?"

"ক-র র র কঃ—সে কথায় তোমার কাজ কি ? এখন আমি যে ফিরে এলাম, এই কি যথেষ্ট নয় ?"

আমি একটু রাগের ভাণ করে বল্লাম, "তা অন্ততঃ আমাকে বলে গেলেনা কেন ?"

"কু রু রু রু ক্রঃ ক্রঃ ক্রঃ—কেন বলে যাব ? তোমরা না বুদ্ধিবৃত্তি এবং পাণ্ডিত্যের বড়াই কর ? দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির আলোচনা কর, এমন কি অনেক সময়ে ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে ফেল ? আমরা সামান্য পাখীমাত্র—তোমাদের চোখে ; আমরা সে সবের ধার ধারিনে। আমরা জীবনমুক্ত না হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি, কিন্তু জীবনে আমরা মুক্ত। তোমরা যেটা নিয়ে কেবলমাত্র আলোচনা কর, তর্ক কর, একে অপরের টিকি, নাক, কান, নেজ (থুড়ি) থিসিস্ পর্য্যন্ত কাটবার চেষ্টা কর, আমরা তাকে জীবনের স্বাভাবিক সহায় করে নিয়েছি। দ্যাখো, আমার চোখ তোমার মত আর্দ্ধেকটা পর্দ্দাঘেরা নয়—সম্পূর্ণ খোলা, ব্রহ্মাণ্ডের মত গোলাকার। আমি মায়ামুক্ত।

"আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।"

এই সিদ্ধবৈদান্তিক একপাদের কাছে আমাকে মাথা নত করতে হল।

ক্রমে বোঝা গেল যে একপাদ যাকে বলে গৃহী তা নয়। সে এক স্থানে ঘর করে থাকবার লোক নয়। বড় জোর এক মাসের বেশী সময় সে কোথাও থাকে না। সুতরাং মাঝে মাঝে তার আকস্মিক অন্তর্ধানে আমি আর বিস্মিত হইনে। এমনিভাবে আজ চার বৎসর কেটে গেছে।

একপাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আরও ঘনীভূত হয়েছে, কিন্তু তবু এই বন্ধুত্বের মাঝখান দিয়ে সে একটা রেখা টেনে রেখেছে। একবার মাত্র আমি তাকে নিকটে পেয়েছিলাম—সে অনেক সাধনার ফলে। এক দিন সে হঠাৎ ফিরে এসেছে। আমি তাকে বল্লাম, "আজ তোমাকে আমার হাত থেকে খাবার নিতে হবে।"

সে একটু হেসে বল্লে, "ক্র রঃ—হয়ত বা তা পারি, কিন্তু ভেবে দেখি।" ভেবে দেখতে তার

এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগল, ততক্ষণ আমি অচল অধমের মত রুটির টুকরো হাতে করে একভাবে জানালায় দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেকবার সে আসি আসি করে এল না। পরিশেষে সে এসে আমার হাতের কব্জির উপর চেপে বস্‌ল, রুটির টুকরোটা দুই চার বার ঠুক্‌রে দেখ্‌ল, তারপর একবার আমার চোখের দিকে চাইল এবং পরমুহূর্ত্তে টুকরোটা নিয়ে প্রাচীরের উপর গিয়ে বস্‌ল। সে বোধ হয় আট দশ সেকেণ্ডের বেশী আমার হাতে বসেনি। আমি যখন হাতটা নামিয়ে নিলাম তখন সেটা প্রায় অসাড় হয়ে গেছে।

সেবারে একপাদ প্রায় দুই মাস বাদে ফিরে এল। এতটা বিলম্ব সে পূর্ব্বে কখনও করেনি। আমি তাকে সঙ্গীতের ছলে জিজ্ঞেসা করলাম,

"বল্ সে কোন দেশে বা—
গিয়েছিলি ?
আর, সে কোন ধনি বা—
রেখেছিল
ধরে তোরে, বল্ সে কোন—"
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

একপাদ একটু হেসে বল্ল, "ক্র র ক্রর ক ক কম্—ওহে, আমাদের দেশে ধরে রাখবার উপায় নেই। যদি কেউ নিতান্তই ধরে রাখতে চায়, তবে তার সহগামী হওয়া ভিন্ন গত্যন্তরো নাস্তি। আমার বিলম্বের কারণ আছে। ওরাড়ীর পিছনে ওই মরা আমগাছটার মাথায় শুকনো ডালের মধ্যে খড়কুটোয় তৈরি একটা পাখীর বাসা দেখছো ? ওটা একটা বাজপাখীর বাসা। ও যখন নীড় প্রস্তুত করে তখন আমি এখানে ছিলাম। ক্রমে যখন তার ডিমে তাপ দেবার সময় এল, আমাকে তখন অন্য স্থানে যেতে হল, কারণ, বুঝতেই পাচ্ছ, আমার বাসাটা অদূরের ওই নারিকেল গাছের মাথায়, ওর বাসা থেকে দেখা যায়। কথাটা বুঝিয়ে বলি। তোমাদের দেশে কপিলমুনি থেকে আরম্ভ করে দু'চার জন লোক সেকালে একটু সত্যসন্ধান করত। আমাদের রাজ্যের খবর নিয়ে তারা এক আধটা বুদ্ধি তোমাদের মাথায় দেবার চেষ্টা করেছিল—তোমরা সে বুদ্ধি গ্রহণ করতে পারনি। পরে মুনিদের বংশ লোপ পেল, তাদের যায়গায় এলে তোমরা, ভাবলে যে ছনিয়ার যা কিছু জানবার কথা, তার সবটাই তোমরা হজম করে বসে আছ। সেকালে গ্রীকরাও কিছু সত্যসন্ধান করেছিল, এবং তার পর প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরে সব নিভে গেল। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে এক ঋষি আমাদের রাজ্যের একটা সারদত্য আবিষ্কার করে তোমাদের দিয়ে গেছেন। তোমরা তাঁকে ঠাট্টা করতে অবশ্য ত্রুটি করনি। তাঁর নাম ডারউইন। হাঁ, তুমি জান তা আমি জানি। তাঁর কথাগুলো পড়েছ তাও আমি স্বীকার করি, কিন্তু সত্যটা আজও হৃদয়ঙ্গম করতে পারনি। বাজপাখীর আস্তানাটা এড়িয়ে যে আমাকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে, এটা আমি বাপপিতেমোর আমল থেকেই জানি, ডারউইন তোমাদের মাত্র বলেছেন সে দিন। যদি এড়িয়ে থাকতে না পারি, তবে আমাকে, আমার জাতকে, সমূলে বিনষ্ট হতে হবে। যে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের

(survival of the fittest) কথা তোমরা ডারউইনের কেতাবে পড়েছ, জীবনে আমরা তার পরিচয় নিত্যই দিচ্ছি। অবশ্য মনে করোনা যে আমরা সে পরিচয় সজ্ঞানে, ইচ্ছে করে দিচ্ছি—পরিচয় দেওয়াটা আমাদের মজ্জাগত। তারপর আমার নিজের কথা ধর। আমি বোঁড়া, যোগ্যতম অবশ্যই নই, বোধ হয় যোগ্যও নই, সুতরাং আমার পক্ষে জীবনসংগ্রাম (struggle for existence) আরও কঠিন। এখন বুঝ্‌লে যে আমাকে সব দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে চলতে হয় ? সুতরাং আমার পক্ষে একস্থানে বাস করা অসম্ভব। অনেকদিন এক যায়গায় থাকলে সবাই চিন ফেলবে, তখন শত্রুর কাছে সংবাদ পৌঁছুতে কতক্ষণ ? তা বাদে আরও একটা কথা আছে। তুমি না হয়, ভালমানুষ বলে, আমার ব্রেকফাষ্ট ও ডিনারের ব্যবস্থা করেছ ; কিন্তু তোমার বাড়ীর একই রকম খাবার খেয়ে আমার শরীর টেকে কেমন করে ? আমাকে কিছু মৎস্য, মাংস এবং অন্যান্য খাদ্য—যাকে তোমরা ভিন্ন রুচি হেতু অখাদ্য বল—তা' খেয়ে শরীরে প্রোটিন সঞ্চয় করতে হবে। তোমার দেয় হাইড্রোকার্ব্বন এবং কার্ব্বোহাইড্রেট খেয়ে দু'দশ দিন পেট চলতে পারে, কিন্তু চিরদিন চলবে না। বুঝলাম তুমি না হয় আরও কিছু ব্যবস্থা আমার জন্যে করতে পার ; কিন্তু আমি তোমাদের গৃহপালিত পশুর মত দাসবৃত্তি অবলম্বন করে নিজস্ব হারাইনি। আমার স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য আছে। সুতরাং নিতান্ত শরীররক্ষার খাতিরেও অন্য ভোজ্য আহরণে আমাকে ভিন্নস্থানে যেতে হয়। আশা করি আমার কথাটা সব তোমাকে বুঝাতে পেরেছি।"

বাস্তবিকই একপাদের বিপদ অসংখ্য। জীবনধারণ করতে তাকে নানা উপায় অবলম্বন করতে হয়, বিশেষতঃ যখন তার একটা পায়ের অভাব। কাকেরা ডালে-বসা পাখীর (perching birds) দলের। জীবনযাত্রার অনেক কাজ এদের পায়ের সাহায্যে সম্পন্ন করতে হয়। সুতরাং এদের পায়ের একটু বিশেষত্ব আছে। যখন এরা বসে থাকে, অথবা মাটিতে হেঁটে চলে, তখন দেহের সমস্ত ভার, অনেকটা মানুষের মত, এদের পদদ্বয়কে বহন করতে হয়। অনেক সময়ে কোন খাদ্যবস্তু আহরণ করা, অথবা তাকে অসমান স্থানে রেখে আয়ত্ত করার পক্ষে পায়ের সাহায্য আবশ্যক। কাকের (এবং অন্যান্য পাখীর ডালে বসার) পক্ষে তাদের পদদ্বয় অনেক পরিমাণে হাত এবং পা উভয়েরই কাজ করে। একপাদের পদশূন্যতা তার হস্তপদ বিহীনতার সমানই বলতে হবে।

শরীরের সকল ভার এক পায়ের উপর সমানভাবে রক্ষা করতে একপাদকে অনেকটা বাঁ দিকে হেলে বসতে হয়। এইরূপে অভ্যস্ত হওয়ায় তার পায়ের হাড়গুলি স্বাভাবিক স্থান (normal position) থেকে একটু ভিতরের দিকে সরে গেছে। ফলে অস্থিগ্রন্থিগুলি বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী হয়ে নতুন করে গঠিত হয়েছে। যে সকল মাংসপেশী দ্বারা পায়ের হাড়গুলি পরিচালিত হয়, সেগুলি বাহিরের দিকে প্রসারিত এবং ভিতরের দিকে সঙ্কুচিত হয়েছে। তাদের ক্রিয়া-প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটেছে। উড়ে যাবার সময় কাকেদের পা দুটো দেহদৈর্ঘ্যের সমরেখায় পেটের কাছে গুটিয়ে থাকে। একপাদের বাঁ পা কিয়ৎপরিমাণে তার পেটের আড়াআড়ি ভাবে বাঁ থেকে

ডানদিকে বিস্তৃত অবস্থায় গুটিয়ে যায়। সমরেখায় গোটাবার শক্তি এবং প্রয়োজন উভয়ই নেই। (চিত্র দ্রষ্টব্য।)

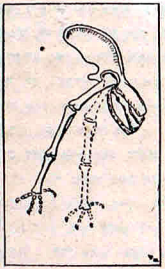

চিত্র—৩

মানুষের এবং তার নিকট আত্মীয়দের যেমন হাতে পায়ে পাঁচটা আঙুল আছে, কাকেদের তেমনি চারটে। এই চারটের একটা ঠিক পিছন দিকে ডালপালা আঁকড়ে ধরবার সুবিধের জন্যে। সামনের আঙুল যে মাংসপেশীদ্বারা চালিত হয়, পিছনের আঙুলটি তা দিয়ে চালিত না হয়ে ভিন্ন পেশী দ্বারা চালিত হয়। একপাদের পিছনের আঙুলের পরিচালক মাংসপেশীর শক্তি খুব প্রবল হয়েছে। সে যেখানেই বসে সেখানে পিছনের আঙুল সর্বদাই জোরে চেপে ধরে। মাটিতে তার পায়ের দাগে এই পিছনের আঙুলের চাপই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। স্বাভাবিক গতির দাগ ঠিক এর উল্টো হওয়া উচিত, কারণ মাটিতে চলবার সময় সামনের আঙুলে জোর পড়াই রীতি। অন্যান্য কাকের পায়ের দাগ এই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী।

একপাদের আহার্য্য ঠুক্‌রে খাবার প্রণালী তার বর্তমান অবস্থার অনুযায়ী। অন্যান্য কাকেরা আহার্য্য সামনে রেখে, অথবা একটা পায়ে চেপে ধরে, যেদিকে খুসি ঘাড় বাঁকিয়ে, অথবা সোজাসুজি ঠুক্‌রে খায়। একপাদ কেবলমাত্র ডানদিকে ঘাড় বাঁকিয়ে খেতে পারে। এটা তার এত অভ্যাস হয়ে গেছে যে আমি তাকে অন্য কোনরকমে খেতে দেখিনি।

অন্য কাক যেদিকে ইচ্ছে সেই দিকে ঘুরে দেখে, বসে, উড়ে যায়, আহার্য্য অনুসন্ধান করে, শত্রুর খবর নেয়, ইত্যাদি; কিন্তু একপাদ প্রায়শঃই বাঁদিকে ঘুরে এই সব কাজ করে। দেখে যেন মনে হয় যে সে তার বাঁ পাটাকে খুটি করে সেইদিকে ঘুরে যাবার সুবিধে পায়। কোন সময়ে সে যদি ডানদিকে ঘোরে, তবে তাকে দু'চারবার লাফিয়ে নিজেকে সামলে নিতে হয়।

অঙ্গহীন কাকের পক্ষে দলে বাস করা একপ্রকার অসম্ভব। অন্য কাকেরা সে রকম সঙ্গীকে যে কেবল অগ্রাহ্য করে এমন নয়, তাকে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে যতক্ষণ না দলছাড়া করে ততক্ষণ তারা ক্ষান্ত

হয়না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি যে একপাদ তার নিজ শক্তিতে দলপতির আসন গ্রহণ করেছে। এটা খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। কারণ জীবজগতে যে স্বাভাবিক নির্ব্বাচন (natural selection) ব্যাপার চলেছে তার ফলে কোন দলের মধ্যে অযোগ্যের স্থান নেই। আমি তাকে একবার একটা ক্ষুদ্র লড়াই করতে দেখেছিলাম। একটা কাক, বোধ হয় ভিন্ন দলের, হঠাৎ এসে সে যেখানে মাটিতে বসে ভোজন করছিল, সেখানে উপস্থিত হয়ে তার চারদিকে ঘুরে দেখল যে একপাদ অঙ্গহীন। অমনি সে একপাদকে দুই একটা ঠোকর মারল। একপাদ অনেকটা দূরে, রাস্তার ওপার পর্য্যন্ত, উড়ে গিয়েই এমন জোরে ফিরে এসে সেটাকে একটা ছোঁ মারলে যে সে ব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করতে পথ পেলেনা। তারপর সে আততায়ী আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সাহস করলে না।

সকল কাক একই রকমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে কিনা তা জানবার উপায় নেই, কারণ তাদের চিনে রাখা দায়। অঙ্গহীন হওয়ায় একপাদকে চিনতে কষ্ট হয় না। তবে তার সঙ্গীদের যতটা লক্ষ্য করবার অবকাশ পেয়েছি, তাতে তাদের কোন বিশেষত্ব দেখতে পাইনি। একপাদ নিতান্তই অনন্যসাধারণ।

এবারে প্রায় তিনমাস হল সে চলে গেছে, আর ফেরেনি। সে জীবিত আছে, কি তার নিয়তির দেখা পেয়েছে, তা জানিনে। সে নিজে এসে না জানালে কেমন করে জানব? সে যদি আর না আসে তবে আমার মনের কোণে যে একটা কালদাগ পড়বে না তা বলতে পারিনে।

প্রাচীন হিন্দুর উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব

শ্রীসত্যভূষণ সেন

উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ

চরকের মতে উদ্ভিদের চারিটি শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে।

(১) বনস্পতি—যে বৃক্ষ ফল উৎপাদন করে, অথচ তাহাতে পুষ্পের উদ্গম হয় না।

(২) বানস্পত্য—যে বৃক্ষ পুষ্প এবং ফল উভয়ই উৎপাদন করে।

(৩) ওষধি * —ফল উৎপাদনের পরেই যে সকল উদ্ভিদের আয়ুষ্কাল শেষ হয়।

(৪) বীরুধ—শাখাপল্লব সমন্বিত অন্যান্য উদ্ভিদ।

সুশ্রুতপাণি চরকের এই শ্রেণীবিভাগের উপরে ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—বীরুধ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা,

(১) লতা এবং (২) গুল্ম। ওষধি দুই প্রকার—

* ডাক্তার শীল তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন—'ঔষধি'।

(১) বৎসরজীবিই হউক বা বহুবৎসরজীবিই হউক, একবার মাত্র ফল উৎপাদন করিলেই যাহার আয়ুঃশেষ হয়।

(২) যাহার বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইলেই আয়ুঃশেষ হয় কিন্তু কোন প্রকার ফল উদ্গম হয় না, যেমন দুর্ব্বা জাতীয় ঘাস।

সুশ্রুতের শ্রেণীবিভাগ চরকের সহিত অভিন্ন। কিন্তু তাঁহার ভাষ্যকার **দল্হন** কিছু কিছু বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বনস্পতির উদাহরণ দিয়াছেন প্লক্ষ (পাকুড়, অশ্বত্থ) এবং উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর)। যে সকল বৃক্ষের পুষ্প অপরিণত বিকাশের পরিচায়ক তাহাদিগকে অপুষ্পক বলিয়াই উল্লিখিত দেখা যায়। বৃক্ষ অর্থে ফলপুষ্পধারণকারী বৃক্ষ; বৃক্ষের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে আম্র এবং জম্বু (জাম)। বীরুধের দুই শ্রেণী (১) লতা এবং (২) গুল্ম। ওষধি অর্থ যে সকল উদ্ভিদ ফলোৎপাদনের পরেই শুষ্ক হইয়া যায় (ফলপাকনিষ্ঠাগোধূমাদয়ঃ), যেমন যব, গম প্রভৃতি। কেহ কেহ ওষধির দুইটি শ্রেণী বিভাগ করেন, যথা (১) যে গুলি ফলোৎপাদনের পরেই শুষ্ক হইয়া যায়, যেমন, ধান, তিসি, ডাল প্রভৃতি; (২) যে গুলি পরিণতির চরম সীমা প্রাপ্ত হইলেই শুষ্ক হইয়া যায়, কোন প্রকার ফুল বা ফল ধারণ করে না, যেমন বেঙের ছাতা প্রভৃতি।

বৈশেষিক তত্ত্বকার **প্রশস্তপাদ** উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন এইরূপ—

(১) তৃণ—ঘাস প্রভৃতি।
(২) ওষধি—ফলপাকনিষ্ঠা উদ্ভিদ্।
(৩) লতা—
(৪) অবতান—গুল্ম প্রভৃতি।
(৫) বৃক্ষ—যে উদ্ভিদে ফল ও পুষ্প উৎপন্ন হয়।
(৬) বনস্পতি—পুষ্পহীন ফলদ বৃক্ষ।

শ্রীধর তাঁহার 'কন্দলী' গ্রন্থে ঘাসের উদাহরণ দিয়াছেন—উলপ (উলুখড়); ওষধির উদাহরণ ধব; অবতানের উদাহরণ কেতকী এবং বীজপুর (টাবা লেবু); বৃক্ষের উদাহরণ—কোবিদার (রক্ত কাঞ্চন, মন্দার ও পারিজাত); বনস্পতির উদাহরণ উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর)।

উদয়ন তাঁহার "কিরণাবলীতে" লতার উদাহরণ দিয়াছেন কুষ্মাণ্ড এবং তালজাতীয় বৃক্ষকে তৃণের প্রকারভেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অমর তাঁহার '**বনৌষধিবর্গ**' এবং '**বৈশ্যবর্গ**' গ্রন্থদ্বয়ে কতকগুলি বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন যাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

(১) বৃক্ষ—(সপুষ্প বৃক্ষ এবং পুষ্পহীন বনস্পতি) ফল উৎপাদন করে এবং ইহাদের কাণ্ড দারুময় (কাষ্ঠদারু)।

(২) ক্ষুপ বা গুল্ম—ফল ও পুষ্প উৎপাদন করে।

(৩) লতা ও গুল্ম—পুষ্প ধারণ করে। লতা ভূমিতে লতাইয়া যায় অথবা বৃক্ষে আরোহণ করে।

(৪) ওষধি—(সঙ্কীর্ণ অর্থে) পুষ্পহীন অথবা পুষ্পসমন্বিত যে সকল উদ্ভিদ ফলধারণের পরেই শুষ্ক হইয়া যায়, ওষধির মধ্যে একশ্রেণী কন্দপাক। কন্দপাকের উদাহরণ পলাণ্ডু, লহুন প্রভৃতি। কতকগুলি ওষধির তৃণজাতির সহিত সাদৃশ্য আছে।

তৃণ—ঘাস ইত্যাদি। এস্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে বাঁশ এই তৃণের মধ্যে উল্লিখিত, ইহার নাম তৃণধ্বজ। নল প্রভৃতিও এই তৃণের মধ্যে পড়ে।

(৬) তৃণ দ্রুম—তালজাতীয় সমস্ত বৃক্ষ এই শ্রেণীতে পড়ে; যেমন তাল, নারিকেল, সুপারি, খেজুর প্রভৃতি।

অমরের মতে পরগাছাও লতার অন্তর্গত। এই পরগাছা অপর গাছের উপরে আরোহণ করিয়া সেখান হইতেই পুষ্টিলাভ করে। ইহাদের সহিত গুড়ুচির প্রভেদ আছে। গুড়ুচি বৃক্ষে আরূঢ় হইলেও তাহার পৃথক শিকড় থাকে। গুড়ুচির অপর নাম বৎসাদনী, ছিন্নরুহা।

বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে ভূমি অভিমুখে শিকড় নামিতে দেখা যায়—ইহার নাম অবরোহ।

এই সকল শ্রেণীবিভাগ ছাড়া হিন্দু উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে আরও তিন প্রকার উদ্ভিদের উল্লেখ দেখা যায়।

(১) আকাশ বল্লী—কোন প্রকার পরগাছা।
(২) প্লব—বদ্ধ জলাশয়ে ভাসমান উদ্ভিদ।
(৩) শৈবাল—

এই সকলের কোন শ্রেণীবিভাগ নাই। প্রকৃত পক্ষে ইহারা পাকনিষ্ঠ ওষধির মধ্যেই পড়ে।

উদ্ভিজ্জীবনের বিশিষ্টতা

বৌদ্ধ পণ্ডিত **ধর্ম্মোত্তর** তাঁহার 'ন্যায়বিন্দুটিকা' গ্রন্থে কোন কোন উদ্ভিদের রাত্রিকালে নিদ্রার কথা উল্লেখ করিয়াছেন; নিদ্রার লক্ষণ পত্রসঙ্কোচ।

উদয়ন তাঁহার "পৃথিবী নিরূপণম্" গ্রন্থে উদ্ভিজ্জীবনে নিম্নলিখিত বিশিষ্টতাসমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—জীবন, মৃত্যু, নিদ্রা, জাগরণ, রোগ, ঔষধপ্রয়োগ, বীজ হইতে বিশিষ্ট গুণের সঞ্চার, অনুকূল অবস্থার দিকে গতি, প্রতিকূল অবস্থা হইতে দূরে গমন। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সূর্য্যমুখী ফুলের নিয়ত সূর্য্য অভিমুখে গতিপ্রবণতা সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের একটা প্রসিদ্ধ প্রচলন।

জৈন লেখক **গুণরত্ন** তাঁহার 'ষড়্দর্শনসমুচ্চয়' নামক টীকাগ্রন্থে (১৩৫০ খৃঃ) উদ্ভিজ্জীবনের নিম্নলিখিত বিশেষত্বগুলির উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) শৈশব, যৌবন ও বার্দ্ধক্য।
(২) নিয়মানুগত শারীরিক বৃদ্ধি।
(৩) বিভিন্ন প্রকার গতি বা শক্তির বিকাশ, যেমন—নিদ্রা, জাগরণ, স্পর্শের প্রভাবে সঙ্কোচন বা সঙ্কোচন, কোন প্রকার আশ্রয় অভিমুখে গতি।
(৪) কোন প্রকার আঘাতপ্রাপ্তির দরুণ মৃত্যু।

(৫) জমির বিশিষ্টতা অনুসারে খাদ্যের সারগ্রহণ।

(৬) বৃক্ষায়ুর্বেদ মতে নির্দ্দিষ্ট খাদ্যগ্রহণজনিত শারীরিক উন্নতি বা অবনতি।

(৭) রোগ।

(৮) ঔষধ প্রয়োগে রোগ বা ক্ষত হইতে আরোগ্যলাভ।

(৯) প্রাণিশরীরে রসের অনুরূপ উদ্ভিদে রসের তারতম্য অনুসারে উদ্ভিদের শুষ্কতা বা বিপরীত ভাব।

(১০) গর্ভসঞ্চারের অনুকূল খাদ্য বিষয়। পুষ্পহীন বনস্পতিকে পুষ্পধারণক্ষম করিবার কথারও উল্লেখ আছে।

শঙ্করমিশ্র অতিরিক্ত আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যে কোন প্রকার ক্ষত বা ভগ্নাবস্থা হইতে আরোগ্যলাভ করিবার পক্ষে উদ্ভিদের স্বাভাবিক শক্তি আছে।

গুণরত্ন একটি তালিকাতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন কোন্ কোন্ উদ্ভিদ নিদ্রিত এবং জাগ্রত অবস্থার পরিচয় দেয়। লজ্জাবতী লতার মত কোন কোন উদ্ভিদ যে স্পর্শমাত্রেই সঙ্কোচনের পরিচয় দেয় তাহারও উল্লেখ আছে।

উদ্ভিদের পুংস্ত্রী বিশেষত্ব

উদ্ভিদের পুং স্ত্রী বিশেষত্ব সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। পুষ্পপরাগের প্রতিশব্দ দেখা যায় রজঃ, পুষ্প, প্রসূন; গর্ভকেশর বলিতেও এই সকল নামের প্রয়োগ দেখা যায়। **অমর** পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন যে এসকল বিষয়ে এবং নামেও পুং স্ত্রী পার্থক্য কিছু নাই। (অমর—বনৌষধিবর্গ)। **চরক** (**দৃঢ়বল**) পুং ও স্ত্রী কুটজের মধ্যে পার্থক্য করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যেগুলি শ্বেত পুষ্প এবং বৃহৎ ফল ধারণ করে সেগুলি পুং এবং যেগুলি হলুদ বা রক্তবর্ণ পুষ্প এবং ক্ষুদ্র ফল ধারণ করে সেগুলি স্ত্রী। কিন্তু এই ধারণা একেবারেই ভুল। এই সকল অস্পষ্ট ধারণা শেষে একেবারেই লোপ পাইয়াছিল। 'রাজনিঘণ্টু'তে উদ্ভিদের পুং, স্ত্রী এবং নপুংসক এই তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগের এক অদ্ভুত ধারণার উল্লেখ আছে—বৃক্ষ এবং গুল্মের বিশেষত্বের উপরে এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তির নির্দ্দেশ আছে।

উদ্ভিদের চৈতন্য

হিন্দুশাস্ত্র মতে উদ্ভিদের সুপ্ত বা গুপ্ত অবস্থাপন্ন এক প্রকার চেতনা আছে এবং তাহাদের সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতাও আছে (অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ)। **চক্রপাণির** 'ভানুমতি'তে উল্লেখ আছে যে উদ্ভিদের চেতনা এক প্রকার মোহগ্রস্ত চেতনা। **উদয়নের** মতে উদ্ভিদের এক প্রকার চেতনা আছে যাহা অবিকল্পিত এবং অতি মৃদুভাবাপন্ন। **মহাভারতে** (শান্তি পর্ব) আছে যে শীততপ, বজ্রধ্বনি এবং সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের প্রভাবে উদ্ভিদ সাড়া দেয়।*

* ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের "The Positive Sciences of the Ancient Hindus" গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

মৃত্তিকা

শ্রীলক্ষ্মণলাল বর্ম্মণ

১৩৩৪ সালের শীত সংখ্যার "প্রকৃতি"তে আমার মৃত্তিকা প্রবন্ধটী বাহির হতে বন্ধুবান্ধবরা বল্লেন—"এ লেখা ত কেতাবী ধরণের (theoretical) হয়েছে, এমন কিছু লেখ যাতে কাজের কথা থাকে।" কথাটী কানে বেশ লেগেছিল। উত্তরে বলেছিলাম "সে ত বুঝলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকলে লেখা অসম্ভব। আর এ নয় যে দু'চারটী ইংরাজী বই হ'তে তর্জ্জমা করে ফেলব। ইংরাজদের কৃষির পদ্ধতি, তাদের দেশের জলবায়ু আমাদের দেশের কৃষিপদ্ধতি, আবহাওয়া হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।"

এই দীর্ঘ কয় বৎসর তাই আর কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। এখন এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট হতে যৎকিঞ্চিৎ তথ্য সংগ্রহ করেছি। সেই সংগৃহীত তথ্য অবলম্বন করে বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনায় সাহসী হয়েছি। আমার এই চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে জানি না। যদি "প্রকৃতি"র সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা এতে কিছুমাত্র আনন্দ পান, আমার শ্রম সার্থক হবে।

পূর্ব্বে আমি মাটিকে রাসায়নিকভাবে ভাগ করেছিলাম। এখন আমরা মাটিকে ভাগ করব সাধারণভাবে। সাধারণতঃ আমরা মাটি বলতে আঁটাল মাটি, দোঁয়াশ, বেলে দোঁয়াশ, ফাঁস মাটি, বেলে মাটি, চুণ মাটি, কথা মাটি, সার মাটি, বোদ মাটি, লোণা মাটি, উষর মাটি, লৌহ মাটি বুঝি। আমরা একে একে তাহাদের গুণাগুণের আলোচনা করব।

আঁটাল মাটি—চটচটে আঁটাল। এই মাটিতে alumina চূর্ণ বেশী থাকে।

দোঁয়াশ মাটি—এতে বেশীর ভাগ কাদা (clay), কিছু কিছু চুণ ও সার মাটি থাকে। বালুকা কাদার অপেক্ষা কিছু কম থাকে তবে চুণ ও সার মাটির চার পাঁচ গুণ থাকে।

বেলে দোঁয়াশ—এ মাটিতে দোঁয়াশ মাটিতে যা থাকে তার প্রায় সবই থাকে, কেবল বালির অংশ কিছু বেশী। সেজন্য দোঁয়াশ মাটির তুলনায় বেলে দোঁয়াশ নিকৃষ্ট। রসধারণ শক্তি এর কম এবং উত্তাপ বিকিরণ করে কিছু বেশী। তবে এতে কিছু সার মাটি সংযোগ করলে মৃত্তিকার রসধারণ ও রসশোষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়।

ফাঁস মাটি—বালুকাই বেশী। দোঁয়াশ মাটির অল্পাধিক উপাদান থাকায় ইহা বেলে মাটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বর্ষাকালে ও বর্ষার পর দুই এক মাস পর্য্যন্ত সরস থাকে।

বেলে মাটি—বালুকার প্রাধান্য। সার মাটি মোটেই থাকে না বলিলেও হয়।

চুণ মাটি—ইহাতে ৫ হইতে ২০ ভাগ চুণ থাকে। সার দিয়া কার্য্যোপযোগী করা যায়। তবে চুণের শক্তিকে হ্রাস করবার জন্য বহু পরিমাণে সার মাটি দেওয়া প্রয়োজন।

কথা মাটি—অত্যন্ত চুণ থাকে, প্রায় ২০।২৫ ভাগ পর্য্যন্ত।

সার মাটি—ইহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ বেশী থাকে। রসধারণ শক্তি এ মাটির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। উত্তাপ নিক্ষেপ করে অতি কম।

ঘোর মাটি—শুষ্ক অবস্থায় অগ্নি সংযোগে জলে উঠে এবং লঘু বলে জলে ভাসতে থাকে। সিক্ত অবস্থার বর্ণ ঘোর মসিবৎ, শুষ্ক অবস্থায় গোড়া মাটির ন্যায় খসখসে। এ মাটিতে কোন গাছপালা হয় না।

লোণা মাটি—লবণ অত্যধিক। চাষ-আবাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।

উষর মাটি—গ্রীষ্মকালে লবণ ফুটতে থাকে। মাটিতে সাজিমাটি, সোডা বেশী থাকে। বর্ষাকালে লবণ ধৌত হয়ে যায়, নয় তো নিম্নে নেমে যায় বলে চাষ করা যায়; নতুবা বার মাস চাষ করা যায় না।

লৌহ মাটি—লাল। জলে ওগুলে জল লাল হয়ে যায়। লৌহসঙ্কুল পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানের জমিগুলি এরূপ হয়।

আমরা মাটিকে মোটামুটি ভাবে ভাগ করে তাদের গুণাগুণের বিষয় আলোচনা করে জানলাম যে জলবায়ুর উপর মাটির গুণাগুণ কতটা নির্ভর করে। তবে মানুষ কৃত্রিম উপায়ে মাটির জমিকে সরস করতে পারে। কৃষির এই তো কৌশল। সেজন্য আমরা নানারকম মাটি নিয়ে যা জানা আবশ্যক, তাই বললাম। এখন আমরা আলোচনা করব মৃত্তিকাকে সরস বা চাষ-আবাদের উপযোগী করবার সাধারণ কৃত্রিম উপায়গুলি।

নয়াঞ্জলি খনন করা—

যে জমি বদাল বেশী বা বেশী ভিজা, তাহার উন্নতিসাধন করবার জন্য হয় জমিকে কিছু উঁচু করতে হয় নতুবা সুবিধা থাকলে তাহার চারি পার্শ্বে নয়াঞ্জলি খনন করতে হয়। এতে তিনটী উপকার পাওয়া যায়। প্রথম জল নিম্নে চলে যায়, তাতে জমির আর্দ্রতা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ নয়াঞ্জলির মাটি দ্বারা জমিকে উঁচু করতে পারা যায়। তৃতীয়তঃ অতিরিক্ত জল বার হয়ে গেলে মাটির মধ্যে বায়ু প্রবেশের পথ সুগম হয়।

নয়াঞ্জলি সকল জমিতে করা উচিত নয়। যেমন বেলে মাটি; এ সব জমিতে জল যত থাকে তত ভাল। বরং চারদিকে আল দিলে ভাল।

নয়াঞ্জলি খনন করলেই হবে না। জমির শস্তর দিকে লক্ষ্য রেখে নয়াঞ্জলির গভীরতা রাখতে হবে। পটল, অড়হর, গাজর প্রভৃতি দীর্ঘমূল ফসলের আবাদ করতে হলে জমির পার্শ্বে আবশ্যকমত গভীর নয়াঞ্জলি কাটায় লাভ আছে। নতুবা গোধূম, ছুট্টা, তিসি, সরিষা, ও সাময়িক তরিতরকারীর উদ্ভিদ অল্পদিন স্থায়ী হয়। এদের মূল বহুদূর প্রসারিত হয় না। এদের জন্য পগার কাটবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

একটি কথা বলতে ভুল হয়েছে। নয়াঞ্জলি কাটলেই হল না, এর জল বার করবার ব্যবস্থা করতে হবে।

সেচন—

জলসেচন করবার পক্ষে সন্ধ্যাকালই উৎকৃষ্ট সময়। তখন রৌদ্রের প্রখরতা থাকে না, জলও বাষ্পীভূত হয় না, জমিতে সব জল পায়। বর্ষাকালে বৃষ্টি না হ'লে সেচন করা উচিত, কিন্তু বৃষ্টির

সম্ভাবনা থাকলে সেচন করা উচিত নয়। মাটি "ঝারা" করে অর্থাৎ মাটিকে খুরপি বা কোদাল দিয়ে চেলে নিয়ে পরে সেচন করবে, এতে জল সর্ব্বত্র সমানভাবে শোষিত হবে।

আবরণ (mulching)—পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমি কিছু বলেছিলাম। কিন্তু ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক আর আমাদের দেশের লোকেরা এর বিষয়ে খুব কমই জানে বলে আমি আবার কিছু বলতে চাই। আবরণ দেওয়া যায় উপরিভাগের মাটিকে সাধ্যমত চূর্ণীত করে বেশ ঘনভাবে নিম্নস্থ মাটিকে ঢেকে দিলে। তাতে নিম্নতলস্থ মাটি সরস ও ক্রিয়াশীল থাকে। একে কৃষকেরা "নিড়েন" দেওয়া বলে। মৃত্তিকা ব্যতীত সার দিয়েও আবরণ দেওয়া যায়। তাতে অধিক উপকার পাওয়া যায়, কারণ তাতে প্রথমতঃ আবরণের কার্য্য হয়, দ্বিতীয়তঃ উক্ত সার দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। আঁশাল বা স্থূল উদ্ভিজ্জ পদার্থ, গবাদি পশুর পুরীষ কিংবা উদ্ভিজ্জ ভস্ম এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ কাজে লাগে। এ প্রকার সার দ্বারা গাছের গোড়া ঢেকে রাখলে এক পসলা বৃষ্টিতে স্থানীয় মাটি তত দৃঢ়রূপে জমাট বাঁধতে পারে না। মাটিকেও সব সময়ে চালনা করতে হয় না। আবরণ সূত্র হৃদয়ঙ্গম করলে কি কৃষক কি উদ্যানক জলসেচন ও খুরপি করবার নিরন্তর পরিশ্রম থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে।

আগাছা—বর্ষাকালে ভূকর্ষণ সময়ে কৃষকগণ ক্ষেত্রস্থ আগাছাকেই ভূশারী করে পচতে দেয়। একে পচান চাষ কহে। সময়াভাবে এদেরকে না পুড়িয়ে, কোন স্থানে পচিয়ে পরে ক্ষেত্রে সাররূপে ছড়িয়ে দিলে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়।

উপকারিতা অপেক্ষা আগাছার অপকারিতা অধিক বলে আগাছাবৃদ্ধির কেহ প্রশ্রয় দেয় না। অপকারিতার মধ্যে প্রথমতঃ এরা ফসলের খাদ্য গ্রহণ করে, দ্বিতীয়তঃ এদের জন্য ফসলের স্থান সঙ্কুলান হয় না, তৃতীয়তঃ নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ এসে ক্ষেত্রের ফসলাদি নষ্ট করতে থাকে। আগাছা বিনাশের উপায় ঘন ঘন বীজরোপণ করা।

আগাছার উপকারিতা এই যে এরা ক্ষেত্রে আবরণের কার্য্য করে সুতরাং ক্ষেত্র হতে উত্তাপ ও রস বাহির হয় না। মাটি সরস ও ঠাণ্ডা থাকে। আবাদবিজ্ঞান মতে পর্য্যায় যে কত উপকারী তা আমাদের সরল কৃষক বহুদিন থেকে জানে। অনেক জমি ভালামুল উদ্ভিদের উপযোগী না হতে পারে, কিছুদিনের জন্য সারহীন হয়ে থাকতে পারে। তাতে তখন দীর্ঘমূল ফসলের আবাদ করলে খাদ্যের অভাব হয় না, এদিকে উপরের জমি সারবান হতে পারে। পর্য্যায় যে কেবল এইমাত্র উপকার করে তা নয়। পর্য্যায়ে কীট বিনাশ হয়। বিভিন্ন ফসলের সময় বিশেষ বিশেষ কীটের আগমন ও বৃদ্ধি হয়, পর্য্যায় ক্ষেত্রে কীট বিশেষকে বাসা বাঁধতে দেয় না। এজন্য ক্ষেত্রের পক্ষে এ বিশেষ উপযোগী। একবার ক্ষেত্রে কীটের আস্তানা হলে তাদের দূর করা যে কি রকম কষ্টসাধ্য তা কৃষক ও উদ্যানকই ভাল করে জানে। আমরা এতক্ষণ কৃত্রিম উপায়ে মৃত্তিকার উৎকর্ষবিধানের বিষয় বললাম। এদিকে প্রকৃতি যে অন্তরালে চুপে চুপে মাটির উৎকর্ষবিধানের কত কি কচ্ছেন তার আমরা কি খবর রেখেছি? পাশ্চাত্য জগৎ কিন্তু এ সব রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত। পরে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করব। তবে এটুকু বলে রাখি যে মহীলতা, উচ্চিংড়ে, মূষিক, গন্ধমূষিক, কেঁচো, প্রভৃতি মৃত্তিকার মধ্যে সুড়ঙ্গ ক'রে তাতে বায়ুপ্রবেশের পথ সুগম করে দেয়।

আমরা পরিশ্রান্ত হই কেন ?

কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়

দৈনিক রেল-যাত্রীদিগকে অনেক সময়েই ছুটিয়া গিয়া ট্রেন ধরিতে হয়, আর বেঞ্চিতে বসিয়াই হাঁপাইতে হয়। ট্রেন ধরিবার জন্যই হউক আর যে কোন কারণেই হউক খানিকটা ছুটিবার পর, কিংবা অত্যধিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের পর সকলকেই হাঁপাইতে হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম লওয়ার পর আবার সুস্থ হওয়া যায়। ইহার কারণ কি ? কেহ অনবরত দৌড়াইতেই বা পারে না কেন ?

শরীরের আয়াসজনিত কার্য্যকে ব্যায়াম বলে। ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইলে অঙ্গ-চালনা করিতে হয় অর্থাৎ মাংসপেশীগুলিকে উত্তেজিত করিতে হয়। সুতরাং ব্যায়াম করিলে আমাদের শরীরে কি কি ব্যাপার ঘটে তাহা জানিতে হইলে আমাদিগকে মাংসপেশীর মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

গত একশত বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মাংসপেশী লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন এবং বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে ব্যাঙের মাংসপেশী লইয়া পরীক্ষা করাই প্রথা ; কারণ উহা খুব সহজপ্রাপ্য। একটী সদ্যোহত ব্যাঙের পায়ের একটী পেশী বেশ সাবধানে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে উহা কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, অর্থাৎ উত্তেজিত করিলে সঙ্কুচিত হয়। পর পর অনেক-বার উত্তেজিত করিলে সেটী ক্রমশঃ শ্রান্ত বা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আবার ঐ পেশীটীকে অক্সিজেন জোগাইতে না পারিলে, কিংবা ৩৫° ডিগ্রি (সেণ্টিগ্রেড) উত্তাপের অধিক রাখিলে উহা প্রাণহীন হইয়া যায়।

আবার ইহাও দেখা যায় যে যদি কোন উপায়ে পেশীর রক্তসঞ্চালন বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তবে উহা অতি শীঘ্র শ্রান্ত হইয়া পড়ে। দুইটী মাংসপেশী বিচ্ছিন্ন করিয়া একটীকে অক্সিজেনের ভিতর এবং অপরটীকে নাইট্রোজেনের ভিতর রাখিলে দেখা যায় যে প্রথমটীকে উত্তেজিত করিলে উহা ক্রমশঃ শ্রান্ত হইয়া পড়ে, আর দ্বিতীয়টী কয়েক মিনিট পরেই একেবারে ক্রিয়াহীন হইয়া যায়। অক্সিজেন ভিন্ন দহনক্রিয়া চলিতে পারে না। রক্ত হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া তবে মাংসপেশীগুলি ক্রিয়াশীল হয়। উপরের পরীক্ষা হইতে বেশ দেখা যাইতেছে যে অক্সিজেনের অভাবই শ্রান্তির একটী প্রধান কারণ। এখন প্রশ্ন এই যে, কি উপায়ে অক্সিজেন শ্রান্তিনিরোধ করিতে পারে, আর শ্রান্তির উৎপাদকই বা কে ?

জীবকোষের সমষ্টি দ্বারা পেশী গঠিত। প্রত্যেক জীবকোষ এক একটী রাসায়নিক যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রগুলি এত ছোট যে অত্যুৎকৃষ্ট অনুবীক্ষণের সাহায্যেও ইহার সমস্ত অংশ ঠিক নির্দ্ধারণ করা যায় না। বহুকাল ধরিয়া বহু পরীক্ষা করিয়াও আজ পর্য্যন্ত ইহার স্বরূপ নির্ণয় করা সাধ্য হয় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের পরস্পর সংযোগ-বিয়োগের দ্বারাই জীবকোষের মূল প্রকৃতির বিকাশ হয়।

মাংসপেশীতে কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আছে, আর অন্যান্য কয়েকটী ধাতুও অতি সামান্য পরিমাণে আছে। ইহার শতকরা ৭৫ ভাগ জল, ১৮ ভাগ আমীষজাতীয়, ২-৫ ভাগ স্নেহজাতীয় এবং ১-২ ভাগ লবণজাতীয় পদার্থ। আর মাংসপেশীতে glycogen বা জীবশর্করা বলিয়া এক প্রকার শ্বেতসার থাকে। অন্য শ্বেতসারের ন্যায় এই জীবশর্করাও অতি সহজে সাধারণ শর্করা বা দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হয়। প্রত্যেক পেশীতে কিছু পরিমাণ জীবশর্করা সঞ্চিত থাকে। পেশী যখন ক্রিয়াশীল হয় তখন এই জীবশর্করা তাহার ইন্ধন স্বরূপ হয়। অক্সিজেন যোগে জীবশর্করা দগ্ধ হইয়া অঙ্গারাম্ল বাষ্প ও জলে পরিণত হয়। এই দহনক্রিয়ার ফলে পেশীগুলি তেজঃসম্পন্ন হয়।

খাদ্য পরিপাক হইলে উহার সারভাগ যকৃতে যায়। যকৃতের ক্রিয়ার দ্বারা এই সারভাগ হইতে শর্করা উৎপন্ন হইয়া যকৃদ্‌কোষে সঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহারই কিছু অংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। আমরা যখন পরিশ্রম করি তখন জীবশর্করার ব্যয় হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পেশীগুলিও রক্ত হইতে শর্করা গ্রহণ করে। এই শর্করা জীবশর্করার ক্ষয় পূরণ করে।

শরীরে যেখানে যেমন শর্করার প্রয়োজন হয়, যকৃতে সঞ্চিত শর্করা হইতে শোণিত-ধাতু ঠিক সেইরূপ প্রয়োজনানুসারে শর্করা গ্রহণ করে। মানুষের তেজঃ যথাযথভাবে রক্ষা করিতে হইলে এই শর্করার বিশেষ প্রয়োজন।

জীবশর্করা ব্যতীত মাংসপেশীতে অপর একটী বিশিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেটী হইতেছে দুগ্ধাম্ল (lactic acid)। আগুনের উপর দুধের পাত্র চড়াইলে অনেক সময় দুধ 'ছিঁড়িয়া' যায় ও 'ছানা কাটে'। অনেক কারণে, বিশেষতঃ অধিক তাপে, দুগ্ধে দুগ্ধাম্ল-জীবাণু উৎপন্ন হয়। এই জীবাণু দুগ্ধশর্করাকে দুগ্ধাম্লে পরিণত করে ; তাহাতেই দুগ্ধ অম্লভাব প্রাপ্ত হয় এবং উহার কতক অংশ জমাট বাঁধিয়া ছানা হইয়া যায়। কোনও রূপ জীবাণুর ক্রিয়া ব্যতীত মাংসপেশীতে পেশীর ক্রিয়ার ফলেই দুগ্ধাম্ল উৎপন্ন হয়। পেশী সঙ্কুচিত হইলেই কিছু পরিমাণ দুগ্ধাম্ল উৎপন্ন হয়। অত্যধিক পরিশ্রম বা ব্যায়ামের সময় পেশীগুলিতে খুব বেশী পরিমাণ দুগ্ধাম্ল উৎপন্ন হয়। খুব বেগে ১০০ গজ দৌড়াইয়া গেলে আমাদের শরীরে প্রায় এক আউন্স বা অর্দ্ধ ছটাক দুগ্ধাম্ল অতি সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে।

অধ্যাপক এ, ভি, হিল এ সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন। তিনি পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়াছেন যে যখন কেহ পুরা দমে দৌড়ায় তখন তাহার মাংসপেশীতে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় তিন গ্র্যাম (1 gram = 15·43 gr = প্রায় দেড় আনা) করিয়া দুগ্ধাম্ল উৎপন্ন হয়। তিনি বহু পরীক্ষার দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ব্যায়ামজনিত শ্রান্তির সহিত মাংসপেশীতে উৎপন্ন দুগ্ধাম্লের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। পেশীতে যত বেশী দুগ্ধাম্ল সঞ্চিত হইবে আমরাও তত শীঘ্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িব। অক্সিজেনের কাজ হইতেছে এই দুগ্ধাম্ল দূর করা। তাই দৌড়াইবার পর আমরা হাঁপাই। অর্থাৎ জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করি। ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণের ফলে আমাদের শরীরে যত অধিক পরিমাণ অক্সিজেন প্রবেশ করিবে পেশীতে সঞ্চিত দুগ্ধাম্লও তত শীঘ্র দুগ্ধীভূত হইবে। আর আমাদেরও শ্রান্তি দূর হইবে। বিশ্রামের পর যখন আমাদের শ্রান্তি দূর হইতে থাকে, তখন ক্রমশঃ দুগ্ধাম্লের মাত্রাও হ্রাস পায়।

কিন্তু আমাদের এই অদ্ভুত দেহযন্ত্র অবশ্য অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে না। দুগ্ধাম্লের পরিমাণ যখন বৃদ্ধি হয়, তখন উহা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে পেশীস্থিত কোন দ্রব্য হইতেই উহা উৎপন্ন হয়। পেশীর জীবশর্করা হইতে দুগ্ধাম্ল উৎপন্ন হয়। পেশী সঙ্কুচিত হইলে কিছু পরিমাণ জীবশর্করা দুগ্ধাম্লে পরিণত হয়। আবার যখন পেশীটী বিশ্রাম পায় তখন সেই দুগ্ধাম্ল পুনরায় জীবশর্করায় পরিণত হয়। সমস্ত দুগ্ধাম্ল যখন জীবশর্করায় পুনঃ পরিণত হয়, তখন আমরা সম্পূর্ণভাবে স্বচ্ছন্দতা অনুভব করি।

এই পরিবর্ত্তনগুলি কি পরিমাণে হইতেছে তাহা সঠিকভাবে মাপা যায়। ইহার এক উপায় হইতেছে যে যখন পেশী সঙ্কুচিত হয় তখন সেই ক্রিয়ার জন্য যেটুকু তাপ উৎপন্ন হয় তাহা মাপা। ইহা খুব সহজসাধ্য নয়। তাপ এত কম উৎপন্ন হয় যে উহা নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু অধ্যাপক হিল এই উদ্দেশ্যে একটী অভিনব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি একরূপ Thermopile বা বৈদ্যুতিক তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করেন। ইহার দ্বারা এক ডিগ্রির একলক্ষ ভাগের এক ভাগ তাপ নির্ণয় করিতে পারা যায়। এইরূপ যন্ত্রের সহায্যে তিনি দেখিয়াছেন যে ব্যায়ামের সময় প্রতি এক এক গ্র্যাম্ দুগ্ধাম্ল উৎপন্ন হইতে ৩৭০ ক্যালরি উত্তাপ জন্মে।

ব্যাঙের পেশী একবার সঙ্কুচিত হইলে উহার উত্তাপ ১০০০ ডিগ্রি (সেন্টিগ্রেড্) বৃদ্ধি হয়। আবার পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তনের সময়, যখন এক গ্র্যাম্ দুগ্ধাম্ল পুনরায় জীবশর্করায় পরিণত হয়, তখন ৩৭০ ক্যালরি তাপ শোষিত হয়। আমরা এই ঘটনাগুলি নিম্নলিখিত ভাবে দেখাইতে পারি—

সঙ্কুচন অবস্থা

জীবশর্করা → দুগ্ধাম্ল + তেজঃ

বিশ্রাম অবস্থা

দুগ্ধাম্ল → জীবশর্করা − তেজঃ

জীবশর্করা + অক্সিজেন → অঙ্গারাম্ল ও জল + তেজঃ

কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রকৃতির রাজ্যে শূন্য হইতে কোন ভাব-পদার্থ পাওয়া যায় না। এই তেজঃ আসিল কোথা হইতে? উপরোক্ত পরিবর্ত্তন ক্রিয়ায় যখন ছয়টী অণু দুগ্ধাম্ল জীবশর্করায় পরিণত হয়, তখন একটী অণু খরচ হইয়া যায়। উক্ত ক্রিয়ায় যতটুকু তেজের প্রয়োজন তাহা এই একটী অণু দুগ্ধাম্ল হইতে পাওয়া যায়। কোন দহনক্রিয়ায় যেরূপভাবে তেজঃ পাওয়া যায়, ইহাও সেইরূপ। ঠিক যেভাবে কয়লা পুড়িবার সময় উহা অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হয়, এই দুগ্ধাম্ল সেইরূপ অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া তেজঃ উৎপন্ন করে। এইজন্যই ব্যাঙের বিচ্ছিন্ন পেশীকে অক্সিজেন জোগাইতে হইবে, নচেৎ উহা বাঁচিবে না। আর সেইজন্যই ব্যাঙ বা মানুষ যে কোন প্রাণীকে শ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের চলিতে-ফিরিতে, উঠিতে-বসিতে, সামান্য কাজ করিতে হইলেও পেশী চালনা করিতে হয়, সুতরাং দুগ্ধাম্ল উৎপন্ন হয়। আমাদের সাধারণ শ্বাসগ্রহণের ফলে শরীরে যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রবেশ

করে তাহাতেই এই দুগ্ধাম্ল পুনরায় জীবশর্করায় পরিণত হইয়া যায় এবং আমরা শ্রান্তি অনুভব করি না। এক ঘণ্টায় ৪ মাইল ভ্রমণ করিলেও আমাদের জোরে শ্বাস লইতে হয় না। কিন্তু আমরা যখন বেগে দৌড়াইতে আরম্ভ করি, তখন বহির্বায়ু হইতে প্রায় মোটেই অক্সিজেন গ্রহণ করি না। আমাদের দেহের পূর্ব্বসঞ্চিত তেজের সাহায্যে আমরা দৌড়াইতে পারি। ব্যায়ামের শেষে আমাদের অধিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করিতে হয় অর্থাৎ হাঁপাইতে হয়। এই সময়ের দহনক্রিয়ার ফলে যে তেজঃ উৎপন্ন হয় তাহার দ্বারা নষ্ট তেজের পুনরুদ্ধার হয়।

পূর্ব্ব-সঞ্চিত তেজঃ ধার করিতে পারি বলিয়াই আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিতে পারি। ইহাকে "অক্সিজেন ঋণ" বলে। ব্যায়ামের সময় আমরা এই ঋণ গ্রহণ করি, আর ব্যায়ামের শেষে বিশ্রামের সময় বহির্বায়ু হইতে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া এই ঋণ পরিশোধ করি। ব্যায়ামের ফলে যে পরিমাণ দুগ্ধাম্ল উৎপন্ন হয় তাহা পুনরায় জীবশর্করায় পরিণত করিতে হইলে যতটুকু পরিমাণ অক্সিজেন লইতে হয় তাহাই "অক্সিজেন-ঋণ"।

যখনই কেহ খুব বেগে দৌড়াইতে আরম্ভ করিবে তখনই তাহাকে হঠাৎ অত্যধিক তেজঃ গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণতঃ ব্যায়ামের ২ বা ২½ মিনিট পরেই তাহার "অক্সিজেন-গ্রহণ" অর্থাৎ যে পরিমাণ বায়ু সে ফুস্ফুসে ঢুকাইতে পারে, তাহা স্থির ভাবে বৃদ্ধি পায়। ২½ মিনিট পরে তাহার শ্বাস-গ্রহণ শক্তি চরম সীমায় পৌছায়। যতক্ষণ সে দৌড়াইবে ততক্ষন এই শ্বাসগ্রহণের মাত্রা অচল থাকিবে। ইতিমধ্যে মাংসে যে দুগ্ধাম্ল উৎপন্ন হইতেছে তাহা পেশী হইতে রক্তে চলিয়া যায় এবং সেখান হইতে দেহের সর্ব্বত্র গমন করে। এই সময় এক অভিনব ব্যাপার ঘটিতে পারে। যদি ব্যায়ামকারী তাহার সমস্ত মাংসপেশী চালনা না করে তবে যে পেশীগুলি ক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকে সেগুলি রক্ত হইতে উক্ত দুগ্ধাম্লের কিয়দংশ গ্রহণ করে। এই সমস্ত পেশীতে ঐ শোষিত দুগ্ধাম্ল সহজেই জীবশর্করায় পরিণত হয়। এইরূপে শরীরের এক স্থানে উৎপন্ন দুগ্ধাম্ল অপর স্থানে গিয়া অপনীত হয়। দুগ্ধাম্লের অপনয়ন বলিতে শ্রান্তির অপনয়ন বুঝায়। তাই ডাঃ হিল বলিতেছেন, "আমাদের পদদ্বয়ের শ্রমকাতরতা বাহুদ্বয়ে গিয়া নিবৃত্তি পায়।" যখন কেহ কেবল পদ, বা কেবল হস্ত চালনা করে, তখন সে এইরূপে শ্রান্তিদুর করিতে পারে। কিন্তু সমস্ত অঙ্গ চালনা করিলে আর ঐ সুবিধা থাকে না। সে ক্ষেত্রে শরীরে উৎপন্ন দুগ্ধাম্লের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে পেশীগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং শক্ত হইয়া যায়। অবশেষে ব্যায়ামকারী একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং বিশ্রাম লইতে বাধ্য হয়। বিশ্রামের সময় শরীরে বেশী করিয়া অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং দুগ্ধাম্ল আবার জীবশর্করায় পরিণত হয়।

প্রফেসার হিল বলেন, "এইরূপে ব্যায়ামের পর অক্সিজেনের সদ্ব্যবহার করিয়া যদি আমাদের দেহ তেজঃ অর্জ্জন করিতে না পারিত, তাহা হইলে মানুষ কখনও অধিক ব্যায়াম করিতে পারিত না, সিঁড়ি দিয়া দৌড়াইয়া উপরে উঠা অসম্ভব হইত, কিংবা ঘণ্টায় ৮।৯ মাইলের বেশী কেহ হাঁটিতে পারিত না। আমরা তাহা করিতে পারি তাহার কারণ এই যে প্রকৃতি আমাদের দেহে এরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যে আমরা কিছু পরিমাণ অক্সিজেন ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিতে এবং পরে উহা পারিশোধ করতে পারি।"

যে যতবড়ই পালোয়ান হউক না কেন, তাহাকে দুইটী জিনিষ মানিয়া চলিতে হইবে। প্রথম,—তাহার পেশীগুলি কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক দুগ্ধাম্ল সহ্য করিতে পারিবে না। যখন পেশীতে দুগ্ধাম্লের মাত্রা এই চরম সীমায় আসিয়া পৌছাইবে তখন ঐ পেশী আর কার্য্য করিতে পারিবে না, তাহাকে থামিতেই হইবে। দুগ্ধাম্লের কার্য্যকে প্রতিহত করিবার এই যে ক্ষমতা, ডাঃ হিল তাহাকে ব্যায়ামকারীর "মূলধন" বলিয়াছেন। দ্বিতীয়,—যে পরিমাণ অক্সিজেন সে গ্রহণ করিতে পারে তাহাও সীমাবদ্ধ। কারণ সেটী তাহার ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ডাঃ হিল ইহাকে ঐ ব্যক্তির "আয়" বলেন। ব্যায়ামকারীর "মূলধন" ও "আয়" মিলিত হইলে যাহা হয় তাহাই তাহার শ্রান্ত হইবার প্রতিবন্ধক। যখন দুইটীই খরচ হইয়া যায় তখন সে সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে।

ব্যায়ামের পর বিশ্রামজন্য সুখ অনুভব করিতে যে সময় লাগে তাহা ব্যক্তিবিশেষের ফুস্‌ফুসের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। কেহ কেহ খুব দ্রুত শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে ; ইহাদের অক্সিজেন-ঋণের পরিমাণ খুব বেশী হইতে পারে। নিত্য ব্যায়ামশীল ব্যক্তি মিনিটে ৪ লিটার (এক letr প্রায় এক সের) অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারে। কোন কোন পালোয়ান ব্যায়ামের পর ১৫ হইতে ২০ লিটার অক্সিজেন গ্রহণ করিতে পারে। এই অক্সিজেন সর্ব্বশরীরে বিক্ষিপ্ত করিতে হইলে হৃৎপিণ্ডকে খুব তেজে রক্ত সঞ্চালিত করিতে হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে যদি কেহ মিনিটে ৬ লিটার অক্সিজেন গ্রহণ করে তাহা হইলে হৃৎপিণ্ডকে মিনিটে ৫৬ লিটার রক্ত উৎক্ষিপ্ত (pump) করিতে হয়। সুতরাং মাঝে মাঝে হৃৎপিণ্ড যে এই চাপ সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

মানুষ কতটুকু পরিশ্রম করিতে পারে, তাহা নির্ভর করে তাহার দুগ্ধাম্লের পরিমাণের উপর। কতটুকু দুগ্ধাম্ল আমরা কাজে লাগাইতে পারি, কতটুকু সঞ্চিত দুগ্ধাম্ল আমরা অপনয়ন করিতে পারি, এই ক্ষমতার উপর আমাদের সমস্ত কার্য্যশক্তি নির্ভর করে।

জলস্তম্ভ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়

জগতে বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে ; জলস্তম্ভ উহাদের অন্যতম। উহাদের দর্শনে মন যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। সমস্ত সমুদ্র ও বৃহৎ জলাশয়ের উপরে জলীয় বাষ্প স্তম্ভাকারে দেখা যায় বলিয়া উহাকে জলস্তম্ভ বলে।

কখন কখন দেখা যায় যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘসমূহের নিম্নস্থিত সমুদ্রবারি ১০০ হইতে ১২০ গজ ব্যাস পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া অতি দ্রুতবেগে আন্দোলিত হইতেছে। উর্ম্মিমালা বিকম্পিত সুবিস্তীর্ণ ঐ জলরাশির মধ্যভাগ হইতে একটি জলীয় বাষ্পযুক্ত স্তম্ভ ঊর্দ্ধে উঠিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে রণশৃঙ্গের

আকারে মেঘাভিমুখে চলিতেছে ; মেঘের বিপরীত দিকে ঊর্দ্ধগামী স্তম্ভের ন্যায় অন্য আর একটি স্তম্ভ নিম্ন দিকে নামিতেছে। দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ দুইটি স্তম্ভ একত্র মিলিত হইয়া পড়ে আর ঐ মিলিত স্থানের ব্যাস ২।৩ ফুট মাত্র হইয়া আসে, সঙ্গে সঙ্গে গুড় গুড় শব্দ শ্রুত হইতে থাকে। ঐ মিলিত স্তম্ভ দুইটির দৃশ্য অতীব চমৎকার, উহার মধ্যভাগ ফিকা কিন্তু পার্শ্বদেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ (২নং চিত্র)। এই জন্যই জলস্তম্ভের মধ্য দিয়া স্বচ্ছ কাচখণ্ডের ন্যায় দূরস্থ পর্ব্বত ও জাহাজাদি পদার্থসকলকে দেখিতে পাওয়া যায়। জলস্তম্ভ একই স্থানে স্থির থাকে না ; পরন্তু স্থানীয় বায়ুর গতি অনুসারে উহা চালিত হইয়া থাকে। তবে বায়ুপ্রবাহ না থাকিলে কখন্ যে কোন্ দিকে যাইবে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

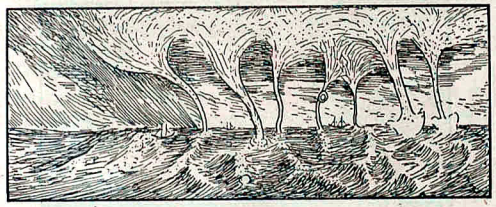

চিত্র—১

ভূমধ্য সাগরে দৃষ্ট কয়েকটি জলস্তম্ভ

জলস্তম্ভের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ প্রায়ই বিভিন্ন গতিতে চালিত হইয়া থাকে। তাহার ফলে সমস্তটা একটু হেলিয়া যাওয়া মাত্র দেখিতে দেখিতে ভীষণ শব্দ করিয়া স্তম্ভটা ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। তখন ঐ বাষ্পরাশি বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া যায় ও ঊর্দ্ধাকাশস্থিত বায়ুর অধিকতর শৈত্যপ্রভাবে জমিয়া প্রবল ধারায় নিম্নস্থ সমুদ্রের উপরে পতিত হইয়া থাকে। কখন কখন ঐরূপ জলস্তম্ভ অতি অল্পকাল স্থায়ী হয় আবার কখন বা একঘণ্টা কালও যে না থাকে এমন নহে।

শুধু যে সমুদ্রের জলরাশির উপরেই জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয় তাহা নহে। অনেক সময় স্থলভাগের উপরেও উহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে নিম্নস্থ ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ হইতে কোন ঊর্দ্ধগামী রণশৃঙ্গাকার জলরাশি বা জলীয় বাষ্প উঠিয়া ঊর্দ্ধাকাশে মিলিত হয় না। আকাশমার্গে বারামাকৃতি-বিশিষ্ট বাষ্পরাশি হইতে জলস্তম্ভ বহির্গত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন বিদ্যুৎপাত হয় ও প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করে। ঐ সময় এক প্রকার তীব্র গন্ধ অনুভূত হয়।

মধ্যে মধ্যে জলস্তম্ভ প্রবলবেগে উচ্চভূমি, উপত্যকা ও নদ নদী অতিক্রম করতঃ পর্ব্বতের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং উহার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে এইরূপ একটি

জলস্তম্ভ ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কেসায়ার প্রদেশে দেখা দেয়। উহা যখন ভাঙ্গিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল, তখন তত্রত্য অর্দ্ধ মাইল পরিমিত স্থান বিধ্বস্ত হইয়া ৭ ফুট গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছিল।

সমুদ্রের উপরে দৃষ্ট অধিকাংশ জলস্তম্ভের আকার প্রায় একই প্রকার অর্থাৎ উহার মধ্যভাগ সরু ও ছুই প্রান্ত অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর।[৮] তবে যে সকল জলস্তম্ভ স্থলভাগের উপরে উৎপন্ন হয় তাহাদের নিম্নাংশ প্রশস্ত থাকে না। সুতরাং উহাদিগকে অনেকটা গ্রামোফোনের হর্ণের মত দেখায়। সার উইল স্থলের উপরিস্থ আকাশে দৃষ্ট অনেকগুলি জলস্তম্ভের বর্ণনা করিয়াছেন। কলিকাতার ৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত দমদমা নামক স্থানে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে একটি জলস্তম্ভ দেখা

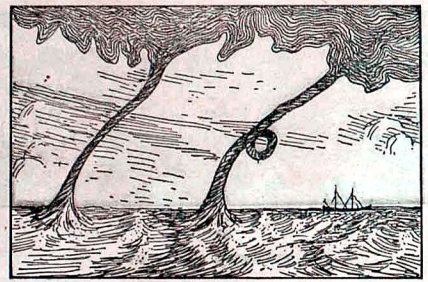

চিত্র—২

নিউ সাউথ-ওয়েলসের উপকূলে দৃষ্ট জলস্তম্ভ

দিয়াছিল। ঐ সময়টা বর্ষাকাল। সেইজন্য দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমী বাতাস ভারত-মহাসাগর হইতে যথেষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প আনিয়া হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে—উত্তর বঙ্গে—সঞ্চিত করিতে থাকে। যে সপ্তাহে ঐ স্তম্ভটি দমদমায় দেখা দেয়, সেই সপ্তাহে মাঝে মাঝে বিপরীত দিক হইতে উত্তরপূর্ব্ব মৌসুমী বাতাসও বহিতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে পূর্ব্বসঞ্চিত ঐ সকল মেঘরাশি আর অন্যত্র যাইবার সুযোগ পায় না। ঐরূপ বাধা পাইয়া মেঘরাশি দমদমার উপরে ক্রমশঃ জমিতে থাকে। ছুইটি পরস্পর বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহের সঙ্ঘর্ষের ফলে মেঘরাশি ক্রমে ক্রমে বৃত্তাকারে আকাশপথে ঘুরিতে আরম্ভ করে। ক্রমে বাতাসের গতিপথ দিবসে ছুই তিন বার পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; কখন বা দক্ষিণে হাওয়া বহে, আবার পরক্ষণেই উত্তরে বাতাস আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ ঘটিতে ঘটিতে ৭ই অক্টোবর অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকার মধ্যে বায়ুপ্রবাহের গতিপরিবর্ত্তন ও সঙ্গে সঙ্গে

মেঘরাশির বৃত্তাকারে ঘূর্ণন ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। ঐ সময় অনেকগুলি জলস্তম্ভ হইতে হইতে নষ্ট হইয়া যায়। ৪টার পর হঠাৎ বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হইয়া আসে, সমস্ত আকাশ যেন শান্তভাব ধারণ করে। দেখিতে দেখিতে একখণ্ড বৃহৎ মেঘের পৃষ্ঠদেশ যেন অবনত হইয়া ক্রমাগত ভূপৃষ্ঠের দিকে অগ্রসর হয় এবং হঠাৎ ঐ মেঘখণ্ডের মধ্যভাগ হইতে একটি প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ দ্রুতবেগে মৃত্তিকা পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। কিন্তু মৃত্তিকাসংলগ্ন হইয়া উহার নিম্নভাগ ছুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহার পরেই স্তম্ভটি ফাটিয়া যায় ও একরাশি জল ঊর্দ্ধাকাশ হইতে মাটিতে পড়িতে থাকে; মনে হয় যেন একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে অপরাহ্ন ৫টার সময় দমদমা হইতে ১০ হাজার ফুট দীর্ঘ আরও একটি প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ দেখা গিয়াছিল।

আমরা এখানে ছুইটি জলস্তম্ভের চিত্র দিলাম। প্রথম চিত্রে অনেকগুলি জলস্তম্ভ দেখা যাইতেছে। ঐগুলি ভূমধ্যসাগরের উপরে জন্মিয়াছিল। কাপ্তেন কাবেল্ল নামক এক ব্যক্তি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে উহা দর্শন করেন। উহাদের অনেকগুলির তলদেশ প্রশস্ত নহে। কিরূপে মেঘরাশি আকাশ হইতে সূক্ষ্মাগ্র হইয়া নীচের দিকে নামিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। দ্বিতীয় চিত্রটি অষ্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরস্থ নিউ-সাউথ-ওয়েলস্ প্রদেশের উপকূলের অদূরস্থ সমুদ্রপৃষ্ঠে দৃষ্ট জলস্তম্ভ ছুইটির চিত্র। উহাতে ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের ছুইটি স্তম্ভ পরস্পর মিলিত দেখা যাইতেছে। একটিতে আবার একটা পাক লাগিয়াছে। সাগরপৃষ্ঠ কিরূপে তরঙ্গায়িত ও জলরাশি ঊর্দ্ধগামী হইতেছে তাহাও সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

উৎপত্তি

জলস্তম্ভের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ একমত নহেন। ফলতঃ প্রকৃত কারণ বোধ হয় আজও সুস্পষ্টভাবে আবিষ্কৃত হয় নাই। কোন কোন বৈজ্ঞানিক পুস্তকে এমন বলা হইয়াছে যে, যে কারণে বাউড়ি, বাতাবর্ত্ত (cyclone) ও ঝঞ্ঝাবর্ত্ত (tornado) উৎপন্ন হইয়া থাকে, জলস্তম্ভের উহাই কারণ (১)। কিন্তু এই প্রকার বাক্য যে ভ্রমোৎপাদক, তাহা বলা বাহুল্য।

গ্রীষ্মকালে ধূলিময় রাস্তার উপরে অনেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণিবায়ু দেখিয়া থাকিবেন। উহার সহিত রাস্তার ধূলিকণা, শুষ্ক তৃণপত্র প্রভৃতি ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্দ্ধাকাশে উত্থিত হয়। নদীয়া জেলায় উহাকে সাধারণ লোকে "বাউড়ি" (dust whirl) বলিয়া থাকে। রাস্তার উত্তপ্ত ভূমিসংলগ্ন বায়ুর অস্থির অবস্থাই বাউড়ির কারণ; প্রখর রৌদ্রতাপে ভূপৃষ্ঠ অত্যধিক উত্তপ্ত হইয়া পড়ে, ঐ উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে নিম্নস্থ বায়ু উত্তপ্ত হইয়া যায়। যদি সমগ্র বায়ুমণ্ডল স্থির থাকে, তবে ঐ উত্তপ্ত বায়ুও কিছুক্ষণ স্থির থাকিতে পারে। পরে ক্রমাগত তাপাধিক্য বশতঃ উহা আয়তনে বৃদ্ধি

(১) "That the water spout (like its terrestrial congener, the tornado) is precisely analogous to the wide-spread cyclone or "low" on the one hand, and to the tiny whirl of dust, dry leaves, and the like over hot, dry ground on the other".—Popular Science Siftings, Sept. 7, 1912, page 518.

পায় ও অধিকতর হাল্কা হইতে বাধ্য হয় এবং সহসা উহার কিয়দংশ উপরের দিকে উঠিয়া পড়ে। আর মাধ্যাকর্ষণের ফলে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া চতুর্দ্দিক হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল বাতাস আসিয়া যে স্থানে বায়ু উর্দ্ধদিকে উঠে, সেই স্থানের উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের উপর উপস্থিত হয়। নদনদী, বনভূমি ও পর্ব্বতাদির বাধা প্রভৃতি নানা কারণে ঐ সকল বায়ুপ্রবাহ এক বিন্দুতে মিলিতে পারে না, বিভিন্ন-দিক হইতে বাতাস আসিয়া পরস্পরের সহিত ধাক্কাধাক্কি করে মাত্র। সেই জন্যই ঐ স্থানের বায়ুতে একটা ঘূর্ণিপাক উৎপন্ন হয়। বর্ষাকালে নদীর স্রোত স্থলভাগের নানা স্থানে বাধা পাইয়া অনেক সময় ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ উজানমুখে কিনারা দিয়া চলে। ঐ দুই বিপরীত জলস্রোত যে স্থানে মিলিত হয়, সেই স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি ঘূর্ণিপাক বা "ঘুল্লো" উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

বাতাবর্ত্ত

ভূপৃষ্ঠস্থ উত্তপ্ত বায়ুরাশির একাংশের ঐ ঘূর্ণি অর্থাৎ আমাদের "বাউড়ি" ঐরূপ বিপরীত-মুখী বায়ুপ্রবাহের সঙ্ঘর্ষের ফলে উৎপন্ন হয় বুঝিতে হইবে। পৃথিবী নিয়ত আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তিত হইতেছে। এই আবর্ত্তনের জন্যই সহস্র সহস্র যোজনব্যাপী বাতাবর্ত্ত (cyclone) উভয় গোলার্দ্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে কাঁটার অনুরূপ দিকে ঘুরিয়া থাকে। বাউড়ির পথ এত ক্ষুদ্র যে উহার উপর আহ্নিক গতির প্রভাব নগণ্য। সেইজন্য আমরা উহাকে কখন ডানপাকে (ঘড়ির কাঁটার অনুরূপ পাকে) আবার কখন বা বাম পাকে (কাঁটার বিপরীত পাকে) ঘুরিতে দেখি। আর এই পার্থক্যের জন্যই আমরা বাতাবর্ত্ত ও বাউড়িকে একই ঘটনার মাত্রাভেদ—ছোট বড় ভেদ—বলিতে পারি না।

বাউড়ি

একবার আমরা একটী বৃহদাকার বাউড়ি দেখিয়াছিলাম। ক্ষুদ্র না হইলে উহাকে বালুকাস্তম্ভ (sand spout) বলা চলিত। প্রথমে অতি অল্প পরিমিত স্থানের উপরের ধূলি হঠাৎ যেন পাক দিতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক তৃণপত্রাদি আকাশে উত্থিত হইয়া ঘুরপাক খাইতে থাকে। দেখিতে দেখিতে উহার আয়তন ক্রমশঃ বেশ বৃদ্ধি পায়। শেষে ৫।৬ হাত ব্যাস লইয়া উহা একই স্থানের উপর কিছুক্ষণ ঘুরিতে থাকে। অথচ সে সময়ে নিকটস্থ আম্র ও বট বৃক্ষের একটী পত্রকেও বায়ুবেগে কাঁপিতে দেখা যায় নাই; বাউড়িটা ক্রমশঃ বৃহদাকার ধারণ করে ও শেষে কিছুদূর চলিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

বায়ু যখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ বলিয়া বোধ হইতেছিল, গাছপালার সামান্য একটুও স্পন্দন অনুভূত হইতেছিল না, গুমট গরমে প্রাণ আইঢাই করিতেছিল, তখন বায়ুতে ঘূর্ণিপাক বা বাউড়িটা উৎপন্ন হইল কিরূপে? ফলতঃ স্থানবিশেষের ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন বায়ুর অত্যধিক তাপবৈষম্য ও তজ্জন্য প্রবাহিত বিভিন্নমুখী বায়ুস্রোতের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ এই বাউড়িটার উৎপত্তির প্রকৃত কারণ হইতে পারে না বলিয়া সন্দেহ হয়। তখনই মনে হয় প্রথমে উর্দ্ধাকাশের বায়ুতে কোনও কারণে ঘূর্ণিপাক উৎপন্ন হইয়া উহা ক্রমশঃ ভূপৃষ্ঠের দিকে নামিয়া আসে বলিয়াই ভূপৃষ্ঠস্থ ধূলিকণা ও শুষ্ক তৃণাদি ঐ সঙ্গে পাক দিতে দিতে উপরে উঠে।

ফলতঃ বাউড়ি, ঝঞ্ঝাবর্ত্ত, বালুকাস্তম্ভ ও জলস্তম্ভের উৎপত্তির ইহাই একটা কারণ হওয়া সম্ভব। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মত এই যে, পরস্পর বিপরীত দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহের সঙ্ঘর্ষের ফলে উর্দ্ধাকাশের বায়ুমণ্ডলে এক প্রকার ঘূর্ণিপাক উৎপন্ন হয় এবং বায়ু প্রবল বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে নিম্নের দিকে নামিয়া আসে।

ঝঞ্ঝাবর্ত্ত

ঐ পাকের সঙ্গে সঙ্গে আকাশব্যাপ্ত জলীয় বাষ্পের কণাসকল ইতস্ততঃ পার্শ্বভাগে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় মধ্যস্থলে একটি ফাঁপা স্তম্ভ হইয়া উঠে। এইরূপেই ঝঞ্ঝাবর্ত্তের উদ্ভব হয়। ফলতঃ ঝঞ্ঝাবর্ত্তের কেন্দ্রস্থলে সাধারণতঃ কলিকাকৃতি (funnel shaped) মেঘ থাকে; তথায় সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকটা আংশিক ভাবেও বায়ুহীন স্থান (vacuum) উৎপন্ন হইতে পারে। আর ঐ ঝড়ের কেন্দ্র যখন কোন গৃহের উপর দিয়া যায়, তখন ঐ গৃহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইয়া দরজা জানালা, এমন কি চাল, ছাদ ও দেওয়াল পর্য্যন্ত উড়াইয়া ফেলে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটা ঝঞ্ঝাবর্ত্তের ফলে মৈমনসিংহের জেলখানার গৃহপ্রাচীরের কিয়দংশ নষ্ট হওয়ায় কয়েকটী কয়েদীর জীবন নষ্ট হইয়াছিল, এইরূপ সংবাদ পাঠ করা গিয়াছিল।

সৌভাগ্যক্রমে এই মারাত্মক ঝঞ্ঝাবর্ত্তের কেন্দ্রস্থলের ব্যাস অধিক বিস্তৃত হয় না, মাত্র কয়েক শত গজ হইয়া থাকে, কচিৎ সিকি মাইলের অধিক প্রশস্ত হয় (২)। ইহা কয়েক মাইল মাত্র পথ ভীষণ মূর্ত্তিতে চলিয়া বেগহীন হইয়া পড়ে। যদিও এই মারাত্মক ঝড় এক কি দুই মিনিটের মধ্যেই কোন একটী স্থানের উপর দিয়া চলিয়া যায়, তথাপি ঐ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই ঐ স্থানের গাছপালা, বাড়ীঘর সব ওলটপালট হইয়া পড়ে। এক শারদীয়া পূজার সময় আমাদের ষ্টীমার যাত্রীসহ গঙ্গার উচ্চ চরে নীত হইয়াছিল। সে সময় ঝড়ের যেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করিলে এখনও যেন হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। মার্কিন যুক্তরাজ্যের দক্ষিণপশ্চিমাংশে এই ঝড় অনেক সময় দেখা যায়। ঐ অঞ্চলের লোকেরা অনেক সময় মৃত্তিকার মধ্যে গর্ত্ত কাটিয়া উহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ঝঞ্ঝাবর্ত্তের উৎপত্তির কারণ

মেক্সিকো উপসাগরের উত্তরস্থ মার্কিন যুক্তরাজ্যের মিসিসিপি নদীর উপত্যকায় অনেক সময় যে ঝঞ্ঝাবর্ত্ত দেখা যায়, তাহার কারণ ঐ অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ সমতল, পর্ব্বতবিহীন এবং ফাঁকা। সুতরাং মেক্সিকো উপসাগর হইতে উত্তপ্ত ও বাষ্পপূর্ণ বাতাস অনায়াসেই ঐদিকে আসিতে পারে। এদিকে আবার উত্তর অঞ্চলের প্রশস্ত সমতলক্ষেত্র হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল উর্দ্ধবায়ু আসিয়া উহার সহিত মিলিত হয়। এই মিলনের ফলে ঘূর্ণিপাকযুক্ত ঝঞ্ঝাবর্ত্তের উৎপত্তি ঘটে।

বালুকাস্তম্ভ

সাহারা ও অন্যান্য অনেক মরুভূমির উপর দিয়া যখন এই ভীষণ ঝঞ্ঝাবর্ত্ত বহিয়া যায়, তখন বালুকা-রাশি ঘুরিতে ঘুরিতে উর্দ্ধাকাশে প্রবলবেগে উঠিয়া থাকে। ইহাকেই বালুকাস্তম্ভ (sand spout) বলে। পদ্মা প্রভৃতি নদীর চরে অনেক সময় বাউড়ি দেখা যায়—বালুকাস্তম্ভ নহে। ফলতঃ বাউড়িকে কখন বালুকাস্তম্ভের পর্য্যায়ভুক্ত

(২) Longmans' Geographical Series, BK. III, p. 15.

করা চলে না; কেননা কোন বাউড়ি ডান পাকে আবার কোন বাউড়ি বাম পাকে ঘুরিয়া থাকে। কিন্তু বালুকাস্তম্ভ একই মুখে ঘোরে বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। দ্বিতীয়তঃ একদল বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, উর্দ্ধাকাশের একস্থানে (যেখানে সাধারণতঃ মেঘ থাকে ও ঝড় উৎপন্ন হয় সেই স্থানে) পরস্পর বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহের তাড়নে তন্মধ্য বায়ুতে একটা ঘূর্ণিপাক উৎপন্ন হয়। আর ঐ ঘূর্ণিপাক ক্রমশঃ উর্দ্ধাকাশের ঐ স্তর হইতে ভূপৃষ্ঠের দিকে নামিয়া আসে। তবে সকল ঘূর্ণিপাকই যে ভূতল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিতে পারে তাহা নহে (১নং চিত্র)।

ঐ ঘূর্ণিবায়ু বা ঘূর্ণাবর্ত্ত যদি স্থানীয় বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে সমুদ্রের উপরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সমুদ্রে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হইতে পারে। উহাতে

জলস্তম্ভের উৎপত্তি

আকাশব্যাপ্ত জলীয় বাষ্পের কণাগুলি ইতস্ততঃ পার্শ্বভাগে বিক্ষিপ্ত হওয়ায় মধ্যস্থলে একটা ফাঁপা স্তম্ভ গড়িয়া উঠে। সুতরাং যখন সমুদ্রের জলরাশির উপর ঐরূপ ঘটে, তখন উক্ত প্রদেশে বায়ুর ভার অপসারিত হওয়ার জন্য জলরাশির কতকটা উর্দ্ধাকাশে উঠিতে বাধ্য হয়।

কেহ কেহ আবার বলেন যে ঘূর্ণিপাক ও উহার ফলে উৎপন্ন কুয়াশাস্তম্ভ যদিও উর্দ্ধাকাশ হইতে নিম্ন দিকে নামিয়া থাকে, তথাপি ঐ ঘূর্ণিবায়ুর অভ্যন্তরস্থ বায়ুরাশি স্ক্রুর প্যাঁচের ন্যায় পাক দিতে দিতে উপরের দিকে উঠিয়া থাকে। এই জন্যই সমুদ্রের অনেক জল উর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে। আবার অনেকে বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, বৈদ্যুতিক আকর্ষণের জন্য মেঘসকল হইতে বিদ্যুৎ পৃথিবীপৃষ্ঠে চালিত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে জলকণাও ভূপৃষ্ঠে আসিয়া পতিত হয়। আবার পৃথিবীর বিদ্যুৎ কম হইলে জলকণাগুলি মেঘ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে থাকে। এই জন্যই জলস্তম্ভ সৃষ্ট হইয়া কখন কখন অত্যল্প সময়ের মধ্যেই আকাশে অদৃশ্য এবং পর মুহূর্ত্তেই পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইতে পারে।

জলস্তম্ভ অর্থে আমরা তথাকথিত জলের স্তম্ভ বুঝি না; বুঝি বায়ুবেগে ঘূর্ণিত জলীয় বাষ্পরাশি মাত্র। এই জন্যই ইহার মধ্য দিয়া দূরস্থ পর্ব্বতাদি পার্থিব পদার্থসকল দৃষ্ট হইতে

জলস্তম্ভ কি

পারে। কোন দ্রব্য যখন একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া বেগে ঘুরিতে থাকে, তখন উহার কেন্দ্রস্থল হইতে পরিধির দিকে একটা বল উৎপন্ন হয়। উহাকে আমরা কেন্দ্রত্যাগী (centrifugal) বল বলিতে পারি। ঐ বলের জন্য বাষ্পস্তম্ভের আয়তন যতই বৃদ্ধি পায়, উহার কেন্দ্রস্থ বায়ুর পরিমাণও ততই কমিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে উহার চাপ কমিয়া আসে; সঙ্গে সঙ্গে উহার তাপক্ষয় হয়। যে সমস্ত জলীয় বাষ্প পূর্ব্বে অদৃশ্য অবস্থায় থাকে, উহারা তাপক্ষয়ের ফলে জমাট বাঁধিয়া কুয়াশার আকার ধারণ করে। সেই জন্য দূর হইতে উহাকে জলের স্তম্ভ বলিয়া ভ্রম হয়।

যে কারণে বাউড়ি উৎপন্ন হয়, ঠিক সেই কারণে জলস্তম্ভ হওয়া যে সম্ভবপর নহে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাউড়ি স্থলবিশেষের সহসা অত্যধিক উত্তপ্ত হওয়ার ফলে উৎপন্ন

হয়। বালুকাচর অবশ্য অদূরস্থ মৃত্তিকা অপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত হওয়া সম্ভব; কিন্তু

বাউড়ি ও জলস্তম্ভের পার্থক্য

সমুদ্রাদি সুবৃহৎ জলাধারের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের তাপ সহসা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভবপর নহে। অথচ স্থলভাগের উপরে যতগুলি বাউড়ি দৃষ্ট হয়, জলভাগের উপরে তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক জলস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সমুদ্রেই যে জলস্তম্ভ বেশী দেখা দেয় তাহা নহে। নাতিশীতোষ্ণ ভূমধ্যসাগরে এবং ইংলণ্ডের নিকটস্থ সমুদ্রেও উহা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঝঞ্ঝাবর্ত্ত যেমন এক স্থানে স্থির থাকে না, জলস্তম্ভও সেইরূপ একই স্থানে আবদ্ধ না থাকিয়া স্থানীয় বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। জলস্তম্ভ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বেগহীন হয় ও ক্রমশঃ থামিয়া যায় এবং ঐ বায়ুর ঘূর্ণনবেগ যখন কমিয়া আসে তখন জলস্তম্ভও ভাঙ্গিয়া পড়ে। কোন কোন ভাঙ্গা জলস্তম্ভের বেশীর ভাগ জলই সমুদ্র হইতে উত্থিত লবণাক্ত জল নহে, মেঘ হইতে গৃহীত বাষ্পকণা মাত্র।

সকল জলস্তম্ভের আকার অবশ্য একই রূপ হয় না। উহারা কখন কখন একটি মাত্র, আবার কখন বা অনেকগুলি পাশাপাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে (১নং চিত্র)। একবার ২০টি জলস্তম্ভ একই সময়ে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। কোন কোন জলস্তম্ভের উচ্চতা এক মাইল পর্য্যন্ত হইতে পারে। আজকাল নাবিকেরা উহাকে দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভয় পায় না বটে, কিন্তু এমনও ঘটনা শোনা গিয়াছে যে বড় বড় জাহাজ উহার আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। নাবিকেরা নাকি দূর হইতে কামানের সাহায্যে উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে। জলস্তম্ভের অব্যবহিত নিম্নস্থ সমুদ্রের জলরাশি আন্দোলিত হইলেও উহার নিকট দিয়া অনেক সময় অনেক জাহাজ গমন করিয়াছে। নাবিকগণ লক্ষ্য করিয়াছে যে, ঐ সময় বায়ু চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। সুতরাং বাউড়ির ন্যায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর দিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী বাতাস বহিয়া বায়ুমণ্ডলে ঘূর্ণিপাক ও সঙ্গে সঙ্গে জলস্তম্ভের সৃষ্টি করিতে পারে না। উহার উৎপত্তির কারণ উর্দ্ধাকাশে উৎপন্ন ঘূর্ণিবায়ু মাত্র।

বিবিধ

অভিনব হাইড্রোজেন পরমাণু

প্রায় বর্ষাধিক কাল হইতে বৈজ্ঞানিকেরা এক প্রকার নূতন হাইড্রোজেন-পরমাণুর রহস্যোদ্ঘাটনে নিরত আছেন। এই অভিনব পরমাণুর ওজন সাধারণ হাইড্রোজেন-পরমাণুর দ্বিগুণ। রাসায়নিক মাত্রেই অবগত আছেন যে হাইড্রোজেন লঘুতম পরমাণু এবং তাহার ওজন এক। ইহাও তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে যে, কোনও একটি মৌলিক পদার্থের যাবতীয় পরমাণুর বস্তুমানই অভিন্ন হইবে এমন কথা বলা চলে না। অঙ্গারের সকল পরমাণুর ওজন সমান নয়,—কাহারও ওজন ১৩, কাহারও বা ১২। অক্সিজেন-পরমাণুর ওজন ১৭, ১৮ কিম্বা ১৬ হইতে পারে, যদিও ষোলই তাহার সাধারণ পরিচিত ওজন। এই প্রকার ব্যতিক্রম প্রায় সকল মৌলিক পদার্থেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু হাইড্রোজেন সম্পর্কে এই ব্যতিক্রম বৈজ্ঞানিকগণ অনুমোদন করেন নাই। কারণ হাইড্রোজেন-পরমাণুটির ওজন ১-এর স্থলে ২ হইয়া যাইবে অর্থাৎ শতকরা একশত ভাগেরই পরিবর্ত্তন ঘটিবে ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু প্রায় এক বৎসর হইল কতিপয় বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে সাধারণ হাইড্রোজেনে ১-ওজনবিশিষ্ট প্রতি চারি শত পরমাণুর মধ্যে একটি ২-ওজনবিশিষ্ট পরমাণুর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। অতঃপর তাঁহারা ২-ওজনবিশিষ্ট কতকগুলি হাইড্রোজেন-পরমাণু একসঙ্গে সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের সেই চেষ্টা সফল হইয়াছে। এক অণু জলে দুইটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে। জলের ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ পরিচালনা করিলে জলের এই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিভক্ত হইয়া এক প্রান্তে হাইড্রোজেন এবং অপর প্রান্তে অক্সিজেন নির্গত হয়। প্রচুর পরিমাণ জলে তড়িৎ চালনা করিয়া শতকরা ৯৯ ভাগ জল যখন অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন আকারে বিভক্ত হইয়া গেল, তখন অবশিষ্ট জলে যে হাইড্রোজেন রহিল তাহার অধিকাংশের পরমাণবিক ওজন দেখা গেল দুই। এইরূপে একমাত্র ২-ওজনবিশিষ্ট হাইড্রোজেন-পরমাণু ১-ওজনের পরমাণু হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা না গেলেও ২-ওজনের বহু পরমাণু একত্র সংগৃহীত হইল। এই অবশিষ্ট জল পরিস্রুত করিয়া দেখা গেল তাহার ঘনত্ব সাধারণ পরিস্রুত জলের ঘনত্ব অপেক্ষা শতকরা ১০ বেশী। ইহার স্ফুটনবিন্দু, তুষারবিন্দু এবং অন্যান্য বহু বৈশিষ্ট্যেরও সমধিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গিয়াছে।

নূতন হাইড্রোজেন-পরমাণু রসায়নের ক্ষেত্রে নানাপ্রকার কৌতূহলোদ্দীপক সমস্যার সৃষ্টি করিবে। ১-ওজনবিশিষ্ট হাইড্রোজেন-পরমাণু যোগে অজৈব রসায়নে সাল্‌ফিউরিক অম্লকে H_2SO_4 এই সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা প্রকাশ করা হয়। হাইড্রোজেনের ওজন দুই হইলে এই রাসায়নিক পদার্থটির প্রকৃতির কিছু পরিবর্ত্তন হইবে না কি? জৈব রসায়নে হাইড্রোজেন পদার্থসমূহের অন্যতম প্রধান উপাদান; সুতরাং এই ভারী হাইড্রোজেন যে জৈব রসায়নে একটা বিপুল উলটপালট ঘটাইয়া তুলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কীটদমনে তড়িৎতরঙ্গের ব্যবহার

দ্রুতকম্পনশীল তড়িৎতরঙ্গকে অর্থাৎ যে তড়িৎতরঙ্গের দৈর্ঘ্য কম তাহাকে 'ক্ষুদ্র তরঙ্গ' নামে বৈজ্ঞানিকগণ অভিহিত করিয়া থাকেন। বেতার বার্ত্তায় অথবা রেডিওতে এইরূপ দ্রুতকম্পনশীল ক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা অনেক আজকাল প্রায়ই শুনিয়া থাকি। চিকিৎসাবিজ্ঞানে কিন্তু এইরূপ তড়িৎতরঙ্গের ব্যবহার বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। মনুষ্যদেহের কোষসমূহ এই তরঙ্গ প্রয়োগে প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে; দেহের উত্তাপ সমধিক বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ পক্ষে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দ্বারা যে ইচ্ছানুসারে মানুষের দেহে জ্বরের সঞ্চার করা যায়, তাহা পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

উক্ত ক্ষুদ্র তরঙ্গের দ্বারা কীটের উৎপাত হইতে শস্যসমূহকে রক্ষা করা যায় কি না—এই সমস্যা লইয়া আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ কিছুদিন যাবৎ গবেষণা করিতেছেন। যে তরঙ্গের প্রভাবে মানুষের শরীরে দুরন্ত জ্বররোগ প্রবেশ করানো যায়, তাহাতে কি ক্ষুদ্র কীটের প্রাণনাশ হইতে পারে না? মিঃ ডেভিস্ নামক জনৈক আমেরিকান বৈজ্ঞানিক এই সমস্যার নিরাকরণে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

ভাণ্ডারে সঞ্চিত শস্যকণাকে কীটের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে আলোবাতাসে বাহির করিয়া ঝাড়িয়া আবার ঘরে তুলিবার প্রথা সকল দেশেই প্রচলিত আছে। এই প্রক্রিয়ায় কীটের ডিম্ব অথবা পরিণত কীটের অত্যাচার কিছু কালের জন্য নিবারিত হয় বটে, কিন্তু কোন স্থায়ী উপকার পাওয়া যায় না; কারণ ইহাতে ডিম্বগুলি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না, আবার গুদামজাত করিলেই ডিম ফুটিয়া নূতন কীট বাহির হয় এবং শস্যের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলে। দ্রুতকম্পনশীল ক্ষুদ্র তড়িৎতরঙ্গ প্রয়োগ করিয়া যদি এই সকল শস্যকণাকে সযত্নে ভাণ্ডারে রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে বহু দিবস পর্য্যন্ত তাহারা বেশ ভাল থাকে, কেবল গোলাজাত শস্যে যাহাতে যথোপযুক্ত বায়ুরের মুক্ত বাতাস লাগিতে পারে এবং ভাণ্ডারগৃহ কোনরকমে স্যাঁতস্যাঁতে হইয়া না যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। শুধু আলোবাতাস লাগাইয়া ঝাড়িয়া তুলিলে তাহাতে যে আশানুরূপ ফললাভ হয় না তাহা নহে, পুনঃপুনঃ ঘরবাহির করিতে এবং ঝাড়িতে বহু শস্যের অপচয়ও ঘটে।

ঘৃণজাতীয় কোন কোন কীট শস্যকণার দেহ ছিদ্র করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডিম পাড়ে এবং ছিদ্রপথ এমনভাবে রুদ্ধ করিয়া ফেলে যে বাহির হইতে তাহাদের অস্তিত্ব কিছুমাত্র সন্দেহ করা যায় না। তৎপর তিন চারি সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয় এবং ক্রমে শস্যের শাঁস খাইয়া তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। রেডিও-তরঙ্গ প্রয়োগ করিয়া এই প্রকার কীটের উৎপাত হইতে শস্যকে রক্ষা করা সম্ভবপর কিনা মিঃ ডেভিস্ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি তিরিশ এবং ছয় মিটার অর্থাৎ প্রায় ১১৮১ এবং ২৩৮ ইঞ্চি—এই দুই প্রকার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িৎতরঙ্গ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ৯০ সেকেণ্ড প্রয়োগের ফলে ৩০ মিটার দীর্ঘ তরঙ্গ পরিণত কীটকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু ডিমগুলিকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু ৬ মিটার দীর্ঘ তড়িৎতরঙ্গ মাত্র ৬ সেকেণ্ডেই ডিম, শুক কীট এবং পরিণত কীট সকলকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে পারিয়াছে।

আমেরিকাতে বর্তমানে শস্যসংরক্ষণে এই প্রকার রেডিও-তরঙ্গের ব্যবহার ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে কীট ধ্বংস হয়, কিন্তু বীজশস্যের অঙ্কুরোদ্গমশক্তি বিনষ্ট হয় না; পরন্তু গম, যব প্রভৃতি কোন কোন শস্যে তরঙ্গপ্রয়োগ ফলে এই শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও তো আজকাল রেডিওর ব্যবহার ক্রমেই বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। নিছক গানবাজনা এবং সংবাদ-প্রেরণের জন্যই উহাকে নিয়োজিত না রাখিয়া এই প্রকার জনহিতকর কার্যে উহার ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে সাধারণের বিশেষতঃ দরিদ্র কৃষকের বহু উপকার সাধিত হইতে পারে। আমরা এই বিষয়টির প্রতি কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পজিট্রন

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে ঋণতড়িৎযুক্ত কণা 'ইলেকট্রন' বিজ্ঞানজগতে প্রথম আবিভূর্ত হয়, তাহার ওজন একটি হাইড্রোজেন-পরমাণুর ওজনের $\frac{১}{১৮৪০}$ অংশ। কিছুদিন হইল আর একটি নূতন কণা আবিষ্কৃত হইয়াছে,—তড়িৎশেশহীন এবং ওজনে প্রায় হাইড্রোজেন-পরমাণুর সমান; তাহার নাম 'নিউট্রন'। এই নিউট্রন সম্পর্কে আমরা 'প্রকৃতি'তে পূর্বে (৮ম বর্ষ, ৪১৮ পৃষ্ঠা) আলোচনা করিয়াছি। অধুনা ধনতড়িৎযুক্ত আরও একটি অভিনব কণা বিজ্ঞানাকাশে দেখা দিয়াছে। বৈজ্ঞানিক এণ্ডারসন তাহার নাম দিয়াছেন 'পজিট্রন'। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, বস্তুতঃ পক্ষে ইহা ধনতড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন মাত্র। 'কস্‌মিক'রশ্মি লইয়া গবেষণা করিতে তাঁহারা সর্বপ্রথম এই পজিট্রনের অস্তিত্বের আভাস পান। কস্‌মিকরশ্মি অসীম শূন্যের অন্তর হইতে নির্গত হইয়া অব্যাহত গতিতে পৃথিবীপৃষ্ঠে আসিয়া পৌঁছায়, সাধারণ আলোকরশ্মি যে সকল পদার্থ ভেদ করিতে পারে না, কসমিক রশ্মি তাহাদিগকেও অনায়াসে অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসে।

এণ্ডারসন উইলসনপ্রবর্তিত মেঘপ্রকোষ্ঠ • সহযোগে কস্‌মিকরশ্মির প্রকৃতি নির্দ্ধারণকল্পে নানাবিধ পরীক্ষা করিতেছিলেন। এই প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিবার কালে কসমিকরশ্মিপথবর্তী 'আয়ন'-গুলির দেহে ঘনীভূত বাষ্পবিন্দু সঞ্চিত হইয়া যায় এবং যে পথ স্বভাবতঃ অদৃশ্য তাহা নয়নগোচর হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় এই রশ্মিপথের আলোকচিত্রও গ্রহণ করা চলে। রশ্মিগুলি প্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়া নিম্নাভিমুখে গমন করে এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বক্র হইয়া যায়। পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই সকল রশ্মিপথের কতকগুলি ধনতড়িৎযুক্ত কণা এবং কতকগুলি ঋণতড়িৎযুক্ত কণার দ্বারা উৎপন্ন। ধনতড়িৎযুক্ত কণার প্রভাবজাত রশ্মিপথে যে 'আয়ন'-এর সৃষ্টি হয় তাহা বিচার করিয়া এণ্ডারসন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঐ ধনতড়িৎযুক্ত কণাগুলি প্রধানতঃ প্রোটন এবং ঋণতড়িৎযুক্ত কণাগুলি ইলেকট্রন। কিন্তু পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে একমাত্র ইলেকট্রন এবং প্রোটনই যে ঐরূপ রশ্মিপথের সৃষ্টি করে তাহা নহে। কারণ এণ্ডারসন

• প্রকৃতি, ৮ম বর্ষ, ৩১৭ পৃষ্ঠা এবং ৯ম বর্ষ, ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এমন একটি রশ্মিপথের সন্ধান পাইয়াছেন যাহা প্রকোষ্ঠমধ্যে কসমিকরশ্মির নিম্নাভিমুখী গতি স্বীকার করিয়া লইলে কোন রকমেই প্রোটনজাত বলিয়া নির্দেশ করা চলে না। এণ্ডারসন তাঁহার পরীক্ষায় যে চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে প্রোটনজাত বক্র পথের দৈর্ঘ্য প্রকোষ্ঠ-মধ্যে ৫ মিলিমিটারের অধিক হওয়া সম্ভবপর নয়, কিন্তু বর্ত্তমান বক্র পথটি ছিল কিঞ্চিদধিক ৫ সেণ্টিমিটার দীর্ঘ। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই বক্র পথটির সৃষ্টিকর্ত্তা এমন একটি ধনতড়িৎযুক্ত কণা যাহার ওজন সাধারণ ঋণতড়িৎবাহী ইলেকট্রনের সমতুল্য। ধনতড়িৎযুক্ত ইলেকট্রনের ইহাই সর্ব্বপ্রথম আভাস। অতঃপর এণ্ডারসন কসমিকরশ্মিপথের ১৩০০ শত আলোকচিত্রের মধ্যে এইরূপ ধনতড়িৎযুক্ত ইলেকট্রনজাত ১৫টি বক্র পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহাদের তড়িতাবেশ খুব সম্ভবতঃ প্রোটনের তড়িতাবেশের সমান, এবং এই তড়িতাবেশ যদি যথার্থ হয় তাহা হইলে রশ্মিপথের বক্রতার ও আয়নসৃষ্টির পরিমাণ দেখিয়া মনে হয় ইহাদের ওজন ইলেকট্রনের ওজন অপেক্ষা ২০ গুণ কম হইবে। এমন কতকগুলি রশ্মিপথও পাওয়া গিয়াছে যাহার সৃষ্টিকর্ত্তা ইলেকট্রনের সমান-ওজনবিশিষ্ট ধনতড়িৎযুক্ত কতকগুলি কণা। এই কারণেই এণ্ডারসন ইহাদের নাম দিয়াছেন "পজিট্রন"। ইহাদের আয়নসৃষ্টির শক্তি, গতিপথের দৈর্ঘ্য এবং চৌম্বক ক্ষেত্রজনিত গতিপথের বক্রতা প্রভৃতি বিচার করিয়া দেখিলে ইহারা যে প্রোটন নহে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। সুতরাং পজিট্রন আবিষ্কারের নিঃসংশয় প্রমাণ এখনও বৈজ্ঞানিকগণের হস্তগত না হইলেও ধনতড়িৎযুক্ত ইলেকট্রনের অস্তিত্বের যে একটা আভাস পাওয়া গিয়াছে সে কথা অস্বীকার করা চলে না। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন কসমিকরশ্মির আঘাতে মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস বিশ্লিষ্ট হইয়াই ইহাদের সৃষ্টি হয়।

সমগ্র বিজ্ঞানজগৎ পজিট্রনের পরিণতি দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে।

বাংলাভাষা ও শিক্ষার বাহন

বাংলাভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চ্চার তথা শিক্ষার বাহনরূপে বাংলাভাষার গভীর প্রয়োজনীয়তার কথা বহু বার আমরা 'প্রকৃতি'তে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বাঙ্গালী শিক্ষক ও অধ্যাপকমণ্ডলী এবং শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষীয়েরা যে আমাদের মতবাদটি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন অথবা দ্বিধাবিহীন চিত্তে তাহার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন, সে প্রমাণ এখনও আমরা যথেষ্ট পরিমাণে পাই নাই। বস্তুতঃ পক্ষে বাংলার ঘরে ঘরে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মহামূল্য বাণী পৌঁছাইয়া দিতে হইলে বর্ত্তমান শিক্ষার ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া মাতৃভাষার সরস ও সহজ ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া যে তাহাকে প্রবাহিত করিতে হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। এতৎসম্পর্কে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া দেখিবার সময় অবশ্যই আসিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"শিক্ষার দুর্গতি আজ অসীম। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে এসে এই চেষ্টা, এই প্রশ্ন। মাতৃভাষায় আজ তার উদ্ধারের কী হবে না? • • •

বস্তুতঃ আধুনিক শিক্ষা ইংরেজী ভাষা বাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশ পথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজী খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয়, এমন বাঙ্গালীর ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি-এণ্ড-ও কোম্পানীর ডিনার কামরায় যখন খেতে বসে, তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটাছুরির দৌত্যতার পথ বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের সম্পূর্ণ দাবী মিটিতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা, আছে সবই অথচ মাঝ পথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। * * * বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মত উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি, তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক বঙ্গভূমির দিগদিগন্তরে। সমস্ত দেশের চিত্তক্ষেত্র আজ পরিপূর্ণ হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে-পল্লবে। মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙ্গালীচিত্তের মরা নদীর রিক্তপথে বান ডেকে বয়ে যাক দুইকূল-পূর্ণ চেতনায়; ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।"

আমরা একান্তমনে প্রার্থনা করি, কবির আবেদন জয়যুক্ত হউক।

প্রফুল্লজয়ন্তী উৎসব

বিগত ২৫শে অগ্রহায়ণ ১১ই ডিসেম্বর আজন্ম ব্রহ্মচারী পবিত্রচিত্ত রাসায়নিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসী এবং শ্রদ্ধাবনত ছাত্রবৃন্দ কলিকাতা টাউনহলে এক অভিনন্দন-উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ছিলেন এই অভিনন্দন-সভার সভাপতি। সুপ্রশস্ত টাউনহলে বাংলার বহু কৃতি সন্তান এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত বহু মনীষী উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনাড়ম্বর সরল জীবনযাপন কাহারও অবিদিত নাই। চিরজীবন ব্রহ্মচারীর ব্রতধারণ করিয়া তিনি জ্ঞানাহরণ ও জ্ঞানবিস্তারকল্পে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। ইংরাজীতে যাহাকে Plain living and high thinking বলে, তাঁহার জীবন ও চরিত্র সেই বাক্যের আদর্শস্থল। ছাত্রদের প্রতি তাঁহার স্বতোৎসারিত প্রীতি, দরিদ্র ছাত্রদের জন্য তাঁহার মানসিক উৎকণ্ঠা—তাহাদের অভাবে তাঁহার আনুকূল্যদান বাংলাদেশে তথা সমগ্র ভারতে আজ সুপরিচিত। অথচ এই বিখ্যাত রাসায়নিক, এই দরিদ্রবন্ধু অধ্যাপক আত্মভোলা মহাত্মাকে দেখিলে চিনিতে পারা যায় না—এমনই সাদাসিধে তাঁহার আচারব্যবহার ও পোষাকপরিচ্ছদ। এই কারণেই জয়ন্তী সমিতিও অভিনন্দন উপলক্ষ্যে কোন অযথা আড়ম্বর বা কোলাহলের সৃষ্টি করেন নাই। তাপস বৈজ্ঞানিকের জয়ন্তী উৎসব তপোবনের শান্ত নিরাভরণ সৌন্দর্য্যেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

চারিটার সময় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি সার নীলরতন সরকার এবং সমিতির সদস্যগণ মূল সভাপতি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া কবিবর ও আচার্য্যদেবকে সংবর্দ্ধনা করেন। তারপর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যথারীতি সভাপতি বরণ করিলে সমস্বরে একটি উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। অতঃপর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে মাল্য চন্দনাদির দ্বারা বরণ করা হইলে শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার জয়ন্তী সমিতির পক্ষ হইতে অভিনন্দন পাঠ করেন এবং 'প্রকৃতি'সম্পাদক মহাশয় দেশবিদেশের বহু মনীষীর রচনারাজি দ্বারা সমলঙ্কৃত প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ "আচার্য্য রায় স্মারক গ্রন্থ"খানা আচার্য্যদেবের চরণে উপহার প্রদান করেন। তৎপর আরও বহু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সমিতির পক্ষ হইতে আচার্য্যদেবকে অভিনন্দিত করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করা হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র অতি সুললিত ভাষায় এই সকল মানপত্রের একযোগে উত্তর প্রদান করিলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একটি নাতিদীর্ঘ রচনা পাঠ করিয়া আচার্য্যের প্রতি তাঁহার সুগভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তৎপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

যে দরিদ্র ছাত্রগণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রাণস্বরূপ, সর্ব্ববিধ প্রযত্নে তিনি যাহাদের অভাবমোচন দ্বারা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে আজীবন ব্রতী রহিয়াছেন, সেই দরিদ্র ছাত্রগণের সাহায্যার্থে ছাত্রবন্ধু প্রফুল্লচন্দ্রের জয়ন্তী উপলক্ষ্য করিয়া একটি "ছাত্র-ভাণ্ডার" সংস্থাপনের সংবাদ উৎসব বাসরে ঘোষিত হইয়াছে। "আচার্য্য রায় স্মারক গ্রন্থ" এবং এই "ছাত্র-ভাণ্ডার"স্থাপন জয়ন্তী উৎসবের সর্ব্বপ্রধান এবং স্থায়ী অঙ্গ সন্দেহ নাই। ইহারাই জয়ন্তী সমিতির জাঁকজমক ও কোলাহলহীন প্রচেষ্টাকে সার্থক গৌরবে মহিমান্বিত করিয়াছে।

অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

দীর্ঘ ছয়মাস কাল রোগ ভোগ করিবার পর বিগত ১লা জানুয়ারী তারিখে অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তত্রত্য জিলা স্কুলে তাঁহার প্রথম শিক্ষারম্ভ হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের এফ-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হন এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজ হইতেই কৃতিত্বের সহিত ভূতত্ত্ববিদ্যায় প্রথম বিভাগে এম-এ পাশ করেন। ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্ববিভাগে ডিমন্‌ষ্ট্রেটরের পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি অবশেষে ঐ কলেজের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক এবং ডিপার্টমেন্টের সর্ব্বময় কর্ত্তার পদে উন্নীত হন। তিনি ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী এবং সুখেদুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা হইয়া তিনি আজীবন জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। অর্থচিন্তা বা প্রতিষ্ঠালাভের বাসনা কখনও তাঁহাকে তাঁহার তপস্যা হইতে পরাঙ্মুখ করিতে পারে নাই,—তিনি অনন্যচিত্ত হইয়া বিজ্ঞানের গবেষণা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকেই চিরদিন শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি প্রতিষ্ঠার সন্ধান করিয়া ফিরেন নাই বলিয়াই প্রতিষ্ঠা নিজে আসিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়াছে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ত্বশাখার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত একবার বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখার সভাপতিও তিনি হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক

বিভাগের শিক্ষাকার্য্যের সঙ্গে তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; তিনি ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের একজন সভ্য এবং অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম "ফেলো" মনোনীত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক দাশগুপ্ত ভারতবর্ষীয় জিওলজিক্যাল, মাইনিং এণ্ড মেটালার্জিক্যাল সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং আমরণ ইহার অন্যতর যুগ্ম সম্পাদকরূপে তিনি অক্লান্তভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপক দাশগুপ্তের উদার ও সরল হৃদয়ের মধুর ব্যবহার, কর্ত্তব্যে অবিচলিত নিষ্ঠা এবং চরিত্রবল অনুকরণীয়। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও সহানুভূতি এবং আশ্রিত জনের প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ ব্যবহার তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকে রমণীয় করিয়াছিল।

বাংলা সাহিত্য—বিশেষতঃ বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য তাঁহার পরম আদরের বস্তু ছিল। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বৈজ্ঞানিক পরিভাষাগঠনে বহু প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। "প্রকৃতি"ও তাঁহার সস্নেহ সহানুভূতি প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃতির একজন উৎসাহী লেখক এবং পরম হিতৈষী বন্ধু। এইরূপ একটি কর্ম্মময় জীবনের অকাল অবসানে বাংলার বিজ্ঞানভারতী একজন প্রকৃত সাধকের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, বাংলার বিজ্ঞানসাহিত্য একজন একনিষ্ঠ সেবক হারাইয়াছে।

সহযোগী সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ

আমাদের দেশের গাছপালা—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন, এল্-এ-এম্-এস্ (ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৩৯)

অ্যালফ্রেড বার্ণহার্ড নোবেল—শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, এম-এ, বি-এল (সুবর্ণবণিক সমাচার, মাঘ ১৩৩৯)

জল—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্ (স্বাস্থ্য সমাচার, মাঘ ১৩৩৯)

জ্যোতিষের কথা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এল (সৌরভ, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩৯)

শ্বাতাস—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্ (স্বাস্থ্য সমাচার, চৈত্র ১৩৩৯)

রেকর্ডের জন্মকথা—শ্রীভবানীশঙ্কর বসু (ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৩৯)

সর্দ্দি— (স্বাস্থ্য, পৌষ ১৩৩৯)

সর্দ্দি হইতে বাঁচিবার উপায়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ (স্বাস্থ্য, ফাল্গুন ১৩৩৯)

সচিত্র বৈজ্ঞানিক পত্রিকা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৬৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক

শ্রীসত্যচরণ লাহা

৯ম বর্ষ

১৩৩৯ সাল

কলিকাতা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৯৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

লেখক সূচী

আলোচনা *

পুস্তক সমালোচনা †

অ

অধ্যাপক শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত, বি-এ—
পৃথিবীর দেহগঠন ৮০, ১৫৬

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, এম-এস-সি, আই-ই-এস—
প্রসরণশীল বিশ্ব ১৪৭

আ

অধ্যাপক শ্রীআনন্দকিশোর দাসগুপ্ত, এম-এ, বি-এস-সি—
সোডাপ্রস্তুতের ইতিহাস ২২৫

এ

ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম-এস-সি, এম-ডি—
বাংলার মৎস্যগুলির বৈজ্ঞানিক নাম ... ৫৮,১০৩,১৭১
চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় কথিত
কয়েকটি পশুর পরিচয় ২৩৪

ক

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য, বি-এস-সি—
গ্রহগণের জন্মকথা বা জড়ের জন্মমৃত্যু রহস্য ... ১৬
জড়ের উপাদান ২০৭

গ

শ্রীকালিপদ বিশ্বাস, এম-এ—
* ইন্দুদী ১৯০

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—
ফনোফিল্ম বা সবাক চলচ্চিত্র ১

শ্রীগণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন—
* ইন্দুদী ৬৫

অধ্যাপক শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার, এম-এস-সি—
বাঙ্গালীর নামকরণে উদ্ভিদ ১৭৯

জ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়—
জলস্তম্ভ ২৬০
কেরোসিন তেল ২৮
বংশানুবর্তন ১২৫

ঘ

কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, এম-এস-সি—
আয়ুর্ব্বেদের ত্রিধাতু ৩৬,৮৯
আমরা শ্রান্ত হই কেন? ২৫৬

প

ডাঃ শ্রীপূর্ণেন্দু সেন, এম-এস-সি, পি-এচ্-ডি, ডি-আই-সি—
† জীব জগৎ ২০০

ব

শ্রীবিজনবিহারী দত্ত—
ভারতের গাছ ১৩৩,১৮৪

ম

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ—
মকরধ্বজ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১১১

ল

শ্রীলক্ষ্মণলাল বর্ম্মণ—
মৃত্তিকা ২৫৩

শ

অধ্যাপক শ্রীশরৎচন্দ্র মিত্র, এম-এ—
সম্বলপুরে নরবলি ১৬৯
জলপাইগুড়িনিবাসী নেপালীদিগের একটী ধর্ম্মমূলক বিশ্বাস ২৩১
শ্রীশিবনাথ—
একপাদ ২৩৯

স

ডাঃ শ্রীসত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ডি-এস-সি ও ডাঃ শ্রীসুবোধগোবিন্দ চৌধুরী ডি-এস্-সি—
কণাদল (কোলয়ড্) ৭৩

ডাঃ শ্রীসত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ডি-এস-সি—
কয়লা ১৫৩
শ্রীসত্যভূষণ সেন—
প্রাচীন হিন্দুর উদ্ভিদতত্ত্ব ২৪৯
অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট—
† গঙ্গা ১৪২

হ

শ্রীহীরালাল দত্ত, এম-এস-সি—
ইলেকট্রন ৪৯

বিষয় সূচী

বিবিধ *
পুস্তক সমালোচনা †
আলোচনা শ্ব

অ

* অভিনব হাইড্রোজেন-পরমাণু ২৬৮
* অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ২৭৩

আ

আয়ুর্ব্বেদের ত্রিধাতু ৩৬,৮৯

ই

ইলেক্ট্রন ৪৯
শ্ব ইন্দুদী ৬৫,১৯০

এ

একপাদ ২৩৯
* এভারেষ্ট অভিযান ১৯৭

ক

কেরোসিন তেল ২৮
কণাদল (কোলয়ড্) ৭৩
* কারেণ্ট সায়েন্স ১৪১
কয়লা ১৫৩
কীটদমনে তড়িৎতরঙ্গের ব্যবহার ২৬৯
† গঙ্গা ১৪২

গ

গ্রহণের জন্মকথা বা জড়ের জন্মমৃত্যুরহস্য ... ১৬

চ

চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় কথিত কয়েকটী পশুর পরিচয় ... ২৩৪

জ

জড়ের উপাদান ২০৭

জলপাইগুড়িনিবাসী নেপালীদিগের একটী
ধর্ম্মমূলক বিশ্বাস ২৩১

† জীবজগৎ ২০০

• জাতীয় জীবনে ভূতত্ত্বের স্থান ১৯৫

• জার্ম্মানীতে ইহুদীপীড়ন ১৯৯

দ

• দন্তক্ষতে ভিটামিন্ ডি ৬৯

প

• পঞ্জিটুন ২৭০

পৃথিবীর দেহগঠন ৮০,১৫৬

প্রসরণশীল বিশ্ব ১৪৭

প্রাচীন হিন্দুর উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ২৪৯

• অধ্যাপক পিকার্ডের গগনপর্য্যটন... ... ১৩৯

• প্রফুল্ল জয়ন্তী ৬৮

• প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসব ২৭২

ফ

ফনোফিল্ম বা সবাক চলচ্চিত্র ১

ব

• বাংলা ভাষা ও শিক্ষার বাহন ২৭১

বাংলার মৎস্যগুলির বৈজ্ঞানিক নাম ... ৫৮,১০৩,১৭১

• বিজ্ঞান ও মানবজীবন ৭০

বংশানুবর্ত্তন ১২৫

বাঙ্গালীর নামকরণে উদ্ভিদ ১৭৯

ভ

ভারতের গাছ ১৩৩,১৮৪

ম

মকরধ্বজ ও আধুনিক বিজ্ঞান ১১১

• ম্যালেরিয়ার নূতন ঔষধ ১৪১

• মনুষ্যদেহে "জীবন রশ্মি" ১৯৭

মৃত্তিকা ২৫৩

স

সম্বলপুরে নরবলি ১৬৯

সোডাপ্রস্তুতের ইতিহাস ২৪৮

চিত্র সূচী

ই

ইহুদী—

চিত্র ১— ১৯৩

এ

একপাদ—

চিত্র ১— ২৩৯

চিত্র ২— ২৪২

চিত্র ৩— ২৪৮

ক

কর্ণাদল—

চিত্র ১— ৭৪

চিত্র ২— ৭৫

চিত্র ৩— ৭৬

চিত্র ৪— ৭৮

কমলা—

চিত্র ১— ১৫৩

চিত্র ২— ১৫৪

জ

জলস্তম্ভ—

চিত্র ১—ভূমধ্যসাগরে দৃষ্ট কয়েকটি জলস্তম্ভ ... ২৬১

চিত্র ২—নিউ-সাউথ-ওয়েলসের উপকূলে দৃষ্ট জলস্তম্ভ ... ২৬২

ফ

ফনোফিল্ম বা সবাক চলচ্চিত্র—
চিত্র ১— ৬
চিত্র ২— ৮
চিত্র ৩— ৯
চিত্র ৪— ১০
চিত্র ৫— ১২
চিত্র ৬— ১৩
চিত্র ৭ (ক) ১৪
চিত্র ৭ (খ) ১৪
চিত্র ৮— ১৫

ম

মকরধ্বজ ও আধুনিক বিজ্ঞান—
চিত্র ১ (ক)—বালুকা যন্ত্র ১১৩
চিত্র ১ (খ)—বালুকা যন্ত্র ১১৩
চিত্র ২ (ক)—পারদপরিস্রবণ প্রণালী ... ১২৩
চিত্র ২ (খ)—পারদপরিস্রবণ প্রণালী ... ১২৩

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

OPINION OF

Dr. Satya Churn Law, M.A., B.L., PH.D., F.Z.S., M.R.A.S.U.
Editor, PRAKRITI.

I make no secret of the fact that whenever I have occasion to require the services of a block-maker to skilfully manipulate the intricacies or niceties of a difficult illustration, I always entrust the Indian Photo Engraving Company with such work.

Satya Churn Law

24 Sukias St.
Calcutta
19th July 1926.

THE INDIAN PHOTO ENGRAVING CO.
Process Engravers and Colour Printers
217, Cornwallis Street, Calcutta
Telephone—B.B. 2905
Telegram—"DUOTYPE"
Calcutta.

১৭

নারায়ণ নমঃ

দণ্ডি বাবা দত্ত বিনামূল্যে

হাঁপানী, কাশির ঔষধ বিতরণ

এই ঔষধ তাঁমার মাদুলী করিয়া গলায় ধারণ করিতে হয়, প্রতি দিন চরণামৃতের ন্যায় মাদুলী ধৌত করিয়া পান করিবেন, ঔষধ ধারণের পূর্ব্বে এই কবজটী পঞ্চগব্য দ্বারায় নারায়ণকে যে রূপ স্নান করান সেই মত করিবেন, ঐ পঞ্চগব্য ১০ বার গায়ত্রীর দ্বারায় শোধন করিবেন, আর কিছু মিষ্টান্ন নারায়ণকে নিবেদন করিয়া রোগী নিজ হস্তে একটী ব্রাহ্মণকে দিবেন (ঐ মিষ্টান্ন যেন কলের চিনির না হয়।) ২১ দিবস শাক, অম্ল, কলাইয়ের ডাল খাওয়া নিষেধ। স্ত্রীলোক মাসিক অপবিত্র হইলে তাহাকে তিন দিবস স্পর্শ নিষেধ। তামাক সম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তু জন্মের মত ত্যাগ করিবেন, প্রতি দিবস ১০৮ নারায়ণের নাম স্মরণ করিবেন।

২১ দিবস পরে রোগী যেমন থাকেন সংবাদ দিবেন ইতি

ঠিকানা—
শ্রীবীরেশ্বর ঘটক
সাতগাছিয়া পোষ্ট (বর্দ্ধমান)
ভায়া' মেমারি ষ্টেশন।